নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল ঃ সমাজ ভাবনা

তারাপদ বসু

NARASINGA BASUR DHARMAMANGAL : SAMAJ BHABANA
By Tarapada Basu

প্রথম প্রকাশ — ইং-২৭.০৮.২০০০

প্রকাশক — রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদ
৮৯ ডি. এন. মিত্র লেন,
বর্ধমান - ১, পিন — ৭১৩১০১

প্রচ্ছদ বিন্যাস ঃ কবি নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যের পুঁথি পৃষ্ঠার অংশ ও
জুঝুটির ধর্মরাজ ঠাকুর।

ফটো ঃ লেখক

উৎসর্গ

পরম পূজ্যপদ কাব্যকার নবম পূর্বপুরুষ
স্বর্গীয় কবি নরসিংহ বসুর
চরণকমলে
ও

যাঁর অকৃপণ সাহায্য সহযোগিতা ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়েছে নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যের গবেষণা কার্যে এবং যাঁর স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ বর্ত্তমান লেখককে এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে সেই পরম পূজ্যপদ স্বর্গীয় পিতা উমাচরণ বসুর

পাদপদ্মে
ও
মাতা পঙ্কজিনীদুর্গারাণী বসুর
পদ যুগলে
শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে নিবেদিত
হল এই গ্রন্থ।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

আমার লেখা আরম্ভ করার আগে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই নবম পূর্বপুরুষ স্বর্গীয় কবি নরসিংহ বসু ও স্বর্গীয় পিতা উমাচরণ বসুকে। আর নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের সামাজিক বিশ্লেষণ ও কাহিনীর গদ্যরূপ দিয়ে কবি নরসিংহ বসুকে নিবেদন করি আমার অন্তরের বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি - এবং উমাচরণ বসুর রচিত কয়েকটি ভক্তিগীতি এই গ্রন্থে প্রকাশ করে তাঁকে জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লেখকের নিবেদন

আমার উর্দ্ধতন নবম পুরুষ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনার পটভূমি হিসাবে এক অলৌকিক ঘটনার কথা বাবার কাছে শোনার পর সেই কাব্য পড়ার বিশেষ আগ্রহ জেগেছিল, কিন্তু হাতের কাছে কোন পুঁথি না পাওয়ায় সেই ইচ্ছা বহুদিন অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল। বাবার কাছে শুনেছিলাম নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যের পুঁথি আছে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু সেই পুঁথি তখন সংগ্রহ করা যায় নাই। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ১৯৬৯ সালের শুভ বিজয়া দশমীর পরদিন দেবদূতের মতো আমাদের বাড়িতে বাবার কাছে উপস্থিত হলেন মেদিনীপুরের রামচন্দ্রপুর রাইসুদ্দিন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক শ্রী সুকুমার মাইতি মহাশয়। আমিও সেই সময় শিক্ষকতা করতাম, কয়েকদিনের জন্য বাড়ি এসেছি, সুকুমার বাবুর সঙ্গে আলাপ হল, তাঁর কাছে জানলাম যে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ড. বিজন বিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের অধীনে নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল নিয়ে গবেষণা রত। এ কাজে কঃ বিঃ সংগৃহীত দুখানি ও তাঁর সংগৃহীত দুখানি পুঁথি গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে। তিনি দুখানি পুঁথি সংগ্রহ করেছেন ময়নাগড়ের রাজবাটী থেকে তাঁর শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের সহায়তায়। আর তাই তিনি বাবার কাছে এসেছিলেন বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে. বাবাও সুকুমার বাবুকে নানা তথ্য সরবরাহ করে তাঁর গবেষণা কার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন, আর সে কথা ড. মাইতি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁর গবেষণাপত্র 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' গ্রন্থের সম্পাদকীয় কলমে উল্লেখ করে লিখেছেন — ''অকৃপণ সাহায্য লাভ করেছি কবি নরসিংহ বসুর অধস্তন অষ্টম পুরুষ উমাচরণ বসু মহাশয় ও ওঁর পরিবারের কাছে। ক্ষেত্র অনুসন্ধানে গিয়ে ওঁদের আতিথ্যলাভ করেছি বেশ কয়েকদিন, শুধু তাই নয় মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে উমাচরণ বসু মহাশয় আমার গবেষণা কর্মে প্রভূত সহায়তা করেছেন। ঐ সময় তিনি প্রায়ই চিঠির মাধ্যমে আমার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন।

উমাচরণ বসুর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ড. সুকুমার মাইতি মহাশয়কে জানাই অশেষ ধন্যবাদ, আর একাগ্র চিত্তে নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করে নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যের গবেষণা কার্যে সফলতা অর্জন করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করার জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের পর দীর্ঘ তিরিশ বৎসর ধরে সংগ্রাম করে তাঁর গবেষণা পত্র প্রকাশ করে তাঁর সম্পাদিত 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' গ্রন্থের একটি কপি এক বিশেষ লিপিসহ বর্ত্তমান লেখকের কাছে প্রেরণ করার জন্য তাঁকে জানাই নরসিংহ বসু তথা উমাচরণ বসু পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক

ধন্যবাদ। ডঃ. সুকুমার মাইতি মহাশয়ের গবেষণা পত্রটি খুবই উচ্চমানের। তাঁর গবেষণা কার্য সাফল্যমন্ডিত হওয়ায় এবং 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' প্রকাশিত হওয়ায় উমাচরণ বসুও স্বর্গ থেকে নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন। তাই উমাচরণ বসুর পরিবারকে তাঁর সম্পাদিত 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' গ্রন্থ প্রেরণের সময় যে লিপি পাঠিয়ে ছিলেন তা এখানে তুলে ধরলাম তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য —

''মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার বিশিষ্ট কবি নরসিংহ বসুর অধস্তন অষ্টম পুরুষ ধর্মপ্রাণ আতিথেয়তাপরায়ণ শাক্ত গীতিকার ঁ উমাচরণ বসু মহাশয়ের বংশধারার অন্যতম প্রাণপুরুষ শ্রীযুক্ত তারাপদ বসু ও তাঁর পরিবার বর্গের করকমলে বর্তমান গ্রন্থসম্পাদকের বিনম্র উপহার রূপে 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' অর্পিত হল।

বিদ্যাসাগরপুর — সুকুমার মাইতি।''

ইন্দা, খড়গপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর

২৯.০১.০২

ড. সুকুমার মাইতি মহাশয়ের কাছ থেকে বহু আকাঙ্খিত 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' গ্রন্থটি পেয়ে বারবার পড়েছি আর মুগ্ধ হয়েছি। বিশেষ করে মুগ্ধ হয়েছি কবির সামাজিক অনুভূতির গভীরতা দেখে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল ধর্মরাজের নির্দেশে তাঁরই পূজা প্রচারের জন্য। কবি নরসিংহ বসুকেও ধর্মরাজ সন্ন্যাসীর বেশে দেখা দিয়ে ও আশীর্ব্বাদ করে ধর্মের গীত রচনার আদেশ দিয়েছিলেন।

'অপূর্ব সন্ন্যাসী এক আসি উপস্থিত।
আশীর্ব্বাদ দিয়া কন গাও কিছু গীত।।'

তারপর কবি যেখানেই গেছেন, যে পথেই গেছেন ধর্মরাজের কৃপায় সেখানেই তাঁর মনে উঠে এসেছে কাব্যের গীত —

'অনাদ্যের আজ্ঞা হইল রচিতে সঙ্গীত।
পথে যাই অকস্মাৎ মনে উঠে গীত।।'

অনাদ্যের আজ্ঞাকেই সম্বল করে কবি তিনশ পাতার অধিক এই ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্রই রচিত হয়েছিল ধর্মরাজের আশীর্ব্বাদে, তাঁর প্রেরণায় ও ইচ্ছায়। তাই যখন দেখি কবি ধর্মের মহিমা বর্ণনার সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন তখন মনে হয় এ সবই কবি ধর্মের নির্দেশ ও ইচ্ছাতেই লিখেছেন। আমরা শ্রীশ্রীগীতাতেও দেখেছি সমাজে মানুষ যখন অনাচারী হয়, ধর্মের অবনতি হয়, অধর্ম বৃদ্ধি পায়, তখন ন্যায়, ধর্ম, সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অনাচারীকে বিনাশের জন্য ভগবান বারবার সংসারে অবতীর্ণ হয়েছেন। তেমনি এখানেও শ্রীশ্রীভগবান ধর্মরাজ সমাজে

ন্যায়, ধর্ম সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার কথা, অনাচারীকে শাস্তি দানের কথা কবির মাধ্যমে বলিয়েছেন। আর কবি সেই সঙ্গে যুক্ত করেছেন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাই কবি বর্ণিত এই সামাজিক দিকগুলি শুধুমাত্র কবির যুগের মধ্যেই সীমা বদ্ধ থাকেনি, যুগে যুগে এই সামাজিক বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাই ভগবান শ্রীশ্রীধর্মরাজের ইচ্ছাকে, কবি নরসিংহ বসুর প্রচেষ্টাকে, পিতা উমাচরণ বসুর আকুলতাকে, এবং গবেষক ড. সুকুমার মাইতি মহাশয়ের পরিশ্রমকে মর্যাদা দিয়ে নরসিংহ বসুর বংশধর হিসাবে তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যের সামাজিক বিশ্লেষণে ব্রতী হই। জানিনা এই কাজ সমাজের কোন কাজে লাগবে কি না, যদি কণা মাত্র কাজে লাগে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। আর কাব্যের সামাজিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি এর গদ্যানুবাদ করার যে প্রয়াস পেয়েছি তা সার্থক হবে যদি পাঠক পাঠিকার কাছে এটি উপভোগ্য হয়।

পরিশিষ্ট অংশে কবি বন্দিত কয়েকটি দেবদেবী ও তাঁদের পূজা পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে যাঁদের সাহায্য বিশেষভাবে পেয়েছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শাঁকারীর হরিসাধন রায়, বঙ্কুবিহারী রায়, মনোরঞ্জন রায়, হারাধন চক্রবর্ত্তী, শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, অলক মজুমদার, অমিত মজুমদার, বিশ্বনাথ দাঁ, জুঝুটির জয়রাম মন্ডল ও তাঁর পরিবার, কেন্না জুঝুটির অজিত গোস্বামী, ঢেকুর বিষ্টুপুরের ভূতনাথ রায়, বুঁয়াইচন্ডীর পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, দক্ষিণ কুলের কালিপদ ঘোষ, কুলীন গ্রামের অমিতা ঘোষ, রাজগঞ্জ রাধাগোবিন্দ পল্লীর আমার সহকর্মী শিশির কুমার ভট্টাচার্য্য ও আমার প্রতিবেশি আত্মীয় শিবপ্রসাদ ঘোষ। এঁদের প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কিছু ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফি সংগ্রহে সাহায্যের জন্য স্নেহাশিষ জানাই অরিজিৎ ঘোষকে। আর বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই ড. সুকুমার মাইতি মহাশয়কে যিনি প্রায় ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে বার করে এনে 'নরসিংহ বসুর এই ধর্মমঙ্গল'কে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আর ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বীরভূমের রাজনগরে যে পাঠান রাজবংশের সূচনা হয়েছিল, ও যে রাজপরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের রাজা আসাদুল্লাহ খাঁ-য়ের উকিল হিসাবে কর্মরত অবস্থায় নরসিংহ বসু তাঁর বিখ্যাত ও সুবৃহৎ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, সেই রাজপরিবারের প্রাচীন রাজদরবার যেখানে কবি বহুসময় অতিবাহিত করেছিলেন, সেই রাজদরবারে ও প্রাচীন রাজবাড়ির অন্যান্য অংশের চিত্র ও তথ্য সংগ্রহকালে যাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি সেই রাজপরিবারের একাদশ প্রজন্মের বর্ষিয়াণ সদস্য শ্রদ্ধেয় রাজাসাহেব মহঃ রফিকুল আলাম খাঁ, ও তাঁর পুত্র মহঃ সফিউল আলাম খাঁ কে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পান্ডুলিপির সংশোধনের কাজে এবং এই পুস্তক সম্পর্কে নানা পরামর্শ দিয়ে আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাই রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি মাননীয় শ্রীসুধীর চন্দ্র দাঁ মহাশয় এবং নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যের

পুঁথির আবিষ্কারক ও গবেষক মাননীয় ড. সুকুমার মাইতি মহাশয়। নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গ ল কাব্যের গবেষক ও বিজন-পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. সুকুমার মাইতি মহাশয় এই গ্রন্থটির একটি মূল্যবান 'মুখবন্ধ' এবং রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি তথা রাঢ় বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণার কাজে নিবেদিত প্রাণ মাননীয় শ্রীসুধীর চন্দ্র দাঁ মহাশয় এই গ্রন্থের একটি 'ভূমিকা' লিখে এবং রাঢ় বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান মাননীয় শ্রীঅরিন্দম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের 'পরিচায়িকা' সংযোজন করে গ্রন্থটির বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেছেন। এঁদের কাছে আমি চির ঋণী রইলাম। এঁদের সকলকে জানাই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিশিষ্ট বন্ধু সহকর্মী তথা গলসী হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রণব কুমার রায় মহাশয়কে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি নানা সাহায্য। এই গ্রন্থ রচনায় যাদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ও সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল — পত্নী শ্রীমতি নমিতা বসু, পুত্র ড. অনুপম বসু, এম. এসসি., এম. ফিল., পি. এইচ. ডি., কন্যা ড. মঞ্জরী সরকার (বসু) এম. এ., পি. এইচ. ডি. এদের জানাই আমার আন্তরিক স্নেহাশিস। ঠাকুরের কাছে এদের মঙ্গল কামনা করি। এরা যেন সুখে শান্তিতে থাকে। আর কবি যেমন ঠাকুর নিরঞ্জনের কাছে তাঁর সকল আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধবের জন্য প্রার্থনা করে ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

'কনেষ্ঠ খুড়োর পুত্র জ্যেষ্ঠ বিশ্বেশ্বর।	'ছোট বেটা রঘুনাথ পৌত্র মধুরায়।
মধ্যম শ্রীগৌরী বসু কনেষ্ঠ সুন্দর।।	এ সভাকে নিরঞ্জন হবে বর দায়।।'
গৌরীর রতন শিবচরণ আখ্যান।	'শোভা মিত্র প্রভৃতি জামাতা গণ যত।
সুন্দরের শঙ্করী চরণ অভিধান।।'	ধনধান্যে কল্যাণে রাখিবে অবিরত।।'

তেমনি ভাবেই কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রার্থনা জানিয়ে বলি —

জামাতা পার্থসারথী সরকার সুকুমার ঘোষ।
পুত্রবধু দেবযানী বসু কন্যা পল্লবী ঘোষ।।
পৌত্রী শ্রেয়া দৌহিত্রী নেহা আর পৃথা।
দৌহিত্র পল্লব আর ভাই্ভগ্নী আছে যেথা।।
যত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিজন।
'এ সভাকে কুশলে রাখিবে নিরঞ্জন।।
কৃপা কর ধর্ম কর সভার কল্যাণ।
প্রত্যেককে বিভব দিবে ধন পুত্রধান।।
কদাচিৎ কেহো যেন দুঃখ নাহি পায়।
সদা সুখে সভাকে রাখিবে ধর্মরায়।।'

আমার কথা শেষ করার আগে সশ্রদ্ধ ভক্তিপূর্ণ প্রনাম জানাই পূর্বপুরুষ কবি

নরসিংহ বসু, স্বর্গীয় পিতা উমাচরণ বসু, মাতা পঙ্কজিনীদুর্গরাণী বসু, আর জ্যেঠা, খুড়া, জ্যেঠি, কাকি, দাদা-দিদি প্রভৃতি সকল পূজ্যপদে।

এই গ্রন্থের বর্ণসংস্থাপনের কাজে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা পেয়েছি বধমান প্রেসে কর্মরত আহম্মদ হোসেনের এবং মুদ্রণের কাজে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি শ্রী প্রদীপ যশ মহাশয়ের এবং তাঁর সংস্থায় কর্মরত সুবোধ নন্দী মহঃ আসিফের। এঁদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

কবি নরসিংহ বসু তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' রচনা শুরু করেন ১৬৩৬ শকাব্দের বাং ১১২১ সালের ১০ ই ভাদ্র। ঐ তারিখের স্মরণে বর্তমান গ্রন্থটি ১০ই ভাদ্র প্রকাশিত হল।

তারাপদ বসু

শ্রীশ্রী সরস্বতী মায়ের কাছে প্রার্থনা

উমাচরণ বসু

বিশ্বব্যাপি হাস্যময়ী
আসছে নিয়ে শুভ্রবেশ।
মধুর ধ্বনী, বিনাখানি,
মুখর করি মোদের দেশ।।
বিদ্যাবানী গ্রন্থখানি
হস্তে লয়ে আগমন।
হংসে চরি, পদ্মোপরি
ছন্দে করি, আহ্বান।।
শিক্ষা মন্ত্র, দীক্ষা কেবল
রক্ষা করে ছাত্রগন।
ভিক্ষা তাদের, লক্ষ্য পথে,
বিদ্যালাভে অনুক্ষণ।।
পুর্ব্বকালে আর্য্যঋষি।
শিষ্য সহ পুষ্প দান।।
মাতৃপদ পূজ্য করি।
জ্ঞানালোকের - অনুষ্ঠান।।
অদ্য মোদের সদ্যাগতা।
শুভ্র, শ্বেত পদ্মাসনা।।
দিব্যজ্ঞানে, ডাকছে কাছে
করতে তাঁরে আরাধনা।।

শিক্ষকগণ ছাত্রসহ
(হয়ে) মায়ের কাছে অধিষ্ঠান।
মন্ত্রপূত পুষ্প নিয়ে
যত্নে করে - অর্ঘ্য দান।।
লব্ধ কীর্ত্তি - ভূবন বসু
ধন্য ছিলেন শাঁকারী গ্রামে।
সেকালেও বহু অর্থ
ব্যয় করেছেন বিদ্যাদানে।।
শিক্ষায়তন সুন্দর গঠন
পত্তন করেন অন্তর দিয়ে।
এখনও রয়েছে পুণ্যে তাঁহার
দাঁড়িয়ে, অমর কীর্ত্তি নিয়ে।।
(কিন্তু) কালের অবাধ স্রোতে
ভগ্ন হতে করেছে শুরু।
আবার ইহা রক্ষা পাবে
(যদি) মহৎ-দৃষ্টি পরে কারু।।
উমাচরনের এই প্রার্থনা
হউক কেহ কীর্ত্তিমান
স্থায়ি রাখতে, অগ্রনী হবে
গ্রামের মহৎ এই প্রতিষ্ঠান।।

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব ঃ পরিচিতি

দ্বিতীয় পর্ব ঃ কবির সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ

পরিশিষ্ট - ১

কবি বন্দিত ও একালের শাঁকারী এবং রাঢ় বাংলার অন্যান্য কয়েকটি গ্রামের দেবদেবী ও তাঁদের পূজা পদ্ধতির বর্ণনা

পরিশিষ্ট - ২

পরিশিষ্ট - ৩

তৃতীয় পর্ব ঃ

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল ঃ গদ্যরূপে রীতিতে

পরিশিষ্ট - ৪

সুকুমার মাইতি
এম. এ. পি. এইচ. ডি. (কলি), বি. এড্ (বিশ্বভারতী)
অবসরপ্রাপ্ত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষক
ও
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
বিজন পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র

বিদ্যাসাগরপুর
পোঃ- ইন্দা, খড়গপুর
মেদিনীপুর-৭২১৩০৫
দূরভাষ ঃ (০৩২২২) ২২৬৮৩৪

মুখবন্ধ

'হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' বা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা ভাষার সাহিত্য ও সৃজন যুগের যে নিদর্শন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য আজও সমানভাবে স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির আদিপর্বে এই গ্রন্থসহ, 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' কাব্য ছাড়া সৃজন পর্বের আর কোন নতুন নিদর্শন আজও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

সৃজন যুগের সাহিত্যের আঙিনা পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় যার কালসীমা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। আর এ যুগেই বাংলা সাহিত্যের শাখা প্রশাখা পল্লবিত হয়ে উঠেছে - শাক্তগীতি, বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি ধারার মধ্যে। সেকালের সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্ম ধরা থাকত পাণ্ডুলিপি আকারে। আধুনিক কালের মত মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় পাঠকও গায়েনদের চাহিদা পূরণের কারণে এক একটি সৃষ্টি লিপিকরদের দ্বারা লিখিত হয়ে হস্তান্তরিত হত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা মানুষের সচেতনতার অভাবে ঐ সকল হাত-লেখা পুঁথির বিপুল পরিমাণ অংশ যেমন বিনষ্টির পথে চলে গিয়েছে তেমনি হাজার হাজার পুঁথি এই বিনষ্টিকে উপেক্ষা করে আজও টিকে রয়েছে আমাদেরই মাঝে আর সেগুলি কখনও কখনও কৌতূহলী আবিষ্কারের আবিষ্ক্রিয়া ও গবেষণার দ্বারা দেশ ও জাতির হারানো কৃষ্টি সভ্যতা ও ইতিহাসকে আমাদের সামনে তুলেঁ ধরতে সহায়তা করছে।

এ যুগেরই এক বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবি নরসিংহ বসু। এঁর কাব্যের খন্ডিত দুখানি পুঁথি আমি আবিষ্কার করে কঃ বিঃ সংগৃহীত ও খন্ডিত দুখানি পুঁথির সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে প্রায় পূর্ণাঙ্গ রূপ দিই। কবির এই কাব্যটি নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করি ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। কঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ড.

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তাম্রলিপ্তিক উপভাষা জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি (১ম ও ২য়) সুবর্ণ স্বাক্ষর, সাহিত্য ইতিহাস অন্বেষণ অনুধ্যান, নরসিংহবসুর ধর্মমঙ্গল, উনিশ ও বিশ শতকের দলিল দস্তাবেজে আইন আদালত ভাষা সমাজ ও সংস্কৃতি, রম্যাণি বীক্ষ্য ও ভারততত্ত্ব, বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্ত, প্রত্যয়, শিলালিপি, এ জীবন সমুদ্র সফেন, শান্তি একটি নমস্কার।

বিজন বিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের অধীনে। এ কাজে প্রধান উৎসাহ দাতা ও সহায়ক ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যাপক ও পুঁথি পরিচারক ড. পঞ্চানন মন্ডল মহাশয়। এই উপলক্ষে কবি নরসিংহ বসুর অনুসন্ধানে তাঁরই পুণ্য বাস্তুভূমি বর্দ্ধমান জেলার খন্ডঘোষ থানার শাঁখারিতে কবিব অধঃস্তন অষ্টম পুরুষ ঁউমাচরণ বসু মহাশয়ের আতিথ্যলাভে ধন্য হই। ঐ সময়েই বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক মাননীয় শ্রীযুক্ত তারাপদ বসু মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিতি লাভের সুযোগ আসে।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে আমার গবেষণা সন্ধর্ভ ডিগ্রী লাভে সমর্থ হলেও এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে। আমার উক্ত গবেষণা সন্দর্ভ 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' অবলম্বন করেই কবির অধঃস্তন নবম পুরুষ শ্রীযুক্ত তারাপদ বসু মহাশয় রচনা করলেন -

'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল ঃ সমাজ ভাবনা'

রাঢ়ভূমির জাতীয় কাব্য ধর্মমঙ্গল। তাই কবি রূপরাম, সীতারাম, রামদাস, ঘনবাম ও নরসিংহ বসু প্রমুখ রাঢ়ভূমির জাতীয় কবি। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে রাঢ়ভূমির লৌকিক দেবতা ধর্মরাজ সহ অন্যান্য দেবদেবী যেমন বন্দিত হয়েছেন তেমনি রাঢ়ভূমির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক কাব্যে উদ্ভাসিত। আমার গবেষণা সন্দর্ভটিতে এই বিষয়গুলির উপর যথাসাধ্য আলোকপাতের চেষ্টা করেছি সেই সঙ্গে কবিসহ কবির বংশপরিচয়, জন্মভূমির পরিচয়, কাব্যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনাও রেখেছি। তা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত তারাপদ বসু মহাশয়ের বর্ত্তমান গ্রন্থখানি রচনার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা এ প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক অন্তত নরসিংহ বসুর কাব্যের গবেষক রূপে আমার কাছে এটি একটি বড় প্রশ্নরূপে দেখা দিয়েছে।

এখানে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল, কোন একজন গবেষক বা ঐতিহাসিক কোন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কখনোই সঠিক এবং সম্পূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ নন। উদ্‌ঘাটিত কোন তথ্যকে সমকালে সত্য বলে জেনে নিলেও আগামী দিনে তা অন্যতর নতুন আলোকে আলোকিত হতে পারে-আর এটাই স্বাভাবিক। এখানেই আসে প্রথম গবেষকের সার্থকতা।

এখন দেখা যাক আমার গবেষণা সন্দর্ভটিকে ভিত্তি করে তিনি কোন্ কোন্ বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন এবং সফলতা অর্জন করে আমাকে উদ্বোধিত করেছেন।

কবির পূর্বপুরুষের আদি গ্রাম বসুধা মিরাসভূমির বিস্তৃতপরিচয়, বীরভূমের রাজনগরের পাঠান রাজ পরিবারের পরিচয় (বংশ লতিকাসহ), কবির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি সমান ভক্তি প্রদর্শন, বহু দেবদেবীর পূজার্চনার অনুপুঙ্খ পদ্ধতি বর্ণনা কবি জীবনের বহু অনালোচিত তথ্য বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচিত হওয়ায় কবি নরসিংহ বসু তথা রাঢ়ভূমিকে গভীরভাবে চেনা ও জানার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এ কাজ করেছেন গৃহবন্দী পুঁথি পড়ুয়ারূপে নয় সরেজমিনে অনুসন্ধান করে। ক্ষেত্র সমীক্ষা করে গবেষণা করা গবেষকের প্রধান গুণ ও কর্তব্য। বর্তমান ক্ষেত্রে তারাপদ বসু মহাশয় সেই গুণের অধিকারী।

ফলে নরসিংহ বসু ও তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যকে যথাযথ ভাবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তারাপদ বসুর এই গবেষণা গ্রন্থটি আমার গ্রন্থের পরিপূরক রূপে কাজ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সে কারণে আমি গর্বিত ও আনন্দিত।

এ গ্রন্থ রচনায় আরও একটি বিষয় তাঁর মৌলিক কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। সমূহ বিষয় বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে আধুনিক জীবন ও মননের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে কোনটি শুভ এবং কোনটি অশুভ সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা সত্য, যা শাশ্বত, সুন্দর তাকে গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দেশের বর্ত্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ণ করেছেন সুক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে। ফলে এ গ্রন্থ সমাজ বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ্, ঐতিহাসিকদের কাছে সমানভাবে গ্রহনীয় হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত মঙ্গলকাব্যগুলির প্রথম প্রকাশনাকে ভিত্তি করে দ্বিতীয় কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সেদিক থেকে তারাপদ বসু মহাশয়ের গ্রন্থটিও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে বলি —

"যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারিনি দিতে, নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে।"

কবি নরসিংহ বসুর মাটির কাছাকাছি থেকে গবেষণার আনন্দের ভোজে তাঁরই উত্তরসূরী তারাপদ বসু যা দিলেন এবং আমি নিজে যা দিতে পারিনি তার জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাই আমি বিশ্বাস করি ধর্মমঙ্গল তথা রাঢ়ভূমি গবেষণার ক্ষেত্রে তারাপদ বসুর এ গ্রন্থটি একটি আকর গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হবে।

শ্রী সুকুমার মাইতি

ড. সুকুমার মাইতি মহাশয় কতৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গলে'র পুঁথির দু'একটি পৃষ্ঠার-অংশ- 'পরিচায়িকার' পরের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হল।

ভাষাচার্য জ্ঞানতাপস ড. সুকুমার সেন প্রতিষ্ঠিত

রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদ

স্থাপিত ঃ ১৯৮২

কার্যালয় ঃ- ৮৯, ডি এন. মিত্র লেন (১নং পাকমারা গলি), বর্দ্ধমান - ৭১৩১০১, ফোন ঃ ২৬৬৪০২৫

ভূমিকা

প্রাক্-তুর্কিআক্রমণের সময় বাংলার অবস্থা কেমন ছিল তা বিশদভাবে জানা যায় না, কোন ইতিহাসও নেই। কারণ বাঙালি কোনদিন ইতিহাস সচেতন ছিল না। আজও যে ইতিহাস সচেতন হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। অনেক বাঙালিই জানেন না বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরের বেশী নয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবার থেকে 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়' নামে যে পুঁথিখানি সংগ্রহ করে আনেন ও চর্যাপদাবলী রূপে প্রকাশ করেন — সেই চর্যাপদই প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন, অবহট্ট ভাষায় লেখা। অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী। কথাটি সঠিক নয়। আমাদের বেদ, উপনিষদ যে ভাষায় প্রথম লেখা হয়েছিল, যে ভাষা বৈদিক যুগে চালু ছিল তার নাম ছিল বৈদিক ভাষা। এই বৈদিক ভাষা থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব ও জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণগত ভূমিকার কারণে বিভিন্ন উপভাষা বহতা নদীর মত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসারিত হতে শুরু করলে খ্রিষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতকে বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পানিনি সমস্ত বিচ্ছিন্নগামী ভাষাগুলিকে সংস্কার, সুসংবদ্ধ ও ব্যাকরণাবদ্ধ করে নূতন যে ভাষার সৃষ্টি করেন তার নাম সংস্কৃত। সম + কৃত করেছিলেন বলেই তাকে সংস্কৃত বলে। সারা ভারতের মঠে, বিহারে বা মন্দিরে, সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারিত হত, গ্রন্থ রচনা হত এই সংস্কৃতে। সম্রাট অশোকের আমলে লিপি ছিল ব্রাহ্মী কিন্তু ভাষা ছিল সংস্কৃত। মৌর্য, গুপ্ত যুগেও ভাষা ছিল সংস্কৃত, কিন্তু লিপি ছিল গুপ্ত লিপি। প্রাকৃত দেশজ কথ্য ভাষায় সে সময় কোন সাহিত্য রচনা করা হত না। ভারতবর্ষ রাজনৈতিক দিক থেকে কোনদিন ঐক্যবদ্ধ ছিল না ; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষিত ছিল সারা ভারতে। তুর্কী আক্রমণের পরও এই সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয় নি। বাংলা ভাষার উদ্ভবের পর "চর্যাগীতি", "বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" ও মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্য পরম্পরার দিক থেকে বাংলা ভাষার বিবর্তনের খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়, যদিও হাজার বছর বয়ঃক্রমেই বাংলা ভাষা এমন স্বচ্ছতোয়া বেগবতী হয়েছে, যা সারা পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দিক থেকে তার স্থান চতুর্থ।

মঙ্গল কাব্যগুলি মূলতঃ রাঢ় বঙ্গের গ্রামীন সমাজ জীবনে প্রভাবশালী দেব-দেবী ধর্মঠাকুর, চন্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রমুখদের অবলম্বন করে সমকালীন কিম্বদন্তী বা বহুল প্রচলিত কাহিনির আশ্রয়ে লিখিত হলেও তার থেকে ক্ষণোদ্ভাসিত চিত্রের মতো ফুটে উঠেছে জনজাতির সমাজচিত্র, মানস সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, জীবনচর্যা, ধর্মীয় জীবন ও লোকসংস্কৃতি। রাঢ়ের আদি বাসিন্দা বড়ো, ডোম, শবর, কিরাত, কোল, মুন্ডা, হাড়ি, হোড়, শুঁড়ি, ধাঙড়, পাশি, দুলে, কোঁড়া, ড্যাকড়া, ডোকলা, কাহার, বাউরি, ভাঙ্গি, মুচি, লোধা প্রভৃতি তপশীল, অন্ত্যজ,

কৌম্য শ্রেণির জাতি বা সাঁওতাল, ভীল, ওঁড়াও প্রভৃতি উপজাতির নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণশীলতায় সাংকর্যের প্রভাব সত্ত্বেও মূল্যবান সম্পদ বলে ধরে রেখেছে। পূর্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গল-মধ্যবর্তী দামোদর, অজয়, দ্বারকেশ্বর, কোপাই, কাঁসাই, ময়ূরাক্ষী নদ-নদী অধ্যুষিত এলাকা বা বর্তমান মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, হাওড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলই এই রাঢ়ভূমি। তুর্কি আক্রমণের পূর্বে এই এলাকা তেমনভাবে কোন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় নি এবং এই অঞ্চলেই অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কেন্দ্রীভূত সমাবেশ। তাই রাঢ় অঞ্চলকে বলা হয় লোকসংস্কৃতির সূতিকাগার।

রাঢ়ের লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে ধর্মঠাকুরই প্রধান আরাধ্য দেবতা অন্ত্যজ শ্রেণির দ্বারা পূজিত। তারপর চন্ডী ও মনসা; কিন্তু আমি সমগ্র রাঢ় অঞ্চল ঘুরে এমন কোন গ্রাম দেখিনি যেখানে শিব বা ধর্মঠাকুর নেই। ধর্ম শব্দটি এসেছে ডোম> দোম> দম> ধম> ধর্ম, কারণ এই লৌকিক দেবতা বেশীরভাগ গ্রামে ডোমেদের বা অন্ত্যজ শ্রেণির দ্বারা পূজিত হতেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্যই হল এই লৌকিক দেবতাকে আর্যীকৃত করে সমস্ত বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পন্ডিত ধর্মের গীতকে বা পাঁচালিকে পঞ্চম বেদ বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি বলেছেন, "শূণ্য মূর্ত্তি ধ্যান করি / সাকার মূর্ত্তি ভজি"। অর্থাৎ এই ধর্মপূজর মধ্যে নিরাকারবাদী, ব্রহ্মবাদী ও সাকারবাদী অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান খ্রিষ্টান সব ধর্মের মেলবন্ধন ঘটেছে। ধর্মপূজায় 'ধর্মরায়' নামটি কেন্দ্রীভূত, এখানে রাজা> রাজ> রায় - অর্থাৎ দেবতাকে দেশের রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তিনিই দন্ডমুন্ডের কর্তা, তিনিই প্রজাকল্যাণের মালিক। ধর্মঠাকুরের সৃষ্টি কাহিনি ঋক্‌বেদে বর্ণিত, সৃষ্টিতত্ত্বের মতই। কূর্ম ধর্মঠাকুরের পাদপীঠ সুতরাং শূণ্য মূর্ত্তির প্রতীক স্থানীয় বহুস্থানে কেবলই কালো পাথরের টুকরোই এই দেবতা। সংস্কৃতায়িত শব্দ ধর্মের অর্থ ধৃ ধাতু ম প্রত্যয় অর্থাৎ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। মানুষের মানবতা, সততা, আদর্শ, নিষ্ঠা প্রভৃতি সদগুণ গুলি যে ধারণ করে - এই অর্থে ধর্মঠাকুরই রাঢ় বঙ্গের সঞ্জীবনী সুধা, ধর্মঠাকুরই রাঢ়ের প্রাণ ভোমরা। এর বারমতির গাজন উৎসব এত বৈচিত্র্যমূলক, এমন লোমহর্ষক আচরণ ও পদ্ধতি প্রকরণের সমন্বয় ঘটেছে যা বিস্ময়াবহ। এই লোক উৎসবের দাপটে ম্রিয়মান হয়ে গেছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূর 'প্রেম-ভালবাসার' মানবপ্রীতির বন্যা, সে কেবল 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়' এর মধ্যেই -সীমাবদ্ধ। রাঢ়ের ধর্মরায়ের এই জমকালো পূজা-পাটের জন্য আমি ধর্মঠাকুরকে রাঢ়ের গণদেবতা বলি। তাই ধর্মমঙ্গল কাব্য রাঢ়ের জাতীয় কাব্য।
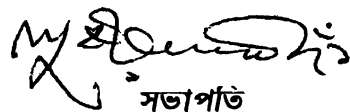
অষ্টাদশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণ প্রাচীন পাঁচালি কাব্যের যুগ শেষ হয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ও রুচির এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের যুগ শুরু হচ্ছে। সব দেশেই দেব-দেবী বা ধর্মকে কেন্দ্র করেই প্রথম ভাষার সাহিত্য বা কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। রাঢ়ের মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী, রূপরাম চক্রবর্ত্তী বা ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ইতিমধ্যেই যথাক্রমে চন্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমে (১৭১৪ খ্রিঃ অঃ) দক্ষিণ রাঢ়ের এক সুপ্রাচীন গ্রাম শাঁকারীতে জন্মগ্রহণ করে নরসিংহ বসু লিখলেন আর এক 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য। এই কাব্যের আকৃতি বিশাল, মার্জিত ছন্দ ও ভাষা-বৈদগ্ধে প্রাঞ্জল। শুধু তাই নয়, প্রেম, প্রতিহিংসা, চক্রান্ত ও ভালবাসার পরতে পরতে এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে সংবেদনশীল মনোধর্মের আবেগ ও মানসিক প্রতিচ্ছবি ও কাহিনি বিন্যাসের বিজ্ঞানভিত্তিক যৌক্তিকতা। নরসিংহ বসুর উত্তরসূরি নবমপুরুষ শ্রীমান তারাপদ বসু যিনি আমার ছাত্র ও সহকর্মী, — এমন সময় আমার সম্মুখে উপস্থিত করলেন সেই কাব্যের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের এই পান্ডুলিপি। নরসিংহ বসু বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি,

ওড়িয়া, ও হিন্দুস্থানি ভাষায় পন্ডিত এবং পেশায় উকিল ছিলেন। বীরভূমের রাজনগরের রাজা আসাদুল্লা খাঁর দরবারে রাজার পক্ষে আঠারো বৎসর মুর্শিদাবাদের নবাব জাফর আলি খাঁর প্রতিপক্ষে আইনি পরামর্শদাতা ছিলেন। শ্রীমান তারাপদ বসু তাঁর পূর্ব পিতৃপুরুষের এই অক্ষয় কীর্তির টানে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত কাহিনির মধ্যে তন্ন তন্ন করে চরণ ও পংক্তি উদ্ধৃত করে সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলি তুলে ধরে যে অমূল্য কাজ করেছেন, তা ভবিষ্যত গবেষকদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হবে। সব চাইতে উল্লেখ্য শ্রীমান তারাপদ বসুর ভক্তি ও নিষ্ঠা। তিনি যখন নরসিংহ বসুর মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শ্যামারূপা মায়ের পাদপীঠে গড় জঙ্গলে পুরোহিত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করছেন তখন তাঁর অন্তরে স্বতোৎসারিত ভক্তি প্রবাহের বন্যার মধ্যে তিনি যেন তাঁর কীর্তিমান নবম পূর্বপুরুষ নরসিংহ বসুকেই প্রত্যক্ষ করে জীবন ধন্য করতে চাইছেন। কাব্যের সামাজিক বিশ্লেষণের পূর্বে তিনি পূর্বপুরুষদের বাস্তুভিটা বসুধা, মিরাস প্রভৃতি গ্রামগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষা করে অসীম শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছেন, যার সঙ্গে পাঠকও তার শরিক হয়ে উঠবেন। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত নরসিংহ বসুর কর্মস্থল রাজনগরের আসাদুল্লাহ খানের ধ্বংসপ্রায় রাজপ্রাসাদ। তার বর্তমান বংশধরদের সঙ্গে আলাপচারিতায় আন্তরিক নিষ্ঠার ভাবই ফুটে উঠেছে পিতৃপুরুষের প্রতি নবম উত্তর পুরুষের গভীর কৃতজ্ঞতা।
কবি পরিচিতি, কবি পূর্বপুরুষদের বংশলতিকা, মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত রাঢ়ের প্রাচীন গ্রাম ও লৌকিক দেবদেবীর বর্ণনা সহ পথনির্দেশিকা, তার প্রাচীন ইতিহাস, পূজাপার্বন পদ্ধতি এমন নিখুঁত ভাবে বর্ণিত হয়েছে যা কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে এক বাড়তি পাওনা। তার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত রাজনগরের মতিচূড় মসজিদের বর্তমান রূপ ও তার ইতিহাস। নবাবদের কূল-পঞ্জি, কুলীন গ্রামের সঙ্গে নীলাচলের রথযাত্রার সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জুঝুটির ধর্মঠাকুরের বর্তমান অবস্থা, মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর ক্ষেত্র সমীক্ষা সহ বর্তমান অবস্থা এবং মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত পতিভক্তি, স্বামীর প্রতি কর্তব্য, খলনায়ক মাতুল মহামদের বিভিন্ন চক্রান্ত, ধার্মিক লাউসেনের বীরত্ব অপরদিকে স্বাধীনচেতা ইছাই এর দেবীভক্তি ও পরাক্রম এবং লখ্যা ডোমনী ও কালু ডোমের বীরত্ব -আর মূল কাব্যের গদ্যরূপ, সব মিলে এই বিশ্লেষিকা ও গদ্যরূপ আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক পরম আস্বাদ্য বলে গণ্য হবে। বর্তমান গ্রন্থটি "নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল ঃ সমাজ ভাবনা" কেবল ধর্মমঙ্গল কাব্যের খুঁটি নাটি বিশ্লেষণই নয়, তার মধ্যে পাঠক পাবেন তিনশ বছর আগের সঙ্গে বর্তমান কাল ধর্মের পথপরিক্রমা, সমাজ বিবর্তন ও বর্তমানের সঙ্গে অতীতকে মিলিয়ে দেখার সুযোগ।

এই গ্রন্থ গবেষক ও কৌতূহলী পাঠকের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হবে বলে আমি মনে করি। শ্রী তারাপদ বসুর এই অনুসন্ধানমূলক কাজটি হল পূর্বপুরুষগণের এক কীর্তিমান পুরুষ মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নরসিংহ বসুর সৃষ্টি ও প্রজ্ঞার প্রতিএক অধঃস্তন উত্তরসূরির সশ্রদ্ধ পিতৃতপর্ণের ঋণ স্বীকার করে ধন্য হওয়া। গ্রন্থকারকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

সভাপতি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (বর্ধমান জেলা),
সভাপতি
রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদ, বর্ধমান

Arindam Chattopadhyay
Head, Department of Bengali
Recognised by the UGC as
Centre of Advanced Study
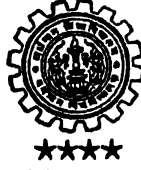
THE UNIVERSITY OF BURDWAN
GOLAPBAG, BURDWAN-713104
WEST BENGAL, INDIA
Phone : (0342) 2556549,
2556566, 2558554
(EPABX), Extn. 434
2556995 (Direct)

****

পরিচায়িকা

রাঢ় বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় নিবেদিত কিছু মানুষ আমাদের অলক্ষে যে কাজ ক'রে চলেছেন তার হিসেব আমাদের জানা নেই, হয়তো বা আমাদের জানার আগ্রহও নেই। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় শেষ পর্যন্ত তার স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

রাঢ় বাংলার সাহিত্য ধারায় মঙ্গলকাব্যের বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু বহুদিনের প্রচলিত মঙ্গলকাব্যধারার বাইরে অন্যতর মঙ্গলকাব্য রচনা, রূপান্তর ইত্যাদির হদিশ ক'জন জানেন ? যেমন নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গলকাব্যের যে সমাজ বাস্তবতা ও কাব্যপাঠে ভাষার প্রতিবন্ধকতা তা সম্যক অনুধাবন করেছেন শ্রদ্ধেয় তারাপদ বসু মহাশয়। তিনি অপরিসীম নিষ্ঠায়, নিদারুণ অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ মন ও মননে নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যের গদ্যরূপদান এবং সমাজভাবনার বিচার বিশ্লেষণ যেভাবে করেছেন তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি।

মঙ্গলকাব্য পিপাসু, বিশেষত ধর্মমঙ্গলকাব্য প্রেমী মানুষজন শ্রদ্ধেয় তারাপদ বসুর রচনা "নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল ঃ সমাজ ভাবনা"- পাঠ করলে যে বিশেষ আনন্দ ও শান্তি পাবেন তা বলাই বাহুল্য।

আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

শাঁকারীর শ্রীশ্রী অষ্টভূজা শঙ্করীমাকে
জানাই প্রণাম
পৃষ্ঠা - ১০, ১১, ১২৫
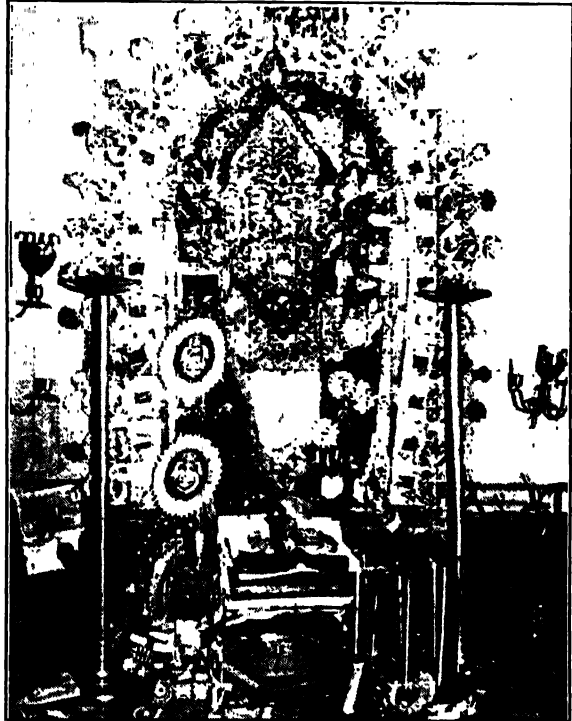
কবির
শ্রীশ্রীকালীমায়ের
চরণে রইল প্রণতি
পৃষ্ঠা - ১৩৫

বসুধা মৌখিরা গ্রামের মুখ্য ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্র

পৃষ্ঠা - ১০

বসুধা গ্রামের বাসস্টপ সংলগ্ন ঘরবাড়ি ও এস.টি.ডি. বুথ

পৃষ্ঠা - ১০

বসুধা গ্রামের পূর্বদিকে মৌখিরার রায় পরিবারের মহাদেব ও বিষ্ণু মন্দির। পৃষ্ঠা - ১০
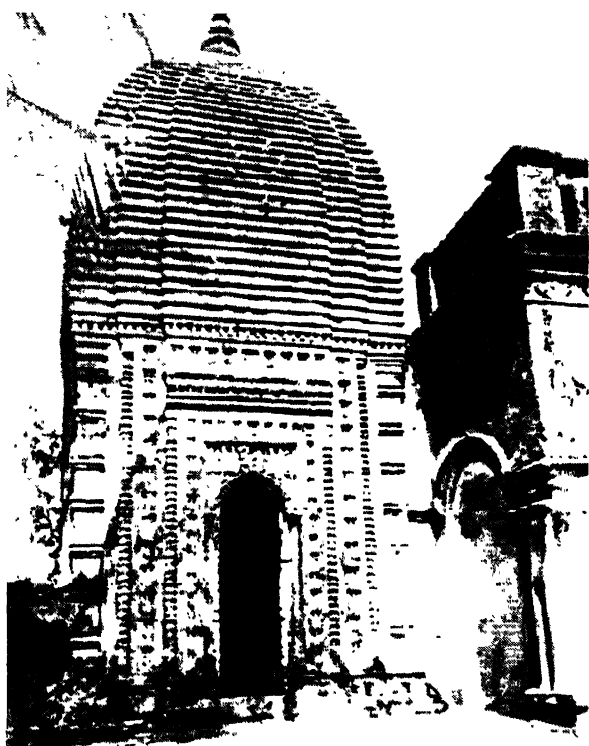
বসুধা গ্রামের পূর্বদিকে মৌখিরার ভট্টাচার্য্য পরিবারের মহাদেব ও নারায়ণ মন্দির। পৃষ্ঠা - ১০

জুঝুটির ধর্মরাজ ঠাকুর (যাঁর নির্দেশে কবির এই ধর্মমঙ্গল রচনা)। পৃষ্ঠা - ১৪, ১৫৯

জুঝুটির ধর্মরাজের চড়ক পুকুর ও পাশে খেজুরতলা। পৃষ্ঠা - ১৪

বৈশাখী পূর্ণিমায় জ্বঝুটির ধর্মরাজের গাজনে মূল সন্ন্যাসীর ঝাঁপ। পৃষ্ঠা - ১৬০

বৈশাখী পূর্ণিমায় জ্বঝুটির ধর্মরাজের গাজনে বাবার কাছে প্রণাম খাটা। পৃষ্ঠা - ১৫৯, ১৬০
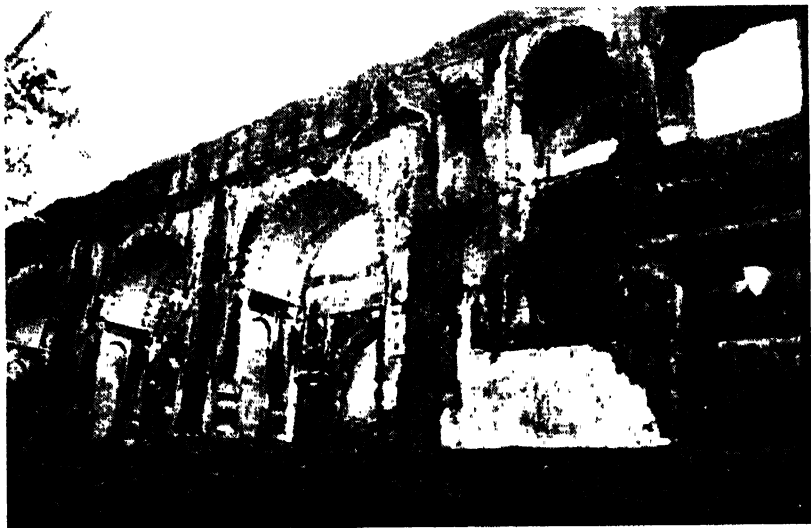
বীরভূমের রাজনগরের আসাদুল্লাহ খান সহ পাঠান বংশীয় ভগ্ন রাজপ্রাসাদ ও দরবারের অংশবিশেষ।

পৃষ্ঠা - - ১৯

বীরভূমের পাঠান রাজদরবারের পাশেই ইমামবাড়া ও রাজনগর হাইস্কুল।

পৃষ্ঠা - ১৯

আসাদুল্লাহ্ খাঁর
রাজপরিবারের একাদশ
প্রজন্মের সদস্য
'রাজাসাহেব'
মহঃ রফিকুল আলাম খাঁ।
পৃষ্ঠা - ১৮, ১৯

রাজনগরের রাজদরবারের
পাশে স্তম্ভমিনার ও
কালিদহের কাছে রফিকুল
আলম সাহেবের কণিষ্ঠ পুত্র
মহঃ সফিউল আলাম খাঁ।
পৃষ্ঠা - ১৯

আসাদুল্লাহ্ খাঁর
রাজদরবারের পাশে
স্তম্ভমিনারের সামনে লেখক।
পৃষ্ঠা - ১৯

বীরভূমের রাজনগরের মতিচুর মসজিদের বর্তমান অবস্থা।

পৃষ্ঠা - ১৬

জাতীয় সম্পদ রূপে ঘোষিত মতিচুর মসজিদের অংশবিশেষ।

পৃষ্ঠা - ১৬

প্রথম পর্ব
পরিচিতি

(১) কবি পরিচিতি ঃ মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের মত কবি নরসিংহ বসুও তাঁর কাব্যের স্থাপনা পালায় আত্মপরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর কাব্যাংশ থেকেই জানা যায় কবির আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার বসুধা মিরাস গ্রামে। তার আগে নাকি হুগলির শেয়াখালায়। যাইহোক, কবির পিতামহ মথুরা বসু সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বসুধা গ্রাম ত্যাগ করে বর্ধমান জেলারই খন্ডঘোষ থানার অন্তর্গত শাঁকারি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবি তাঁর কাব্যের স্থাপনা পালার আদ্যখন্ডে উল্লেখ করেছেন-

'শুন ভাই সভাজন করি নিবেদন।
যে রূপে ধর্মের গীত হইল রচন।।
বসুধা মিরাস ভূমি ছিল পূর্বাপর।
মথুরা বসুজা কৈল শাঁখারিতে ঘর।।' (৪)

সেই সময় বর্ধমানের অধিপতি ছিলেন মহারাজ কীর্তিচন্দ্র রায়। কবি মহারাজের প্রশংসা করে লিখেছেন-

'অধিকারী সে দেশে কীর্তিচন্দ্র রায়।
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।।
সত্যবাদী সদাচারী যেন যুধিষ্ঠির।
প্রজাগণ পালন সাক্ষাৎ রঘুবীর।।
ধর্মপরায়ণ ধীর গভীর সুমতি।
তরণী ধরণী অশ্ব রাজা নরপতি।।
প্রবল প্রতাপ রাজা সমরে বিজয়।
ধনাধীপ জিনি ধন দাতা মহাশয়।।
দেব দ্বিজ গুরুর চরণ পরায়ণ।
নিজ নাম উদয় প্রকাশ ত্রিভূবন।।'(১৪)

এরপর কবি আবার ফিরে এসেছেন আত্মপরিচয়ে। সেই অংশ থেকে জানা যায় কবির পিতামহ মথুরা বসুর তিন পুত্র ছিল- জ্যেষ্ঠ ঘনশ্যাম বসু, মধ্যম রাধিকা বল্লভ আর কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ। কবি নরসিংহ বসু ছিলেন ঘনশ্যাম বসুর পুত্র। তাঁর মাতার নাম নবমল্লিকা। কবিরা পুরুষে পুরুষে ছিলেন মসীজীবি।

'মথুরা বসুজা বংশ সর্বগুণধাম।
তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ ঘনশ্যাম।।
রাধিকা বল্লভ বসু মধ্যম তনয়।
রামকৃষ্ণ ছোট বেটা সরল হৃদয়।।
সর্বকাল রাজধানী সবে স্বতন্তর।
পুরষে পুরুষে মসীজীবি পূর্বাপর।।
নরসিংহ বসু ঘনশ্যামের নন্দন।
কেবল ভরসা যার দেব ত্রিলোচন।।'(২২)

কবির পূর্বপুরুষের আদি গ্রাম- বসুধা ঃ

কাব্যাংশ থেকে জানা যায়- কবির পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল বসুধা-মিরাস গ্রামে। বসুধা গ্রামটি পানাগড়ের কাছে পানাগড়-দার্জিলিং রোডের ওপর অজয় নদীর দক্ষিণ গায়ে বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার মধ্যে অবস্থিত। কবির পিতামহ মথুরা বসু সপ্তদশ

শতাব্দীর মাঝামাঝি কিম্বা শেষার্দ্ধে বসুধা গ্রাম ত্যাগ করে শাঁকারিতে বসতি স্থাপন করেন।

কবির পিতামহ কেন তাদের আদি নিবাস বসুধা ত্যাগ করে শাঁখারিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে একদিন (২০.৩.২০০৫) বেরিয়ে পড়লাম বসুধা গ্রামের উদ্দেশ্যে। সকালে বর্ধমান স্টেশন থেকে 'ব্লাক ডায়মন্ড' ধরে পানাগড়, সেখান থেকে বাসে করে 'দার্জিলিং রোড' ধরে সরাসরি বসুধা বাস স্টপেজ। তারপর ভ্যান- রিক্সায় বসুধা গ্রামের পূর্বপাড়া ঘুরে পাশের গ্রাম মৌখিরা বা মিরাস গ্রামে যাই। বর্তমানে বসুধা গ্রামের অবস্থানগত গুরুত্ব খুবই বেড়েছে। এই গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক-'পানাগড়-দার্জিলিং' রোড যার দ্বারা এই গ্রামের সাথে সহজেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে বর্ধমান, পানাগড়, দুর্গাপুর, আসানসোল, ইলামবাজার, সিউড়ি, বোলপুর, ফারাক্কা, মালদা, দার্জিলিং, আবার অন্যদিকে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন শহরের সঙ্গেও। বাস স্টপেজ নির্মিত হয়েছে যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার, বসেছে নানারকম দোকানপাট, এস.টি.ডি বুথ।

গ্রামের মধ্যে রয়েছে স্কুল, ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্র, পঞ্চায়েত অফিস ইত্যাদি। গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ যোগাযোগও রয়েছে। তবুও গ্রামের জনবসতি আজও খুব কম। বাঁশবন আর ঝোপঝাড়ের পরিমাণই বেশি। এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অধিবাসিদের ঘরবাড়ি, অবশ্য রাস্তার পশ্চিমে অবস্থিত গ্রামের অংশটি অপেক্ষাকৃত উন্নত, কিছু পাকা বাড়ি রয়েছে। আজ গ্রামটি একটি উল্লেখযোগ্য সড়কপথের সঙ্গে যুক্ত হলেও, সাড়ে তিনশ বছর আগে এই অবস্থা ছিল না। আজকের দুর্গাপুরও তখন ছিল না। জেলা শহর বর্ধমান থেকেও গ্রামটির অবস্থান অনেক দূরে, আজও লোকবসতি নদীতীরবর্তী পূর্ব অংশে খুবই বিরল। অপরপক্ষে শাঁকারি গ্রামটি অনেক উন্নত, কৃষিসম্পন্ন, বহু প্রাচীন দেবদেবীর আরাধ্য স্থল। এছাড়া গ্রামটি বর্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্র রায়ের রাজধানী শহর বর্ধমানের মাত্র আট-ন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। তাই শাঁকারির আকর্ষণ কবির পিতামহের কাছে অনেক বেশি ছিল। সর্ব্বোপরি শাঁকারির অধিষ্ঠাত্রী দেবী অষ্টভুজা মা শঙ্করীর পদছায়া তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য বসুধা গ্রামের পূর্বদিক সংলগ্ন আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত 'মৌখিরা' (বা মিরাস) নামে যে গ্রামটি রয়েছে সেখানেও দেখা যায় সুন্দর সুন্দর সারিবদ্ধ প্রাচীন মন্দির, প্রাচীন পাকা দালান- কোঠাবাড়ি। দেখেই মনে হয় গ্রামটি এককালে বেশ উন্নত ছিল। মন্দির গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জমিদার 'রায়' পরিবারের দুর্গামন্দির, শিবমন্দির, বিষ্ণু মন্দির, শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, যার গায়ে খোদিত রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ লীলার বিভিন্ন ঘটনা। এছাড়া মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রাচীন নারায়ণ ও মহাদেব মন্দির দুটিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বসুধা গ্রামের ঠিক পাশেই এই রকম একটি মন্দিরময় উন্নত গ্রাম থাকলেও কবির পিতামহ শাঁকারির শঙ্করীমায়ের পদছায়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন হয়ত ইছাই ঘোষের বংশধরদের ভয়ে বা অত্যাচারে। ইছাই এর ঢেকুরগড় আর বসুধা এই দুটি জায়গাই কাঁকসা থানার অন্তর্গত। এবং ইছাই এর রাজত্বের মধ্যে অবস্থিত। কবির পরিবার পুরুষানুক্রমে মসীজীবী ছিলেন। এই মসীজীবী কায়স্থের হিসাব থেকেই গৌড়েশ্বর জানতে পারেন- ইছাই ঘোষের কুড়ি বছরের খাজনা বাকিআছে। সেই খাজনা আদায়ের জন্য গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ঢেকুর পাঠান, কিন্তু ইছাই ঘোষ খাজনা না দেওয়ায় লাউসেনের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ বাধে, সেই যুদ্ধে ইছাই নিহত

হন। তার বহুপরে হলেও ইছাই এর বংশধরদের হয়ত রাগ গিয়ে পড়ে হাতের কাছে থাকা মসীজীবী কায়স্থ পরিবারের ওপর। আর সেই ভয়েই হয়ত কবির পিতামহ বসুধা গ্রাম ত্যাগ করে শঙ্করী মায়ের পদছায়ায় শাঁকারি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবিও তাঁর 'আদ্য ঢেকুর পালায়' প্রচ্ছন্নভাবে সেই অনুমানেরই কিছুটা আভাস দিয়েছেন। ইছাই শ্যামারূপার বরে স্বতন্তর রাজা হওয়ায় তাঁর অত্যাচারে ঢেকুরের প্রাক্তন সামন্তরাজ কর্ণসেন ঢেকুর ছেড়ে গৌড়দেশ চলে যাবার সময় কবি বলেছেন-

'ইছাই বসিল পাটে   না জানি কখন কাটে
পরিবার সহিত আমাকে।
যদি বা দেশেতে থাকি   কার বাপে মোকে রাখি
গোয়ালাতে যদি প্রাণ লয়।।
করি এই অনুমান   ছেড়ে ঘর ধনধান
রাজ্যপাট রতন মন্দির।
পরিজন সঙ্গে নিয়া   দেশভূম পরে দিয়া
পালাইলা পরাণে অস্থির।।' (৩৭২)

দেখা যাচ্ছে ইছাই এর ভয়ে রাজ্যপাট ছেড়ে কর্ণসেন গৌড় দেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর এই ঘটনা উল্লেখ করার পরের চরণেই কবি লিখেছেন-

'বসুধা-মিরাস ছাড়ি   শাঁখারিতে ঘরবাড়ি
করিলেন মথুরা বসুজা।
সত্যবাদী সদাচার   সদাই সাপক্ষ যার
আপনি শঙ্করী অষ্টভূজা।। (৩৭৬)
ভবানী করিয়া দয়া   দিল নিজ পদছায়া।'

যদিও ইছাই-কর্ণসেনের ঘটনার বহু পরে মথুরা বসুর যুগ, কিন্তু দু'টো ঘটনা পাশাপাশি উল্লেখ করে কবি দেখাতে চেয়েছেন যে কর্ণসেনের ঢেকুর ত্যাগ করার বহুকাল পরে হলেও মথুরা বসুর বসুধা গ্রাম ত্যাগ করার মধ্যে একটা কিছু মিল আছে। এই সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে আর বসুধা গ্রাম ঘুরে এসে এটাই মনে হয়েছে যে কবির পিতামহের আদি নিবাস ত্যাগ করে শাঁকারিতে বসতি স্থাপনের কারণ হতে পারে- ইছাই এর ন্যায় কারুর ভয়ে তৎকালীন একটি অনুন্নত গ্রাম ছেড়ে উন্নত কৃষিসম্পন্ন এবং রাজবাড়ির কাছাকাছি কোন গ্রামে বসতি স্থাপন, বিশেষ করে যেখানে রয়েছে দেবী শঙ্করীর আশীর্ব্বাদ ও পদছায়া লাভ করা।

কিন্তু মানুষের সুখের দিন সব সময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কবির খুব অল্প বয়সেই তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। তাঁর পিতামহী প্রবল শোকের মধ্যেও কবিকে পরম যত্নে মানুষ করে বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন করে তোলেন। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে একজন গ্রাম্য মহিলা গ্রামে থেকে কিভাবে তাঁর নাতিকে বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন তা ভাবলে খুবই অবাক লাগে। কিন্তু সেটা সম্ভব

(৩৭২,৩৭৬ আদ্য ঢেকুর পালার চরণ সংখ্যা, বাকি সব সংখ্যা 'নিশাস্থাপনা পালার' চরণ)

হয়েছিল তাঁর অদম্য ইচ্ছা আর মনের জোরে। আর এই শিক্ষার প্রভাবে ও অষ্টভুজা শঙ্করীর কৃপায় কবি নানা স্থানে রোজগার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অবশেষে ফারসি ভাষায় দক্ষতার জন্য তিনি বীরভূমের রাজনগরের পাঠান রাজা বাহাদুর আসাদুল্লাহ খানের পক্ষে মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে উকিল হিসেবে নিযুক্ত হন, এবং আঠারো বৎসর তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। কবি তাঁর আত্ম পরিচিতিতে এ-সম্পর্কে বলেছেন—

'অল্পকালে পিতার হইল পরলোক। অষ্টভূজা শঙ্করীর কৃপাবলোকনে।
পিতামহী ঠাকুরাণী পাল্য বড় শোক।। নানাদেশে রোজকার করি নানা স্থানে।।
পিতৃব্যের ব্যবহারে পরম যত্ন করি। বাঙ্গালায় বীরভূম বিখ্যাত অবণী।
বাঙ্গালা পারসী উড়্যা পড়াল্য নাগরী।। শ্রী আসফুল্লা খান রাজা শিরোমণি।।' (৩০)

'কৃপা করি নৃপমণি রাখিল চাকর।
ওকালতি একক্রমে আঠারো বৎসর।।' ৪২

কবি তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য লেখার সময় পর্যন্ত (১৭১৪ খ্রিঃ) আসাদুল্লাহ খানের পক্ষে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে উকিল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরে আরও কয়েক বছর এই কাজেই এই রাজ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর এই ওকালতি কাজের সুবাদেই শাঁকারির নরসিংহ বসু একদিন হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ **কবি নরসিংহ বসু**।

(২) কাব্য রচনার উৎস ঃ যে অলৌকিক ঘটনা নরসিংহ বসুকে এই ধর্মমঙ্গল কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল, কাব্যে উল্লেখিত সেই ঘটনা এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হল—

রাজা আসাদুল্লাহ খানের উকিল হিসেবে নরসিংহ বসুকে নবাব দরবারেই বেশীরভাগ সময় থাকতে হত। সেই সময় মুর্শিদাবাদের নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খান। তিনি ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত নবাব। রাজস্ব বা খাজনা আদায়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। সব রাজা বা সামন্ত জমিদারদের খাজনা তিনি নিজে বুঝে নিতেন। কারুর খাজনা বাকি থাকার উপায় ছিল না।

'নবাব জাফর খান ন'বন্দি হাকিম মাঝে মাঝে লোকের খাজনা নেন বুঝে।
দরবার দেশে দেশে প্রতাপ অসীম।। বেবাক করিলে পুন বাকি বুলে খুজে।।' (৪৬)

সম্ভবত ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের কথা, একদিন নবাব জাফর আলি খান বীরভূমের রাজা আসাদুল্লাহ খানকে জানালেন যে তাঁর সাত লক্ষ টাকা খাজনা বাকি। কিন্তু রাজার মতে কোন খাজনা বাকি ছিল না। তাই নবাবের এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদে তিনি ঐ খাজনা দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু নবাব ছাড়বার পাত্র নন। এই সময় উকিল নরসিংহ বসু দেখলেন রাজা আর নবাবের মধ্যে এই নিয়ে একটা বড় বিপদ বেধে যেতে পারে। তাই তিনি রাজাকে বোঝাবার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে রাজনগরে এলেন।

'বীরভূমের বাকী নাহি দিয়াছে বেবাক। নৃপতি না দেন কর নবাব না ছাড়ে।
তথা (সেখানে) বন্দী করে সাত লাখ।। মনোমধ্যে ভাবিল বিপদ পাছে বাড়ে।
মণিবের মনে যে হাকিম করে তট। বীরভূমে বিদায় আনিতে বাকী কর।
তবে তাকে খাজনা না দিব এক বট।। রাত্রি দিনে চল্যা যাই দাখিল নগর।।' (৫৪)

কাব্য রচনার উৎস

উকিল নরসিংহ বসু রাজনগরে রাজার কাছে এসে সব সমাচার দিয়ে রাজার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। রাজা আসাদুল্লাহ খাঁ নবাবের সাত লাখ টাকা দাবির মধ্যে মাত্র একলাখ টাকা দিতে সম্মত হলেন। নরসিংহ বসু ঐ এক লাখ টাকা নিয়েই ত্রিশে কার্ত্তিক ভোরে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নৃপতি আসাদুল্লাহ খাঁ তাঁর উকিল নরসিংহ বসুকে জোড়া, জামা, শিরোপা দিয়ে বিদায় জানালেন।

'সবিশেষ সকল কহিল সমাচার। কার্ত্তিকের ত্রিশা ভোরে পাঠায় বেবাক।।
নৃপ আজ্ঞা খাজনার কি করি বিচার।। জোড়া জামা শিরোপা দিলেন মহারাজ।
নিকাশ পড়িলে দিব টাকা এক লাখ। বিদায় করিল যাই মুর্শিদাবাদ।।' ৬০

রাজনগর থেকে মুর্শিদাবাদ যাবার সময় কবি মনে মনে ভাবলেন--- বাড়ির কাছাকাছি এসেছি, তাই একবার বাড়ি দিয়ে ঘুরে গেলে ভাল হয়। এই কথা মনে ভেবে পাল্‌কি বেহারাদের বর্ধমানের শাঁকারি গ্রাম যাবার নির্দেশ দিলেন। রাজনগর থেকে শাঁকারি যাবার পথে আউশগ্রামের কাছে ঝড়বৃষ্টির জন্য রাত্রে ঐ গ্রামে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন সকালে ঝিকিমারি গ্রামে তাঁর যশোদা পিসির বাড়িতে স্নান পূজা সারলেন, সেখানে পিসির ছেলে নারায়ণ তাঁদের যথোচিত সমাদর করেন, ওখান থেকে পালকি বেহারা নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করেন কিন্তু দামোদরের কাছে জুঝুটি গ্রামের পথে আবার জলকাদা পেলেন, এদিকে ঐ সময় জুঝুটি গ্রামে খুব পরিপাটি করে ধর্মের পূজা হচ্ছিল---

---

টীকা ঃ- গৌড়ের ইতিহাস থেকে জানা যায় গৌড় তথা বঙ্গদেশের রাজধানী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে। কখনও গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনের জন্য, কখনও জল হাওয়া দূষিত হওয়ার জন্য, কখনও বাণিজ্যিক কারণে। যেমন শশাঙ্কর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ এবং ভোজরাজগণের পর শূর বংশীয়দের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগরে বা পুন্ড্রবর্দ্ধনে, (এটি মালদহ জেলাতেই অবস্থিত); পাল রাজত্বকালে (৭৭৫ খ্রিঃ - ১১০৩ খ্রিঃ) রাজধানী ছিল গৌড় নগরে বা গৌড়ের পাশেই রামাবতী (রমতী) নগরে। (ধর্মমঙ্গল কাব্যেও গৌড়ের রাজধানী রমতী নগরেই ছিল বলে উল্লেখ আছে।) সেন রাজত্বকালে (১১০৩/১১১৯ খ্রিঃ- ১২০৩/১২০৬ খ্রিঃ) এবং মুসলমান রাজত্বকালের অর্ধেকেরও বেশী সময় ধরে রাজধানী ছিল গৌড় নগরেই, যাকে ইসলামিয়া ইতিহাসে লক্ষণাবতী বা লক্ষ্মৌতী বলা হয়েছে। ১৫৬৩ খ্রিঃ সোলেমান কররানী গৌড় নগরের কাছেই তান্ডা বা টাঁড়া নামে গঙ্গার এক চরে রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর আকবরের সেনাপতি মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করে, সম্ভবতঃ ১৫৯২ খ্রিঃ রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। তারপর ১৬০৮ খ্রিঃ ইস্‌লাম খাঁ রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। এর প্রায় একশ বছর পর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৪ খ্রিঃ ঢাকা থেকে মুকসুদাবাদে রাজধানী তুলে নিয়ে আসেন। আর নিজের নামের সঙ্গে মিল করে মুকসুদাবাদের নাম রাখেন 'মুর্শিদাবাদ' যা মুসলমান বাংলার শেষ স্বাধীন রাজধানী। আর এই মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারের একটা বিবাদ মীমাংসা করার জন্য আসারপথে ধর্মরাজের নির্দেশে কবি নরসিংহ বসু তাঁর সুবৃহৎ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে।

'গড় দ্বার বই হইয়া মনে যুক্তি সার।
ঘর দিয়া শহর যাইব এইবার।।
রাতে দিনে চলে যাই নাহিক বিশ্রাম।
আউশ গ্রামে ঝড়বৃষ্টি রজনী বিরাম।।
পালকির বাহার পবন বেগে যায়।
স্নান পূজা করিলাম ঝকিমারি গাঁয়।।
যশোদা পিসির বেটা নারায়ণ নাম।
সেখানে বিষয় তার শাঁখারিতে ধাম।।
যথোচিত সমাদর করিল মালিক।
কাহার বেগার দিল করিয়া লৌকিক।।
পথে বড় জল কাদা পেলাম জুঝুটি।
সেখানে ধর্মের পূজা হয় পরিপাটি।।' (৭২)

কবি পালকি বেহারাদের দূরে রেখে যে খেজুরতলায় ধর্মের পূজা হচ্ছিল সেখানে পূজা দেখতে গেলেন এবং নয়নভরে ঠাকুর মায়াধরকে দেখলেন— এমন সময় অপূর্ব এক সন্ন্যাসী তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে এবং তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে ধর্মের গীত রচনা করার নির্দেশ দিলেন।

'নয়ন ভরিয়া তথা দেখে মায়াধর।
খেজুর তলায় উপস্থিত তারপর।।
কতদূরে লোকজন রাখিয়া বাহন।
একেলা গেলাম ধর্ম করিতে দর্শন।।
অপূর্ব সন্ন্যাসী এক আসি উপস্থিত।
আশীর্ব্বাদ দিয়া কন গাও কিছু গীত।।
অপরূপ বচন বলিল মহাশয়।
চারিপার্শে চাহিতে হইল কত ভয়।।
ভূমে পড়্যা দন্ডবৎ জুড়্যা দুই কর।
মাথা তুল্যা চাহিতে সন্ন্যাসী অগোচর।।' (৮২)

কবি সন্ন্যাসীকে দু'হাত জোড় করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দেখেন সন্ন্যাসী আর নাই,- তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এরকম একটা অলৌকিক ঘটনায় তাঁর মন তোলপাড় হতে লাগল, মনে সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে দামোদর পার হয়ে শাঁখারির বাড়িতে পৌঁছালেন, সেখানে দিন দুই থেকে মুর্শিদাবাদ চলে গেলেন এবং নবাব দরবারে ঐ এক লাখ টাকাতেই ধর্মের কৃপায় বিবাদের মীমাংসা হয়ে গেল। কবির জয় হল। এদিকে ধর্মের গীত রচনার জন্য ধর্মরাজের আদেশের ফলে তিনি যখনই পথে যান ধর্মের গীত মনে উঠে আসে।

'সাত পাঁচ অনুভব মনে অনুক্ষণ।
পার হৈয়া দামোদর পাইল ভবন।।
দিন দুই অশেষ ব্যাপারে গেল ঘরে।
মুর্শিদাবাদ যাত্রা কৈল তার পরে।।' ৮৬

'রাত্রি দিন চলে যাই বিলম্ব না হয়।
ধর্মের কৃপায় হৈল দরবারে জয়।।'
'অন্নাদ্যের আজ্ঞা হৈল রচিতে সঙ্গীত।
পথে যাই অকস্মাৎ মনে উঠে গীত।।' (৯০)

এইসব অলৌকিক ঘটনার কথা কবি তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের জানিয়ে তাঁদের সম্মতি নিয়ে ১৬৩৬ শকাব্দের বা ১১২১ বঙ্গাব্দের ১০ ই ভাদ্র (ইং ১৭১৪ খ্রিঃ ২৭ শে আগষ্ট) তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। আর কবি তাঁর কাব্য রচনার তারিখটি তাঁর কাব্যের মধ্যেই সাঙ্কেতিক শব্দে উল্লেখ করেছেন, যেমন-

'শশ শশী পিঠে ঋতু ভুবনেতে রস।
কবিত্ব আরম্ভ কর্কটের দিনে দশ।।' (৯৬)

এই সাঙ্কেতিক শব্দগুলি ব্যাখ্যা করে গবেষক ড. সুকুমার মাইতি মহাশয় দেখিয়েছেন যে কবির কাব্য রচনার তারিখ ছিল - ১৬৩৬ শকাব্দের ১০ ই ভাদ্র। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী শশী

অর্থে চাঁদ বা ১, ঋতু = ৬ অর্থাৎ একের পিঠে ছয়-, তারপর ভুবন = ৩, এবং রস = ৬। অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলি সাজালে দাঁড়ায় - ১৬৩৬ (শকাব্দ), আর কর্কট অর্থে ভাদ্র মাসকে বোঝায় অর্থাৎ 'কর্কটের দিনে দশ'= ভাদ্র মাসের দশ তারিখ। সুতরাং কাব্য রচনার তারিখ দাঁড়ায় ১০ ই ভাদ্র, ১৬৩৬ শকাব্দ। (ইং ১৭১৪ খ্রিঃ) আর কবির এই কাব্য রচিত হয়েছিল আসাদুল্লাহ খানের রাজত্বকালের শেষদিকে। আসাদুল্লাহ খানের রাজত্বকাল ছিল ১৬৯৭ খ্রিঃ - ১৭১৮ খ্রিঃ। ডঃ সুকুমার সেন,এবং ঐতিহাসিক রজতকান্ত রায়ও কবির কাব্য রচনার কাল উল্লেখ করেছেন ১৭১৪ খ্রিঃ। এর পর থেকে কবি দিনে দরবারের কাজ সেরে রাত্রে কাব্য রচনার কাজ করতেন। এইভাবে কাব্যরচনার কাজ করতে করতে ধর্মের কৃপায় একদিন তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল।

'দিনে দরবার করি রাতে রচি গীত। অনাদ্যের মায়া কিছু বুঝা নাহি যায়।
ধর্মের কৃপায় পূর্ণ হইত সঙ্গীত।। ধর্মের আজ্ঞায় বসু নরসিংহ গায়।।' (১০০)

৩. বীরভূমের রাজনগরের পাঠান রাজ পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও মতিচুড় মস্‌জিদের কথা ঃ রাজনগরের যে পাঠানবংশীয় রাজপরিবারের তৃতীয় রাজা আসাদুল্লাহ্ খানের পক্ষে কবি নরসিংহ বসু আঠারো বছর ওকালতির কাজে নিযুক্ত থেকে তাঁর বিখ্যাত ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন, সেই রাজপরিবারের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন গ্রাম বাংলার ঐতিহাসিক উইলিয়াম উইলসন হান্টার। এই কাজের জন্য তিনি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা জৌহার জামান খানের আমলে অর্থাৎ আসাদুল্লাহ্ খানের মৃত্যুর দেড়'শ বছর পর রাজনগরে গিয়েছিলেন। তখনও রাজনগর ছিল বীরভূমের রাজধানী। রাজনগরের অবস্থান হচ্ছে বীরভূম জেলার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা সংলগ্ন স্থানে। সেই রাজনগরে ঐ পাঠান রাজবংশের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদের 'ধ্বংশাবশেষ' আজও দাঁড়িয়ে আছে। হান্টার সাহেব রাজপ্রাসাদ থেকে ঐ সময় ফারসি ভাষায় লিখিত রাজপরিবারের বংশপঞ্জী সংগ্রহ করে তা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়ে পন্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই রাজপরিবারের ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত করেন। পন্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফার্সী পুঁথির অনুবাদ থেকে এবং স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে যে কাহিনি উদ্‌ঘাটন করেছিলেন তার থেকে জানা যায় যে রাজনগরে পাঠান রাজাদের আগে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশীয় এক রাজপরিবার রাজত্ব করে গেছেন। ঐ বংশের শেষ রাজা ছিলেন 'রাজাবীর'। ঝাড়খন্ড সীমান্তের জংলি লোকেদের আক্রমণ থেকে রাজত্ব রক্ষার জন্য তিনি দুই পাঠান বীর জুনায়েদ খান ও তাঁর ভাইকে নিয়ে এসে উচ্চ সামরিক পদে বসান।

রজতকান্ত রায়ের 'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় - রাজার মৃত্যুর পর রাণী জুনায়েদ খানকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। রাণীর মৃত্যর পর সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে জুনায়েদ খান সেই বিদ্রোহ দমন করে রণমস্ত খান বা বাহাদুর খানের হাতে রাজ্যভার

'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' - ড. সুকুমার মাইতি - পৃ: ৫৫, 'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ' রজতকান্ত রায় - পৃ: ৯১.

বি.দ্র. : (১) শকাব্দ এবং বঙ্গাব্দের মধ্যে সময়ের পার্থক্য ৫১৫ বছর (২) খ্রিস্টাব্দ এবং বঙ্গাব্দের মধ্যে সময়ের পার্থক্য ৫৯৩ বছর (৩) খ্রিস্টাব্দ ও শকাব্দের মধ্যে সময়ের পার্থক্য ৭৮ বছর।

তুলে দিয়ে অল্প কালের মধ্যে মারা যান। রণমস্ত খান ১৬০০ খ্রিঃ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। আর তাঁর আমল থেকেই বীরভূমে পাঠান রাজত্বের শুরু হয়। রাজনগরে পাঠান রাজবংশের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে ঐ বংশের প্রথম রাজা হিসাবে রনমস্ত খানের নামই উল্লেখ আছে। রনমস্ত খানের রাজত্ব কাল ছিল ১০০৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ১০৬৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের পয়লা পর্যন্ত (ইং ১৬০০ খ্রিঃ মে মাস থেকে ১৬৫৯ খ্রিঃ অক্টোবর মাস) তিনি উনষাট বছর পাঁচমাস রাজত্ব করেছিলেন। এরপর তাঁর পুত্র বা আসাদুল্লাহ খানের পিতা কামাল খান বাহাদুর ১০৬৬ বঙ্গাব্দ থেকে ১১০৪ বঙ্গাব্দ (ইং ১৬৫৯ - ১৬৯৭খ্রিঃ) পর্যন্ত মোট আটত্রিশ বছর চারমাস রাজত্ব করে বিমারিতে মারা যান। বড় ফুল বাগিচায় তার কবর ছিল।

বীরভূমের পাঠান রাজ বংশের তৃতীয় রাজা হলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রাণ মহানুভব বাহাদুর আসাদুল্লাহ খান বা আসফুল্লা খান। পিতা কামাল খানের মৃত্যুর পর ১১০৪ বঙ্গাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্ব কাল ছিল ১১০৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১১২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত (ইং ১৬৯৭ - ১৭১৮ খ্রিঃ) মাত্র একুশ বছর। তাঁরই রাজত্বকালে তাঁরই উকিল হিসাবে কর্মরত অবস্থায় ১১২১ বঙ্গাব্দে বা ১৬৩৬ শকাব্দে (ইং ১৭১৪ খ্রিঃ) কবি নরসিংহ বসু তাঁর সুবৃহৎ ধর্মমঙ্গল কাব্যটি রচনা করেন, আর সেই কাব্যের স্থাপনা পালায় কবি তার নিয়োগ কর্তা আসাদুল্লাহ খান সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে এবং তাঁর মহিমা ও পরাক্রম বর্ণনা করে লিখেছেন

'বাঙ্গালায় বীরভূম বিখ্যাত অবনি।
শ্রী আসফুল্লা খান রাজা শিরোমণি।।
প্রবল প্রতাপ ভূপ সমরে প্রচন্ড।
সব দেশে যশ গায় রাজা ঝারিখন্ড।।
অস্ত্র শস্ত্রে নিপূণ বিখ্যাত মহীতলে।
দ্বাদশ হাজার ঢালি যার আগে চলে।।
তীরন্দাজ ধানুকির নাহিক সুমার।
অশ্বপতি তুরঙ্গ টাঙ্গন দু হাজার।।
সব বলে পরিপূর্ণ রিপু নাহি আঁটে।
বিশাশয় ভূপতি যাহার আজ্ঞা খাটে।।
দেশে নাঞি ডাকাচুবি রিপু কম্পমাণ।
তার দ্বারে থাকে সদা হাথে কর‍্যা প্রাণ।।' (৪০)

বীরভূমের রাজা আসাদুল্লাহ খান সম্পর্কে শুধু কবিই প্রশংসা করেছেন তাই নয়, ইতিহাস থেকেও জানা যায় তিনি ছিলেন ধার্মিক, মহানুভব, এবং হিন্দু মুসলমান সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল, তাই তিনি উভয় সম্প্রদায়ের জন্য বহু মন্দির ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্পত্তির বা আয়ের অর্ধেক আলিম, পীর ও ধার্মিক লোকেদের মধ্যে মদদ্ - ই - মাশ হিসাবে উৎসর্গ করেছিলেন। প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য বড় বড় জলাশয় খনন করে দিয়েছিলেন। তিনি রাজকার্য পরিচালনার সাথে সাথে নামাজ পাঠ ও আল্লাহর চিন্তায় সময় কাটাতেন।

মতিচুড় মসজিদের কথা ঃ ইতিহাস বিখ্যাত টেরাকোটা কাজে সমৃদ্ধ রাজনগরের মতিচুড় মসজিদ আসাদুল্লাহ খানের আমলেই তৈরী বলেই মত প্রকাশ করলেন এই রাজ পরিবারের একাদশ প্রজন্মের অন্যতম বর্ষীয়ান সদস্য রাজা সাহেব মহম্মদ রফিকুল আলম খান। অবশ্য অন্য একটি মত অনুসারে 'আনুমানিক ৪০০ বছর আগে রাজনগরের রাজা আমাদুরজ্জামানের আমলে তৈরী হয় 'মতিচুড় মসজিদ।' কিন্তু ঐ সময়ে রাজনগরের

সিংহাসনে আমাদুরজ্জামান নামে কোন রাজাই ছিলেন না। ৪০০ বছর আগে ১৬০০ খ্রিঃ প্রথম পাঠান বংশীয় রাজা হিসাবে যিনি অভিষিক্ত হয়েছিলেন তিনি হলেন — রনমস্ত খান বা বাহাদুর খান। এরপর ১৬৫৯ খ্রিঃ সিংহাসনে আসেন কামাল খান, তারপর ১৬৯৭ খ্রিঃ অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তিনশ আট বছর আগে আসাদুল্লাহ খান রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলেই রাজনগর অঞ্চলে বহু মস্‌জিদ নির্মিত হয়, যা অন্য কোন রাজার আমলে উল্লেখ নাই। তাই মতিচুড় মস্‌জিদের আনুমানিক বয়স (৩০০ - ৪০০ বছর), ধর্মীয় ব্যাপারে ও মস্‌জিদ নির্মাণের ব্যাপারে রাজা আসাদুল্লাহ খানের উৎসাহ, এবং অপর মতের নামের আদ্য অক্ষরের সঙ্গে মিল দেখে রাজাসাহেব রফিকুল আলম খানের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায় মতিচুড় মস্‌জিদ আসাদুল্লাহ খানের আমলেই নির্মিত হয়েছিল।

এই মতিচুড় মসজিদের অপূর্ব নির্মাণ শৈলী ও টেরাকোটার কাজ এটিকে সারা ভারতের মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য পুরাকীর্ত্তিতে পরিণত করেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর পর্যটকগণ এটি দর্শনে এসেছেন। কিন্তু বর্তমানে এটি ধ্বংসের মুখে, মস্‌জিদের গায়ে ছোট বড় নানা ধরনের গাছ জন্মেছে। মস্‌জিদের ভেতর এখন জঙ্গল ও জঞ্জালে পরিপূর্ণ। মস্‌জিদের ভেতরের অপূর্ব কারুকার্যের পাশে জঞ্জালের স্তূপ দেখলে কান্না পায়। এখানে আজ আর নামাজ পাঠের পরিবেশ নাই। তবে রাজ্যসরকার এটিকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের জাতীয় সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে একটি ফলকে বিজ্ঞপ্তি আকারে লিখেছে — 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতৃক রক্ষিত পুরাকীর্তি।' এই ফলক দেওয়ার পরও আজ পর্যন্ত (জুন ২০০৫) সংস্কারের কোন কাজে হাত দেওয়া হয় নাই, যদিও 'এই মস্‌জিদ সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তিন লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসনের কাছে আছে। জেলা প্রশাসনের মতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন' তবে রাজবাড়ির সদস্য থেকে শুরু করে স্থানীয় সকল মানুষের দাবি রাজনগরের গর্ব পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের এই জাতীয় সম্পদ --- মতিচুড় মস্‌জিদকে যে কোন মূল্যে সরকার রক্ষা করুক।

ফিরে আসা যাক রাজপরিবারের কথায় -- [১]ফার্সী ইতিহাস থেকে জানা যায় -- আসাদুল্লাহ খানের আমল পর্যন্ত রাজনগরের পাঠান রাজপরিবার নবাবকে পেশকার ও নজর পাঠাবার ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিলেন--- তাঁরা অন্যান্য দেওয়ানী সনদ নিযুক্ত জমিদারের মত নবাবের সামনে উপস্থিত হতেন না, তাঁরা তাঁদের উকিল মারফত পেশকার ও নজর পাঠাতেন। এ সম্পর্কে ড. রজতকান্ত রায় মহাশয়ের মতে হুজুরে খাজনা চালান দেওয়ার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গলে। তাঁরা নবাবের মুখাপেক্ষীও ছিলেন না। ১৭১৮ খ্রিঃ আসাদুল্লাহ খানের মৃত্যুর পর এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। যদিও তার পুত্র বদিউল জামান বা বদিউজ্জামান খান রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সম্ভবত পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্য শাসনের দায়িত্ব ভাই আজিম খানের উপর অর্পণ করে আর সৈন্য পরিচালনার ভার বীর পুত্র আলি নাকির উপর ন্যস্ত করে নিজে নাচ গান আর বাঁশি বাজিয়ে সময় কাটাতেন। এদিকে পাঠান সৈন্যরা বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় নবাবী সৈন্যদের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়ায় সরফরাজ খানের নেতৃত্বে বিরাট নবাবী ফৌজ রাজনগরের দিকে অগ্রসর হলে বদিউজ্জামান বুঝলেন নবাবের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সরফরাজের

১ **'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ' -ড. রজতকান্ত রায়।**

শর্ত মেনে বদিউজ্জামান নবাবের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। আর এই প্রথম বীরভূমের কোন নরপতি মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে হাজিরা দিলেন। তখন নবাব দরবারের তরফ থেকে বদিউজ্জামানকে দেওয়ানী সনদ দেওয়া হয় এবং পূর্বের ন্যায় বীরভূমের সাড়ে তিন লাখ টাকা খাজনাই ধার্য হয়,' তবে ঠিক হয় অন্যান্য জমিদাররা যে প্রথায় নিজেরা উপস্থিত হয়ে খাজনা প্রদান করেন এবং নবাবী হুকুম তামিল করেন বীরভূমের দেওয়ান জমিদাররা সেই প্রথা অনুসরণ করে চলবেন। বদিউজ্জামানের রাজত্বকাল ছিল ১৭১৮ - ১৭৫১ খ্রিঃ পর্যন্ত।'

বদিউজ্জামানের জীবিত কালেই তাঁর তৃতীয় পুত্র আসাদ আল জামান খান বা আসাদুর জামান খান ১৭৫২ খ্রিঃ রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এবং ১৭৭৭ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এরপর ১৭৭৮ খ্রিঃ থেকে ১৭৮৯ খ্রিঃ পর্যন্ত তাঁর ছোট ভাই মহম্মদ বাহাদুর আল জামান খান রাজ্য পরিচালনা করেন। বদিউজ্জামান খান পুত্রদের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে ধর্মচর্চা ও কোরাণ পাঠে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি ১৭৭১ খ্রিঃ মারা যান। এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে— বদিউজ্জামান খান কেন তাঁর জীবিত অবস্থাতেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমদ আজাহার খান ও দ্বিতীয় পুত্র বীর আলি নাকি খানকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে তৃতীয় পুত্র আসাদ আল জামান খানের হাতে রাজ্যভার তুলে দেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হান্টারের পন্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা হল — সৈফুল হক নামে এক ফকির রাজনগরের রাজদরবারে এসে বদিউজ্জামানকে কোরাণ শোনাতেন, রাজা এই ফকিরের মুখে কোরাণ শুনতে খুব ভালবাসতেন। আর কোরাণ শুনতে বসলে রাজা আর রাজকার্যও দেখতেন না। তাই আলি নাকি খান ও তাঁর বড়ভাই যুক্তি করে মুর্শিদাবাদ নবাবের অনুমতি নিয়ে ফকিরকে হত্যা করে। এই ঘটনায় বদিউজ্জামান মর্মাহত হয়ে রাজকার্য ছেড়ে দিলেন, এবং তাঁর ঐ দুই পুত্রকে রাজ্যভার না দিয়ে তৃতীয় পুত্র আসাদ উল জামানের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করেন। আলি নাকি খান ও আলি জামান খান অনুশোচনায় এবং পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে বাস করতে থাকেন। এক সময় আলি নাকি খান তাঁর বাবার শত্রু গিধোরের রাজাকে পরাস্ত করে বৈদ্যনাথ মন্দির সহ দেওঘর শহর বীরভূমের রাজার অধিকারে নিয়ে আসেন। সেই সময় আলি নাকি খান কর্তৃক বদিউজ্জামানের বর্ধিত রাজ্য বাংলায় সবচেয়ে বড় মুসলমান জমিদারী ছিল।

বাহাদুর আল জামান খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ জামান খান ১৭৯০ খ্রিঃ-— ১৮০১ খ্রিঃ মাত্র এগারো বৎসর রাজ্যভার পরিচালন করেন। এরপর দোয়ার জামান খান ১৮০২ খ্রিঃ - ১৮৫৫ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রায় তিপান্ন বছর রাজত্ব করেন। দোয়ার জামান খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জৌহার জামান খান রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলেই উইলিয়ম উইলসন হান্টার ১৮৬৪ খ্রিঃ বীরভূমের রাজনগরে গিয়েছিলেন ঐ রাজপরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করতে। সেই সময়েও রাজপরিবারের সদস্যরা রাজপ্রাসাদেই বাস করতেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁর পুত্র মহম্মদ জান আলাম খান পুরাতন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে প্রাসাদেরই উত্তরপূর্বদিকে নূতন ভিটেয় বসতি স্থাপন করেন। কারণ তখন ভঙ্গুর রাজ অট্টালিকা বসবাসের প্রায় অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। যাই হোক এখন নূতন ভিটেয় বসবাস করছেন রাজপরিবারের একাদশ প্রজন্মের সদস্য তথা সুলতান আলম খানের পুত্র ও মহম্মদ জান আলাম খানের পৌত্র মহম্মদ রফিকুল আলাম খান, যিনি রাজনগরে 'রাজাসাহেব' নামে পরিচিত।

বীরভূমের রাজনগরের পাঠান রাজপরিবারের পরিচিতি

আজ থেকে প্রায় তিনশ বছর আগে আমারই উর্দ্ধতন নবম পূর্বপুরুষ কবি নরসিংহ বসু রাজনগরের যে রাজ দরবারের পক্ষে প্রায় কুড়ি বছর ওকালতির কাজে নিযুক্ত ছিলেন, এবং যে রাজ দরবারের একটি জটিল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পথে ধর্মরাজের দর্শন ও নির্দেশ পেয়ে এই বৃহৎ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন সেই পুণ্য রাজ দরবারের ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদ যা অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই পুণ্যভূমিকে দর্শন ও স্পর্শ করার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে ২০.৩.২০০৫ তারিখে রাজনগর যাত্রা করেছিলাম। বর্ধমান থেকে পানাগড় ইলামবাজার সেখান থেকে আবার বাসযোগে রাজনগর পৌঁছালাম। সেখানে পৌঁছে রাজপরিবারের একাদশ প্রজন্মের বর্ষিয়ান সদস্য 'রাজাসাহেব' মহম্মদ রফিকুল আলাম খানের সাথে সাক্ষাৎ হল। খুব অল্প সময়ের আলাপ ও তাঁর আতিথেয়তায় বুঝলাম তিনি এক বিরাট হৃদয়ের অধিকারী, বুঝলাম একেই বলে রাজরক্ত। সত্যই তিনি 'রাজাসাহেব।' আর এও বুঝলাম অতিথি আপ্যায়নে তাঁর পুত্রদেরও যথেষ্ট সচেতন করে তুলেছেন — যা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সফিউল আলামের ব্যাপারেই বুঝা যায়। অতিথি সেবার পর রাজা সাহেব পুত্র সফিউল আলামের সাথে বর্ত্তমান লেখককে প্রাচীন রাজবাড়ি ও অন্যান্য ঐতিহাসিকস্থান দেখানোর জন্য পাঠালেন। উপস্থিত হলাম বহু আকাঙ্খিত প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও রাজ দরবারের সামনে । মনে মনে প্রণাম জানালাম। সুন্দর কারুকার্য মন্ডিত ভগ্ন রাজপ্রাসাদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম এই রাজদরবারের হয়েই কবি নরসিংহ বসু দীর্ঘ আঠারো কুড়ি বছর নবাব দরবারে ওকালতির কাজ করেছেন, এই সিঁড়ি দিয়ে কতবার উঠে দরবারে বসে রাজাবাহাদুর আসাদুল্লাহ খানের সাথে কত যুক্তি পরামর্শ করেছেন। সবশেষে এই দরবারে বসেই খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে নবাবের সঙ্গে বিবাদের মীমাংসা করার ব্যবস্থা করেছেন, আর ধর্মের কৃপায় নবাব দরবারে বিবাদের মীমাংসায় জয়লাভ করেছেন, রাজাকে বিপদমুক্ত করেছেন। আর সব থেকে বড় কথা এই বিবাদের মীমাংসা করতে যাওয়ার পথেই ধর্মরাজের দর্শন ও নির্দেশ পেয়ে তিনি একটি সুবৃহৎ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন। এই পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে রয়েছে ঐতিহাসিক দীঘি 'কালিদহ', যার মধ্যস্থলে দ্বীপের আকারে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে আছে হাওয়া মহলের ভগ্নাবশেষ, এই দীঘির দক্ষিণ দিকে বাঁধানো ঘাটের পাশে রয়েছে দু'টি সৌধ মিনার, আর রাজ প্রাসাদ সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে রয়েছে ইমাম বাড়া, সেখানে মহরমের দিন রাজনগরের সব 'তাজিয়া' এসে উপস্থিত হয়। তারপর রাজার অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে প্রথমে রাজপরিবারের 'তাজিয়া' আর তার পিছু পিছু অনান্য সব তাজিয়া শহর প্রদক্ষিণ করতে বের হয়। এখন বাজত্ব নেই কিন্তু রাজা আছেন, এখনও রাজবেশে সজ্জিত হয়ে রাজাসাহেব মহঃ সফিকুল আলম খাঁ বাহাদুর 'তাজিয়া' যাত্রার অনুমতি দেন। সৌধমিনারের বা কালিদহের দক্ষিণে রাজবাড়ির আরও কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ি পড়ে রয়েছে। প্রাসাদের উত্তর দিকে নির্মিত হয়েছে রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়। এটি রাজ স্টেটের জমির ওপর সম্ভবত মহম্মদ জান আলাম খান ও মহম্মদ সাফার জামান খানের আমলে প্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যালয় পরিচালনায় মহঃ তাহের জামান খান, সুলতান আলাম খান, বাহাদুর জামান খান ও মহঃ রফিকুল আলাম খানের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান পরিচালক মন্ডলীতে রাজবাড়ির প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছেন মহঃ রফিকুল আলাম খান।

মহঃ রফিকুল আলাম খানের কাছে রক্ষিত পাঠান রাজবংশপঞ্জী নিম্নে দেওয়া হল —

বীরভূমের রাজনগরের পাঠান রাজবংশের বংশপঞ্জী।
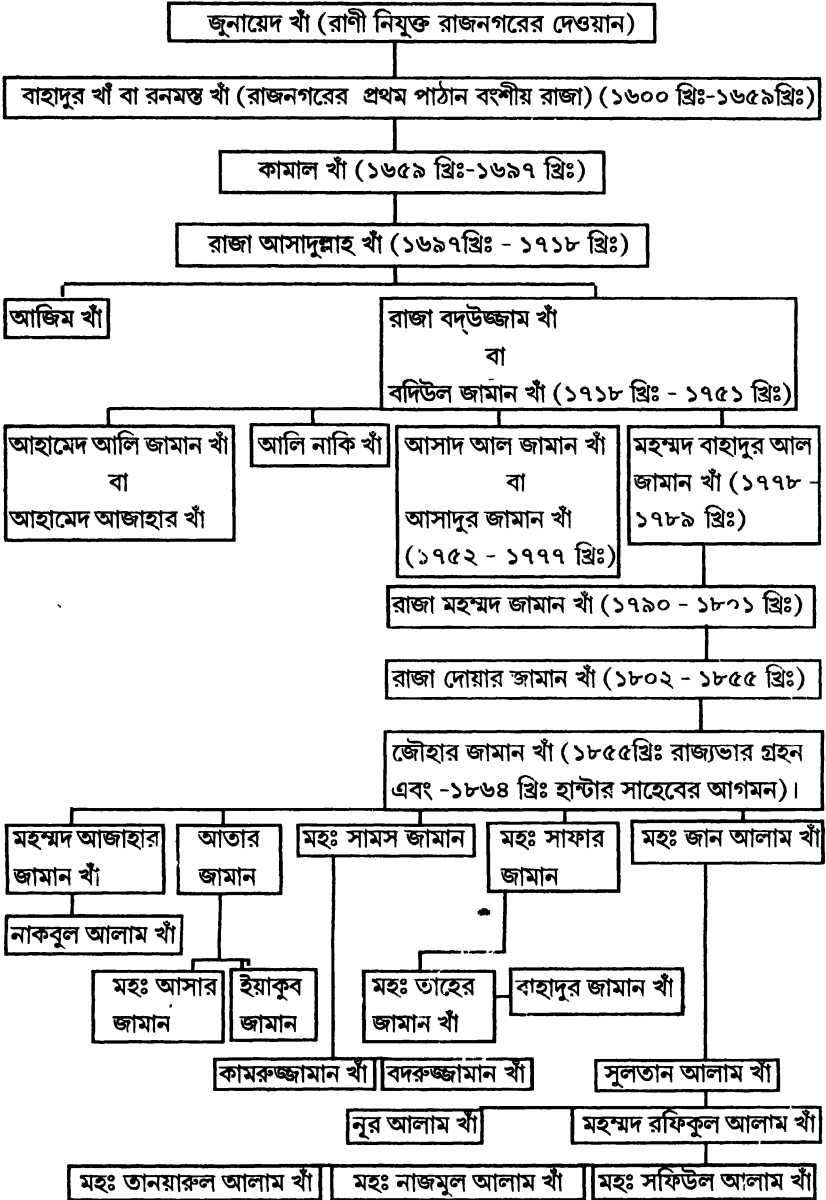
৪। কবি ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে বিভিন্ন সাহিত্যিকের অভিমত ঃ-

নরসিংহ বসু রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে ও কবি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন , ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুকুমার মাইতি, ঐতিহাসিক রজতকান্ত রায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল আয়তনে বিশাল,ভাষায় মার্জিত ও প্রাঞ্জল, সমাজমুখী ও বাস্তবধর্মী এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনারও অভ্রান্ত প্রামাণ্য নথি। এই প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন — [১] নরসিংহ বসু নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে বীরভূমের তদানীন্তন নবাব আসাদুল্লাহ্ খানের ওকালতি পদ লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তিনি বাংলা, সংস্কৃত ছাড়াও ফারসী, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার কাব্যের মধ্যে এই সকল পান্ডিত্যের অযথা প্রকাশ পাওয়া যায় না। তাঁহার কাব্যখানি আকারে সুবৃহৎ কিন্তু ইহার কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও পান্ডিত্যে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। নরসিংহের ভাষা মার্জিত, কোথাও গ্রাম্যতা দোষ-দুষ্ট নহে।'' [১]ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন — 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল গ্রন্থখানি বৃহৎ গ্রন্থ, ইহা ঘনরামের ধর্মমঙ্গল হইতে আকারে বৃহত্তর হইবে।' ঐতিহাসিক রজতকান্ত রায় হান্টারের পন্ডিত নবীন চন্দ্রের লেখা অপেক্ষা নরসিংহ বসুর লেখাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। — রাজা আসাদুল্লাহ খানের কাছ থেকে নবাবের খাজনা আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে ডঃ রজত কান্ত রায় লিখেছেন --- [২]কায়স্থ উকিল নরসিংহ বসুর বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায় যে মুর্শিদকুলি খানের নিজামত শুরু হবার পর রাজনগর আর আগের মতো স্বায়ত্ত শাসন বজায় রাখতে পারে নাই। যদিও হান্টারের পন্ডিত লিখেছেন -- নবাবকে প্রয়োজনে সৈন্য সাহায্য দিয়ে আসাদুল্লাহ পেশকাশ মুকুব করিয়ে নেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আসাদুল্লাহর উকিলের কথাই মানতে হবে। আসাদুল্লাহর মৃত্যুর চার বছর আগে যে হুজুরে খাজনা চালান দিতে হচ্ছিল তার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে নরসিংহ বসুর 'ধর্মমঙ্গলে।' [২] মাননীয় শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ বসু কায়স্থ পত্রিকায় -- (চৈত্র দ্বাদশ সংখ্যা - পঞ্চম বর্ষ) 'নরসিংহ বসু ও ধর্মায়ন' নামে একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন। ড. সুকুমার মাইতি মহাশয় বলেছেন --- [৩]নরসিংহ বসুর কাব্যভাষা মার্জিত ও অলংকৃত, এছাড়া কবি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুচির কাল থেকে ঐ বংশ শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতিতে সুসমৃদ্ধ ছিল। অধিকন্তু কবি আরবি, ফারসী, উড়িয়া, হিন্দী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তাই কবি বিভিন্ন ভাষায় শব্দভান্ডার থেকে শব্দচয়ন করে তাঁর কাব্যে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করেছেন। শব্দ নির্বাচন ও সুষ্ঠ প্রয়োগ কুশলতার জন্য কবি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'

কবি তাঁর কাব্যে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রায়নের মাধ্যমে তিন'শ বছর আগে সমাজের যে বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরে মানুষকে সমাজ সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন যা আজকের সমাজেও আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয়। গবেষক ডঃ সুকুমার মাইতি কবির এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলেছেন --- [৪] 'ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম কবি নরসিংহ বসুর সমাজ সম্পর্কে ধারণা কত স্পষ্ট ছিল তা তাঁর কাব্য পাঠ করলেই জানা যায়।

---

(১) বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস — ডঃ আশুতোশ ভট্টাচার্য - পৃঃ ৬৩৯ (২) 'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ' রজতকান্ত রায় - পৃ: ৯১. (৩,৪) 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' — ডঃ সুকুমার মাইতি - পৃঃ ৯৮, ৭৭ (৫) উমাচরণ বসুর নিকট সংরক্ষিত কায়স্থ পত্রিকার বিবরণ।

সমাজ জীবনকে তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কোন কাল্পনিক বাতায়ন থেকে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেননি, তাই তাঁর বর্ণিত সমাজের সঙ্গে আজকের সমাজের কোন পার্থক্য নাই, বরং বলা যায় স্রষ্টা ও দ্রষ্টার দৃষ্টি নিয়ে তিনি সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন বলেই মধ্যযুগে আবির্ভূত হয়েও আধুনিক কালের সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিম্বা বলা যায় যা সত্য যা শাশ্বত তার একটি নিখুঁত ছবি তাঁর কাব্যে চিত্রিত হয়েছে।' [৪] কবির এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু দৃষ্টান্ত পরের অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যেগুলি একালের সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ডঃ মাইতি মহাশয় বর্ত্তমান গ্রন্থকারকে লিখেছেন --- " আমার কাছে শাঁকারি তীর্থভূমি, যে ভিটেয় এই মহান কবি নরসিংহ বসু জন্মেছিলেন তাঁকে আজও একবার প্রণাম করে আসতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।"

নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল ঃ সমাজ ভাবনা

দ্বিতীয় পর্ব

নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের সামাজিক বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় পর্ব

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে সব ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল তা মূলতঃ ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন সমাজের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক। কবি নরসিংহ বসুও তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের সাথে সাথে সমাজভাবনার বিভিন্ন দিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন - সেই সম্পর্কেই এখানে কিছু আলোচনা করছি —

কবির সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ

১। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা - কবি নরসিংহ বসু তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন চরিত্রের কার্যকলাপ বর্ণনা করতে গিয়ে এবং তাঁর নিজেরও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাঁর যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন তার গুরুত্ব সর্বকালের বলা যেতে পারে। যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা। আমরা তাঁর বন্দনা পালায় দেখতে পাই একদিকে তিনি যেমন বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা করেছেন, তেমনি তাঁর জানা অজানা পীর পয়গম্বরেরও বন্দনা করেছেন। তাঁর কাব্যের বন্দনা পালার অংশ থেকেই সেই পরিচয় পাই — যেমন-

'শাঁখারিতে বন্দ দেবী শঙ্করীর পা।
কাতর কিঙ্করে ডাকে কৃপা কর মা।।
বাসুদেব রাঢ়েশ্বরী আর পঞ্চানন।
মহাদেব মনসা বন্দিব একমন।।
সেনের আলয়ে ধর্মবন্দ হাতজুড়ি।
শঙ্করী সম্মুখে বন্দিব ষষ্ঠি বুড়ি।।
নিজালয়ে শ্যামারূপা বন্দ সাবধানে।
অপার মহিমা যার আগমে পুরাণে।।' ১২
'কাঙ্গুরে কামাখ্যা বন্দ জোড় করি পাণি।
ক্ষীরগ্রামে বন্দিব যোগাদ্যা ঠাকুরাণী।।' ১৮
'কিরীটী কোনার মধ্যে বন্দ কৃষ্ণ কালী।
কালীঘাটে কালিকা বন্দিব মুন্ডমালী।।
শ্রীরাজবল্লভী বন্দ রাজবল হাটে।
দিবানিশি যেখানে আনন্দ গীত নাটে।।
বন্দ সর্বমঙ্গলা নিবাস বর্ধমান।
হিংলার দেবীবন্দ হয়ে সাবধান।।' ৩৬
'সাবধানে বন্দিব বোড়োর বলরাম।
পুড়িচর বন্দ বিশালাক্ষী অনুপাম।।
বোঁয়ায়ে বসন্তচন্ডী বন্দ পঙ্কজাক্ষী।
জোড়হাতে বন্দ চাবলার বিশালাক্ষী।।' ৬৮
'সোনাটিকরির মধ্যে বন্দ বিষহরি।
আমতার মেলাই বন্দ জোড়হাত করি।।'
'সগড়াই চন্ডী বন্দ রাজপদ্মা সনে।
কঙ্কাবতী বাজিতৎপুরে বন্দ একমনে।।
হরিপালে বন্দ দেবী চন্ডালের ঝি।
ভদ্রকালী মাতার উপমা দিব কি।।
শ্যামারূপা দেবী বন্দ ঢেকুরের গড়ে।
ছাগ মেষ যেখানে অনেক বলি পড়ে।।
কুলীন গ্রামের মধ্যে বন্দিব শিবানী।
বাঁধগাছা মধ্যে বন্দ রক্তেশ্বরী ঠাকুরাণী।।' ৮০
'বড়বেলুনের পাট চাবলার কুলি।
বন্দিব কুলীন গ্রামে লোটাইয়া ধূলি।।'
'কাইতির বানেশ্বর বন্দ সাবধানে।
বান ভূপতির পাট কেবা নাহি জানে।।' (৮৮)

এরপর তিনি তাঁর কাব্যে তাঁর জানা অজানা পীর পয়গম্বরের বন্দনা করে শ্রদ্ধাভক্তি জানিয়েছেন —

'কোটা শিমূলে বন্দ সইদ পীর আলি।	শাহবাহারাম বন্দ হয়ে সাবধান।
মন্দারণে বন্দী গাব পীর ইস্‌মালি।।' ১৫০	বন্দ মনে খোস করে যত আছে গান।।
'সৈয়দ মোর্তুম বন্দ আর সেখ চিল্লি।	জোড় হাতে বন্দিব দফর খান গাজি।
যার কথা বিখ্যাত সকল দেশ দিল্লী।।	শাহদোড় বন্দিব বাহন যার তাজি।।
শাখড়ায় চাপানিধি বন্দ পাঁচ পীর।	বন্দিব পাতালপুরী হনহন্যার বাগে।
দোবের সাহেব বন্দ খোয়াদে গিদির।।	মোকামের পীর বন্দ জোড় করি পাগে।।
কটক ঢাকায় বন্দ কদম্ব রসুল।	কত পীর পগম্বর নাম নাহি জানি।
জীয়ারুণ গেলে লোক দেয় নানা ফুল।।	সবার কদম বন্দ জোড় করি পাণি।।' (১৬৬)

কবি নরসিংহ বসু তাঁর কাব্যের এই বন্দনা পালায় হিন্দু মুসলমানের দেবদেবী ও পীরপয়গম্বরের বন্দনা করে সমাজে একটা বার্তা পাঠাতে চেয়েছেন যে সকল ধর্মকে সমান ভাবে শ্রদ্ধা করা দরকার।

শুধু বন্দনা পালাতেই নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে - হিন্দু দেবদেবীর প্রতি কবির যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি রয়েছে অন্য ধর্মের প্রতিও তিনি সমান শ্রদ্ধাশীল। ধর্মরাজের পূজার জন্য লাউসেন যখন হাকন্ড যাচ্ছেন, নৌ পথে যেতে যেতে কবি লাউসেনকে যেমন ধর্মরাজ দর্শন করিয়েছেন কপিল মুনির আশ্রম দর্শন করিয়েছেন, রামের সেতুবন্ধ দর্শন করিয়েছেন, সেইরকম গড় মান্দারনের পীরের মোকাম দর্শন করিয়েছেন, এমন কি দূর হতে মক্কা মদিনার ঘরও দর্শন করিয়েছেন। --

হাকন্ড যাত্রার জন্য লাউসেন ও সাঙ্গযাতরা নৌকায় চেপেছেন তখন কবি বলছেন ---

' হরি বল্যা তরি বায় যত নয়্যাগণ।
সন্ধাপুরে ধর্ম্মরাজ করিল দর্শন।।'
' তরণী ছুটিল যেন খস্যে পড়ে তারা। বাহিল দারকেশ্বর বহে দুই ধারা'
' বামদিকে পীরের মোকাম দরশন।
তার আগে কতদূর সিঙ্গা বেতাবন।।'(৮৫৬)
' কপিল আশ্রমে নৌকা হল্য উপনীত। সাগর সঙ্গম সেন পারাল্য তুরিত।।' ৮৭০
' *সেতুবন্ধ গেল নৌকা বামে রহে লঙ্কা।' 'হাথে প্রাণ করিয়া পারাল্যা সেতুবন্ধ।।'*
' ডানদিকে দূরে মক্কা মদিনার ঘর।
হাকন্ড ভূবন পাল্য রঞ্জার কুঙর।।'(৮৮৬)

আবার হাকন্ডে যখন ধর্মপূজা সম্পন্ন করে, ধর্মের দর্শন লাভ করে ও পশ্চিমে উদয় দিয়ে লাউসেন তাঁর সাঙ্গযাতদের নিয়ে নৌকাযোগে গৌড় দেশে ফিরছেন তখন কবি বলেছেন---

' সমুদ্রের ঢেউ উঠে সাত তাল জল। ডানিদিকে রাখিয়া চলিলা অস্তাচল।।
বামদিগে রহে মক্কা মদিনার ঘর।
দিবানিশি যেখানে থাঁকেন পয়গম্বর।।' (১৮)

৩৬,৬৮,৮৮,১৬৬ বন্দনা পালার, ৮৫৬,৮৭০, ৮৮৬, অঘোর বাদল পালার চরণ সংখ্যা।

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল ঃ সমাজ ভাবনা

ময়না থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্যের হাকন্ড তীর্থভূমিতে দাঁড়িয়ে যেখানে ভগবান নিরঞ্জনের প্রধান আরাধ্যস্থল, কবিরই ভাষায় যেখানে স্বয়ং ভগবান ধর্মরাজ লাউসেনকে দেখা দিয়ে পশ্চিমে উদয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, কবি সেখান থেকেই একদিকে যেমন লাউসেনের জন্য প্রভু মায়াধরের কৃপা প্রার্থনা করছেন,

' নায়কের কৃপা কর প্রভূ মায়াধর। জন্মে জন্মে লক্ষ্মী যেন না ছাড়েন ঘর।।'

আসর সহিত ধর্ম হবে বরদায়। বন্দিয়া মউরভট্ট নরসিংহ গায়।।'(৩৪৪৮)

আবার অন্যদিকে ওখান থেকে বহুদূরে অবস্থিত মুসলিম ধর্মের প্রধান তীর্থক্ষেত্র মক্কা মদিনার দিকে তাকিয়ে বলেছেন —

'বামদিকে রহে মক্কা মদিনার ঘর।

দিবানিশি যেখানে থাকেন পগম্বর।।' ১৮

এইভাবে কবি বিভিন্ন ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন করে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। কবির এই আবেদন আজকের নয়, তিনশ' বছর আগেকার সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াকার কথা, কিন্তু আজ একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসেও আমরা দেখছি কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে মস্‌জিদ মন্দির ভেঙ্গে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লড়াই বাধিয়ে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। সুস্থ সমাজের পক্ষে এ ধরনের বিভেদ সৃষ্টি খুবই ক্ষতিকারক। তাই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ' নিজের মত বা ধর্মকে শ্রদ্ধা কর, ভালবাস, কিন্তু অন্যের মতকে অন্যের ধর্মকে অশ্রদ্ধা ক'রো না, ঘৃণা ক'রো না। অন্য ধর্মকেও শ্রদ্ধা করবে।' তাই আজকের পরিবর্তিত পরিবেশে নতুন করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গল কবি নরসিংহ বসুর অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কথাগুলি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শরণ করি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায়।

২। বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি সমান ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন ঃ- নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মীয় ব্যাপারে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় সেটি হল সকল দেব দেবীর প্রতি তাঁর সমান ভক্তি শ্রদ্ধা। আমরা অনেক সময় দেখি যে যিনি শিবের উপাসক তিনি মনসার পূজা দেন না, যিনি কৃষ্ণের পূজারী তিনি কালীর পূজা করেন না। এক পাড়ার ঠাকুর অন্য পাড়া দিয়ে গেলে বাধা দেওয়া হয়। এক ক্লাবের পূজোর সঙ্গে অন্য ক্লাবের পূজোর প্রতিযোগিতা অনেক সময় মারামারিতেও রূপান্তরিত হয়। কবি নরসিংহ বসুর মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন ছত্রে আমরা কিন্তু দেখতে পাই বিভিন্ন দেব দেবীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ---

কবি নিজে ছিলেন কালীমায়ের সাধক। তাঁর গৃহদেবী হচ্ছেন কালী মা, যে মা আজও তিনশ বছর ধরে তাঁর বসত বাটীতে ভক্তিভরে পূজিতা হয়ে আছেন। তিনি বন্দনা পালায় তাই বলেছেন —

' নিজালয়ে শ্যামারূপা বন্দ সাবধানে।

অপার মহিমা যার আগমে পুরাণে।।' (১২)

৩৪৪৮ পশ্চিমে উদয় পালা, ১৮ স্বর্গারোহন পালার , ১২ বন্দনা পালার চরণ সংখ্যা।

বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি সমান ভক্তি

কিন্তু নিজালয়ে শ্যামারূপা কালীমায়ের বন্দনা হলেও তাঁর গ্রাম্য দেবী অষ্টভুজা শঙ্করী মাকে সবার উপরে রেখেছেন। নিজালয়ে শ্যামারূপার বন্দনা করেছেন বন্দনা পালার দ্বাদশ ছত্রে, কিন্তু শঙ্করী দেবীর বন্দনা করেছেন ষষ্ঠ ছত্রে -

' শাঁখারিতে বন্দ দেবী শঙ্করীর পা।
কাতর কিঙ্করে ডাকে কৃপা কর মা।। (৬)

কবির পিতামহ মথুরা বসু যখন তাঁর আদি নিবাস বর্ধমান জেলার বসুধা গ্রাম ত্যাগ করে শাঁখারিতে এসে ঘরবাড়ি স্থাপন করেন এই প্রসঙ্গেও কবি লিখেছেন ---

' বসুধা মিরাস ছাড়ি　　　শাঁখারিতে ঘরবাড়ি
করিলেন মথুরা বসুজা।
সত্যবাদী সদাচার　　　সদাই সাপক্ষ যার
আপনি শঙ্করী অষ্টভূজা।।
ভবানী করিয়া দয়া　　　দিল নিজ পদছায়া।' (১৭৬)

মথুরা বসু যে শাঁখারি এসেছেন তা অষ্টভুজা শঙ্করী মায়ের কৃপাতেই এসেছেন, এবং দেবী ভবানী - (শঙ্করী) দয়া করে নিজ পদছায়া দিয়ে তাঁকে সবসময় রক্ষা করেন। মা শঙ্করীর প্রতি কবির এই অসাধারণ ভক্তিই এই ছত্রগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে।

মা শঙ্করীর প্রতি কবির এই ভক্তির প্রকাশ তাঁর কাব্যের আরও বেশ কিছু ছত্রে পাওয়া যায়। --- কবির লেখা ' নিশাস্থাপনা' পালায় তাঁর আত্মকথা থেকেই জানা যায় যে অল্পকালে কবির পিতৃবিয়োগ হলে পিতামহী শোকাকুলা হয়েও তাঁকে পরম যত্নে নানা ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। এইসব শিক্ষা লাভের পর অষ্টভুজা শঙ্করীর কৃপায় কবি নানা স্থানে রোজকার করেছেন। সে কথাও তিনি তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন ---

' অল্পকালে পিতার হইল পরলোক।　　　পিতৃব্যের ব্যবহারে পরম যত্ন করি।
পিতামহী ঠাকুরাণী পাল্য বড় শোক।।　　　বাঙ্গালা পারসী উড়্যা পড়াল্য নাগরী।।
অষ্টভূজা শঙ্করীর কৃপাবলোকনে।
নানা দেশে রোজকার করি নানা স্থানে।।' (২৮)

আবার কাব্যের শেষ অংশে লাউসেন সকলের মঙ্গল কামনা করে রথে চড়ে যখন বৈকুণ্ঠের দিকে যাত্রা করলেন কবিও তখন অষ্টভুজা শঙ্করীর কৃপার কথা উল্লেখ করে প্রভূ নিরঞ্জনের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন।

' বসু বংশে অবতাংশ মথুরা বসুজা।　　　তার বংশে পুত্র কন্যা যত হয় যার।'
সদা যার সাপক্ষ শঙ্করী অষ্টভূজা।।　　　সভাকে করিবে দয়া প্রভু করতার।। (৯০৪)

আবার যে ইছাই ঘোষেদের অত্যাচারে কবির পিতামহ মথুরা বসুকে তাঁর আদি নিবাস বসুধা গ্রাম ত্যাগ করে শাঁখারিতে বসবাস স্থাপন করতে হয়েছিল, সেই ইছাই ঘোষের

শ্যামাপূজার বর্ণনাতে বা ইছাই ঘোষের শ্যামা মায়ের ভক্তির বিবরণে এতটুকু কার্পণ্য করেন নাই, বরং আছে উচ্ছ্বাস, আর এর মধ্যেই পাওয়া যায় তাঁর উদারতা। --- ইছাই এর শ্যামা রূপা দুর্গা মায়ের পূজার বর্ণণার কিছু অংশ ---

'শ্যামারূপা সিদ্ধিপাঠ ত্রিষষ্ঠের গড়ে।
ইছাই পূজেন শ্যামা চমৎকার পড়ে।। ২২০
ঢোল বাজে দামামা নিনাদ দুর দুর।
শানি বাজে সুন্দর শুনিতে সুমধুর।।'
' জগঝম্প গমকে ঠমকে পড়ে কাঠি।
রনসিঙ্গা তেঘাই বাজনা পরিপাটি।।' ২২৬

'ব্যালিশ বাজনা বাজে দেবীর সম্মুখে।
পূজার আয়োজন সব করেন কৌতুকে।। (২৩০)
কালিকা পুরাণ মতে ষোল উপচারে।
গোয়ালার মানস পূজিব অভয়ারে।।' (২৩৯)
'পুষ্প পাত্রে নানা ফুল কেশব কাঞ্চন।
জাতি যূথি জবা চাঁপা টগর রঙ্গন।।
বকুল মাধবী লতা মল্লিকা কমল।
করবী কেতকী কুন্দ শ্রীফলের দল।।' (২৪০)
'ছয় রসে পরিপূর্ণ সুবর্ণের থালা।
পরিপাটি নৈবেদ্য জ্বলিল দীপমালা।।
ধূপধূনা অন্ধকার দিবসে রজনী।
ভক্তিভাবে ইছাই পূজেন ত্রিনয়নী।।' (২৪৬)

এরপর রাজা গৌড়েশ্বর যখন লাউসেনকে ঢেকুর যুদ্ধে পাঠিয়েছেন এই সময়েও কবি ইছাই ঘোষের শ্যামারূপা মায়ের পূজার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানেও কবির সেই ভক্তিনিষ্ঠার পরিচয়ই পাই ---

' ভাব্যা চিন্তা গোপসুত যুক্তি কৈল সার।
শ্যামারূপা বিনা মোর কে রাখিবে আর।
পূজিব দেবীর আজি অভয় চরণ।
তাহার রক্ষিত আমি জানে সর্বজন।।' ১২
' একান্তে ভাবেন মনে ভবানী চরণ।
যার পূজা কর‍্যা রাম জিনিলা রাবণ।।
শ্যামারূপা সমীপে সত্বর গেলা ভূপ।
পূজার কারণ আওজন নানারূপ।।' ১৬
'পুষ্প দেন জাতি যূথী মল্লিকা টগর।
রঙ্গন কাঞ্চন কালা কিয়া নাগেশ্বর।।

'পলাশ অপরাজিতা জবা শতদল।
কেতকী ধাতুকী কুন্দ কেশর শ্রীফল।।
পুষ্পাঞ্জলি অঞ্জলি ভরিয়া পরিপাটি।
চারিদিগে জ্বালিল সুগন্ধ ধূপ কাঠি।।' ২৬
' নৈবেদ্য দিতেছে গোপ অশেষ প্রকার।
ক্ষীর চিনি ছেনা নাড়ু বিশাশায় ভার।।
নারিকেল কাঁঠাল কদলী নানা ফল।
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিল সুশীতল জল।।
কর্পূর তাম্বুল বস্ত্র অষ্ট আভরণে।
ইছাই পূজেন শ্যামা একভাব মনে।।' (৩৬)
'মহাবিদ্যা জপেন হইয়া একভাব।
যে বিদ্যা জপিলে সিদ্ধ বিষ্ণু ভক্তিলাভ।।' (৪০)

তিনি আরও বলেছেন ইছাই এর এই ধ্যান জপ আর ভক্তিতে কৈলাশ থেকে ভবানী ঢেকুরে ইছাই সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বর দিলেন এবং বল্লেন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঢেকুরে থাকবেন ---

---

৬,২৮,স্থাপনা পালার, আদ্য ঢেকুর পালার - ২২০, ২৪০, ২৪৬ ৩৭৬ চরণসংখ্যা।
১২, ১৬, ২৬, ৩৬, ৪০, ইছাই বধ পালার, ৯০৪ স্বর্গারোহণ পালার চরণ সংখ্যা।

বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি সমান ভক্তি

' এত বলি দেউলে বসিলা ভগবতী।
ভনে নরসিংহ যার শাঁখারি বসতী ।। (৮৪)

বিভিন্ন দেবদেবীকে কবি যে সমান ভাবে ভক্তি করতেন তা আমরা কাব্যের আরও অনেব অংশে দেখতে পাই। তিনি নিজে ছিলেন কালী মা বা ভবানীর সাধক, আবার তিনিই ধর্মরাজের আদেশে এবং ধর্মরাজের কৃপায় এই ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন তা বার বার স্বীকার করেছেন। যেমন বলেছেন ---

'অনাদ্যের আজ্ঞা হৈল রচিতে সঙ্গীত ।
পথে যাই অকস্মাৎ মনে উঠে গীত।।' ৮৮
'দিনে দরবার করি রাতে রচি গীত ।
ধর্মের কৃপায় পূর্ণ হইল সঙ্গীত।।
অনাদ্যের মায়া কিছু বুঝা নাহি যায় !
ধর্মের আজ্ঞায় বসু নরসিংহ গায়।।' (১০০)

আবার বিভিন্ন সময়ে একই সাথে শঙ্করী শিব ও ধর্মরাজের কৃপা প্রার্থনা করেছেন।

'শঙ্করী চরণে শিবে হও কৃপান্বিত। ধর্মের কৃপায় নরসিংহ গায় গীত।।' (৪৭০)

তাঁর কাব্যে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায় — যেমন কর্ণসেন - রঞ্জাবতীর বিবাহে রাণী ভানুমতি তাঁর মত প্রদান করার পর কবি লিখেছেন —

'চাঁদরায়ে কৃপা কর প্রভু মায়াধর।।
শঙ্করী চরণে শিবে হবে বরদায়। ধর্মেরমঙ্গল বসু নরসিংহ গায়।।' ২৭৪

এরপর পুত্রকামনায় রাণী রঞ্জাবতী চাঁপায়ে ধর্মপূজা ও 'শালেভর' দেবার জন্য রাজা কর্ণসেনের অনুমতি প্রার্থনা করতে যাবার সময় কবি লিখেছেন —

' বিদায় হইতে গেল ভূপতির স্থানে। শঙ্করী চরণে শিবে হবে কৃপান্বিত ।।
চাঁদরায়ে কৃপা কর প্রভু নিরঞ্জনে।। ভনে নরসিংহ বসু নতুন সঙ্গীত ।।' ৭৮

আবার ভগবান নিরঞ্জনের কাছ থেকে পুত্র বরলাভ করার পর রাণী রঞ্জাবতী রাজাকে সব বললেন— , এরপর দাসী মাণিকী কল্যাণী বাসর শয্যা প্রস্তুত করে বৃদ্ধ রাজাকে সেখানে রেখে রাণীর কাছে সেই সংবাদ দিতে যাবার সময় কবি বলেছেন —

'রঞ্জার সম্মুখে দাসী দিল দরশন। চাঁদরায়ে কৃপা কর প্রভু নিরঞ্জন।।' ৫০৬
'শঙ্করী চরণে শিবে করিবে কল্যাণ। নরসিংহ রচিল সাপক্ষ ভগবান।।' ৫০৮

আবার রাজা গৌড়েশ্বর লাউসেনকে কাঙুর যুদ্ধে যাবার নির্দেশ দেবার পর কালুবীরও সেনকে বিশেষ উৎসাহ দিল, তখন কবি বলেছেন —

' বীরদাপ বচনে বীরের ঘুচে ভয়। চান্দরায়ে কৃপা কর প্রভু দয়াময়।।' ৬৯৪
'শঙ্করী চরণে শিবে হবে বরদায়। ধর্মের মঙ্গল বসু নরসিংহ গায়।।' ৬৯৬

অলঙ্ঘ্য কাঙ্গুর গড় দেখে লাউসেন যখন ভাবছেন কি করে এই কাঙ্গুর জয় করবেন তখন কালুবীর একাই গড়ে প্রবেশ করার অনুমতি নিয়ে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে গিয়ে দেবী দর্শন করে ও দেবীর পূজাপাঠে মুগ্ধ হয়ে যে ভাবে দেবীর স্তব করলেন, অর্থাৎ কালুবীরকে দিয়ে কবি দেবীর যে স্তব করিয়েছেন তার থেকে কামাখ্যা দেবীর প্রতিও কবির অগাধ ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়—

'মহাসিদ্ধ পীঠস্থানে বীর উপনীত।
ধর্মের কৃপায় নরসিংহ গায় গীত।।
দন্ডাইয়া দেবীর দ্বারে কালুসিংহ ধল।
জোড়হাতে বন্দিলেন চরণ যুগল।।
পাদপদ্ম দর্শনে সকল পাপ ক্ষয়।
দ্বিতীয় কৈলাশ প্রায় দেবীর আলয়।।' (৮৬)
'পাদপদ্ম পূজে কেহ পরম কৌতুকে।
জোড় হাথে স্তব পাঠ দন্ডায়্যা সম্মুখে।।'
'পুষ্পাঞ্জলি কেহ দেয় চরণ কমলে।
মিষ্টান্ন নৈবেদ্য নিবেদন নানা ফলে।
'বস্যাছেন যোগে কেহো ধর‍্যাছেন ধ্যান।
ভাবে গদ গদ কেহো করিছেন গান।।'
' সপ্তশ্রুতি পড়েন পন্ডিত দ্বিজগণ।
যজ্ঞ কুন্ডে হুতা হবি করেন হবন।।
চারিদিকে চন্ডীর পূজায় পরিপাটি।
চন্দন অগুরু চুয়া পরিপূর্ণ বাটি।।'
'পার্বতীর পূজা দেখ্যা সেনের নন্দন।
ভাবে গদ গদ হৈলা অরুণ নয়ন।
জীবন জনম মোর হইল সফল।
দেখিনু নয়ন ভরে চরণ কমল।।' (১০৮)

দেবীর পূজা দেখে ভাবে গদ গদ হয়ে কালুবীর জোড় হাতে দেবীর স্তব আরম্ভ করল —

'জোড় হাথে স্তব পাঠ হৈয়া দন্ডবৎ।
পাদপদ্ম পূজিল সম্পূর্ণ মনোরথ।।
বিশ্বরূপা ব্রহ্মার জননী বেদমাতা।
বিষ্ণু ভক্তি প্রদায়িনী হরি ভক্তি দাতা।।
দানদয়ামই দেবী দুঃখ বিনাশিনী।
ভক্তে অনুগতা দূর্গা দুর্গতি নাশিনী।।'
'গিরীশ্বর মুনি গিরিরাজের দুহিতা। (১১৪)
তোমা পূজে রামচন্দ্র উদ্ধারিলা সীতা।।
ব্রহ্মাকে রাখিলে মধু কৈটব নাশিয়া।
খন্ডালে দেবের ভয় মহিষ মারিয়া।।
চন্ডমুন্ড বধিয়া হইলে মুন্ডমালী।
রক্তবীজে বিনাশিলে ঘোররূপা কালী।।
শম্ভুবীর বধিলে নিশম্ভু তার ভাই।
দৈত্য দল্যা দূর কৈল্যে দেবের বালাই।।
সাবিত্রী-গায়িত্রী ধাত্রী অখিলের মা।
দেবাসুর দনুজ সেনের তুয়া পা।।'
' সেইজনা পূজে তব চরণ কমল। (১৪০)
তারপারা সংসারে কাহার ভাগ্যবল।।
সভার পূজিত সেই সর্বগুন ধাম।
দিনে একবার যে তোমার লয় নাম।।'
(১৪৬)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কবি শঙ্কর, শঙ্করী, কালী, কামাখ্যা, ধর্মরাজ প্রভৃতি দেবদেবীকে সমান ভাবে ভক্তি প্রদর্শন করে দেখিয়েছেন সকলেরই এই পথ অনুসরণ করা উচিত।

৩। দেব সমাজেও সুসম্পর্ক ঃ

কবি দেব সমাজের মধ্যেও দেখিয়েছেন পারস্পরিক সুসম্পর্ক, এমনকি স্বয়ং ধর্মরাজও যে কোন দেবতা বা দেবীকে তাঁর যোগ্য মর্যাদা প্রদান করতে পিছ পা হন নাই।

৮৮, ১০০ স্থাপনা পালার, কলিঙ্গার বিবাহ পালার ৮৬,১০৮,১১৪,১৪০,১৪৬, 'হরিশচন্দ্রের উপাখ্যানে'র ৭৮, 'লাউসেন জন্মপালা' ৫০৬,৫০৮, আদ্য ঢেকুর পালার ৪৭০, 'কাঙুর মহিম যাত্রা'র ৬৯৪, ৬৯৬ চরণ সংখ্যা।

দেব সমাজে সুসম্পর্ক

যখন আমরা দেখতে পাই 'নিশা স্থাপনা পালা'য় দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় প্রধান নর্তকী অম্বুবতীর নৃত্য দেখার জন্য - সকল দেবদেবী সেখানে এসেছেন, কৈলাশ থেকে দেবী পার্বতী এসেছেন। কিন্তু অম্বুবতী তাঁকে চিনতে না পেরে যৌবন গর্বে গর্বিত হয়ে কিছু কটু কথা বলে দেবীকে ডিঙ্গিয়ে চলে গেলেন। তাই দেবী তাকে শাপ দিলেন, আর দেবী ভবানীর শাপে দেব সভায় নৃত্যের সময় অম্বুবতীর নৃত্যের তাল ভঙ্গ হয়ে গেল। সেই দেখে হনুমান তাকে তিরস্কার করলেন। একারণে নটী ধর্মরাজের চরণ ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন —
সেই সময় ধর্মরাজ বলেছিলেন —

' আমি কি করিব দেবী দিয়েছেন শাপ .
তে কারণে তুমি হেথা পাল্যে অনুতাপ।।
কৈলাশ শিখরে যাহ ভবানীর ঠাই।'
এত বলি বৈকুণ্ঠেতে গেলেন গোঁসাই।।' (৮৮০)

এই অংশ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি — ধর্মরাজ অম্বুবতীকে নিজে ক্ষমা না করে ভবানীর কাছেই পাঠালেন।

আবার ঢেকুরের রণ ও ইছাই বধ পালায় দেখা গেছে ইছাই হলেন শ্যামারূপা ভবানীর সাধক, কিন্তু তার জন্য ধর্মরাজ ও ভবানীর মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বরং ধর্মরাজ দেবী ভবানীর অস্ত্র, ভবানীর বরকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। তাই দেখি দেবীর দেওয়া শর ইছাই যখন লাউসেনের দিকে নিক্ষেপ করল — দেবগণ বৈকুণ্ঠে হাহাকার করে উঠলেন, ঠাকুর নিরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু নিজে কোন অস্ত্র লাউসেনকে দিলেন না, বরং বললেন -

' দিয়াছেন ইছায়ে অভয়া দেবী শর।
ব্যর্থ নাহি হয় কভু দেবীর আতর।।' ৩৯৪

অবশ্য লাউসেনকে রক্ষা করার জন্য হনুমানকে পাঠিয়ে লাউসেনকে মনে পড়িয়ে দিলেন যে দেবী ভবানী লাউসেনকেও তাঁর হাতের খড়গ দিয়েছেন, লাউসেন যেন দেবীর সেই খড়গ ইছাই প্রেরিত শরের আগে ধরেন। দেবীরই দুই অস্ত্রে সব নিষ্ফল হয়ে যাবে, আর হলও তাই -

' দেবী দত্ত দুই অস্ত্র দুই সমতুল।
খড়োতে লাগিল বান যেন চাঁপাফুল।। (৪১০)

এই পালাতেও আরও দেখা যায় যে দেবীর বরে ইছাই এর কাটা মুন্ড বার বার জোড়া লেগে যাওয়ায় ঠাকুর নিরঞ্জন দেবগণকে বলেছেন ---

' কাটিলে না কাটা যায় গোয়ালা নন্দন।।
দেবী দিয়াছেন বর অন্যথা না হয়।' ৫৭৯

তাই দেখা যায় দেবীর বরকে ঠাকুর নিরঞ্জনও অন্যথা করছেন না। উপেক্ষা করছেন না। অথচ ভক্ত লাউসেনের জন্যও তিনি ভেবে আকুল ।

---

৮৮০ - নিশাস্থাপনা পালার চরণ সংখ্যা। ৩৯৪, ৪১০, ৫৭৯ - 'ইছাই বধ পালা'র চরণ সংখ্যা।

' ভক্ত বৎসল প্রভু ভাবেন অন্তরে।
দেবীর বিষম পণ কেবা রদ করে।।' ৭৫৬

তখন দেবতারা প্রভু ভগবানকে বললেন —

' ঢেকুর ছাড়িলে দেবী মরিবে ইছাই।'
' অভয়া থাকেন যদি কৈলাশ শিখরে।
বিজয় হবেক সেন ঢেকুর সমরে।।' (৭৭৬)

যেহেতু লাউসেন ও ইছাই উভয়েই এক একজন দেবদেবীর ভক্ত, তাই ঠাকুর নিরঞ্জন লাউসেন ইছাই যুদ্ধের পরিসমাপ্তির এক চমৎকার উপায় বের করলেন, এক কৌশলে দেবী পার্বতী শ্যামারূপাকে ঢেকুর থেকে কৈলাশে পাঠিয়ে দিয়ে হনুমানকে পাঠালেন লাউসেনের কাছে এই সংবাদ দিতে এবং হনুমানকে আরও বললেন — এবার লাউসেন যখন ইছাই এর মুন্ড কাটবে তুমি সেই মুন্ড সঙ্গে সঙ্গে গোলকে নিয়ে আসবে। তাকে আমি পদছায়া দিতে চাই, কারণ সেও একভাবে ভগবতীর পূজা করছে। —

'একভাবে গোয়ালা পূজ্যাছে ভগবতী।
ইছা এর উত্তম করিতে চাই গতি।।
বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী হন মহামায়া।
অতএব ইছা এ দিতে চাই পদছায়া।।' (৯৩৮)

হনুমান তৎক্ষণাৎ ঢেকুর রণক্ষেত্রে এসে লাউসেনকে সব কথা জানালেন। লাউসেন —

' রাম রাম বলিয়া ইছা এ চোট হানে।
ভূমে মুন্ড পড়িতে লুফিলা হনুমানে।।
পরম যতনে বীর শূন্যপথে ধান।
অবিলম্বে গোলক পাইল হনুমান।।
রাখিল গোবিন্দ পদে ইছা এর মাথা
সাধু সাধু বাখানিল বিশ্বনাথ ধাতা.।
ইছাই হইলা মুক্ত পড়ে জয় জয়।
সমরে বিজয় হৈলা রঞ্জার তনয়।। (৯৮২)

৪। ঢেকুর যুদ্ধে ইছাই এর পরাজয়ের কারণ ঃ-

এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে ভবানীর পদসেবা করে মনুষ্যজীবন থেকে মুক্ত হয়ে ইছাই গোলোকে চলে গেলেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন যুদ্ধটা কেন হয়েছিল? যুদ্ধ হবার কারণ হল — ইছাই নিজ বাহুবলে ও দেবীর বরে স্বঘোষিত স্বতন্ত্র রাজ হয়েছিলেন ঢেকুর গড়ের। সেইজন্য দেশের রাজাকেও মানতেন না, কর দিতেন না। ছ' সালের আঠারো লক্ষ টাকা কর বাকি। রাজার ভাট কর চাইতে এলে ইছাই তাঁকে অপমানিত করে বিদায় করে দেন।

' ইছাই বলেন ডেকে বাঁধ পিঠমোড়া।
ভূমে পড়ে পাল দিয়া ধনুকের চড়া।। (৬০০)
ভাটকে বলেন কিছু ইছাই কুঙর।
কোন বেটা নিতে পারে ঢেকুরের কর।।
কেবা তোকে পাঠাইলা কেবা কর দেয়।
কার বা যোগ্যতা ঢেকুরের করনেয়।
আমি স্বতন্তর রাজা কেবা আছে আর।
এদেশেতে ব্রহ্মার নাহিক অধিকার।।'৬০৬

কাব্যের এই অংশ থেকে আমরা দেখতে পাই — ইছাই এর ঔদ্ধত্য, দেশের রাজাকে

৭৫৬,৭৭৬, ৯৩৮, ৯৮২ এই সংখ্যাগুলি কাব্যের ইছাই বধ পালার, ৬০০, ৬০৬, সংখ্যাগুলি কাব্যের ' আদ্য ঢেকুর পালার' চরণ সংখ্যা।

অবমাননা, মহাশক্তিধর ব্রহ্মাকে অবজ্ঞা, নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করে অন্যান্য সকলকে অসম্মান --- এ সবই ন্যায়নীতি, সমাজনীতি বা ধর্মীয় আদর্শের পরিপন্থি। ইছাই দেশের রাজা তথা নিয়োগকর্তাকে অমান্য করে নিজেকে স্বঘোষিত রাজা প্রতিপন্ন করে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন বলে সে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল।

৫। পিতামাতার প্রতি ভক্তি ঃ কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে দেখিয়েছেন প্রত্যেক সন্তানের তাঁর পিতামাতার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকা উচিৎ যেমনটি ছিল রাজপুত্র লাউসেন ও তাঁর ভাই কর্পূর সেনের। লাউসেন বা কর্পূর সেন যখনই কোন কাজে গেছেন বা কোন কাজ করতে চেয়েছেন তখনই পিতা মাতার বিনা অনুমতিতে করেন নাই, পিতা মাতা কোন কাজে অনুমতি না দিলে সে কাজ থেকে বিরতও থেকেছেন। এ বিষয়ে দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

লাউসেন রাণী রঞ্জাবতী ও রাজা কর্ণসেনের অতি আদরের ছেলে, তাঁরাই ছেলেকে অস্ত্রশস্ত্র নানা বিদ্যায় বিশারদ করে তুলেছেন, সুতরাং ঐ ছেলে যা চাইবে তাই পাবে। এটা লাউসেনও জানতেন। তবুও দেবী দুর্গার দেওয়া খড়্গের সঙ্গে একটি ঢাল বা ফলা দরকার সেটিও চাইছেন অতি বিনীত ভাবে জোড় হাতে। — দেবীর দেওয়া খড়্গখানি মা বাবাকে দেখাতে নিয়ে এসে বলেছেন —

' ভবানী প্রসন্না হয়ে দিলেন আতর। জোড়হাতে সেন জননীকে নিবেদয়।
হের দেখ খড়্গখানি পরম সুন্দর।। খড়্গযোগ্য ফলা হৈলে হবে ভাল হয়।।' ১০২৬

আর একটি ঘটনা — ফলা বিদ্যায় লাউসেন নিপুন হয়ে উঠলে, ভাই কর্পূর গৌড়দেশে মাসি, মেসো গৌড়েশ্বর ও মামাদের সাথে দেখা করার পরামর্শ দিলেন, এবং বলেন —

' বিদায় হইয়া চল মা বাপের ঠাই। পিতার পিরিতে সব দেবতার প্রীত।
জনক জননী হতে বাড়া গুরু নাই।। পিতাপেক্ষা মাতা গুরু শাস্ত্রের লিখিত।।
বেদের বচন দাদা পিতা মাতা পরম গুরু। মা বাপের আশীর্বাদে সব ঠাঁই জয়।
পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতা কল্পতরু।। বিদায় হইয়া যেতে উপযুক্ত হয়।।'
(৫৮৮)

এই বলে দু'ভাই গৌড় যাবার অনুমতি চাইতে গেলেন কিন্তু ছেলেদের কথা শুনে রাজা রাণী দু'জনাতেই ভয়ে অস্থির, গৌড় যেতে দেবার তাঁদের কোন ইচ্ছাই নাই, তাই বললেন —

' গৌড় যেতে যদ্যপি বাসনা আছে মনে।
বড় হলে যাবে বাছা রাজ সম্ভাষণে।।' (৬৭৬)

মা বাবার কথা একবাক্যে মনে নিয়ে তাঁরা গৌড় যাত্রার বাসনা ত্যাগ করলেন —

' যাত্রা ভাঙ্গিলেন দোঁহে মায়ের বচনে।
কৃপা কর ধর্মচাঁদ শঙ্করী চরণে' (৬৮২)

সন্তানের কাছে পিতা মাতার স্থান কত উর্দ্ধে কবি তা দেখিয়েছেন তাঁর কাব্যের বেশ

৫৮৮, ৬৭৬, ৬৮২, এই সংখ্যাগুলি কাব্যের ' মালবধ পালা'র , ১৬, ৩২৪, ৩৩০, ৭২২, ৭৩২, ৭৩৮, ৭৬৮ 'কাঙুর মহিম যাত্রা' পালার চরণ সংখ্যা।

কিছু অংশে - যেমন, একবার লাউসেন ও কর্পূর গৌড়দেশে গিয়ে তাঁর মামার সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে পাত্র আর রাজার নির্দেশে রাজার পাট হাতি বধ করে পুনরায় তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে রাজার কাছে প্রচুর সম্মান, আদর ও পুরস্কার পেয়েছিলেন, সেই সময় দুজনায় দিনকতক গৌড়দেশে ছিলেন, কিন্তু কর্পূর মা বাবার জন্য দাদাকে তাড়াতাড়ি নিজ দেশ ময়নায় ফিরে যেতে বললেন - কারণ মা বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন — এখানে কর্পূরের মুখে কবি বলেছেন —

' জন্মভূম জান্য রায় গোলক সমান। জননী সমান গুরু নাহি ত্রিভুবনে।
জনকেরে জানিবে সাক্ষাৎ ভগবান।। বৃদ্ধ পিতা মাতাকে তোমার নাঞি মনে।।' ১৬

এরপর লাউসেন কর্পূর ময়না ফিরে গেছেন —

'ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি ঘর পড়্যা গেছে মনে। দুই ভাই চলিলেন মা বাপের ঠাঞি।
লাউসেন উপনীত ময়না ভুবনে।।' ৩২৪ দন্ডবৎ প্রণাম সম্পুট হৈয়া পাণি।।'
'ঘোড়া হৈতে নামিল আনন্দে সীমা নাঞি। কোলে কর্য়া মুখে চুম্ব দিল পাটরাণী।।' ৩৩০

এর কিছুদিন পর মহাপাত্রের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে কাঙুর যুদ্ধে গিয়ে ওখানের রাজা কর্পূর ধলের কাছ থেকে কর আদায় করে আনতে লিখেছেন। যুদ্ধে যাবার জন্য লাউসেনের মনে খুব আনন্দ হয়েছে কিন্তু পিতা মাতার অনুমতি প্রয়োজন —

' বাপের নিকট গেলা হরিষ অন্তরে।।' কাঙুর মহিমে যাত্যে লিখেছেন রায়।।
' জোড় হাথে প্রণিপাত চরণ যুগলে। তুমি আজ্ঞা দিলে যাই কাঙুর ভুবন।
লাউসেন বলেন নিবেদি কিছু পায়। কর্পূর ধলের সাথে করি যায়্যা রণ।।' (৭২২)

যুদ্ধের কথা শুনে কর্ণসেন প্রথমে ভয় খেয়ে গেলেন। লাউসেন তখন অভয় দিয়ে বলেন —

' তোমার আশিসে জয়ী হইব সমরে' ৭৩২

' রাজার চাকর আমি তার নোন খাই। শুনিঞা বলেন কিছু কর্ণসেন রায়।
রাজ আজ্ঞা সতত যোগাতে আমি চাই।। আপন মায়ের স্থানে হও সে বিদায়।।' (৭৩৮)

এরপর কর্ণসেন রাজ আজ্ঞা পালনে পুত্রের কর্তব্যবোধ দেখে মায়ের কাছে অনুমতি নিতে বললেন, — পিতার কথায় মায়ের কাছে গিয়ে নৃপতি গৌড়েশ্বরের চিঠি পড়ে মাকে শুনালেন, কিন্তু মা রঞ্জাবতীর মন চাইছিল না ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাতে, কিন্তু পিতা মাতার অনুমতি ছাড়া যাওয়া যাবে না, তাই মাকে বললেন - -

' চিন্তা না করিহ মা সাপেক্ষ মায়াধর।। রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘিবা বড়ই অনুচিত।
তোমার আশিসে মোর সর্ব ঠাঞি জয়। পরিণাম কি জানি কি হয় বিপরীত।।
আজ্ঞা হকু সদয়ে না কর্য়া দ্বিধা মন।
তোমার আশিসে গো বিজয় হব রণ।।' (৭৬৮)

এরপর মা বাবার আশীর্ব্বাদ নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন —

' এত বলি বিদায় বাপ স্থানে রায়। রাজরাণী দুইজনা করিল আশিস।
পদরজ দু জনার বন্দিল মাথায়।। সমরে সারথী বাছা হবে জগদীশ।। (৭৭২)

পিতা মাতার প্রতি ভক্তি

আর একটা ঘটনা উল্লেখ করছি । লাউসেন পিতামাতার প্রতি ভক্তির নিদর্শন হিসাবে- মহাপাত্রের পরামর্শে গৌড়েশ্বর ইছাই এর বিরুদ্ধে ঢেকুরের যুদ্ধে যাবার জন্য লাউসেনকে পত্র লিখেছেন। সেই পত্র পেয়ে লাউসেন ---

'পতি হাতে চলিলা বাপের বরাবর।।
সবিনয়ে বন্দিলেন বাপের চরণ।
বিশেষিয়া মৃদুভাসে বলেন বচন।।
ঢেকুর মহিম যাত্যে লিখেছেন ভূপ।'২৬৩

ঢেকুর যুদ্ধের কথা শুনে কর্ণসেন ভীষণ ভয় পেলেন, কারণ পূর্বে ঢেকুর যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয়েছিল, তাদের শোকে মহারাণী ও পুত্রবধূরা আত্মহত্যা করেছিলেন, তাই তিনি বললেন - 'আপন জননী স্থানে হও গা বিদায়' ২৭৯

তাই - 'শুনিয়া মা এর স্থানে শীঘ্র গেলা রায় '।। ২৮০

গিয়ে - ' জোড় হাতে বন্দিলেন চরণ যুগল।' ২৮১

লাউসেন মাকে জানালেন —

' ভূপতির আজ্ঞা যাত্যে ঢেকুর রণে।
আস্যাছি বিদায় হতে তোমার চরণে।।' (২৮৮)

ঢেকুর যুদ্ধের কথা শুনে মাও সচকিত হয়ে পড়লেন, ঢেকুর যুদ্ধে যেতে তাঁরও মন সায় দিচ্ছিল না। তখন লাউসেন মাকে বোঝালেন, এবং বললেন —

' আমার সাপেক্ষ সদা প্রভূ নিরঞ্জন।
অর্জুন সারথি পূর্বে আছিলা যেমন।।' ৩২৪
ঘরে বস্যা থাক মা না কর মনে ভয়।।
তব আশীর্ব্বাদে হব ঢেকুরে বিজয়।।

এত বলি বিদায় বন্দিলা দুই পদ।
রাণী আশীর্ব্বাদ দিল হুকু অতুল সম্পদ।।
সমরে সারথি বাছা হবে নিরঞ্জন।
পার হইয়া অজয় জিনিবে গিয়া রণ।।' (৩৩৮)

মায়ের আশীর্ব্বাদ পাবার পর লাউসেন ঢেকুর যুদ্ধে যাত্রা করলেন।

কবি লাউসেনের মাতা পিতার প্রতি ভক্তির আর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন পশ্চিম উদয় পালায়। লাউসেনকে হত্যার জন্য মহাপাত্রের সব চক্রান্ত যখন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, তখন মহাপাত্র আর একটি চক্রান্ত করে পশ্চিমে রবির উদয়ের জন্য লাউসেনকে হাকন্ডে পাঠিয়ে দিলেন, আর লাউসেনের মাতা পিতাকে গৌড়ের কারাগারে বন্দী করে রাখলেন। উদ্দেশ্য একসঙ্গে লাউসেন ও তার পিতা-মাতাকে খতম করা, কারণ সবাই জানে পশ্চিমে উদয় সম্ভব নয়, লাউসেন এ কাজ পারবে না। তাই সকলের মৃত্যুদন্ড হবে। যাই হক্ লাউসেন হাকন্ডে গিয়ে সামুল্যার নির্দেশ মত প্রভূ ধর্মরাজের পূজা করে চলেছেন। এইভাবে প্রায় ছ'মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মহাপাত্র গৌড়েশ্বরের অজ্ঞাতে ময়না আক্রমণ করে কালুবীর শাকা শুকা সবাইকে হত্যা করেছে। এমনকী পাটরাণী কলিঙ্গাও যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। এই সংবাদ শুনে লাউসেন তো প্রায় অচেতন। আবার এদিকে মা বাবা বন্দী, তাই সমূল্যাকে বলছেন ---

' মা বাপ রহিল বন্দী গৌড় কারাগারে।
কহিতে বিদারে বুক দুঃখ কব কারে।।

,৭৭২,'কাঙুর মহিম যাত্রাপালার , ২৬৩, ২৮০, ২৮৮, ৩২৪, ৩৩৮ মায়া মুন্ডপালার চরণ সংখ্যা।

পশ্চিমে উদয় বর না পাল্য এখানে।
দেশে যায়্যা কি করিব মরিব পরাণে।।' (২৯৪২)

লাউসেনের মনের অবস্থা দেখে সমূল্যা বললেন ছোটবেলা থেকে তোমাকে আমি ছেলের মতো মানুষ করেছি। তোমার মায়ের চেয়ে আমি কোন অংশে কম নই, তবুও আমি বলছি ---

' মাথা কাট্যা আদ্য পূজা যদি দেহ রায়।
মনোরথ সিদ্ধ তব ঠাকুর সহায়।।'' (২৯৯০)

সামূল্যা মাসির এই সব কথা ---

' লাউসেন শুনিয়া পূজায় দিল মন।
একভাবে পূজিল ঠাকুর নিরঞ্জন।।' (৩০২০)

এরপর লাউসেন নিজের দেহ নয় খন্ড করে যজ্ঞ কুন্ডে আহুতি দিলেন ---

'যজ্ঞ কুন্ড সম্মুখে জ্বলিছে নব দন্ড।
নরসিংহ ভনে সেন হৈল নবখন্ড।।' (৩০২৬)

এইভাবে নিজের দেহের মাংস কেটে কেটে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার পরও যখন ঠাকুর নিরঞ্জনের দেখা পেলেন না তখন লাউসেন ---

'মাথা কাট্যা পেল্যা দিল ধর্মের চরণে।
ধর্ম ধর্ম তিনবার বলিল বদনে।।' (৩০৪২)

সেনের এই কার্যে দেবাসুর নরলোকে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। পিতা মাতার মুক্তির জন্য লাউসেন নিজের জীবন ত্যাগ করলেন। অবশ্য ঠাকুর নিরঞ্জনের কৃপায় জীবন ফিরে পেয়ে পশ্চিমে উদয়ও দেখলেন। ভূপতি গৌড়েশ্বরও গৌড়ে থেকে পশ্চিমে রবির উদয় দেখে দেব দ্বিজে সোনা, রূপা,ঘোড়া, হাতি সব দান করতে লাগলেন। লাউসেন আনন্দিত মনে পূজা সমাপ্ত করে সামূল্যাকে প্রণাম করে সাঙ্গযাতদের নিয়ে দেশে ফেরার জন্য নৌকায় চড়লেন। কিন্তু বড় রাণী কলিঙ্গার মৃত্যু সংবাদ পেয়েও প্রথমে ময়না না গিয়ে পিতা মাতার মুক্তির জন্য আগে গৌড়ে গেলেন, অথচ হাকন্ড থেকে গৌড় যাবার পথে আগেই ময়নার অবস্থান। এই ঘটনার দ্বারা কবি দেখাতে চেয়েছেন লাউসেনের পিতা মাতার প্রতি ভক্তি কত গভীর।

কবি এই সব দৃষ্টান্ত দিয়ে সমাজকেও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। অবশ্য আজও অধিকাংশ সন্তান সন্ততি পিতা মাতার প্রতি যথেষ্ট কর্তব্য পরায়ণ। তবে এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোনা যায় বিধবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে সন্তান তার নিজেদের কর্তব্য শেষ করছে। জানিনা এই ঘটনার মধ্যে কতটা বাস্তবতা আছে। যদি তাই হয় তাহলে এঘটনা খুবই বেদনাদায়ক।

৬। স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক ঃ কবি তাঁর কাব্যে রমণীব পতিভক্তির প্রতি বিশেষ আলোকপাত করেছেন। এ সম্পর্কে কাব্যের দু একটি ঘটনা তুলে ধরছি। ' নিশাস্থাপনা পালা'য় রাজা ধর্মপাল ও রাণী বল্লভা সম্পর্কে যে বিবরণ উল্লেখ আছে তাতে দেখা যায় পরম বৈষ্ণব রাজা ধর্মপাল একবার শিকারে যাবার সময় রাণী বল্লভাকে গোবিন্দ সেবার ভার অর্পণ করে গেলেন কিন্তু রাণী গোবিন্দের সেবা পূজা করতে ভুলে গেলেন। রাজা শিকার থেকে ফিরে রাণীকে যখন গোবিন্দ সেবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন রাণী স্বামীর কাছে মিথ্যা কথা বলতে পারেন নাই, --

---

২৯৪২, ২৯৯০, ৩০২০, ৩০২৬, ৩০৪২ কাব্যের পশ্চিম উদয় পালার চরণ সংখ্যা।

তাই তিনি বলছেন

'আমি সতী পতিব্রতা জানে জগজনে।
মিথ্যা কি করিয়া কব তোমার চরণে।।' (৪৭৪)

গোবিন্দ সেবা না করার জন্য রাজা রাণীকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। রাণী বল্লভা বাল্মীকির আশ্রমে রইলেন বহুকাল। সেই সময় রাজা ধর্মপাল ঐ বনে আবার শিকারে এসে বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হলেন —

'বল্লভার সনে দেখা মুনির আশ্রমে।
রাজাকে দেখিয়া রাণী উঠিলা সম্ভ্রমে।।
জোড়হাতে নৃপতির বন্দিলা চরণ।
ঘোড়াহতে উতরিয়া চলিল রাজন।।' (৪৯৪)

এখানে লক্ষনীয় বিষয় যে স্ত্রীকে স্বামী শুধু একটি মাত্র ভুলের জন্য ত্যাগ করে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন, দীর্ঘদিন পর সেই রাজাকে বা স্বামীকে দেখে তাঁর ওপর কোন রাগ বা অভিমান না করে জোড় হাতে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। এখানেই পাওয়া যায় ভারতীয় নারী চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। এই দিনের আর একটি ঘটনাতেও রাণী বল্লভার পতি ভক্তির একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়! — ঐ দিনেই রাণী বল্লভার সঙ্গে রাজা ধর্মপালের দেখা হওয়ার পর ধর্মপাল বললেন —

'ক্ষুধায় আমার বড় জ্বলিছে অন্তর।।
রন্ধন করিয়া রাণী করায় ভোজন।' ৪৯৭

রাজার এই কথা শুনে রাণী ভাবে গদগদ হয়ে হরষিত মনে রন্ধনের ব্যবস্থা করতে গেলেন— তখন আশ্রমের লীলাবতী নামে এক সই তাঁকে বললেন,— মহারাজ তোমাকে বনবাসে পাঠিয়েছেন, তোমার ওপর সন্তুষ্ট নন, এই সুযোগে রাজাকে ওষুধ করে বশ কর। লীলাবতী ওষুধের শেকড় এনে বল্লভার হাতে দিয়ে বললেন— এই শেকড় বেঁটে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। রাণী বল্লভা রাজার জন্য ভাত ও নানা ব্যঞ্জন রান্না করেছেন, এবার লীলাবতীর কথায় রাজার মন জয় করার জন্য ঐ শেকড় বেঁটে তরিতরকারির সাথে মেশালেন। রাজা খেতে বসেছেন, বল্লভা পরিপাটি করে ভাত দিয়েছেন, চারদিকে ব্যঞ্জনপূর্ণ সব বাটি, কিন্তু তার মনে তখন ভীষণ দ্বন্দ্ব —

'অন্ন দিয়া মনেতে ভাবেন সুলোচনা। ঔষধ কি করে নাথে করাব ভোজন।।
আমাকে উচিত নহে এমন কল্পনা।। প্রীত হৌক না হৌক ঔষধে কাজ নাহি।
আমি সতী সর্বকাল পতি পরায়ণ। এত বলি ঔষধান্ন থুল্যো এক ঠাঁই।।' (৫৩৮)

রাণী বল্লভা নিজের সুখের কথা ভুলে গিয়ে স্বামীর ক্ষতির আশঙ্কায় তাঁকে ওষুধান্ন দিলেন না, ওগুলো রেখে অন্য ব্যঞ্জন দিয়ে খেতে দিলেন —

খাওয়া শেষে রাজা বল্লভাকে কিছু না বলে বাড়ী চলে গেলেন, বল্লভা মনের দুঃখে বনে রয়ে গেলেন। এই ঘটনা দ্বারা কবি পতি পরায়না এক নারীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন।

তুকতাক শেকড় বাকড় ওষুধ করা যে সে যুগে ছিল কাব্যের এই অংশ থেকে আমরা

৪৭৪,৪৯৪, ৪৯৭, ৫৩৮ নিশা স্থাপনা পালার চরণ সংখ্যা।

জানতে পারছি। কিন্তু স্বামীকে বশ করার জন্য শেকড় বাকড়ের ওষুধ ব্যবহারের প্রবণতা একবিংশ শতাব্দীতেও থেমে যায় নাই। কিন্তু এটা যে ক্ষতিকারক হতে পারে পতিপরায়না বল্লভাকে দিয়ে কবি সেকথা সমাজকে বলতে চেয়েছেন।

কাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র রাণী রঞ্জাবতীর মধ্যেও পতিভক্তির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। রঞ্জাবতী ছিলেন রমতী নগরের রাজা বেণুরায়ের কন্যা এবং গৌড়েশ্বরের শালিকা, রঞ্জাবতী ছিলেন অপরূপ রূপবতী যাকে দেখে গৌড়েশ্বর তাঁর স্ত্রীকে বলোছলেন —

'উর্বশী এসেছে বুঝি তোমার নিলয়ে।।'
'এমন মোহিনী বালা রাণী কোথায় পেলি।
নবীন কিশোর বর্ণ যৌবনের ডালি।।' ১৭৪

এমন এক রূপবতী কন্যার গৌড়েশ্বর বিবাহ দিলেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ হারা সহায় সম্বলহীন প্রায় সংসার ত্যাগী বৃদ্ধ রাজা কর্নসেনের সঙ্গে। এই বৃদ্ধ স্বামীকেও রঞ্জাবতী কিন্তু কোনদিন অশ্রদ্ধা করেন নাই বরং তাঁর অনুমতি নিয়েই সব কাজ করেছেন। রঞ্জাবতীর ভাই যখন রাজা কর্নসেনকে আঁটকুড় বলে রাজসভা মাঝে অপমান করেছে সেই অপমান রঞ্জাবতীকে বিশেষ ভাবে ব্যথিত করেছে। তাই —

'পুত্রহেতু রাণীর ভাবনা নিরন্তর।'
কোন কার্য্য করিলে হবে বংশধর।।
'বড়ভাই বচন বলেন আঁটকুড়ি।
তনয়ের কারণ পূজেন ষষ্টীবুড়ি।। (৭৫০)

রঞ্জাবতী আঁটকুড় - আঁটকুড়ি নাম ঘোচাবার জন্য নানা ব্রত উপবাস করতে লাগলেন তারপর রামাই পন্ডিত ও সামুল্যার নির্দেশে চাঁপাইএ ধর্মপূজা করার ব্যবস্থা করতে লাগলেন, চাঁপাই যাবার জন্য ভূপতির কাছে বিদায় নিতে এসে বললেন —

'এসেছি বিদায় হতে তোমার গোচর।।'
'তুমি আজ্ঞা দিলে যাই চাঁপাই ভুবন।
বেদ হতে বাড়া মোকে তোমার বচন।।'৯২
'আজ্ঞা হৈলে চাঁপায় পূজিব ভগবান।।
ধর্মরাজের পূজা করে লব পুত্রবর।
আঁটকুড়ি নাম ঘুচে সংসার ভিতর।।'

কাব্যের বিভিন্ন অংশে রঞ্জাবতীর পতিভক্তির বেশ কিছু নিদর্শণ পাওয়া যায়। তিনি স্বামী ছাড়া স্বর্গে যেতেও রাজী হন নাই। লাউসেন যখন মাকে বললেন —

'স্বর্গে চল জননী বিমানে করি ভর। শুন্যা রাণী কহেন পুত্রের বরাবর।।' ৮৮২
'বনিতার পতিগতি বেদের বচন। স্বামী ছাড়া স্বর্গে যাব একথা কেমন।।' ৮৮৪

কবি শুধু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তির কথা বর্ণনা করে কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, স্ত্রীর প্রতি স্বামীরও বিশেষ ভালবাসা থাকা দরকার বা থাকে তাও লাউসেনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। মামা মহাপাত্রের চক্রান্তে লাউসেনকে ময়না ছেড়ে হাকন্ডে ধর্মপূজা করতে যেতে হয়েছিল সেই সুযোগে মহাপাত্র ময়না আক্রমণ করে ময়নাকে প্রায় ছারখার করে দিয়েছে, এমন কি লাউসেনের পাটরানী কলিঙ্গাকে যুদ্ধে নিহত করেছে, এই সংবাদ পেয়ে লাউসেনের মানসিক অবস্থার যে বিবরণ কবি দিয়েছেন তা খুবই হৃদয়স্পর্শি ---

কন্যা সন্তানের প্রতি ভালবাসা

'কলিঙ্গার মৃত্যু শুন্যা সেন অচেতন।। (২৯২০)	না শুনিব আর সে মুখের বাণী।
কান্দেন করুণা কর‍্যা রঞ্জার কুমার।' (২৯২১)	আমাকে ছাড়িয়া কোথা গেলে পাটরাণী।।
'পাতি পড়্যা কান্দেন তপস্বী ময়নার।	কি রূপে রয়েছে সে কোথা কি বলিবে কারে।
লোচন যুগলে বহে কালিন্দির ধার।।' (২৯২৪)	কি কর‍্যা বঞ্চিব আমি ছাড়িয়া তোমারে।।
আমি অমঙ্গল কালেতে আইলাম যাত্রা করি।	কে করিবে চিত্রসেন পুত্রের পালন।
আর না দেখিব প্রিয়া সে রণ মাধুরী।। (২৯২৬)	তোমা বিনে অন্ধকার ময়না ভুবন।।' (২৯৩২)

কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর যে মধুর সম্পর্ক সমাজকে দেখিয়েছেন সেটা আমরা একালেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাই, কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে অনেক। আইনত পণপ্রথা নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে তা হয় নাই, আর তার জন্যই বহু স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে বা স্বামী গৃহে অমানবিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়, এমন কি জীবন দিতে হয়, পুড়েও মরতে হয়। এ জিনিস সেকালেও ছিল একালেও রয়ে গেছে। কিন্তু সেকালের চেয়ে একালে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে বহুগুণ বেশী। মানুষ চাঁদে গেছে, মঙ্গল গ্রহে মঙ্গলযান নেমেছে, শনির বলয়ে শনিযান ঢুকে পড়েছে কিন্তু আমাদের সমাজ থেকে বধূনির্যাতনের শনি এখনও কাটে নাই, সেটা আমাদের কাছে খুব লজ্জার বিষয়।

৭। কন্যা সন্তানের প্রতি ভালবাসা ঃ অনেক সময় দেখা যায় পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মালে বিশেষ আনন্দ হয় না, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা সন্তান জন্ম দেবার অপরাধে বধূর উপরও চলে নির্যাতন। এই ব্যাপার হয়ত কবির মনে নাড়া দিয়েছিল। তাই তিনি দেখাতে চেয়েছেন কন্যা সন্তানও আনন্দের জিনিষ। তাই রঞ্জাবতীর শুভ জন্মলগ্নে রাজা বেনুরায় ও রাণী মন্থরার আনন্দের কথা উল্লেখ করে তাঁর অভিব্যক্তি জ্ঞাপন করেছেন।

'দশমাস পরিপূর্ণ প্রসবের কাল।	'দিনে দিনে বাড়ে বালা অতি অনুপম।।'
কন্যা রত্ন হৈলা আনন্দ মহীপাল।।' (৯১০)	'কন্যা দেখে রাজরাণী উল্লাসিত মন।।' (৯২০)

কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কথা বলতে চেয়েছেন সে কথা আজ একবিংশ শতাব্দীতেও বলার প্রয়োজন রয়েছে। এখনও অনেক শাশুড়িকে দেখা যায় কন্যা সন্তান জন্মালে বধূকে অবহেলা করেন, নির্যাতনও করেন। যদিও তিনি নিজেও একজন কন্যা বা মেয়ে। আর আজকের কন্যারা তো কোন অংশে পিছিয়ে নাই, তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, শিক্ষক, গবেষক, প্রশাসক, বিমান চালক, মহাকাশচারী, কি না হচ্ছেন। তাঁরাও পিতা মাতার নাম উজ্জ্বল করছেন। তাই কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই 'কন্যা দেখে আমরা যেন উল্লসিত হই।'

৮। তৎকালীন সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠান ও বিবাহ পদ্ধতি ঃ আমরা রামায়ণ মহাভারতের যুগে দেখেছি বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত স্বয়ংবর সভার মাধ্যমে যেখানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হতেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কন্যা যাঁকে উপযুক্ত বলে মনে

১৭৪, ৭৫০, 'রঞ্জাবতী বিবাহ' পালার, ৯২, ১২৪ 'হরিশচন্দ্রের উপাখ্যানের,২৯২০, ২৯২১, ২৯৩২ এগুলি 'পশ্চিমে উদয়' পালার, ৯১০, ৯২০ নিশাস্থাপনা পালার চরণ সংখ্যা।

করতেন তাঁর গলায় মালা দিয়ে পাত্র নির্বাচন করে বিবাহ কার্য সমাধান করতেন। কিম্বা পাত্রী পক্ষ থেকে কোন শর্ত আরোপ করা হতো যে ব্যক্তি সেই শর্ত পূরণ করতে পারতেন, পাত্রী তাঁর গলায় মালা দিয়ে পতি নির্বাচন করতেন। যেমন আমরা দেখেছি জনক দুহিতা সীতার বিবাহের শর্ত ছিল ভোলানাথ মহেশ্বর প্রদত্ত 'হরধনু'তে গুণ বা ছিলা বাঁধা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হরধনুতে ছিলা (দড়ি) পরাতে পারবেন জনক দুহিতা সীতা দেবী তাঁর গলাতেই বরমাল্য প্রদান করবেন। বহু রাজপুত্র ঐ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন কিন্তু একমাত্র দশরথ পুত্র রামচন্দ্রই ঐ শর্ত পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই রামচন্দ্রের সাথে সীতা দেবীর বিবাহ হয়। অনুরূপ ভাবে দ্রৌপদীর বিবাহের শর্ত ছিল — একটি দন্ড বা খুঁটির মধ্যস্থলে ঘুরন্ত চক্রের উপর প্রান্তে একটি মাছ থাকবে। তার নিচে জলের মধ্যে ঐ মাছ ও ঘূর্ণয়মান চক্রের ছায়া দেখে মাছের চোখ বিদ্ধ করতে যিনি পারবেন তাঁর সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ হবে। অর্জুন এই শর্ত পালন করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে অর্জুনের সাথে দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। কালক্রমে স্বয়ম্বর প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়।

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যে কর্ণসেন-রঞ্জাবতী কিম্বা লাউসেন কলিঙ্গার বিবাহ অনুষ্ঠানের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে তৎকালীন সমাজের বিবাহ-ব্যবস্থার একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। সেই যুগে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষ বিবাহে সম্মত হলে গণক দ্বারা পাত্র-পাত্রীর মিলন গণনা করা হত। গণনার ফল শুভ হলে দিন ধার্য করে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা হত। এ কাব্যে কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর বিবাহের সময় গৌড়েশ্বরের কথায় কর্ণসেন বিবাহে সম্মতি দিলে রাজা সঙ্গে সঙ্গে পাত্রীর দিদি রাণী ভানুমতির কাছে গিয়ে —

'কহেন ঈষৎ হেসে রাজা মহাশয়। রঞ্জার করাহ বিভা কর্ণসেন সনে।
যোগ্য কন্যা ঘরে রাখা উপযুক্ত নয়।। মহারাণী সায় দিল রাজার বচনে।। (২৬৬)"

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের সম্মতির পর গণক ডেকে বরকন্যার মিলন বিচার করা হয়,

'গণক ডাকিয়া বর কন্যার গনন।। মন্থরা আনিল ডেকে এয়োসুয়োগণ।। (২৬৮)

একই ঘটনা দেখা যায় লাউসেন - কলিঙ্গার বিবাহের ক্ষেত্রে। লাউসেন কলিঙ্গার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে ভূপতি কর্পূর ধল (কন্যার পিতা) আনন্দিত হয়ে গণক ডেকে এনে মিলন বিচার করলেন ---

'ভূপতি কর্পূর ধল আনন্দিত মন। রাশ্যে রাজ মিলন বিচারে বর্ণ শক।
গণক আনিয়া করে কন্যার গণন।। (৭৯০) 'বরকন্যা বাড়া প্রীত গণিল গণক।। (৭৯২)

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেখা গেছে গণক দ্বারা পাত্র পাত্রী কুষ্ঠি বিচার বা পাত্র পাত্রীর রাশি, বর্ণ, গণ, ইত্যাদির দ্বারা মিলন বিচার করা হত, কিন্তু পরবর্তীকালে বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সামাজিক বিবাহের ক্ষেত্রে রাশি, বর্ণ, গণ, ইত্যাদির গণনা বিচারের পরিবর্তে পাত্র-পাত্রীর রক্তের নমুনা বিচার বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে --- যার মধ্যে রয়েছে রক্তের গ্রুপ, থ্যালেসেমিয়া টেষ্ট, ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বর্তমানে রাশি, বর্ণ, গণ, ইত্যাদির বিচার করলেও রক্তের নমুনার বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।

এরপর বিবাহের দিনে বা বিবাহের পূর্বদিনে বরকনের গায়ে হলুদ হয় (গাত্রহরিদ্রা) বরের গায়ে বা কপালে মাখানো তেল হলুদ (বাঁটা) কনের বাড়ীতে পাঠানো হয়। সেই তেল

বিভা গুবিবাহ, ২৬৬,২৬৮, রঞ্জাবতীর বিবাহ পালার, ৭৯০, ৭৯২ কলিঙ্গার বিবাহ পালার চরণ সংখ্যা।
৮৮৪, স্বর্গারোহণ পালার চরণ সংখ্যা।

হলুদ কনের কপালে মাখানো হয়। বর ও কনের উভয়েব বাড়িতেই এয়োদের নিয়ে একটা আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিবাহের প্রথম পর্বের এই মাঙ্গলিক কাজ অনুষ্ঠিত হত বা হয়।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানের নাম নান্দীমুখ ও অধিবাস। বর কনে উভয়েব বাড়িতে এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে --- পুত্র বা কন্যার বিবাহের এই শুভদিনে বিভিন্ন দেবদেবী এবং স্বর্গগত পূর্বপুরুষদের শরণ করে তাঁদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা। কবি নরসিংহ বসু তাঁর কাব্যে কর্ণসেন-রঞ্জাবতী, কিম্বা লাউসেন-কলিঙ্গার বিবাহের অধিবাস-নান্দীমুখ, বরাগমন, স্ত্রী আচার, কন্যাদান, সিন্দুর দান, মালাবদল, অগ্নিতে লাজাহুতি ইত্যাদির যে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর থেকে তৎকালীন সমাজে বিবাহ ব্যবস্থার একটি পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠেছে। যদিও কাব্যে বর্ণিত বিবাহগুলি দুটি রাজপরিবারের বিবাহের বর্ণনা, কিন্তু কবি তাঁর গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিবাহের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন সেই চিত্র সমাজের যে কোন সাধারণ পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠান হিসাবে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই বিবাহ প্রাঙ্গণকে গোময় লেপে পরিস্কার করে ঘট স্থাপন করা হয়েছে। জ্ঞাতি কুটুম্বরা নিমন্ত্রিত হয়ে বিয়ে বাড়ী এসেছেন। কন্যার পিতা অধিবাস ও নান্দীমুখ করছেন। অধিবাসের সময় ব্রাহ্মণ পন্ডিতগনের উপস্থিতিতে স্বস্তিক সুবচন সঙ্কল্প করে বিভিন্ন দেবদেবী ও মার্কন্ডমুনি প্রজাপতির পূজা করে সমস্ত অধিবাস দ্রব্য হলুদ রং এর কাপড় পরা কন্যার কপালে ঠেকিয়েছেন। হলুদ রং এর সুতায় দুর্বা বেঁধে কন্যার হাতে বেঁধে দিয়েছেন। তারপর ঘৃতের বসুধারা দিয়ে তেজিরাজের পূজা করে নান্দীমুখ সমাপ্ত করেছেন।

রঞ্জাবতীর বিবাহের অধিবাস ও নান্দীমুখের বর্ণনা ঃ

'চৌদিকে জয় জয়   শ্রী বেণু মহাশয়
করেন কন্যা অধিবাস।
চাঁদোয়া পরিসর   টাঙ্গালো নৃপবর
মনের পূর্ণ অভিলাষ।।' ২৭৮
'গোময়ে লেপে স্থল   লিখিল অষ্টদল
করিল ঘটের স্থাপনা। ২৮৪
চৌদিকে দ্বিজগণ   স্বস্তিক সুবচন
সঙ্কল্প করাল রচনা।।
প্রথমে লম্বোদর   পূজিল দিবাকর
গরুড়ারুড় রমাপতি।
ষোড়শ উপাচারে   পূজিল অভয়ারে
শ্রীরায় বেনু শুদ্ধমতি।।' (২৯০)
'করিয়া আবাহন   পুজিল গ্রহগণ
মার্কন্ড মুনি প্রজাপতি ২৯২
'সাজিল রঞ্জাবতী   হরিদ্রা বর্ণ ধুতি ২৯৫
পরিয়া বসিল আসনে।
অধিবাসাদি দ্রব্য   লইয়া নৃপ ভব্য
স্বস্তিক সিন্দুর কার্জল। ৩০২
নৃপতি নহে রঙ্ক   সাপিস্য দিল শঙ্খ
রোচনা রজত কাঞ্চন
সর্ষপ শ্বেতবর্ণ   দিলেন সিদ্ধ অন্ন
তাম্রক দেখাল দর্পণ।।
প্রদীপ শিখা তাপ   কপালে দিল ভাপ
প্রশস্ত পাত্র লয়ে রায়।
বিবিধ বাদ্য বাজে   শ্রী বেণু মহারাজে
বন্দিল কন্যার মাথায়।।' (৩১০)
'বাঁধিল সুতা হাতে   হরিদ্রা দুর্বা তাতে
করিল মাল্যের ধারণ। ৩১৬
শ্রীমতি রঞ্জানন্দে   দ্বিজের পদ দ্বন্দ্বে
করিল আশিস্ রচন।।' ৩১৮
'নৃপতি মহানন্দে   নৈবেদ্য পুষ্পগন্ধে
করিল মাতৃকা পূজন। ৩২৪
ঘৃতের বসুধারা   দিলেন অতি ত্বরা
চৌদিকে পূজিল রাজন।।

দিছেন প্রত্যক্ষ বচনে　　হৃদয়ে মহাসুখ　　করিলা নান্দীমুখ
হৃদয়ে মহানন্দ　　অবনী শিলা গন্ধ　　সঙ্কল্প করিলা রচনা।'
দিলেন ধান্য দূর্বাদল। (৩০০)　　'নগরে যতজন　　আনন্দে পূর্ণমন
'কসুম ফুল দধি　　দিলেন যথা বিধি　　পুরিল মনের কামনা।।' (৩৩০)

লাউসেন কলিঙ্গার বিবাহের অধিবাস নান্দীমুখের একই চিত্র দেখা যায়।

কনের যেমন অধিবাস হয় বরেরও অনুরূপভাবে অধিবাস নান্দীমুখ হয়, কর্ণসেন যখন রঞ্জাবতীকে বিবাহ করতে যান তখন দেখা যায় নান্দীমুখ আদিক্রিয়া সম্পন্ন করে হাতে সুতা বেঁধে বরযাত্রী সহ বিবাহ করতে যাচ্ছেন। সেকালে বর যখন বিয়ে করতে যেতেন সঙ্গে অনেক লোকজন বাজনা বাদ্য সহযোগে যেতেন। বরের সামর্থ অনুযায়ী আতসবাজী জ্বালানো হত। অবশ্য একালেও সামাজিক বিবাহের ক্ষেত্রে বরযাত্রী যাবার ভালই প্রচলন আছে। তবে পরিবহন বা যানবাহন পদ্ধতি পাল্টে গেছে। পূর্বে রাজপরিবারের বিবাহে বর হাতি, ঘোড়া বা পাল্কিতে যেতেন। সাধারণ পরিবারে বরকনের জন্য পাল্কি ব্যবহার করা হত, আর গ্রাম অঞ্চলে বরযাত্রীদের জন্য গরুর গাড়ী। ৩০ - ৩৫ বছর আগেও বরকনে যেতেন পাল্কি করে,

বর্তমানে বরকনের জন্য পাল্কির পরিবর্তে এসেছে মটর গাড়ী, আর বরযাত্রীদের জন্য গরুর গাড়ীর পরিবর্তে হয়েছে বাস।

কাব্যে কর্ণসেনের বিবাহের শোভাযাত্রা —

'কর্ণসেন রায় মনে হয়ে হরষিত।
নান্দীমুখ আদিক্রিয়া করিল বিহিত।।
বিবাহ করিতে যান সুতা বাঁধা হাতে।
বরযাত্র অনেক রাজার চলে সাথে।।
সুখযানে সোয়ার হইল শীঘ্র বর।
আগুপাছু ধায় কত নফর চাকর।।' (৩৪০)
'নানাবিধ বাদ্য বাজে কংস করতাল। ৩৪৩
মাদল মঙ্গল ভেরী কাড়া করনাল।।
দামামা দুন্দুভি পাড়া দগড়ি দগড়।
দোনা খোলা দড়মস কাহন কাঁসড়।।' ৩৪৬
'টমক খমক জোড় খাই ঝগঝম্প।
বন্দিস ধুধরি ভেরী রণসিঙ্গা ডম্প।।'(৩৫০)
'দোমুখ গোমুখ বাজে তোলপাড় মাটি। ৩৫৩
ছুটিল আতসবাজি বড় পরিপাটি।।
ভূমচাম্পা রসবাতি চরখি চাদর।
গগনে হাউই উঠে শব্দ ছর ছর।।' ৩৫৬
'বিবাহ করিতে পথে কর্ণসেন যান।
বিবাহের বাদ্যে বাড়া মেয়ের না পান।।' ৩৬২
'মন্থরার ঘরে হৈল মেয়ের বাথান।
বিভাঘরে বনিতারা বিশেষ না পান।।' (৩৭০)

অন্যদিকে লাউসেন যখন কলিঙ্গাকে বিবাহ করার জন্য যাত্রা করলেন তখনও দেখা যায় প্রায় একই দৃশ্য —

'হেথা লাউসেনের করিয়া অধিবাস।
বিভাহ করিতে যায় বদন সহাস।। (৮৬০)
সত্বর চলিল বর চাপিয়া চৌদলে।
বরযাত্রা শাকাশুকা দোলাই সকলে।।' ৮৬২
'দামামা দুন্দুভি পড়া দগড়ি দগড়।
জয়ঢাকে বীর ডাকে সঘন রগড়।।' ৮৬৬
'ঢোল সানি জগঝম্প বাজে করতাল।
রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ফুকারে করনাল।।' (৮৭২)

এরপর বাজনা বাদ্যিসহ বর কনের বাড়িতে উপস্থিত হলে তাকে মহা সমাদরে অর্চনা করে বসন অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়ে বরণ করা হত। বর্তমানে সামাজিক বিবাহের ক্ষেত্রে বর কন্যার বাড়িতে পৌছালে সোনা রূপার জলে চোখ ধুয়ে দেওয়া হয়, এবং বিবাহের সময় বসন, অঙ্গুরি,

২৯০, ২৯২, ৩০০,৩১০,৩৩০, ৩৪০, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৭০ ইত্যাদি রঞ্জাবতীর বিবাহ পালার চরণ সংখ্যা।

শয্যাদ্রব্য, বাসন পত্র দান হিসাবে অর্পণ করা হয়। তৎকলীন বিবাহ ব্যবস্থা অনুসারে বর কন্যাগৃহে পৌঁছালে কাব্যের বর্ণনায় পাই —

'ছায়া মন্ডপেতে বর দিল দরশন। বসন অঙ্গুরী দিল নানা অলঙ্কার।
বরকে অর্চিয়া কৈল বরের অর্চন।। (৩৭২) রঞ্জার বিবাহে যত্ন অধিক রাজার।।' ৩৭৪

বিবাহে বসার পর বা বরকে অর্চনা করার পর হয় 'স্ত্রী-আচার'। — স্ত্রী আচারের প্রধান তাৎপর্য হচ্ছে বিরলে বর কনের সাক্ষাত, তৎকালীন সমাজে বিবাহের পূর্বে বর কনের কোন সাক্ষাত হত না, তাই হয়ত স্ত্রী আচারের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা। তাছাড়া মায়ের কাছ থেকে মেয়ে এক অজানা অচেনা পরিবারে চলে যাচ্ছে। তাই যাতে মেয়ের কষ্ট না হয় সে কারণ মা এবং কনের অন্যান্য আত্মীয় মহিলারা নানা ক্রিয়া কর্ম ও পরিহাসের ছলে বরকে বলছেন বর যেন মেয়েকে আনন্দে রাখেন, সুখে শান্তিতে রাখেন। রঞ্জাবতী বা কলিঙ্গের বিবাহে কবি যেভাবে স্ত্রী-আচারের নিখুঁত ছবি তুলে ধরেছেন এখনকার বিবাহের 'স্ত্রী-আচারের' এত নিখুঁত দৃশ্য দেখা যায় না।

রঞ্জাবতীর বিবাহের স্ত্রী- আচারের বর্ণনা ঃ

'স্ত্রী আচার বিরলে করেন রমাগণে।
মন্থরা ঢালিল দধি বরের চরণে।।' ৩৭৬
'বরনারী উভয়ে হইয়া সাবধান। ৩৭৯
ছিরি তুল্যা নিছিয়া ফেলিয়া দিল পান।।
সম্মুখে সুন্দরি লয়ে উজ্জ্বলের আলা।
দাসী এনে যোগাইল ঔষধের ডালা।।
বদন ব'সুতে জুঁয়ে ছোঁয়াইল শিল।
ভানুমতি বরের ঘাড়েতে দিল কিল।।
ঔষধ প্রবন্ধ সব অশেষ প্রকার।
বর যেন সদা করে সোহাগ রঞ্জার।।
গোড়ের গালের গুয়া খাওয়াইল পান।
বর যেন থাকে সদা গাড়োর সমান।। (৩৮৮)
হাই হামালতি বেটে দিল বুকে পৃষ্ঠে।
সেন যেন রঞ্জাকে দেখেন শুভদৃষ্টে।। ৩৯০
ছটফট ছোঁয়াইল সদা সোহাগিন।
যে ওষুধে কানু সত্যভামার অধীন।।
ছিটাফোঁটা আশেপাশে দিলেন বিস্তর।
উভয়ের প্রীত যেন থাকে নিরন্তর।।
সাতকাটি হাতে লয়ে যত রামাগণ।
সাতবার প্রদক্ষিণ আনন্দিত মন।।
পিঠে বসে রঞ্জাবতী প্রদক্ষিণ সাত।
পতিকে প্রণাম করে করি জোড়হাত।।
জয়কার হুলুই দিছেন রামাগণ।
ছাউনি নাড়িয়া মালা বদল দুজন।।' ৪০০

এইভাবে স্ত্রী-আচারের পর পিতা কিম্বা অন্য কোন গুরুজন কন্যা দান করেন, — সেই সময় আর একবার বরের অর্চনা করা হয় — রঞ্জাবতী বা কলিঙ্গার বিবাহে কন্যাদান, হস্তবন্ধন, সিন্দুর দান, গোত্রত্যাগ, আত্মসমর্পণ, গ্রন্থীছড়া (গাঁটছড়া) বন্ধন, অগ্নিতে লাজাহুতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে কবির বর্ণনা অনুযায়ী পাই —

'নানাবিধ-বাদ্য বাজে শুনিতে সুন্দর।
বরের অর্চনা পুন কৈল্য নৃপ বর।।
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক বিবিধ বিধান।
মহাবাক্যে মহারাজা কৈল কন্যাদান।। (৯২০)
কুশে হস্ত বন্ধন করিল দ্বিজবর।
'দক্ষিণান্তে দ্বিজ কৈল্য বন্ধন মোচন। ৯২৫
সপ্তপদি আরোহণ শিলা সংক্রমণ।।
সিন্দুর করিল দান শাস্ত্রের বিহিত।
অরুন্ধতি দেখ্যা দুহে হৈল হরষিত।।' (৯২৮)
'গোত্রত্যাগ উভয়েতে আত্মসমর্পণ।

বিভা গুবিবাহ , ৮৬০, ৮৬২, ৮৭২, কলিঙ্গার বিবাহ, ৩৭২, ৩৭৪, ৪০০, ৩৯০,
রঞ্জাবতীর বিবাহ পালার চরণ সংখ্যা। মন্থরা - কনের মা, ভানুমতি - কনের দিদি।

পঞ্চশয্য দান দিল যৌতুক বিস্তর।।' ৯২২ গ্রন্থীছড়া দুজনার বাঁধিল ব্রাহ্মণ।।' (৪১০)

'বরকন্যা দুইজনে অকলঙ্কসোম।
অগ্নির উপরে লাজাহুতি কৈল হোম।।'(৯৩২)

কবির এই বর্ণনায় তৎকালীন সমাজের বিবাহের এক নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই, যা একালের সামাজিক বিবাহের সময়ও এত নিখুঁত বা পরিপাটি ব্যবস্থা দেখা যায় না। স্ত্রী-আচারের সময় যে সব ছড়া ব্যবহৃত হত তাও এখন বিলুপ্তির পথে।

বিবাহের পরের দৃশ্য - বরকনের বাসরঘরে প্রবেশ —

'বাসঘরে প্রবেশ জলের দিয়া ধারা।
চৌদিকে হলুই ধ্বনি দিল বনিতারা।।' (৯৩৪)

'নাট গীতে আনন্দ রজনী অবসান। শয্যা হইতে উঠিলেন রঞ্জার নন্দন।
বিকশিত কুসুম সুগন্ধ পরিমাণ।। শেজ তোলা কড়ি মাগে পরিহাসি জন।।
কলরব করে যত বিহঙ্গম গণ। পঞ্চাশ মোহর রায় করিল লৌকিক।
কুহু কুহু কোকিলের নাদ ঘনে ঘন।।' (৯৪০) সবা হৈতে শালাজের মর্য্যাদা অধিক।। (৯৫০)
'শতদল কমল হইল বিকশিত। বরকন্যা বসিলেন আনন্দিত মতি।
মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জরে গায় গীত।। সুতা পুহাইয়া দিল যতেক যুবতী।।' ৯৫২

কবি তার বর্ণনায় বাসর ঘরে বরকনেকে নিয়ে আনন্দগীত, সকালে শয্যা তোলার কড়ি প্রদান, তারপর সুতা লুকানো প্রভৃতি কোন কিছুই বাদ দেন নাই, বরং দিয়েছেন তাঁর রসবোধের বিশেষ পরিচয়। তারপর এসেছে সেই করুণ বিদায় দৃশ্য, - বিবাহের পর লাউসেন কলিঙ্গাকে নিয়ে গৌড়যাত্রা করছেন—

'সাহেবানী দোলায় কলিঙ্গা আরোহণ। পাটরানী বিমলা কান্দেন কন্যামোহে।
বিদায় মায়ের স্থানে বন্দিলা চরণ।। বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে।। (৯৭৬)

বিবাহের পর কন্যা যখন পতিগৃহে যাত্রা করে সেই দৃশ্য বড়ই করুণ, আর এটা সর্বকালেই দেখা যায়।

বর্তমান কালে বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে, এখন প্রধানত তিন রকম পদ্ধতিতে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে - যে রকম অনুষ্ঠান আমরা তৎকালীন সমাজে রঞ্জাবতী, বা কলিঙ্গার বিবাহের ক্ষেত্রে দেখলাম প্রায় সেই রকম। দুই - সামাজিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নিবন্ধন (Registration)। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে নিবন্ধন প্রায় বাধ্যতামূলক, যেমন বিদেশ যাত্রা, সরকারি চাকুরির পেনশন, গ্রাচুয়েটি ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে। তিন - শুধু নিবন্ধন। নিবন্ধন আবার দু'রকমের আছে — (ক) হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে নিবন্ধন (Registration under Hindu Marriage Act.) (খ) বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে নিবন্ধন (Registration under Special Marriage Act.) হিন্দুবিবাহ বিবাহ আইন অনুসারে নিবন্ধন হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে সিন্দুর দানের পর। সেই সিন্দুর দান কোন দেবালয়েও হতে পারে অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও হতে পারে। বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে যে কোন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বিবাহেব একমাস পূর্বে বিজ্ঞপ্তি (Notice) দিতে হয়। যদি একমাসের মধ্যে কোন আপত্তি জমা না পড়ে তাহলে

৩৮৮, ৪০০, ৪১০ রঞ্জাবতীর বিবাহ পালার, ৯২০, ৯২২, ৯২৮, ৯৩২, ৯৩৪, ৯৫০, ৯৫২, ৯৭৬ কলিঙ্গার বিবাহ পালার চরণ সংখ্যা।

বিবাহ নিবন্ধিত হয়। বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে নিবন্ধনের দিনকে আইনসিদ্ধ বিবাহের দিন হিসাবে গণ্য করা হয়। আর আর ' হিন্দু বিবাহ আইন' অনুসারে সিন্দুর দানের দিনকে আইনসিদ্ধ বিবাহের দিন হিসাবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে সিন্দুর দানের পর যে কোন সময় নিবন্ধন করা যায়।

৯। গর্ভবতী মায়ের অনুভূতি ও প্রসূতি পরিচর্যা ঃ গর্ভাবস্থায় প্রথম মাস থেকে প্রসবের সময় পর্যন্ত একজন গর্ভবতী মায়ের শরীর ও মনের অনুভূতির যে নিখুঁত ছবি রঞ্জাবতীর গর্ভাবস্থাকে কেন্দ্র করে কবি বর্ণনা করেছেন তার থেকে বোঝা যায় মায়েদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি। তিনি তাঁর বর্ণনায় দেখিয়েছেন গর্ভাবস্থায় নারীদের শরীরের বিভিন্ন অবস্থা ও অনুভূতি, যেমন শরীরে আসে অলসতা, যেখানে সেখানে শোবার ইচ্ছা, খাবারে অরুচি, মুখে জল ওঠা, অন্যদিকে সন্তানের নড়াচড়া - ফলে মনে আনন্দ আবার শরীরে কষ্ট। এইসব বর্ণনাই কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য নয় - তাঁর বর্ণনার গভীরতা থেকে বোঝা যায় - তিনি যেন বলতে চেয়োছেন গর্ভাবস্থায় মায়েদের এই যে বিশেষ অবস্থা তারজন্য পরিবারের লোকজন সহানুভুতির সঙ্গে মায়েদের প্রতি যেন বিশেষ যত্ন নেন। কবির বর্ণনায় পাই —

' প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।	'ন মাসে অরুচি অন্ন মুখে উঠে জল।
দ্বিতীয় মাসেতে মেয়েদের কানাকানি।।	উড়ু পুড়ু করে মন পরাণ বিকল।।' (৬৬০)
তিন মাসে অলস অঙ্গের হৈল ভার।	'দশ মাস গর্ভ হৈল প্রসবের কাল।
ভিজা ভূমে শুতে সাধ অধিক রঞ্জার।। (৬৫০)	পেট ব্যথা অনুক্ষণ কি হৈল জঞ্জাল।।
চারিমাস গর্ভ হৈল আনন্দিত মন।	উঠে বসে হাতি (পাতি) ব্যথিত অন্তর।
নারী সব দেখে বলে পুত্রের লক্ষণ।।	হাতি সামায়েছে যেন পেটের ভিতর।।
বামদিকে বাড়ে পেট বেটা হয় ইথে।	এমন জঞ্জাল যদি জানি এ স্বপনে।
পাঁচমাসে ভোজন করালো পঞ্চামৃতে।।	তবে কেন বাসর বঞ্চিব স্বামী সনে।'
ছয় মাস গর্ভক্রমে হৈল যখন।	'রঞ্জা পেতে ধরিল চেপে আড়া। ৬৬৯
মুখে হাই সদাই অলস অনুক্ষণ।।' ৬৫৬	মরি মরি পেট ব্যথা ঘন কুন্থ পাড়া।।
'সাতমাসে সাধভাত আটভাজা আটে।	দাই বলে ডর কি চক্ষের পোছ লো।
নড়ে চড়ে পেটে পো সদাই প্রাণ ফাটে।।'৬৫৮	চুল ধর্যা শূল দিতে প্রসবিল পো।।'৬৭২

প্রসবের পর মা ও শিশুর প্রতি যে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার সে ব্যাপারেও কবি আঁতুর ঘরের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং প্রসূতি মাকে একমাস আঁতুর ঘরে বিশ্রাম দেওয়ার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন। কবির কথায় —

'চালের কাড়িয়া খড় জ্বালিল আঁতুড়ি।	আটদিনে আটকলাই পূজিল গোমুড়ি।
ঢেঁকিশাল দ্বারেতে স্থাপিল ষষ্ঠীবুড়ী।।	টাকাকড়ি ছড়ালো ছেল্যার হুড়োহুড়ি।।' ৬৯৬
পাঁচদিনে পাঁচুট্যায় পোয়াতির স্নান।	'ষষ্ঠীপূজা কৈল এক বিংশতি বাসরে।
ছয়দিনে ষাটেরা করিল সাবধান।।	মাসান্তে আঁতুড়ি সমাপ্ত হল নাওয়া করে।।'

এখন অবশ্য বিজ্ঞানের যুগে ওষুধপালার গুণে প্রসূতি মাকে একমাস রাখা হয় না, তবুও ডাক্তার বাবুরা বলেন কমপক্ষে ছ'সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে।

১০। আহারে সংযম ঃ আমাদের শরীর রক্ষার জন্য-চাই খাদ্য ও পানীয়। কিন্তু সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন আহারে সংযম আর মধ্যে মধ্যে উপবাস। এ সম্পর্কে বিভিন্ন চিকিৎসা পত্রিকার বক্তব্য

অনুসারে ও স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জানা যায় যে — আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তা হজমের জন্য আমাদের শরীরের অনেক শক্তি খরচ হয়, তাই প্রধান প্রধান খাদ্যগ্রহণের পর আমরা ক্লান্তি অনুভব করি, শরীরের বেশী ভাগ শক্তি হজম প্রক্রিয়ায় খরচ হয়ে যাওয়ার জন্য-অন্যান্য সংক্রমণের সঙ্গে ভাল ভাবে যুদ্ধ করতে পারে না। সেই কারণে আমাদের মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়া ও স্বল্প আহার করা উচিত। উপবাসের সময় হজম প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় শরীর অন্যান্য শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে পারে। শরীর অনেক রোগের হাত থেকে রেহাই পায়। এ ব্যাপারে একটা উক্তি – ' while digesting food, the body will use most of its energy to process the nutrients that are in the food. This is why after a large meal people often fill sluggish and fatigued. During a fast the body can take a break from this process and can more easily fight infection. An excess of toxins, that have been stored up in the cells of our body, can lead to various health problem.' অনেকে বলেছেন ওষুধ ব্যবহার না করেও সঠিক ভাবে উপবাস করলে স্বাস্থ্যের এইসব সমস্যার সঠিকভাবে সমাধান করা যায়। 'Fasting can be beneficial to solve the health problem, if done correctly and can help a person extent their lives and improve the quality in which they live their lives.' এখানে 'fasting' বা উপবাস বলতে প্রধানত তিন ধরনের উপবাসের কথা বলা হয়েছে — সম্পূর্ণ উপবাস, ফলমূল গ্রহণ করে আংশিক উপবাস, এবং সারাদিনে একবার 'ফলার' (চিঁড়ে-দই) গ্রহণ করে আংশিক উপবাস। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন — উপবাস করার আগে দেখতে হবে শরীর কি ধরনের উপবাস সহ্য করতে পারবে। বিশেষ করে যাঁদের এ্যাসিডিটি রয়েছে, কিম্বা যাঁরা ডাইবেটিক রোগী, বা হার্টের রোগী তাঁদের পক্ষে - বেশীক্ষণ খালিপেটে থাকা একেবারেই ঠিক নয়। তবে সাধারণভাবে উপবাস বা স্বল্প আহার অনেক সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক, এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক রোগের উপশম ঘটায়। এক্ষেত্রে কিছু অভিমত –

' Fasting promotes detoxification. As the body breaks down its fat reserves, it mobilizes and eliminates stored toxins.'

' Fasting gives the digestive system a much needed rest.'

' Fasting promotes the resolving of inflammatory processes including painful inflammation.'

' Fasting corrects high blood pressure without drugs;

এখানেও দেখা যাচ্ছে উপবাস ও স্বল্প আহার-শরীরে সঞ্চিত 'টকসিন' দূর করতে সাহায্য করে। হজম প্রক্রিয়াকে বিশ্রাম দেয়, উচ্চ ব্লাড প্রেসার কম করে। এছাড়াও যাঁদের ওজন খুব বেশী তাঁদের পক্ষেও স্বল্পাহার খুব উপকারী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে — সুস্বাস্থ্যের জন্য মাঝে মধ্যে উপবাস ও স্বল্পাহার বিশেষ কার্যকরি পন্থা। কিন্তু আজ আমরা এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে বা ডাক্তার বাবুদের কাছ থেকে জানতে পারছি। কিন্তু প্রথমদিকে সমাজ যখন এত উন্নত ছিল না, তখন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেমন অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী, মহাষ্টমী, শিবরাত্রি, নীলপূজো, ষষ্ঠী পূজো, মঙ্গলচন্ডী, বিপত্তারিনী, শনিপূজো, সত্যনারায়ণ ব্রত, ইত্যাদি, আবার মুসলিম ধর্মের মধ্যে শবে-বরাত, শবে-মেরাজ, রমজান মাসের রোজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার উপবাস প্রথার ব্যবস্থা করে মানুষকে পরোক্ষভাবে

৬৫০, ৬৫৬, ৬৬০, ৬৬৬, ৬৭২, ৬৯৬ লাউসেনের জন্মপালার চরণ সংখ্যা।

স্বাস্থ্যবিধি ও সংযম শিক্ষা দেওয়া হতো। আজও সেইসব প্রথা যথারীতি প্রচলিত রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়া ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও বর্তমান রাজ্য যোজনা কমিশনের সদস্য ওসমান গণী সাহেব বলেছেন — " মানুষের সমাজ জীবনে নানা ধর্মের যে উপবাসের বিধান দেখছি তার মূলে পাই .... কখনও সংযমের জন্য উপবাস, কখনও সাধনার জন্য, কখনও স্বাস্থ্য বা অসুখের জন্য আবার কখনও স্রষ্টার আদেশ পালনের জন্য উপবাস। তবে যে কারণের জন্যই হোক উপবাস ব্রতটা যে একটা ভাল কাজ এতে কোন সন্দেহ নাই নচেৎ বিশ্বের এত ফকির-সুফি, আলি-আউলিয়া, সাধু-সন্ন্যাসী, ঋষি-মহর্ষি এই উপবাস ব্রত পালন করতেন না। তবে উপবাসের মূল লক্ষ্য সংযম বরণ। সকল ধর্মেই এই সংযমকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে। যে কোন সংযমী নর-নারী শ্রেষ্ঠ নর-নারী।"

তিনশ বছর আগে কবি নরসিংহ বসু তাঁর কাব্যে দেখিয়েছেন — নায়ক বীর শ্রেষ্ঠ লাউসেন ছিলেন একজন অত্যন্ত সংযমী পুরুষ। আহারেও তিনি ছিলেন খুব সংযমী। 'জামতির নিশাপালায়' এবং 'গোলাহাটের' দিবাপালায় তাঁর কথাতেই পাই —

'আমি হবিষ্যানী যোগী। ফলমূল সদা ভোগী।' ৩৯৫

'আতপান্ন দিনেতে ভক্ষণ একবার। ধর্মের সেবক নাহি সহে অনাচার।' ৪০৪

কবি নায়ক তথা রাজপুত্র লাউসেনের মধ্যে আহারে-বিহারে সংযমের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের বলতে চেয়েছেন যে — সকলেরই উচিত আহারে বিহারে সংযমী হওয়া, তাতে আমাদের শরীর মন সবই সুস্থ থাকবে।

১১। ' মাতৃবৎ পরদারেষু ঃ 'পরের স্ত্রীকে মায়ের মতো দেখবে' এই নীতি যাতে সমাজের সবাই পালন করেন সে ব্যাপারে লাউসেনের আচরণ কবি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। এ সম্পর্কে কাব্যের কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। একবার দেবী ভবানী লাউসেনের ভক্তিভাব পরীক্ষার জন্য ছলনার আশ্রয় নিলেন। দেবী নিজেই বললেন —

'কিন্তু বুঝে নিতে চাই তপস্বী কেমন।
কোন ভক্তিভাবে পূজে ধর্মের চরণ।।' (৪৫২)

এই কথা বলে —

'মহামায়া ধরিলেক মোহিনীর বেশ।
যা দেখে পূর্বেতে ভুলেছিলেন মহেশ।।' ৪৬০
'ভুবন মোহিনী হৈল ভবানীর বেশ।
নরসিংহ গীত রচে ধর্মের আদেশ।।' (৫৩২)

লাউসেনকে ছলনার জন্য মোহিনীরূপী ভবানী লাউসেনের খাটে গিয়ে বসলেন এবং —

'অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া ডাকেন সঘন। 'এ কেমন কুলবধূ এসেছে এখানে।
নয়ন নেহালি দেখ নহলি যৌবন।। লাজকে নাহিক ডর এহার পরাণে।।'
উঠিয়া বসিল সেন রঞ্জার কুঙর।' ৬৭৩ 'জিজ্ঞাসা করেন তবে রঞ্জার কুমার।
'রূপ দেখে অনুমান অন্তরে বিস্তর।।' ৬৭৯ কোথা হইতে তোমার হয়েছে আগুসার।।' (৬৮৪)

ইংরাজী উক্তি --- The Times Of India - New Delhi - সংস্করণ - ১৪.১০.২০০৪.
ওসমান গনি সাহেবের উক্তি --- বর্তমান পত্রিকার সৌজন্যে - ১৮.১০.২০০৫

লাউসেনের কথা শুনে ছদ্মবেশী দেবী জানালেন —

'শুনহে রায়ের বেটা (কি) কহিব বাড়া।
তোমার কারণে হৈনু জাতিকুল ছাড়া।।'৭২৬
'তোমার কারণে আমি কুলে দিনু কালি।
মাথায় তুলিয়া নিনু কলঙ্কের ডালি।।' ৭৩০

'লাউসেন ভূলাতে লাবণ্য নানা রঙ্গ।
খসায়ে বুকের বাস দেখাইল অঙ্গ।।
ভবানীর ভাব বুঝে ময়নার নাথ।
রাম রাম বলিয়া দু 'কানে দিল হাত।।' (৭৩৬)

তারপর লাউসেন মোহিনীরূপী ভগবতীকে বললেন —

'ধর্মসেবা করি আমি ধর্মের সেবক।
ধর্ম বিনা আমারে সকলই নিরর্থক।।' (৭৪২)
'আমি — মায়ের সমান দেখি পরের যুবতী।'
'তোমার চরণে করি নমস্কার দেবী।' ৭৭৭

তখন ভবানী বুঝলেন লাউসেন যথার্থই ধর্মপরায়ণ।

'ভুলাইতে নারে দেবী ভাবে মনে মন।
বুঝিলাম লাউসেন ধর্মপরায়ণ।।' (৭৮০)

কাব্যের এই ঘটনা থেকে কবি বলতে চেয়েছেন সকলেরই উচিত পরের স্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখা।

১২। দ্বিচারিণী রমণীর ছলাকলা থেকে সাবধানতা অবলম্বন ঃ দ্বিচারিণী মহিলারা একদিকে যেমন নানা ছলা কলার দ্বারা পুরুষদের মন ভোলাবার চেষ্টা করে অন্যদিকে তাদের কার্যসিদ্ধ না হলে চরম নিষ্ঠুর হতে পারে। এই ব্যাপারে কবি তাঁর কাব্যের 'জামতির নিশাপালা'য় নয়নী নামে এক দ্বিচারিণী কুলবধূর চরিত্র চিত্রায়িত করেছেন তাতে সকলের চোখ খুলে যাবার কথা।

একবার লাউসেন ও কর্পূর গৌড় যাবার পথে রমতী নগরের অনতি দূরে জামতি নগরের কৃষ্ণ সরোবব নামে একটা পুকুর পাড়ে কদম গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় গাঁয়ের বধূরা সেই পুকুরে জল নিতে এসে কদম তলায় অরুণ কান্তি অশ্বিনী কুমার লাউসেন ও তার ভাই কর্পূরকে দেখে মোহিত হয়ে যায়। এর মধ্যে নয়নী নামে হরিহর বারুয়ের বৌ মনে মনে বললো —

এখন যাইব আমি ঘর। পশ্চাৎ ভুলায়ে নিব বিদেশী নাগর।। (১৬৮)

বাড়ি গিয়ে অপরূপ সাজে সজ্জিতা হয়ে কৃষ্ণ সরোবরের দিকে যাত্রা করল লাউসেনকে ভুলাবার উদ্দেশ্যে। যাত্রা কালে তার কোলের ছেলে মা কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করাতে তার গালে মারলো এক চড়।

'ঘর হৈতে নয়নী দ্বারেতে দিল পা।
কোলের বালক ডাকে কোথা যাও মা।।' (২৯০)

'গমনে পড়িল বাধা নয়নী দু'মনা।
এমনি শিশুর গালে মারিলেক ঠনা।।' ২৯৪

এখানে দেখা যাচ্ছে কুলটা দ্বিচারিণী নারীর অভিসারের কাছে ছেলের ডাকও তুচ্ছ। তাই ছেলেকে মারধর করতেও কুণ্ঠিতা হয় না। যাইহোক এরপর পুকুর পাড়ে কদম গাছের তলায় লাউসেনের কাছে গিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে নানা কথা বলতে আরম্ভ করল, এবং কথার ফাঁকে -

'ঈষৎ কটাক্ষ করে আড়চক্ষে চায়।
বুকের বিমল বাস কিঞ্চিৎ খসায়।।
জিহ্বা কেটে পুনশ্চ টানিয়া ঢাকে অঙ্গ।
দ্বিচারিণী রমণী কতেক জানে রঙ্গ।।' (৩২০)

৪৫২, ৪৬০, ৫৩২, ৬৭৩, ৬৭৯, ৭২৬, ৭৩০, ৭৩৬, ৭৪২, ৭৭৭, ৭৮০ **এইগুলি 'আখড়া নিশাপালা'র চরণ সংখ্যা।**

দ্বিচারিনী রমণীর ছলাকলা থেকে সাবধানতা

তাই সে লাউসেনকে বললো ---

'শুনহে প্রাণের বঁধু কি কহিব আর।
তোমার কারণে ছাড়িলাম ঘরদ্বার।।' ৩৩২
'গায়ে অলঙ্কার সাত ভূপতির ধন।
হের দেখ মোর গাঁঠে অমূল্য রতন।।
ধন কড়ি যত দেখ তোমার এসব।
অনায়াসে বিধি দেয় এমন বিভব।।
মোর সনে থাকিলে পাইবে বড় সুখ।
দূর দেশে যাইয়া পাইবে কেন দুখ।। (৩৪০)
ভালদ্রব্য খাওয়াব পরাব ভাল বাস।
মোর সনে বিলাস করিবে বারমাস।।
পালঙ্কে শুয়ায়ে দিব চামরের বা।
চন্দনেতে চার্চ্চিত করিব সর্ব গা।।' (৩৪৪)

এইভাবে নয়নী লাউসেনকে শারীরিক, আর্থিক বিলাসিতা সব দিক দিয়ে প্রলোভন দেখাতে লাগল, — কিন্তু লাউসেন তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না —

'নয়নীর কথা শুনি হেসে কন গুণমণি
শুনলো নিলজ্জ নিতম্বিনী।
জাতি কুলে নাহি ডর কুলবধূ স্বতন্তর
এখানে কি কাজে একাকিনী।।' (৩৫৪)
'নিজ স্বামী পরিত্যাগ অন্যজনে অনুরাগ
ইথে কিবা পুরিবা কামনা।' ৩৫৮
'যদি শুন যুক্তিসার চলে যাও নিজাগার।
ভজ গিয়া পতি একভাবে।
ভজিবারে ভজপতি সবামাঝে হবে সতী
পশ্চাৎ পরম সুখ পাবে।।' (৩৭০)
'আমি হবিষ্যাণী যোগী ফলমূল সদাভোগী।
হেথা থেকে পাবে কি বা সুখ।
ইথে নাহি অনুরাগী দূর দ্বিচারিণী মাগি
শুনে নয়নীর মনে দুখ।।
শাঁখারি নগরে ধাম বসুবংশে ঘনশ্যাম
সদাগর সরল হৃদয়। (৪০০)
শিব সেবে একমনে অনাদ্য মঙ্গল ভনে
নরসিংহ তাহার তনয়।।' ৪০২

কাব্যের এই অংশে কবি একদিকে যেমন দেখিয়েছেন 'দ্বিচারিণী রমণী জানে কত রঙ্গ'। আবার অন্য একদিকে দেখিয়েছেন লাউসেনের চারিত্রিক দৃঢ়তা। লাউসেনকে কোন ছলা কলা রঙ্গতে ভুলানো যায় নাই। উল্টে দ্বিচারিণী মহিলাদের বিশেষ উপদেশ দিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন। কিন্তু একটা প্রবাদ আছে 'চোরা না শুনে ধর্মের কথা।' নয়নীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এত ছলা কলা রঙ্গ করেও একজন পুরুষকে ভোলাতে না পেরে অপমানিত বোধ করে ঐ পুরুষকে (লাউসেনকে) অপমান অপদস্ত করার মতলব ভাঁজল। --

'উপায় করিব কি নয়নী মনে করে। কামের অনলে তার দহে সর্ব গা।
ভুলাতে নারিনু আমি বিদেশী নাগরে।।'৪০৪ কোলে ছিল শিশু গলায় দিল পা।। (৪১০)
'কুলটা নারীর কথা অশেষ সন্ধান। পরাণে বধিয়া তারে ফেলিল কুঁয়ায়।
মনে করে ইহার করাব অপমান।। ডাকাডাকি করে কাঁদে ধূসর ধূলায়।।' ৪১২

একজন কুলটা দ্বিচারিণী রমণী তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে সে যে কত নিষ্ঠুরা হতে পারে কবি তাঁর কাব্যের এই অংশে দেখিয়েছেন, ঐ দ্বিচারিণী মহিলা তার কোলের শিশুপুত্রকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিতা হয় নাই। আর এই যে ঘটনা কবি তাঁর কাব্যে অঙ্কন করেছেন , এটা নিছক কল্পনা প্রসূত বলে মনে হয় না। সে যুগের সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে এধরণের দ্বিচারিণী রমণীর নিষ্ঠুর আচরণের ঘটনা নিশ্চয় ঘটেছে, তাই সমাজকে সাবধান করার জন্য কবি তাঁর কাব্যে এই ঘটনার অবতারনা করেছেন, --- কিন্তু আমার মনে হয় এই সাবধানতা, সচেতনতা শুধু সেকালের জন্যই নয়- একালের জন্যও। আমরা একালেও অবৈধ প্রণয়ের জেরে নিজের পুত্র কন্যা স্বামীকে বা স্ত্রীকে যে হত্যা করা হয় সে সব ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারি। কিন্তু সব পাপেরই শাস্তি আছে - তাও কবি দেখিয়েছেন - পাপীদের সচেতন করার জন্য।

লাউসেনকে শাস্তি দেবার জন্য নিজের ছেলেকে কুয়ায় ফেলে লোকজন ডেবে লাউসেনের নামে দোষ দিয়ে রাজার কাছে ধরে নিয়ে তাঁকে বন্দী করে রাখল। লাউসেন কাতরভাবে প্রভুনিরঞ্জনকে ডাকতে লাগলেন। তারপর বিচারের সময় কুয়া থেকে মৃত শিশুকে তুলে আনতে বললেন, — এবং মৃত শিশুর গায়ে ঠাকুর নিরঞ্জনের পূজা করা পুষ্প জল ছিটিয়ে তার প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। লাউসেন রাজাকে বললেন — এই শিশু সত্য ঘটনা জানে —

'সাক্ষী কথা শিশুকে জিজ্ঞাসে নৃপবর। বিদেশী না মারে মোরে মেরেছিল মা।
বালক বলিছে বাক্য সভার ভিতর।। কোলে ছিনু আমার গলায় দিল পা।।' (৫৯৮)

তারপর রাজার বিচারে 'নয়নীর নাক কান কাটিল লোটন।'

১৩। বারাঙ্গনা রমণী বা যৌনকর্মী সম্পর্কে সাবধানতা ঃ কবি তাঁর ধর্মমঙ্গল কাবের 'গোলহাটের দিবাপালায়' বারাঙ্গনা রমণী বা নটীদের নানা কলা কৌশলের কথা বলেছেন এবং লাউসেনের চারিত্রিক দৃঢ়তায় সেই কলা কৌশল কিভাবে ব্যর্থ করা যায় তাও দেখিয়েছেন —

লাউসেন ও কর্পুর জামতি নগর পেরিয়ে গৌড় যাবার পথে গোলাহাট নামে একটা গ্রামে পৌঁছাল। এই গ্রামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে —

'ভূবন বিখ্যাত ঐ গ্রাম গোলাহাট। অধিকারি* এহাতে সুরক্ষা বণেশ্বর।
এদেশেতে পুরুষ নাই যুবতীর ঠাট।। এদেশে বেবস্যা বৈশে যোল শত ঘর।।' (৬৬০)

লাউসেন আর কর্পুর এই রকম একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় —

'বাজারের মাঝে মাঝে চলিল রাউত। 'কেহ বলে দিবানিশি থাকিব কৌতুকে।
রূপ দেখে রমণী ধাইল যূথে যূথ।। বারমাস বিলাস করিব মহাসুখে।।
লাউসেনে বেড়িল রমণী সব গিয়া। মুখ তুল কথা বল জুড়াক পরাণ।
লাজ খেয়ে কথা কহে হাসিয়া হাসিয়া।।' ১৮ কেহ বলে লহলি যৌবন দিব দান।
'পাছু পাছু গড়ায়ে যুবতী কত ধায়। এইরূপে (নটনী) ধেয়েছে শয় শয়।
কেহ বলে এক কথা শুন (ওগো) রায়।।' ২৮ রূপ দেখে নটীর ধৈরজ নাহি রয়।।' ৩৬

১৬৮, ২৯০, ২৯৪, ৩২০, ৩৩২, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৭০, ৪০০, ৪০২, ৪১০, ৪১২ 'জামতির নিশাপালা'র চরণ সংখ্যা।

বারাঙ্গনা রমণীর সম্পর্কে সাবধানতা

লাউসেন এসবের কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে নগরের প্রাধানা সুরক্ষা নটী খবর পেয়েছে দু'জন রাজপুত্রের মত লোক নগরে এসেছে, সে তাড়াতাড়ি তার সহচরী গোরক্ষাকে পাঠালো ওষুধ মেশানো পান খাইয়ে তার কাছে নিয়ে আসার জন্য। সুরক্ষার কথা শুনে গোরক্ষা পানের পসরা নিয়ে লাউসেনদের কাছে গেল।

'লাউসেনে দেখে দাসী হাসে খলখল।
বদনে ঈষৎ দিল বসন বিমল।।
ঘন ঘন কটাক্ষ না পান কত তান।
প্রিয় ভাষে বলে কোথা করেছ পয়ান।।
মলিন হয়েছে রৌদ্রে সোনার বরণ।
হের এসো কাছে বস ভাই দুইজন।।
শীতল বটের ছায়া বসন্তের বা।
পান খেয়ে খানিক বিশ্রাম করে যা।।' (১৩২)

গোরক্ষার হাবভাব দেখে আর এইসব কথা শুনে কর্পূর এগিয়ে এসে জানালেন —

'অবধান হয়ে কিছু শুন বারাঙ্গনা।
ধর্মের সেবক মোরা না জানি কল্পনা।।
অনুরাগী বৈরাগী সদাই সদাচার।
হবিষ্যাণী হরিতকী ভক্ষণ আমার।।' (১৩৬)

এইসব বলে কর্পূর গোরক্ষার পানের ডালা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, আর তাতে রেগে গিয়ে গোরক্ষা বলল আমার লাখ টাকার পানের পসরা ফেললি কেন। এখুনি গুনগার না দিলে সুরক্ষার কাছে ধরে নিয়ে যাব।

'এত বলি টানাটানি ধরিয়া (দুজ) নে।
সাক্ষী করে গোরক্ষা পথিক লোকজনে।।' (১৯৮)

এই দেখে লাউসেন খুব রেগে গিয়ে গোরক্ষাকে বললেন —

'পসরা ফেলেছে ভাই কড়ি বুঝে নিবি।
কে তোর রাজত্বে তুই কার কি করিবি।।
না মেরেছে ভাই তোকে না করেছে খুন।
না হয় ইহার মূল্য নিবি দশগুণ।।' (২১০)

এই বলে লাউসেন কর্পূরকে থলিতে যত কড়ি আছে নিয়ে আসতে বললেন, কর্পূর থলি ঝেড়ে দেখলেন মাত্র দুটি কানা কড়ি পড়ে আছে। তিনি তাই নিয়ে এসে লাউসেনকে দিলেন। লাউসেন কড়ি হাতে ঠাকুর মায়াধরকে প্রাণ ভরে ডাকতে লাগলেন। ঐ দু'টো কানাকড়ি তখন দু'টি অমূল্য মাণিকে পরিণত হল। লাউসেন ঐ মাণিক দুটি গোরক্ষাকে দিলেন। গোরক্ষা সেই মাণিক নিয়ে গিয়ে দেখাল সুরক্ষাকে, কিন্তু যেই সুরক্ষার হাতে দিল-ঐ দুই মাণিক আবার কানা কড়িতে পরিণত হল। সেই দেখে সুরক্ষা গোরক্ষা দুজনাই হতবাক। তখন সুরক্ষা বললো এরা খুব চতুর নাগর, আমি নিজেই সেখানে যাব —

এই বলে সুরক্ষা প্রায় ছ'কুড়ি নাগর সহ লাউসেনের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো -

'মোর ভাগ্যে আপনি করেছ আগুসার।
দিনকত থাক হেথা রাজার কুমার।।
দেখাব স্বর্গের নাট শুনাইব গীত।
গুণ বুঝে নিলে মোর হইবে মোহিত।।' ৩৮৬

'তোমাকে দেখিয়া রাজা জুড়াল পরাণ।
বুঝিনু রসিক তুমি রসের প্রাধন।।
মনে সাধ তোমাকে কথক দিনে রাখি।
ভোগ রাগ বিলাসে একত্রে দোঁহে থাকি।।

এহা শুনে লাউসেন কানে দিল হাত।
নরসিংহ বলে দয়া কর জগন্নাথ।।' (৩৯৮)

সুরক্ষার এই সব প্রলোভনের কথা শুনে নিজের কানে হাত দিয়ে —

'লাউসেন বলেন শুনহ বাণেশ্বর।	আতপান্ন দিনেতে ভক্ষণ একবার।
তব মনোমত আমি নহিক নাগর।। ৪০০	ধর্মের সেবক নাহি সহে অনাচার।।
ধর্মসেবা করি আমি ধর্মপরায়ণ।	রাজা আর বেশ্যা সে পরশে হয় পাপ।
নাহি মাখি তৈল নাহি তাম্বুল ভক্ষণ।।	জেনে শুনে কে বা গিয়ে ধরে কাল সাপ।।' ৪০৬

পূর্বে ধনী সম্প্রদায় বা জমিদার শ্রেণির লোকেদের একটা বিলাসিতাই ছিল নিজের স্ত্রীকে অবহেলা করে বারাঙ্গনা নারী বা নটীদের কাছে গিয়ে রাত কাটানো। এই অনাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য কবি লাউসেনের মতো দৃঢ়চেতা পুরুষের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন - 'বেশ্যার পরশে পাপ হয়' এবং তাদের কালসাপের সঙ্গে তুলনা করে তাদের থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তাই বলেছেন ' জেনেশুনে কেবা ধরে কালসাপ।' অবশ্য এখানে আর একটা বিষয়ে কবি সমাজকে সচেতন করেছেন বা বলতে চেয়েছেন যে সমস্ত মহিলারা নটী বারাঙ্গনা বা যৌনকর্মী হয়েছেন তাঁর বেশীর ভাগ সময়েই সংসার বা সমাজের অত্যাচারের ফলেই এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই তাদের ঘৃণা করা ঠিক নয়, এবং তাদের একটা মর্য্যাদা দিয়ে লাউসেনের মুখ দিয়ে পরক্ষণেই বলেছেন —

'দেখিলে পরম পুণ্য পুরাণেতে কয়।
সাবধানে বস যেন স্পর্শ নাহি হয়।।' (৪০৮)

অর্থাৎ দর্শনে পাপ নাই, কিন্তু স্পর্শে সর্বনাশ। এযুগেও এই সাবধান বাণী সমভাবে পালনীয়। যদিও সে যুগের মত 'বাবু' সম্প্রদায় বা জমিদার শ্রেণীর মানুষ এখন আর নাই, কিন্তু বারাঙ্গনা নারী বা যৌনকর্মীদের আবাসস্থল বিলুপ্ত হয় নাই বরং নতুন নতুন বন্দর এলাকায় বিস্তার লাভ করেছে। আর যার ফলে পণ্যদ্রব্য আমদানির সাথে সাথে ভয়ঙ্কর মারণ রোগ 'এডস'ও আমদানি হচ্ছে। যার ছোবল কালসাপের মতই। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবি বারাঙ্গনা নারীদের সম্পর্কে যে সাবধান বাণী শুনিয়েছিলেন আজ একবিংশ শতাব্দীতেও সেই বাণী বেশি করে উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন হয়েছে, সেই কারণে বলতে হয় —

'জেনে শুনে কেউ যেন না গিয়ে ধরে কাল সাপ'

১৪। বনভূমি সংরক্ষণে কবির আকুলতা ঃ সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের মুনি ঋষিরা বহুক্ষেত্রেই ছিলেন অনেক বেশি বিজ্ঞানমনস্ক, তাঁরা বুঝেছিলেন পৃথিবীকে বসবাসের উপযুক্ত করতে, মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। আর তার জন্য দরকার অরণ্য সংরক্ষণ, পশুপাখি বন্য প্রাণী সংরক্ষণ এবং এও বুঝেছিলেন সাধারণ মানুষকে উপদেশ দিয়ে বৃক্ষ বা পশুপাখি সংরক্ষণ করা যাবে না। তাই তাঁরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ও পূজাপার্ব্বণে লতাগুল্ম থেকে শুরু করে বড় বড় বৃক্ষাদির ব্যবহার এবং বিভিন্ন পশুপাখিকে বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন রূপে চিহ্নিত করে ঐসমস্ত দেবদেবীর সঙ্গে তাদেরও পূজা করার ব্যবস্থা করে ঐসমস্ত প্রাণীদের ও বৃক্ষকুলকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তাই আমরা দেখি ইঁদুর থেকে শুরু করে বাঘ সিংহ হাতি পর্যন্ত যা বস্তুতন্ত্রের (Eco-System) এক একটি অঙ্গ তাদের প্রায় সকলকেই এক একটি দেবদেবীর বাহন করেছেন, যেমন ইঁদুর হচ্ছে গণেশের বাহন,

৫৯৮,৬৬০, 'জামতির নিশাপালা', ১৮, ২৮, ৩৬, ১৩২, ১৩৬, ১৯৮, ২১০, ৩৮৬, ৩৯৮, ৪০৬, ৪০৮ 'গোলাহাট দিবাপালা'র চরণ সংখ্যা।

বিড়াল হচ্ছে যষ্ঠীবুড়ির বাহন, কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন হাঁস, বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি, মহাদেবের বাহন ষাঁড়, শনিদেবের বাহন শকুন, মনসার সাপ ও হাঁস, বিশ্বকর্মার বাহন হাতি, বিপত্তারিনীর বাহন বাঘ আর মা দুর্গার বাহন সিংহ ইত্যাদি।

আবার এই সমস্ত দেবদেবীর পূজোর উপকরণে দেখা যায় নানা প্রকার গাছ-গাছড়া ও বৃক্ষাদির ব্যবহার, যেমন দুর্গাপূজায় 'নবপত্রিকা' স্থাপনের সময় প্রয়োজন হয় কলাগাছ, কালকচু গাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তী গাছ বা ডাল, বেলডাল, ডালিম ডাল, অশোক, ডাল, মানকচু গাছ, ধানগাছ ও শ্বেত অপরাজিতা লতা। এছাড়া প্রয়োজন হয় পঞ্চপল্লব - (যেমন আম, পাকুড়, বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞ ডুমুর। বিকল্প পদ্ধতিতে - আম, কাঁঠাল, বট, অশ্বত্থ, বকুল), পঞ্চগুঁড়ি - (যেমন হলুদ গুঁড়ো, আতপ চাল গুঁড়ো, কুসুমফুল গুঁড়ো, ধানের তুঁষপোড়া গুড়ো, বেলপাতা গুঁড়ো), পঞ্চকষায় - (যেমন জাম, শিমুল, বেড়ালা, কুল ও বকুল, গাছের ছাল ভিজানো জল। পঞ্চশষ্য - (যেমন ধান, মাস কলাই, তিল, মুগ, যব)। তাছাড়া পূজার ফুল, দুর্ব্বা, তুলসী পাতা, বেলপাতা, সরকাঠি, হোমের কাঠ বিশেষভাবে শালকাঠ, ইত্যাদি নানা দ্রব্য রয়েছে বিভিন্ন লতাপাতা গাছগাছড়াকে নিয়ে,আবার পূজার উপকরণের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় রয়েছে সেটি হল পঞ্চগব্য - যথা গোমুত্র, গোময়, গোদুগ্ধ, গব্যকৃত, গব্যদধি। এই বিষয়গুলি থেকে একটা জিনিস পরিস্কার যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মোড়কে গাছপালা পশুপাখিকে রক্ষা করার মাধ্যমেও পরিবেশের বস্তুতন্ত্রের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার, পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার গুরুত্ব অপরিসীম হলেও সাধারণ মানুষ অনেক সময় তা ভুলে যায়। তাই যত্রতত্র গাছ কেটে বনভূমি ধ্বংস করে। কবি তাই তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে - তাঁর কাব্যের 'মালবধ পালা'য় বনভূমি সংরক্ষণের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে সমাজকে সচেতন করেছেন। তিনি গাছেদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যত্রতত্র গাছ কাটা কখনই চলে না। মালবধ পালায় দেখা যায় লাউসেনের জন্য ফলা বা ঢাল নির্মাণের কাঠ কাটতে এক কামার বনে গিয়ে কোন গাছ কাটবে তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতে শিমূল গাছে চোট মারল -

'দিবানিশি কামার ভাবেন মনে মন। গাছের গায়েতে লাগে কুঠারের ঘা।
কোন কাষ্ঠের হইবেক ফলার গঠন।।' ২ বাপ বাপ বলে ডাকে বিপরীত রা।।
'সম্মুখে দেখেন এক শিমূলের গাছ। বাইস ফেলে কামার তরাসে পড়ে ভূঁয়ে।
ধর্মজয় বলে হানে চোট চারি পাঁচ।। অচেতন হইল বচন নাহি মুয়ে।।' (১২)

কামারের চেতনা ফিরলে সে ভাবল এই গাছে কোন দেবতা বা ভূত প্রেত আছে, তাই কামারের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, সেই সময় ---

'গাছ বলে কর্মকার অবধান কর।
অপরাধ নাহি করি কার নাহি খাই। বিনা অপরাধে কেন জোরে দিলে ঘা।
বনের ভিতরে থাকি হরি গুণ গাই।। দারুণ বাইসের চোটে ঘন কাঁপে গা।।' (২৬)

গাছের এইসব কথা শুনে কর্মকার অন্য গাছ খুঁজতে গেল ---

'সম্মুখে শালের গাছ দেখিবারে পায়। রাত্রে দিনে শয়নে স্বপনে অনুক্ষণ।
চোট চারি পাঁচ গাছের মারে গায়।। রাম নাম বিনা মোর অন্য নাহি মন।।
গাছ বলে কর্মকার অপরাধ কি। শুন ভাই কর্মকার সবিশেষ কই।
মহাসুখে এই বনে বহুকাল জি।। ফলার গঠন যোগ্য আমি গাছ নই।।' (৩৮)

কর্মকার গাছেদের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে অন্য বনে চলে গেল।

'অন্য বনে কর্মকার করিল গমন।
বিল্ববৃক্ষ তলায় দিলেক দরশন।।' ৪৬
চোট মারিবারে চায় মনে অনুমান।
(গাছ) বলে কর্মকার (শুন) সাবধান।।৪৮

'প্রিয় বড় সংসারে শিবের আমি হই।
শুনহ বিশেষ কথা তোরে আমি কই।।' ৫০
(কোন ধনে) তুষ্ট নন ভবানীর নাথ।
পরম সন্তুষ্ট মোর পাইলে এ(ক) পাত।। (৬৬)

বেল গাছের এই কথা শুনে গাছকে নমস্কার করে আবার অন্য বনে গাছের সন্ধানে গেল।

'সম্মুখে দেখেন এক অশ্বত্থের গাছ।
হানিবারে চায় তারে চোট চারি পাঁচ।।
বৃক্ষ বলে কর্মকার তু বড় পামর।
না জানিস মহিমা আমার তো বর্বর।।
বিষ্ণু অংশ গাছ আমি বিষ্ণু অবতার।
বেদেতে বিস্তর লেখে মহিমা আমার।।
অশ্বত্থ রোপিলে সাত অশ্বমেধ ফল।
স্বর্গ ভোগ করে যে বৈশাখে দেয় জল।।

অশ্বত্থ রোপন ক'রে উৎসর্গয়ে যে।
ভবসিন্ধু মহাঘোর তরে যায় সে।।
বর্ণ মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন বর্ণ গুরু।
সকলের শ্রেষ্ঠ আমি যত আছে তরু।।
অশ্বত্থের গাছকে কাটে যেই জনা।
ব্রহ্ম হত্যা পাপ হয় সে পায় যন্ত্রণা ।।
ডাল ভেঙ্গে (পাত) ছিঁড়ে যে জন পোড়ায়।
তাহার পাপের সীমা কহা নাহি যায়।।' (৮৬)

অশ্বত্থ গাছের এইসব কথা শুনে কামার নিজেকে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত রাখতে কানে হাত দিল —

'এহা শুনে কামার কানেতে দিল হাত।
রাম রাম গোবিন্দ বলিল বার সাত।।' (৮৮)

'কামার সে বন ছেড়ে অন্য বনে যায়।
সে বনের যত বৃক্ষ হরি গুণ গায়।।' (৯০)

'হরিনাম গোবিন্দ বলেন শারি শুক।
বন দেখে কামারের পরম কৌতুক।।'

এইভাবে কর্মকার বন থেকে বনান্তরে ঘুরতে লাগলো বা অন্যভাবে বলা যায় যত্রতত্র যে কোন গাছ কাটা যে ঠিক নয় তা বুঝাবার জন্য কবি তাকে ঘুরাতে লাগলেন। শেষে স্বপনে ধর্মরাজের নির্দেশে ফলা বা ঢাল নির্মাণের জন্য একটি মান্দার গাছ কাটার সুযোগ পেল।

কাব্যের এই অংশে অর্থাৎ 'মালবধ পালা'র ১-১১০ ছত্রের মধ্যে কবি শিমূল, শাল, বেল, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছেদের দিয়ে কথা বলিয়ে, ভয় দেখিয়ে কর্মকারকে যত্রতত্র যে কোন গাছ কাটতে না দিয়ে বন থেকে বনান্তরে ঘুরিয়ে বনভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন। বনভূমি সংরক্ষণের জন্য সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছেন, যার প্রয়োজনীয়তা আজ অনেক অনেক বেশি করে অনুভূত হয়। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সভ্যতা বিকাশের ফলে একদিকে যেমন ঘটছে জনবিস্ফোরণ অন্যদিকে হচ্ছে শিল্পায়ণ, আর তার ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণ। এই দূষণ রোধ করার জন্য এখন পালিত হচ্ছে 'অরণ্য সপ্তাহ', 'বিশ্বপরিবেশ দিবস' ইত্যাদি, কিন্তু দূষণের মাত্রা যে ভাবে বেড়েছে বা বাড়ছে যার

ফলে তাজমহলও আক্রান্ত হচ্ছে, সেখানে বছরের সাতদিন মাত্র অরণ্য সপ্তাহ পালন, কিম্বা একদিন পরিবেশ দিবস পালন করলে সমস্যার খুব একটা সমাধান হবে না। সমগ্র সমাজকে এরজন্য সমান ভাবে সচেতন হতে হবে। যে কোন দিন সময় সুযোগ পেলেই বৃক্ষরোপনের ব্যবস্থা করতে হবে। তিন'শ বছর আগে কবি গাছেদের দিয়ে কথা বলিয়ে কর্মকারকে যত্রতত্র গাছ না কাটতে দিয়ে বন থেকে বনান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে গেছেন, তেমনি বনদপ্তরের কর্মীবন্ধুরা সমাজের কথা ভেবে যে কোন পশুশিকারি বা কাষ্ঠচোরাচালনকারীকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে তাদের উপযুক্ত সাজা দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে সমাজ খুব উপকৃত হবে। সুখের কথা সমাজের উচ্চস্তরের দু একজন ব্যক্তি যেমন ভারতের এক প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক আর এক চিত্রাভিনেতা, নবাবোচিত ভঙ্গিতে হরিয়ানার ও যোধপুরের সংরক্ষিত বনভূমি থেকে বিরল প্রজাতির কৃষ্ণসার হরিণ শিকার করে বমাল সহ ধরা পড়ে বিচারাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে একজনের সাজাও ঘোষিত হয়েছে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

১৫। রাজ্য শাসনে রাজা প্রজার সম্পর্ক ঃ কবি নরসিংহ বসু তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে গৌড়েশ্বর, কর্ণসেন, লাউসেন, ইছাই ঘোষ প্রভৃতি রাজা ও সামন্তরাজাদের রাজ্য শাসনে রাজা- প্রজার সুসম্পর্কের কথা উপস্থিত করে বলতে চেয়েছেন রাজা প্রজার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। মনে হয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রের অস্থিরতা, শাসন শোষণ কবিমনকে বিশেষ ভাবে আলোড়িত করেছিল। তাছাড়া তিনি নিজে আঠারো বছর ধরে তাঁর নিয়োগকর্তা রাজা আসাদুল্লাহ খাঁয়ের হয়ে মুর্শিদাবাদ-নবাব দরবারে ওকালতির কাজ করে রাজা নবাবদের ভালমন্দ সমস্ত রকম কাজকর্ম খুব কাছ থেকে বা ভেতর থেকে দেখেছেন। দেখেছেন বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্র রায়ের, আসাদুল্লাহ খানের প্রজাবাৎসল্য, আবার দেখেছেন নবাব মুর্শিদকুলি খানের কঠোর শাসন ব্যবস্থা, আবার অনেক সময় দেখেছেন রাজা অপেক্ষা মন্ত্রী আমলাদের প্রজা পীড়ন। আর সে গুলোই তিনি তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কবি বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্র রায়ের রাজ্যশাসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন

'অধিকারি সে দেশে কীর্তিচন্দ্র রায়। সত্যবাদী সদাচারী যেন যুধিষ্ঠির।
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।। প্রজাগণ পালন সাক্ষাৎ রঘুবীর।।'(৮)

কবি আসাদুল্লাহরও প্রশংসা করে বলেছেন ---

'বাংলায় বীরভূম বিখ্যাত অবনী। প্রবল প্রতাপ ভূপ সমরে প্রচন্ড।
শ্রী আসফুল্লা খান রাজা শিরোমণি।। সব দেশে যশ গায় রাজা ঝারিখন্ড।।
অস্ত্রে শস্ত্রে নিপুন বিখ্যাত মহীতলে।
দ্বাদশ হাজার ঢালি যার আগে চলে।।' (৩৪)

আবার নবাব কুলি খানের খাজনা আদায়ের কঠোরতা সম্পর্কেও লিখেছেন ---

'নবাব জাফর খান নবাব্দি হাকিম। মাঝে মাঝে লোকের খাজনা নেন বুঝে।
দরবার দেশে দেশে প্রতাপ অসীম।। বেবাক করিলে পুন বাকি বলে খুজে।।'(৪৬)

এরপর কবি তার কাব্যের অন্যান্য রাজা বা সামন্ত রাজাদের প্রজাপালনের যে ছবি এঁকেছেন তার কিছু কিছু অংশ তুলে ধরছি ---

---

১২, ২৬৩৮, ৪৮, ৬৬, ৮৬, ৮৮, ৯০ - 'মাল বধ' পালার চরণ সংখ্যা।

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল ঃ সমাজ ভাবনা

রাজা গৌড়েশ্বরের প্রজাপালন ঃ কাব্যের প্রধান রাজা হলেন গৌড়ের রাজা পঞ্চম গৌড়েশ্বর, তাঁর প্রজাপালন সম্পর্কে কবি লিখেছেন ---

'পাটেরাজা হইলেন গৌড়েশ্বর রায়।
জগজনে তাহার যশের গুণ গায়।।' ৬১৪

'প্রজার পালনে রাজা রাম অবতার।
রাজপীড়া নাহি দেশে কোন অবিচার।।'
'ভূমি বিঘা আনা কড়ি নাহি ছিল বার।
ব্যাপার বাণিজ্যে লোক পায় বড় লাভ।।৬৩৪

ভাল জোত নির্ণয় প্রজার তিনভাগ।
আসানে রায়ত এসে বাড়ে অনুরাগ।।
প্রজা বৃদ্ধি দিনে দিনে বসে চালে চাল।
লোক সব সুখি দেশে নাহিক জঞ্জাল।।'৬৩৮

'পালায় চক্ষের পাপ পুরী বিলোকনে।
গৌড়ের সমান দেশ নাহি ত্রিভূবনে।।
মহারাজ চক্রবর্তী রাজা গৌড়েশ্বর।
মহাসুখে রাজত্ব করেন বরাবর।।' (৬৮২)

রাজা গৌড়েশ্বর যে প্রকৃতই প্রজা বৎসল ছিলেন তা কাব্যে বর্ণিত একটা ঘটনা থেকেই পরিস্কার বুঝা যায় --- রাজা গৌড়েশ্বর একদিন শিকারে যাবার জন্য হাতি, ঘোড়া, নফর, চাকর, ঢাল, খাড়া নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে দলিজে আসতেই হঠাৎ বন্দীশালে তাঁর দৃষ্টি পড়ে যায়।

'ঘর হৈতে বাহির দলিজে দরশন।
বন্দীশালে দৃষ্টি পড়ে দৈবের ঘটন।।
অন্নহীন মলিন বসন বেড়ি পায়।
বন্দী দেখে ভূপতি করেন হায় হায়।।
একে একে বন্দীর আব্দাস বুঝে লেন।
ঘোড়া জোড়া দিয়া রাজা বেড়ী কেটে দেন।
সোম ঘোষ নামে এক গোয়ালা কুমার।
জিজ্ঞাসিলা রাজা তাকে কি নাম তোমার।।' (৩০)

'এতশুনি গোয়ালা বিনয় বাক্যে কয়।
সোম ঘোষ নাম মোর গোয়ালা তনয়।।
বালিঘাট নিবাস পুরুষ পাঁচ সাত।
তারি প্রজা নৃপতির ভূবন বিখ্যাত।।
অতি পূর্বে রাজস্ব আছিল যোল পণ।
এবে নানা বাজে জমা পনের কাহন।।
সিকা বিঘা এবে ভূম পূর্বে ছিল আনা।
পণের কাঠার কুড়া মেপে করে সানা।।' (৪০)

'হাজা শুখা বাদ নাই কমি এক কড়া।
এক দন্ড বিলম্বে কোমরে দেয় দড়া।।' (৫৬)

বন্দীদের দশা দেখে রাজা হায় হায় করে ওঠেন, তাদের সংবাদ নিয়ে পায়ের বেড়ী কেটে দিয়ে ঘোড়া জোড়া দিয়ে বিদায় করেন। এখানেই রাজার উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর তিনি যখন সোম ঘোষের কাছে জানতে পারলেন তাঁর অজ্ঞাতে মন্ত্রী মহামদ প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি করেছে, এবং অল্প বাকিতেই প্রজাদের বন্দী করেছে, তখন রেগে আগুন হয়ে মন্ত্রী মহামদ কে ভীষণ বকাবকি করতে লাগলেন এবং বন্দীদের বেড়ী কেটে মুক্ত করলেন।

'বন্দীর বচন শুনি নৃপতি শেখর।
দাবানলে ঘৃত যেন জ্বলিল অন্তর।।
পাত্র মহামদে রায় বলিল বচন।
এত অবিচার দেশে কিসের কারণ।।

বুঝি প্রায় বিলাত করিবে লন্ডভন্ড।
কার বোলে লোকের উপর এত দন্ড।।' (৬৮)
'তোমা হৈতে হৈল পাত্র গৌড়ে অবিচার।
বুঝি জরাসন্ধের এ হৈল কারাগার।।

গোয়ালার বেড়ী কেটে দিল নৃপবর।
ঘোড়া জোড়া দিল তাকে করিয়া আদর।।' (৭৪)

কাব্যের এই অংশে কবি দু'টো বিষয় দেখাতে চেয়েছেন। এক হচ্ছে প্রজাদের প্রতি রাজা গৌড়েশ্বরের বিশেষ মানবিক আচরণ। বন্দীদশা থেকে বন্দীদের মুক্ত করে ঘোড়া জোড়া দিয়ে আদর করে তাঁদের বিদায় করা। আর একটা বিষয় হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে রাজার অজ্ঞাতসারে নিজেদের প্রভাব দেখানোর জন্য মন্ত্রী আমলারা কি ভাবে প্রজাদের হয়রানি করে। খাজনা বৃদ্ধির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও রাজার অগোচরে হয়। তাঁদের কুকর্মের ফলে দেশের ক্ষতি হয়, সুনাম ক্ষুন্ন হয়। তাই মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে রাজাকে বলতে হয়েছে - 'এত অবিচার দেশে কিসের কারণ', 'কার বোলে লোকের উপর এত দন্ড'? 'তোমা হৈতে হৈল পাত্র গৌড়ে অবিচার।' এই যে পাত্র মিত্র আমলা পরিষদের দ্বারা দেশের অবিচার সে যুগে হয়েছে তা এযুগেও হয়ে চলেছে। ২২শে জুলাই ২০০৪ তারিখের একটি সংবাদের কিছু অংশ --- **'বাংলা ১৩৮৫ সাল থেকে বকেয়া খাজনা আদায় করার সরকারী নির্দেশ থাকলেও বর্ধমান জেলায় তার অনেক আগের বছরের বকেয়া খাজনা আদায় করা হচ্ছে।' 'ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীরা জানিয়েছেন কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্যই দপ্তর এই রাস্তা নিয়েছে।'** এখানেও দেখা যাচ্ছে সরকার যখন ১৩৮৫ সালের পূর্বেকার বকেয়া খাজনা মুকুব করে প্রজাদের খাজনার ভার লাঘব করতে চেয়েছেন সেখানে সরকারী নির্দেশনামা প্রায়ই অগ্রাহ্য করে দপ্তরের কর্তারা নিজেদের দপ্তরের কোটা পূরণ করার জন্য - বাসিন্দাদের বা প্রজাদের হয়রানি করতেও ছাড়ছেন না। প্রায় তিনশ' বছর আগে কবি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে বিষয়ে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছিলেন, আজও সে ঘটনা সমানে ঘটে চলেছে। কিন্তু রাজার বা সরকারের নীতি রূপায়ন করার দায়িত্ব যাঁদের উপর থাকে তাঁদের উচিত জনগণের ওপর নিজেদের সিদ্ধান্ত না চাপিয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত মেনে চলা।

কর্ণসেনের প্রজাপালন ঃ

রাজা প্রজা সম্পর্ক নিয়ে কাব্যের বিশিষ্ট সামন্তরাজ কর্ণসেনের সুশাসনের কথাও কবি উল্লেখ করেছেন --- কর্ণসেনের সঙ্গে শালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দেবার পর গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে উড়িষ্যার কাছে ময়না রাজ্যের সামন্তরাজ করে সেখানে পাঠান এবং বলেন

'বসাইবে লোকজন করিয়া আসান। প্রজার পালন করে রামের সমান।।' ৪৪৬

'কর্ণসেন রাজা হৈল পড়ে গেল সাড়া। রামের সমান প্রজা পালেন নৃপতি।
তিন সন্ধ্যা শহরে বাজিছে সিঙ্গা কাড়া।।' ৪৯০ অমরাবতীর তুল্য ময়না বসতি।।
'দিন দশে প্রজাগণ বসিল বিস্তর। নাট গীত আনন্দ সবার ঘরে ঘরে।
বৎসর বেবাক দিল নাহি রাজকর।। রাজার আসানে প্রজা সুখে ঘর করে।।' (৫০৪)

কর ব্যবস্থায় এই আসানের ফলে প্রজারা সুখে বসবাস করতে লাগলেন।

লাউসেনের রাজ্যশাসন ও প্রজানুরঞ্জনের ব্যবস্থা ঃ ময়নার সামন্তরাজ কর্ণসেনের **পুত্র এবং** এই কাব্যের মূল নায়ক হচ্ছেন ধর্মসেবকবীর লাউসেন। লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মেসোমশাই গৌড়েশ্বর তাঁকে নতুন করে ময়নার জায়গীরদার নিয়োগ করেন। গৌড় থেকে ময়নার

৮, ৩৪, ৪৬, ৬১৪, ৬৩৪, ৬৩৮, নিশাস্থাপন পালার, ৩০, ৪০, ৫৬, ৬৮, ৭৪ 'আদ্য ঢেকুর' পালার চরণ সংখ্যা।

জায়গীরদারের সনদ নিয়ে দেশে ফিরে মা বাবাকে প্রণাম করে রাজকার্যে-মনোনিবেশ করেন, তিনি রাজ্যের সমৃদ্ধি ও প্রজাবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন করের ক্ষেত্রে ছাড় এবং বাস্তু জমির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কর মুকুব করে এবং কিস্তিবন্দী করে কর নেবার ব্যবস্থা করে প্রজাদের অনেক আসান করেছিলেন। তাঁর সুশাসনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রজারা ময়নায় এসে বসবাস স্থাপন করতে লাগলেন এমনকি গৌড়েশ্বরের রাজ্যের রমতি ভেঙ্গে লোকজন ময়না চলে আসে। এ সম্পর্কে কাব্যের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি —

'জয়পতি মন্ডলে কহেন কিছু রায়।	রাজার দুই অংশ প্রজার তিনঅংশ ভাগে।
দেশে হলে আসান প্রজার বৃদ্ধি পায়।।	বিস্তর বসিবে প্রজা এই অনুরাগে।।
সালি বিঘা এক আনা ছনা তিন পাই।	মাথট প্রঞ্চক নাই জমার উপর।
দোকর্প দু'আনা দর বাজে কর নাই।। (৪৪০)	কিস্তি বন্দী করে দিল বার মাস কর।।
কর মাপ বাস্তুর ফসল বন্দী কড়ি।	এত শুনি মন্ডলের আনন্দিত মন।
ভূমি বিঘা পরিমান আশি গজ দড়ি।।	আসানে বসায় রাজ্য ময়না ভুবন।।' (৪৪৮)

লাউসেনের খাজনা নীতি, প্রজা পালন ও সুশাসনের ফলে দেখা যায় —

' প্রজার পালন যেন রামের সমান।	রমতি ভাঙ্গিয়া বৈশে ময়না নগর।
নানা দেশ হৈতে হৈল প্রজার পয়ান।।	ভনে নরসিংহ যাকে ধর্ম দিল বর।।' (৪৯০)

লাউসেনের সুশাসনে রমতি থেকেও লোকজন ভেঙ্গে ময়নাতে বসতি স্থাপন করছে শুনে রাজা গৌড়েশ্বর মন্ত্রী মহাপাত্রকে সভামধ্যে অপমান করে বরখাস্ত করলেন।

'রমতির লোক বৈসে ময়না নগরে।	রাজ্যের দিলাম ভার ভাঙ্গিল মুলুক।
সমাচার পাইল ভূপতি গৌড়েশ্বরে।।	উপযুক্ত না হয় দেখিতে তোর মুখ।।
ক্রোধ কর‍্যা চাহেন পাত্রের পানে রায়।	আজি হৈতে যদ্যপি আসিবি দরবার।
(বলেন) তোর অবিচারে মোরদেশ ভাঙ্গ্যা যায়।	সমুচিত শাস্তি পাবি দিবি গুণাগার।।' (৪৯৮)

'এত বলি পাত্রকে উঠায়্যা দিল রায়।'

এই অংশ থেকে আমরা আরও একবার দেখতে পেলাম রাজার সুশাসনে প্রজারা সুখে বসবাস করে কিন্তু মন্ত্রী আমলাদের দোষে রাজ্য ভেঙ্গে যায়। রাজা গৌড়েশ্বর একটু দুর্বল প্রকৃতির রাজা ছিলেন, অধিকাংশ সময়েই মন্ত্রী মহামদের উপর নির্ভর করে থাকতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কবি রাজার চোখ খুলে দিয়েছেন। রাজা বুঝেছেন মন্ত্রী মহামদের জন্যই রাজ্যের হাল খারাপ হয়েছে। তাই পাত্রকে দরবার থেকে বার করে দিয়েছেন। এখানে কবি বলতে চেয়েছেন, মন্ত্রী আমলাদের দোষে রাজ্যের ক্ষতি হলে সুনাম নষ্ট হলে, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দেওয়া দরকার।

১৬। নগরায়ন ও শ্রমবিভাগ ঃ লাউসেনের নগরায়ন পদ্ধতিতে কবি যেভাবে শ্রম বিভাগের নীতি অনুসরণ করে প্রজাদের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন সেদিকে একটু পরিচয় দেব। আমরা জানি কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে তার নিজের সব অভাব মেটানো সম্ভব নয়। তাই সমাজে একসময় সৃষ্টি হল শ্রমবিভাগ। এক একজন ব্যক্তি বা এক একটি গোষ্ঠি এক এক প্রকার কাজে আত্মনিয়োগ করল। কেউ কৃষি কাজে, কেউ পশুপালনে, কেউ বস্ত্র তৈরীর কাজে,

কেউ হাঁড়ি কুড়ি তৈরীর কাজে, কেউ কুড়ুল কোদাল, হাতা-খুন্তি তৈরীর কাজে , এইভাবে সমাজে সৃষ্টি হল - কৃষক, গোয়ালা, তাঁতি, কামার, কুমোর, জেলে, বণিক, ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠি। এরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে দ্রব্য উৎপাদন করে। আর তার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আসে দক্ষতা ও বিশেষায়ণ, যার ফলে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, আর এক একজনের উৎবৃত্ত দ্রব্য অন্যজনের সঙ্গে বিনিময় করে নিজেদের অভাব মেটায়। এইভাবে সমাজে বিভিন্ন লোকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। কবি নরসিংহ বসু শ্রমবিভাগের এই নীতি ভালভাবে উপলব্ধি করে লাউসেনের নগর পত্তনে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বসতি স্থাপন করে প্রজাদের সুখ সুবিধার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন, যেমন কৃষক, কুমোর, কর্মকার, তাঁতি, কৈবৰ্ত্ত, মোদক, বণিক, তাম্বুলি, বারুই, রজক, বৈদ্য এছাড়া পূজা অর্চনার জন্য ব্রাহ্মণ, লেখাপড়া শেখানোর জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত, এবং বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ। আবার নগর রক্ষা করার জন্য হাঁড়ি, ডোম, কোল, মাল, চন্ডাল, বাইতি, বাগদি, কোচ, ধনুকী ইত্যাদি নানা লোক নগরে বসলেন।

১৭। রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্য ঃ রাজার যেমন 'প্রজাপালনে রামের সমান' হওয়া উচিত বলে কবি দেখিয়েছেন, তেমনি তিনি এও দেখিয়েছেন রাজভক্ত প্রজারাও তাঁদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে বা প্রয়োজনে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকবে। কবি তাঁর কাব্যে লাউসেন, কালুবীর, কালুর স্ত্রী - লখ্যা ডুমনি প্রভৃতির দায়িত্ব কর্তব্য জ্ঞান এবং রাজার প্রতি তাদের আনুগত্য যে কত গভীর তার পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

ক) রাজা গৌড়েশ্বরের প্রতি লাউসেনের দায়িত্ব, কর্ত্তব্য ও আনুগত্য ঃ গৌড়েশ্বর কাঙুর যুদ্ধে যাবার জন্য লোক মারফত লাউসেনকে চিঠি লিখে পাঠালেন। রাজা গৌড়েশ্বরের চিঠি পেয়ে লাউসেন পিতা কর্ণসেনের কাছে অনুমতি চাইতে গেলেন। যুদ্ধের কি ভয়ঙ্কর পরিণতি কর্ণসেন সেটা মর্মে মর্মে বোঝেন, কারণ ইছাই এর সঙ্গে ঢেকুরের যুদ্ধে তাঁর ছয় পুত্র নিহত হয়েছেন, আর সেই শোকে ছয় পুত্রবধূ ও পাটরানী আত্মহত্যা করেন। এইসব কথা কর্ণসেন পুত্র লাউসেনকে বলে যুদ্ধযাত্রা থেকে নিরস্ত্র করতে চাইলেন। কিন্তু লাউসেন পিতাকে জানালেন কিছু চিন্তা নাই 'তোমার আশিসে জয়ী হইব সমরে।'

> 'রাজার চাকর আমি তার নোন খাই।
> রাজ আজ্ঞা সতত যোগাতে আমি চাই।।' (৭৩৬)

এরপর লাউসেন মায়ের কাছে গিয়ে গৌড়েশ্বরের চিঠি পড়ে শুনালেন। মা তো যুদ্ধের কথা শুনে পাগল। বললেন বিষয়ে কাজ নাই, ভিক্ষা মেগে খাব, তোমাকে যুদ্ধে যেতে হবে না। মায়ের কথা শুনে লাউসেন একদিকে মায়ের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করলেন অন্যদিকে রাজ আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য তাও জানালেন।

> 'তোমার আশিসে মা সর্ব ঠাঁই জয়। রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘিবা উচিত না হয়।।'

এই বলে লাউসেন পিতা মাতার আর্শীবাদ নিয়ে কাঙুর যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

আর একটা ঘটনা - রাজা গৌড়েশ্বরের বৃদ্ধ বয়সে আবার বিয়ে করার মন হয়েছে। মন্ত্রী মহামদের পরামর্শে হরিপাল-সিমুল্যার রাজকন্যা কানড়াকে তিনি পাত্রী নির্বাচন করেছেন, কিন্তু কানড়া তাতে রাজী নন। তখন দেবী ভগবতীর আশীর্ব্বাদে তিনি একটি লোহার গন্ডার পান, দেবীর নির্দেশ অনুযায়ী যে একচোটে এই গন্ডারটি কাটবে, তাঁকেই কানড়া বিয়ে করবে।

৪৯০, ৫০৪ 'রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা, ৪৪০, ৪৪৮,৪৯০, ৪৯৮, ৭৩৬ 'কাঙুর মহিম যাত্রা' পালার চরণ।

বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর কিম্বা তাঁর শ্যালক মন্ত্রী কেউই ঐ গন্ডার কাটতে না পারায় লাউসেনের ডাক পড়ে। রাজা গৌড়েশ্বর লাউসেনকে লিখলেন — যে তিনি হরিপাল সিমূল্যার রাজ কন্যাকে বিবাহ করার জন্য সিমূল্যা এসেছেন, কিন্তু রাজকন্যা —

' কর‍্যাছে দারুন পণ লোহার গন্ডার।
এক চোটে কাটে যেই পত্নী আমি তার।।'(৩৮০)

আরও লিখেছেন ---

'হাতে সুতা বান্ধ্যা বসি আছি দিন দশ। ভাব্যা চিন্তা মনেতে অনেক কৈল সার।
লোক হাসা হয়্যাছে সংসারে অপযশ।। তোমা বিনা এই গন্ডার কাটে কেবা আর।।'

রাজা গৌড়েশ্বরের এই চিঠি পেয়ে মা বাবার কাছে বিদায় নিয়ে — লাউসেন কালুবীরকে সঙ্গে নিয়ে রাজ আজ্ঞা পালনে হরিপাল সিমূল্যা গেলেন এবং সেখানে গিয়ে একচোটে গন্ডার কেটে দুখানা করে দিলেন।

এখানে অবশ্য কেউ কেউ ভাবতে পারেন লাউসেন গন্ডার কেটে কানড়া সুন্দরীকে বিয়ে করার জন্য সিমূল্যা গিয়েছিলেন। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। অবশ্য কানড়ার ইচ্ছা তার পতি হবেন লাউসেন। তাই গন্ডার কাটার পর নত মস্তকে আচ্ছাদিত বদনে লাজুক চোখে মৃদু ভাষে কানড়া যখন লাউসেনকে বলেন ---

'চিরকাল হৈতে সেবি শঙ্কর-পার্বতী। মনের মানস মোর হবে তুমি পতি।।' (১২৫২)

কানড়ার এই কথা শুনে লাউসেন কানে আঙুল দিয়ে জগন্নাথকে ডাকতে লাগলেন।

' এত শুনি লাউসেন কানে দিল হাত। তোমাকে করিতে বিভা আস্যাছিল রায়।
তিনবার স্মরণ করিল জগন্নাথ।। অধিবাস করা হাথে সুতা বান্ধ্যা প্রায়।'
বলিতে লাগিল রাজা বাক্য সবিনয়। রাজার সম্বন্ধে তুমি হও মোর মাসি।
অসম্ভব বচন শুনিতে বাসি ভয়।। আমাকে উচিত আগে তোমাকে সম্ভাসি।।
গলায় কাপড় দিয়া করি পরিহার
মোর সনে অনুচিত এমন বিচার।।' (১২৬২)

লাউসেনের এই কথা শোনার পর কানড়া বলেছিলেন ---

'বিনয় বচনে যদি নাহি হবে পতি। (তবে) কাটিয়া তোমার মাথা আমি হব সতী।।'

এরপর লাউসেন কানড়ার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। সেই যুদ্ধ দেখে দেবী ভবানী ওঁদের কাছে এসে বললেন —

'কানড়াকে সর্বকাল ভালবাসি আমি। মনে আন না কর‍্য ময়না অধিপতি।,
বর মাগ্যা লয়্যাছে হইবে তুমি স্বামী।। বিভা কর আপনি কানড়া রূপবতী।।'(১৩০০)

ভবানীর চরণ বন্দনা করে লাউসেন তাঁকে জানালেন — আপনি সবই জানেন --

' হাতে সুতা বিবাহে আসিয়াছিল রায়। কি কর‍্যা করিব বিভা মোর না জুয়ায়।।' (১৩০৪)

এইসব ঘটনা থেকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে যে কানড়ার প্রথমে অনুরোধ, পরে যুদ্ধ, তারপর দেবী ভবানীর নির্দেশও লাউসেনকে বিবাহে রাজি করাতে পারে নাই, সুতরাং লাউসেন শুধুমাত্র রাজ আজ্ঞা পালন করার জন্যই শিমূল্যাতে গন্ডার কাটতেই এসেছিলেন। (পরে অবশ্য দেবী ভবানী গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে চিঠি লিখিয়ে নিয়ে এসে এবং লাউসেনের প্রতিজ্ঞা পূরণ করে লাউসেনের সঙ্গে কানড়ার বিবাহ দেন।)

রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্য

লাউসেনের রাজ আজ্ঞা পালনের আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রাজা গৌড়েশ্বর দরবারে বসেছেন, তার অধিনস্থ প্রায় সব রাজারাই দরবারে এসেছেন, যেমন এসেছেন রমতীর রাজা, মঙ্গলকোটের রাজা গজপতি, মল্লরাজ, বর্ধমান রাজ-কালিদাস, চন্দ্রকোনার চোহান, বরদার রাজা, সিমুল্যার রাজা, মিথিলার রাজা, মগধরাজ, বঙ্গের বিনোদ রায়, অযোধ্যার রাজা, কামরূপের রাজা কর্পূরধল ইত্যাদি। রাজা গৌড়েশ্বরের সভা মধ্যে এসে একে একে সব রাজাদের দিকে চেয়ে দেখলেন কে কে এসেছেন। দেখেন ঢেকুরের সোম ঘোষ বা তার ছেলে ইছাই ঘোষ ছাড়া সবাই এসেছেন এবং সকলে রাজকরও দিয়েছেন। শুধু ঢেকুরের প্রায় কুড়ি বছরের রাজকর বাকি। সেই শুনে রাজা গৌড়েশ্বর রাগে কাঁপতে কাঁপতে মন্ত্রী মহামদকে জানালেন ---

' অদ্যাবধি ঢেকুরে গোয়ালা বেটা রায়। তার প্রতিকার না কর‍্যাছ এতদিন।
স্বতন্তর রাজা হৈয়া দেশ লুট্যা খায়।। বুঝি প্রায় টাকা খ্যায়া হৈয়াছ অধীন।। (১০০)

মন্ত্রী মহামদ রাজাকে বললেন ইছাই দেবীর বরে স্বতন্ত্র রাজা হয়েছে, তাকে পরাজিত করা কারো সাধ্য নাই, একমাত্র রঞ্জার ছেলে ধর্মপুত্র লাউসেনই পারে তাকে পরাজিত করে রাজকর আদায় করে আনতে। এই যুক্তি মেনে রাজা লাউসেনকে পত্র লিখে ইন্দা মেটেকে ময়না পাঠালেন, আর সেই চিঠিতে মহাপাত্র কিছু কথা যোগ করে দিল ---

' আশীর্ব্বাদ লিখিয়া লিখিল বিবরণ। অবিলম্বে আসিবে ওজর নহে কিছু।
মহিমে হবেক যাত্যে ঢেকুর ভুবন।।'(১৪০) ফতে হৈলে মহিম বক্সিস পাবে পিছু।।'

লাউসেন গৌড়েশ্বরের চিঠি পেয়ে কালুবীর ও ঘোড়া অশ্বির পাখরের মতামত জেনে নিয়ে পিতা মাতার কাছে বিদায় নিতে গেলেন। পিতা কর্নসেন তো ঢেকুর যুদ্ধের কথা শুনে ভয়ে অস্থির। তখন লাউসেন মাকে জানালেন ---

'হের দেখ স্ব অক্ষরে রাজার লিখন। ভূপতির আজ্ঞা যাত্যে ঢেকুরের রণ।।'

ছেলের কথা শুনে রঞ্জাবতী বলেন ---

'শুন্যাছি বিষম বড় ঢেকুরের গড়। পরের চাকরী কর‍্যা পাবে কত ধন।
রাজা পাত্র হার‍্যা আল্য দাঁতে কর‍্যা খড়।। কত ঠাঞি রণে যাবে কর‍্যা প্রাণপণ।।'(৩০৮)

লাউসেন মাকে চিন্তা করতে নিষেধ করে বললেন ' তব আশীর্ব্বাদে হব ঢেকুরে বিজয়' । এই বলে মা বাবার চরণ বন্দনা করে যুদ্ধযাত্রা করলেন। যাত্রার আগে রাণীদের কাছেও বিদায় নিতে গেলেন। তখন মেজরাণী কানড়া বল্লেন --- মামাশ্বশুর কৌশল করে আপনাকে ঢেকুর যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। আপনার না যাওয়াই ভাল। কানড়ার কথায় একটু হেসে লাউসেন বললেন

' স্বতন্তরা নাহি আমি হইয়াছি চাকর। নোন খাইয়্যা না মানিলে অনেক অধর্ম্ম।
রাজ আজ্ঞা যোগাইতে চাহি নিরন্তর।। রণে যাইতে ডর কি ক্ষেত্রীয় বটে কর্ম্ম।।' (৩৬৪)

(খ) রাজার প্রতি কালুডোমের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা বোধ ঃ আমরা যাদের নীচজাতি বলি সেই নীচজাতিদের একজন কালুবীর। জাতিতে ডোম। চাটাই, ছাতা, কুলো, চালুনি, ধুচুনি, চাঙ্গারি, ঝুড়ি বুনে আর শূকোর চরিয়ে দিনান্তে একবার খাবার জোটে।

' নিজ বিত্তি নিবেদি চাটাই বুনি ছাতি। শূকর চরায়্যা ফিরি জাত্যে ব্যবহার।
কুলা, চালা, চালুনি চাঙ্গারি ঝুড়ি পাতি।। বিত্তি বেচ্যা দিনান্তে ভোজন একবার।। (১৫০)

৩৮০, ৩৮৮, ১২৫২, ১২৬২, ১৩০০, ১৩০৪, কানড়া বিবাহ পালার চরণ সংখ্যা।

মোর নাম কালু ডোম নিবাস এ গ্রাম।
রাজার চাকর লেখা দপ্তরেতে নাম।।' (১৫২)

একদিন লাউসেন কালুবীরের তীর নিক্ষেপের অসাধারণ দক্ষতা দেখে, তার দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে কালুবীরকে সপরিবারে ময়না যেতে প্রস্তাব দিয়ে বললেন ---

'ঘর দ্বার তুল্যা দিব পাবে নানা ধন। জাতি প্রাণ সকল সঁপিব হাথে হাথে।
মোর সাথে চল দিব বসন ভূষণ।। নাম যশ হবে দশ জনার সাক্ষাতে।।' (১৬৪)

লাউসেনের এইসব কথা শুনে কালুবীর বলল --- আমাদের ডোমপাড়ায় তের ঘর ডোম আছে আমি সকলের সঙ্গে কথা বলি। কালুবীর ডোমপাড়ায় গিয়ে সকলকে লাউসেনের প্রস্তাব জানালো, সকলে তো মহাখুশি, ডোমেরা কালুকে বললো ---

' দেশে হৈল অকাল উদর নাঞি ভরে। লাউসেন বাজার চাকর হলে ভাই।
চাটা বিকা কড়িতে কতেক ধার ধরে।। থাকিব পরম সুখে এড়াব বালাই।।' (২০৬)

কালুবীর তখন জোড়হাতে লাউসেনকে বল্লো --- আমরা তের ঘর ডোম সকলেই আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আছি, কিন্তু একটা কথা --- রাজা গৌড়েশ্বরের বিনা অনুমতিতে যেতে পারব না।

'জোড় হাথ হয়্যা কিছু কালুবীর কয়।
নিবেদন করি অবধানে শুন রায়। সাত পিড়ি চাকর রাজার নোন খাই।
বিনা আজ্ঞা রাজার যাইতে না জুয়ায়।। নৃপস্থানে বিহিত বিদায় হৈয়া যাই।।' (২২০)

এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে --- কালুরা মাঠে ঘাটে শূকর চরিয়ে ঝুড়ি চাটা বুনে কোন রকমে একবেলা খেয়ে, ছেড়া কাপড় পরে দিন কাটাচ্ছে, এমন সময় আর এক রাজা তাদের ইনাম দেবার, ভাল ঘরবাড়ি তৈরী করে দেবার, ভাল ভাল বসন ভূষণ দেবার, সর্ব্বোপরি সমস্ত রাজ্যের দেখভালের দায়িত্ব অর্পণ করে কালুকে বিশেষ মর্য্যাদা দেবার কথা বললেও - কালুবা রাজার অনুমতি ছাড়া অন্যত্র যাবে না। কালুডোমের এই যে মনোভাব কবি দেখিয়েছেন, সেটা হচ্ছে রাজার প্রতি আনুগত্য, আর সাত পুরুষ ধরে ' রাজার নোন খাওয়ার' জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ। এই কর্তব্য বোধটা এখন সব সময় দেখা যায় না।

এরপর লাউসেন রাজা গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে যখন কালুবীরদের চেয়ে নিলেন তখন রাজা বললেন ---

'মহাবীর কালু জয়সিংহের তনয়। 'সর্বকাল এঁহার প্রত্যয় স্থল মোর।
বীরপনা এহার বিখ্যাত দেশময়।।'২৪৪ নীচ জাতি অথচ ডাকাত নহে চোর।।
উপরোধে তোমাকে দিলাম এ সকল।
পালন করিবে ভাল দিবে অন্ন জল।।' ২৫০

লাউসেন রাজার কাছ থেকে কালুবীরদের চেয়ে নিয়ে ময়নায় গিয়ে তাদের ভাল কাপড় জামা দিলেন, ঘরবাড়ি করে দিলেন, প্রত্যেককে পঞ্চাশ করে মোহর দিলেন , আর কালুবীরের হাতে ময়নার দায়িত্ব সঁপে দিলেন।

' ঘর দ্বার তুলে দিল বিচিত্র মন্দির। (লাউসেন) বলিল সবার বরাবর।
দেশের বাড়িল নাম কালু মহাবীর।। হাতে হাতে সঁপে দিল ময়না নগর।।' (৪৩৪)

গ) লাউসেনের প্রতি কালুবীরের কর্ত্তব্যবোধ ঃ এখানেও কালুবীর তার নতুন পালনকর্তা

লাউসেনকে সবসময় সবার আগে জীবন দিয়ে রক্ষা করে গেছেন। তার প্রমাণ আমরা পাই যখন দেখি মহামদের চাতুরিতে রাজা গৌড়েশ্বর লাউসেনকে বিভিন্ন যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। কামরূপ কামাখ্যায় যুদ্ধে লাউসেন দেখলেন —

'সাতগড় কাঙুর আকাশে যায়্যা লাগে। 'গিরি গুহা গভীর পর্বত কত ঠাঞি।
নানা বর্ণ পাথর কাঙুরা তার আগে।।'৪ চারিদিকে গহন যাহার অন্ত নাঞি।।' (৮)

লাউসেন অলঙ্ঘ্য এই কাঙুর গড় দেখে ভাবছেন— কি করে এই গড় জয় করব —

'হেনকালে বীরকালু বলেন বচন। আজ্ঞা হৈলে আমাকে কাঙুর যাই একা।
অবধানে গোসাঞি শুনহ নিবেদন।। কর্পূর ধলের সঙ্গে কর‍্যা আসি দেখা।।' (১৪)

এই বলে —

'শুভক্ষণে কাঙুরে বিদায় হৈল বীর। 'সাহসে করিয়া ভর বীর যান একা।
একেলা সামাল্য গড়ে নির্ভর শরীর।।'৪২ সাত গড় পারায়্যা শহরে দিল দেখা।।' (৪৬)

শহরে প্রবেশ করে কালুবীর মহাসিদ্ধ পীঠস্থানে কামাখ্যাদেবীর পূজা দেন।

'দন্ডাইয়া দেবীর দ্বারে কালুসিংহ ধল। জোড় হাথে বন্দিলেন চরণ যুগল।।'(৮৪)

দেবী কামাখ্যার পূজা দিয়ে কালুবীর যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং যুদ্ধে কর্পূরধলকে পরাজিত করে লাউসেনের কাছে নিয়ে যান।

'বান্ধিল কর্পূরধলে যেমন শূকর।।
কান্ধে কর‍্যা লয়্যা যান সেনের সাক্ষাৎ। রণ জিন্যা বীর কালু ভাবে জগন্নাথ।।' (৭১০)

আর একটা ঘটনা — বাঁশডিহা থেকে লাউসেন শিমূল্যাগড়ে ফিরে এসে দেখেন শিমূল্যা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে রাজা গৌড়েশ্বরের হাতি, ঘোড়া ও সৈন্যদের মৃতদেহ পড়ে আছে। লাউসেন তার মেসো গৌড়েশ্বর ও মামা মহামদকে না দেখতে পেয়ে ভাবলেন তারাও এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তাঁদের শোকে আকুল হয়ে বললেন যে এই কাজ করেছে তার রক্তে - মেসো আর মামার তর্পণ করবো।

' মনে করে এ কাজ কর‍্যাছে যেই জন। তার রক্তে দুজনার করিব তর্পন।।' (১১৪৬)

লাউসেনের এই কথা শুনে —

'কালুবীর বলে কিছু জুড়্যা দুই কর। কোন কার্য্যে আপনি করিবে আগুসার।
মন দিয়া শুন রায় বচন আমার।। আমি আগে যাব তুমি থাক দন্ডচার।।'(১১৫২)

এই কথা বলে কালুবীর গড়ের ভেতর চলে গেল।

এই ঘটনাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে - কালুবীর সবসময় লাউসেনকে রক্ষা করার জন্য সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ইছাই এর বিরুদ্ধে ঢেকুর যুদ্ধের সময়ও একই দৃশ্য দেখা যায়। মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর যখন লাউসেনকে ঢেকুর যুদ্ধে যাবার জন্য লিখেছেন তখন —

'কালুকে কহেন রাজা কি করি উপায়। গড় বড় বিষম অজয় পক্ষাবল।
ঢেকুর মহিম যাত্যে লিখেছেন রায়।। বিপক্ষে দেখিলে হয় সাত তাল জল।।
শ্যামারূপা ইছায়ে সাপক্ষ সর্বকাল।
যার রণে আপনি হারিলা মহীপাল।।' (২২০)

১৫০,১৫২, ১৬৪, ২০৬, ২২০, ২৪৪, ২৪৮, ২৫০, ৪৩৪ ' কাঙুর মহিম যাত্রা' পালার চরণ সংখ্যা।

ঢেকুর যুদ্ধে যেতে লাউসেনের একটু ভয় হচ্ছে বুঝতে পেরে কালু বললো —

'এত শুনি বলে কালু তোমার কৃপায়।	'ইন্দ্র আস্যা পক্ষাবল যদি হন তার।
হানা দিতে পারি রাজা কণক লংকায়।।'২২৬	ইছাএ কাটিব মাথা কি বলিবে আর।। ২৩২

বিলম্ব না কর রণে সাজ্যা চল রায়।' ২৩৩

এরপর কালুবীর লাউসেনের সঙ্গে ঢেকুর যুদ্ধে গিয়ে ইছাই এর প্রধান অনুচর লোহাটা **বজ্জরকে** অজয়ের জলে নাকানি চুবানি খাইয়ে তাকে হত্যা করে।

'**নাকানি চু**বানি খায় লোহাটা বজ্জর।	ধাত্তাধাই কালুবীর ধরে তাড়াইয়া।
পাড়ের উপরে উঠে ধনুকের নর।।	টাঙ্গি দিয়া তার মুন্ড নিলেক কাটিয়া।।

লোহাটার মুন্ড দিল সেনের সাক্ষাতে।
কালুবীরে কোল দিল ময়নার নাথে।।' (৭৭০)

লোহাটা বজ্জর নিহত হবার পর লাউসেন ইছাই এর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন, কিন্তু কালুবীর তাঁকে আগে যেতে দেবে না সে নিজে প্রথমে যাবে। —

'সমর করিতে যান রঞ্জার কুমার।	'ধন মদে মত্যা যদি আজ্ঞা করে রদ।
নিবেদয়ে কালুবীর পায়ে ধর্‍্যা তার।।	মাথ্যা কাট্যা লুট্যা লব যে থাকে সম্পদ।।
আপনি সমরে যাবে নাঞি লেই মন।	নফর থাকিতে কেন তুমি যাবে রায়।
কি জানি গোয়ালা বেটা বলে কি বচন।।	কাঙুরে করিনু জয় তোমার কৃপায়।।' ১২৪
তুমি থাক মহারাজা আগে আমি যাই।	'এত বলি বীর কালু করিল গমন।
ভাব কাজ্য বুঝ্যা আসি কি বলে ইছাই।।'	ইছা এর সম্মুখে দিলেক দরশন।।'(১৯৮)

এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কালুবীর বিপদের মুখে তার পালক লাউসেনকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

(ঘ) রাজার প্রতি লখ্যা ডুমনীর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা বোধ ঃ আমরা এর আগে দেখলাম দেশের রাজা বা পালন কর্তার প্রতি কালুবীরের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জীবনপণ চেষ্টা, কিন্তু একজন ডুমনী মহিলার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা বোধ কত গভীর যা এক সময় কালুবীরকেও ম্লান করে দেয় তা দেখিয়েছেন কবি কালুবীরের স্ত্রী লখ্যা ডুমনীর মধ্যে।

পশ্চিমে উদয়ের জন্য লাউসেনকে হাকন্ড পাঠিয়ে মহাপাত্র কৌশলে ময়না আক্রমণ করেছে। ইন্দা মেটে আগে ভাগে গিয়ে মন্ত্রপুত সিন্দ কাটি দিয়ে ময়নার সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে শুধু লাখ্যা ডুমনী ছাড়া। সিন্দ কাটির প্রভাবে আর দেবীপূজার সময় মদ্যপানের ফলে কালুবীরের শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তাই মহাপাত্রর ময়না আক্রমণ করায় কালুবীর খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে কি ভাবে ময়নাকে রক্ষা করা যায়। তখন তার স্ত্রী লাখ্যা বললো কোন চিন্তা নাই, ---

'এত চিন্তা এহাতে ঠেক্যাছে কি প্রমাদে।	'সবিশেষ তোমাকে কি কব আর কথা।
যম ইন্দ্র বরুণ না আটে মোর বাদে।।' ১১৪৪	গৌড়ের পাতর আল্যে নিব তার মাথা।।'(১২৪৮)

৮,১৪,৪৬,৮৪,৭১০,'কলিঙ্গার বিবাহ পালা'র, ১১৪৬, ১১৫২ 'কানড়ার বিবাহ পালা'র চরণ সংখ্যা।

রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্য

এই পরিস্থিতিতে কালিন্দী থেকে জল আনতে গেলে দূর থেকে লখ্যাকে দেখে মহামদ তার কাছে ছুটে এসে যখন বললো --- লাউসেন হাকন্ডে মারা গেছেন, তাই কালুকে ময়নার অধিকার দিতে চাই, তোমরা সুখে এখানে রাজত্ব কর। লখ্যা রাজত্বের লোভকে অবহেলা করে পাত্রকে বললো ---

'জাতি ধন জীবন সঁপিয়া মোর হাথে। বলিতে এমন বাক্য বুকে নাহি ডর।
গেছেন হাকন্ড পুরী ময়নার নাথে।। আপন ভালই চাও চল্যা যাও ঘর।।'
তোর পারা অধর্মী সংসারে কে বা আছে। 'এত শুনি পাতর হইল পাছু আন।
সেনের মাতুল এ কারণ প্রাণ বাঁচে।। গড়ে প্রবেশিল লখ্যা হয়্যা সাবধান।।' (১২৯২)

তারপর নিজের ঘরে গিয়ে লখ্যা রণসাজে সজ্জিত হতে লাগল ---

'কষাকষি করিয়া কোমরে বান্ধে পেটি। রঙ্গন ফুলের মালা গলে নম্রমান।
সমরে সন্ধানী বড় সোনা ডোমের বেটি।। হাথে খড়্গ ফলক হাকুনি হান হান।।
যতনে রচিত রাঙ্গা রেশমি অম্বর। ঢাল বুকে উলট্যা পালট্যা লাফ ছয়।
বান্ধিল তাহার বেড়ে বত্তিশ আতর।।' শূন্যেতে ফলক লখ্যা দিল বিশাশয়।।
'তরকস বান্ধ্যা নিল পিঠের উপর। পিঠে ঢাল হাতে বাস পায়ে লাগে তালি।
খোচলা সিতিথা রাশি নানাবর্ণ শর।।' সাজিল দৈত্যের রণে যেন ভদ্রকালী।।
' কিঙ্কিনী কোমরে বাজে চরণে নূপুর। শুভক্ষণে যাত্রা কর্যা দেখেন মঙ্গল।
বাসে ভরা দিল দেখ্যা কাঁপিল অসুর।। ভনে নরসিংহ বসু ধর্ম পক্ষাবল।।' (১৩২২)
১৩১৪

রণরঙ্গিনী ভদ্রকালীরূপী লখ্যা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে হুঙ্কার ছেড়ে পাত্রকে সম্মুখে আসতে বললেন -- 'ডুমনী কহেন ডাকা কোথা পাত্রবর। আগ হয়্যা আয় বেটা করিতে সমর।।'(১৩২৬)

লখ্যার কথা শুনে পাত্র তো রেগে আগুন, তার নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে ---

'লখ্যাকে বেড়িল ভূপতির লোকজনা। যেন ভবানীকে বেড়ে শম্ভু নিশম্ভুর সেনা।।'(১৩৩২)

কিন্তু সমরে সন্ধানী সোনা ডোমের বেটি নির্ভয় শরীরে - 'লাফ দিয়া পড়ে গিয়া নৃপতির দলে।'

'আথলি পাথলি চোট একাকার কাটে। 'লখ্যার দেখিয়া রণ দেবতাকে ধন্দ।
মার মার শবদে গগনতল ফাটে।। পবন পালায়্যা যান যমের আনন্দ।।' (১৩৮৬)
তাড়্যা হানে ডুমনী সমরে গজ শুন্ড। 'হানে কাটে ডুমনী সঘন মালসাট।
জটে ধরা ফেলে কাটে মাহুতের মুন্ড।।' তিন লক্ষ সেনা ভূপতির গেল কাট।।'(১৩৯৮)
১৩৫২

'পালায় পবন বেগে ভূপতির দল।
ওড়ে পার হয়্যা নদী কালিন্দীর জল।।' (১৪০৪)
'রণ জিন্যা লখ্যার আনন্দ বড় মনে।
একভাবে ভাবেন ঠাকুর নিরঞ্জনে।।'(১৪২০)

কাব্যের এইসব অংশ থেকে আমরা দেখতে পাই লখ্যার মতো একজন নিম্নবর্ণের মহিলার কত গভীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ। ময়নার নাথ তার স্বামী কালুবীরকে ময়না রাজ্যের

২২০, ২২৬, ২৩২, ২৩৩, ৭৭০ ' মায়ামুন্ড' পালার চরণ সংখ্যা।

দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে হাকন্ডে ধর্মরাজের পূজা করতে গেছেন, এই সুযোগে গৌড়েশ্বরের অজ্ঞাতে কুচক্রী পাতর ময়না আক্রমণ করেছে। এদিকে কালুবীরের শারীরিক অবস্থা খারাপ থাকায় এই মুহূর্তে যুদ্ধে যেতে অক্ষম, কিন্তু যুদ্ধকালে একদন্ড সময় নষ্ট করা যায় না। শত্রুপক্ষ এই দূর্বলতার সুযোগ নেয়। তাই লখ্যা সেই সুযোগ না দিয়ে মহাপাতরের প্রলোভনকে পায়ে ঠেলে ফেলে নিজেই চামুন্ডা মূর্ত্তিধারণ করে পাত্রের তিন লক্ষ সেনাকে নিহত করে যুদ্ধজয় করল।

কবি একজন নিম্ন বর্ণের মহিলার অসীম সাহস দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বোধের দৃষ্টান্ত দিয়ে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, যাতে আমাদেরও এই বোধ জাগ্রত হয়। লখ্যার দায়িত্ব ও আনুগত্যের পরিচয় এখানেই শেষ নয়, তার এই পরিচয় কালুবীরকেও একসময় ছাড়িয়ে গেছে। পাত্রের সঙ্গে প্রথমবার যুদ্ধে জয়লাভ করে লখ্যা সেই সংবাদ কালুবীরকে দেবার পর কালুবীর যেমন আনন্দিত হল, আবার শঙ্কিত হল এই ভেবে যে পাত্র একবার পরাজিত হয়েছে, কিন্তু সে আবার আক্রমণ করবে। তাই মনে মনে বললো — দেশ ছেড়ে চলে যাবো, যুদ্ধ বিগ্র আর ভাল লাগছে না। তাই লাখ্যাকে ও বললো — চল, আমরা পালিয়ে যাই সিঙ্গাবেতার জঙ্গলে, কুলো, ঝুড়ি, পাখা বেচে খাব, আর পরের অধীনে থাকব না। কালুর এই কথা শুনে লখ্যা রেগে আগুন। কালুকে খুবই তিরস্কার করতে লাগল —

‘এতশুনি ডুমনি জ্বলিয়া গেল মর্মে। ‘জাত্যের স্বভাব ধর্ম ভুলা নাঞি যায়।
মনে করে ডোম পারা মজিল অধর্মে।।’ এমন সময়ে ডোম পলাইয়া যায়।।
‘সেকালে পরিল টেনা ইবে খাসা জোড়া। জাতি প্রাণ সকল সপিয়া হাথে হাথ।
শূকর চরাত্যে মাঠে ইবে চড়ে ঘোড়া।।’ হাকন্ডতে গিয়াছেন ময়নার নাথ।।
নীচ জাতি না বুঝেন ধর্মাধর্ম পথ।
বুঝিলাম এ সকল সুখের পারাবৎ।। (১৪৮৮)

আমরা কাব্যের এই সব অংশ থেকে দেখতে পাচ্ছি জাতি ধর্ম স্বভাবের কথা তুলে লখ্যা কালুকে তিরস্কার করে তার দায়িত্ব কর্ত্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত করেছে। আর এইটাই আদর্শ স্ত্রীর কাজ। আর সত্য সত্যই নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে লখ্যার হাতে ধরে কালু বললো — আমি নিশ্চয় যুদ্ধে যাব, ‘কাল প্রাতে একেলা করিব রণ জয়।’ লখ্যা শুধু কালুকে অনুপ্রাণিত করেই ক্ষান্ত হয়েছিল তা নয়। যুদ্ধ করতে যাবার জন্য ছেলের কাছে গিয়ে —

‘ডুমনী বলেন শুন কুলের কমল। ময়না বেড়্যাছে আস্যা ভূপতির দল।’ ১৫৪৬
‘একেলা যাইয়া আমি করি মহারণ।’ ‘তিনলক্ষ সেনা তার করেছি বিনাশ।’
‘বিদ্ধ দশা একেলা কতেক দিব হানা। সাবধানে গিয়া তুমি পড়ে দেহখানা।’ ১৫৫৬

এদিকে ইন্দা মেটের সিদ্ধ কাটির প্রভাবে সবার শরীর ঘুমে অবসন্ন, নিস্তেজ, তাই মায়ের কথা শুনে শাকা বললো — মা আজ আমি যুদ্ধে যেতে পারব না, বসতে উঠতে পারছি না, মাথা খসে পড়ছে। ছেলের এই কথা শুনে লখ্যা রেগে সাততাল —

‘এত শুনি হল লখ্যা অগ্নি সাততাল। সুপুত্র হইলে করে কুলের উজ্জ্বল।
বলে মা গুমুখা বেটা তুই জানি সর্বকাল।। কুপুত্রের দোষ বর ডুবায় সকল।।

১১৮, ১২৪, ১২৮ ‘ঢেকুরের রণ-ইছাই বধ পালা’র, ১১৪৪, ১২৪৮, ১২৯২, ১৩১৪, ১৩৫২, ১৩৮৬ ‘পশ্চিম উদয় পালা’র চরণ সংখ্যা।

রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্য
হইয়া সিংহের বেটা শ্রীকাল হইলি।
নাম যশ সকল বাপের ডুবাইলি।।' (১৫৬৬)

মায়ের তিরস্কারে শাকা যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। —

মা এর বচন শেল বুকে গেল বাজ্যা। উঠিয়া ডোমের বেটা রণে যায় সাজ্যা।।'(১৫৬৮)

লখ্যার এইসমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে ন্যায় ধর্ম দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ কত গভীর। স্বামীর শারীরিক অক্ষমতায় সে নিজে যুদ্ধে গেছে, পরে স্বামীকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য - অনুপ্রাণিত করেছে, তারপর ছেলেকেও যুদ্ধে পাঠিয়েছে। সাধারণত মা ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাতে চায় না। যেমন লাউসেনকে যুদ্ধে পাঠাতে রঞ্জাবতীর খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু লখ্যা তিরস্কার করে ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে। আর সে এই কাজ করেছে লাউসেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধে, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বোধে। সে নিজেই কালুকে বলেছে - 'সেকালে পরিল টেনা এবে খাসা জোড়া। শূকর চরাত্যে মাঠে ইবে চড়ে ঘোড়া।' অতীত জীবনের দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে বর্তমান জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তুলনা করে লখ্যা বলতে চেয়েছে যার জন্য এত সুখ এতসম্পদ, তিনি যখন জাতি প্রাণ সম্পদ সব সঁপে দিয়ে দূর দেশে গেছেন, আমাদের তা জীবন দিয়ে রক্ষা করা উচিত। লখ্যা এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছে। একজন নিম্নজাতির মহিলার মধ্যে এই গভীর মূল্যবোধের পরিচয় দিয়ে কবি সমাজে সকলের মধ্যে এই জাতীয় মূল্যবোধ গড়ে তোলার কথাই যেন বলতে চেয়েছেন।

১৮। স্বামীকে সৎপথে সত্যপথে পরিচালনায় স্ত্রীর ভূমিকা ঃ

স্বামীকে ন্যায়ের পথে সত্যের পথে ধর্মের পথে অবিচল থাকার জন্য ঐ পথ থেকে একদিনও সরে না আসার জন্য হরিহর বাইতির স্ত্রীর কি গভীর ব্যাকুলতা তা দেখা যায় যখন পাত্রের প্রলোভনে হরিহর মিথ্যা সাক্ষী দিতে সম্মত হয়েছে।

হরিহর বাইতি পেশায় ছিল ঢাকি, খুবই সৎ এবং ধর্মভীরু, তাই লাউসেন হাকন্ডে ধর্ম পূজা করতে যাবার সময় ঢাকি হিসাবে হরিহরকেই নিয়ে গিয়েছিলেন পূজার সময় ঢাক বাজাবার জন্য।

'অক্ষয় তৃতীয়া শুক্লা মঙ্গল বাসর। হরিহর বাইতি ঢাকেতে দিয়া কাঠি।
ধর্মকে পূজেন সেন হাকন্ড ভিতর।। সাঙ্গসুর নাচেন করিয়া পরিপাটি।।' (২০২)

লাউসেন যখন পশ্চিমে উদয় বর পেলেন এবং ধর্মের কৃপায় পশ্চিমে দিবাকরের উদয় হল তখনও হরিহর আনন্দে নাচতে নাচতে ঢাক বাজাতে লাগল —

'ঘোর অন্ধকার রাতি দ্বিতীয় প্রহর। 'সপ্তদ্বীপ আলো হৈল এ সপ্ত সাগর।
সহস্র কিরণেতে উদয় দিবাকর।।'৩৩৭৬ হাথ তুল্যা নাচেন লাউসেন নৃপবর।।'(৩৩৮০)

'হরিহর বাইতি ঢাকেতে দিল কাঠি।
সাঙ্গসুর পন্ডিত নাচেন পরিপাটি।।' ৩৩৮৬

পশ্চিমে উদয় দেখে লাউসেন ভাবলেন — মামা একথা বিশ্বাস করবেন না, তাই একজন উপযুক্ত সাক্ষী চাই, আর তিনি এও ভাবলেন সৎ এবং ধার্মিক হরিহরই উপযুক্ত সাক্ষী, সেই জন্য তিনি হরিহরের হাতে তিল তুলসি দিয়ে পশ্চিমে উদয়ের সাক্ষী রাখলেন। —

১৩২২, ১৩২৬, ১৩৩২, ১৩৯৮, ১৪০৪, ১৪২০, ১৪৮৮, ১৫৬৬, ১৫৬৮ 'পশ্চিম উদয় পালার চরণ সংখ্যা।

'সেন সাক্ষী করেন বাইতি হরিহরে। দিল তিল তুলসি তাহার ডানি করে।।' ৩৪৩০

'ধর্মের সাক্ষাতে সাক্ষী হল্যা হরিহর।' আপনার স্থানেতে গেলেন দিবাকর।।' ৩৪৩৪

এরপর গৌড়ের রাজ্যসভায় এসে লাউসেন যখন পশ্চিমে উদয়ের কথা জানালেন। তখন মাতুল মহামদ বললো — ভাগ্নার সবই মিছে কথা, 'কখন শুনেছ রবি রাত্রে দেয় দেখা।'
মাতুলের কথা শুনে লাউসেন বললেন —
' একারণে সাক্ষী আমি কর‍্যাছি সেখানে। বিশেষ সকল কথা হরিহর জানে।।' (২৪২)

এই কথায় গৌড়েশ্বর জানালেন — তাহলে হরিহর আমার কাছে এসে সাক্ষী দিয়ে যাক। হরিহর সাক্ষী দেবে শুনে পাত্রের খুব আনন্দ হলো। ভাবলো টাকা দিয়ে হরিহরকে মিথ্যা সাক্ষী দেয়াবো এবং সেই মত পাত্র রাজার সিন্দুক থেকে এক সহস্র মোহর চুরি করে হরিহরের বাড়ি গিয়ে তার হাতে ঐ মুদ্রা দিয়ে বললো — হরিহর এই একসহস্র মোহর তুমি রাখ। আর ময়না রাজ্য তুমি ইনাম পাবে। তার বদলে তুমি রাজসভায় গিয়ে বলবে সেন পশ্চিমে উদয় দিতে পারে নাই। যে হরিহর অত্যন্ত সৎ, ধার্মিক এবং প্রত্যহ ধর্মের পূজা করে, সেই হরিহরের অর্থের লোভে মন গলে গেল। মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি হল।

'ধনলোভে বাইতির ভুল্যা গেল মন। সবা হৈতে সংসারে দুর্লভ বড় ধন।।
বাইতি বলেন শুন গৌড়ের পাতর। মিথ্যা সাক্ষী দিব আমি রাজার গোচর।।'(২৭৬)

মহাপাত্র যখন হরিহরের বাড়িতে এসে তাকে টাকা পয়সা দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি করাচ্ছে সেই সময় বাইতিনী (হরিহরের স্ত্রী) রায়দীঘির ঘাটে জল আনতে গিয়ে দেখল বাইতির পূর্বপুরুষরা দাঁতে কুট দিয়ে সজল নয়নে ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বপুরুষের এই অবস্থা দেখে বাইতিনীও কেঁদে ফেলে পূর্বপুরুষদের এই দশা কি করে হল জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা বললেন —

'মিথ্যা সাক্ষী দিবেন তোমার প্রাণনাথ। নরকস্থ হব মোরা দেখহ সাক্ষৎ (৩০০)
সুবংশ বলিয়া জ্ঞান ছিল হরিহরে। ধুতি খায়্যা মিছা সাক্ষী দিব মনে করে।।' ৩০২

হরিহরের স্বর্গগত পূর্বপুরুষদের করুণ অবস্থা এবং তাঁদের কথা শুনে হরিহরের স্ত্রী ঘাটে কলসী ফেলে বাড়ির দিকে ছুটে এসে দেখে স্বামী স্বর্ণমুদ্রা গুণছেন। কোথায় এত স্বর্ণমুদ্রা পেল জিজ্ঞাসা করাতে হরিহর বলে --- মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্য পাত্র এই মোহর দিয়েছে। স্বামীর পাপ কাজে মন গেছে বুঝে বাইতিনী কপালে আঘাত করতে লাগলেন ---

'বাইতিনী শুনি মা(রে) কপালে আঘাত। আজি কেন পাপে মন দিলে প্রাণনাথ।।
প্রায়শ্চিত্তে শুন্যাছি পাপেতে ধন যায়। পূর্বধন বিনষ্যতি পাপেতে করায়।।
কি লাগিয়া ওহে নাথ পাপে দিলে মন। পিতৃলোক করে দেখ নরকে গ(মন)।।
দুই পায়ে ধরিয়ে এ ধনে কাজ নাঞি। সেই ধনে পুরুষরা স্বর্গে না পান ঠাঞি।।
লাউসেন দিয়াছেন পশ্চিমে উদয়। মিছা কথা কি কর‍্যা কহিবে তাহা নয়।।
মোর কথা হেয় জ্ঞান না কর‍্যা বল্যা খায়্যা। শতেক পুরুষ দেখ আছে দন্ডাইয়া।।' (৩২৪)

২০২, ৩৩৮০, ৩৩৮৬, ৩৪৩০, ৩৪৩৪ 'পশ্চিমে উদয়' পালার চরণ সংখ্যা।

স্বামীকে সৎপথে পরিচালনায় স্ত্রীর ভূমিকা

কবি এখানেও দেখাতে চেয়েছেন একজন বাইতি ঘরের মহিলা তার স্বামীকে পাপ কাজ থেকে (মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া) বিরত করে স্বামীরই পূর্বপুরুষদের যাতে নরকে যেতে না হয় তারজন্য কত কাকুতি মিনতি করেছে, আর এর মধ্য থেকেই ফুটে উঠেছে তার চরিত্রের ন্যায় নীতি আদর্শবোধ।

সেকালের একজন ডুমনী বা একজন বাইতির মধ্যে যে ন্যায় নীতি ও আদর্শবোধ দেখা যায় একালে এই আদর্শবোধ মূল্যবোধ খুব কম দেখা যায়। আজকের দিনের উৎকোচ গ্রহণের প্রবনতা যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতি কারক। সমাজকে এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে কোন আইন নয়, শুধুমাত্র স্ত্রীরা, নারীরা। তাঁরা যদি লখ্যা ডুমনী বা হরিহর বাইতিনীর মত স্বামীকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য এগিয়ে আসেন, তাঁরা যদি স্বামীর বেআইনী আয়ের অন্ন না খান, ফ্রিজ, টিভি, ডিভান ব্যবহার না করেন তাহলেই দেখা যাবে উৎকোচ গ্রহণ অনেক কমে আসছে।

১৯। সরকারী প্রাপ্য আদায়ে আমলাতান্ত্রিক পক্ষপাতিত্ব ঃ

আমরা পূর্বের অংশে রাজার বা সরকারের নির্দেশ পালন না করে মন্ত্রী আমলারা নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য প্রজাদের কাছ থেকে বেশি করে খাজনা বা রাজস্ব আদায়ের ঘটনা যেমন দেখেছি, তেমনি কাব্যের অনান্য কিছু অংশে দেখতে পাই মন্ত্রী আমলাদের পক্ষপাতিত্ব। দেখা গেছে সামান্য কিছু দিনের খাজনা বাকির জন্য রাজার অজ্ঞাতে মন্ত্রী গরীব মধ্যবিত্ত প্রজাদের ধরে এনে বন্দী করে রেখেছে। অথচ প্রভাবশালী কোন কোন সামন্ত রাজাদের কারো ছ'সাল, কারো দশ সাল, কারো বিশ সালের খাজনা বা রাজস্ব বাকি থাকলেও মন্ত্রী তাদের কথা রাজার গোচরেই আনেন নাই। রাজা যখন নিজে জানতে চেয়েছেন কার কত বাকি তখন মুহুরি রাজাকে বাকির হিসাব দিয়েছে তখন রাজা জানতে পেরে মন্ত্রীকে তিরস্কার করেছেন। 'আদ্য ঢেকুর' পালায় দেখা যায় বন্দী শালে 'অন্নহীন', 'মলিন বসন', বেড়িপায়' বন্দীদের দেখে রাজা হায় হায় করে উঠেছেন, তাঁদের কাছ থেকে সব সংবাদ শুনে বেড়ী কেটে মুক্ত করে দিয়েছেন। সোম ঘোষ নামে এক বন্দীর কাছেই জানতে পারেন, --- মন্ত্রী তাদের খাজনা বৃদ্ধি করেছে। পূর্বে যেখানে রাজস্ব ছিল ষোল পণ বা এক কাহন, এখন সেখানে হয়েছে পনের কাহন, আগে যেখানে ছিল বিঘাপিছু এক আনা খাজনা এখন সেখানে হয়েছে সিকি বা চার আনা। হাজা শুখার জন্য কোন ছাড় নাই। এক দন্ড বিলম্বে কোমরে দড়ি পরে। সোম ঘোষের কথায় জানা যায় —

'হাজা শুখা বাদ নাই কমি এক কড়া।	কানা পড়ে একারণ বন্দী আছি রায়।
একদন্ড বিলম্বে কোমরে দেয় দড়া।।	দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হল প্রায়।। (৬০)
ষোল বৎসরের কর দিয়াছি বেবাক।	অন্নাভাবে মোল ভাই ভাইদের পো।
দু কাহন কানার কারণ এ বিপাক।। (৫৮)	বৃদ্ধ পিতা মরিল বেটার মায়া মো।।'(৬২)

আমরা কাব্যের এই অংশ থেকে দেখতে পাচ্ছি মাত্র দু কাহন খাজনা বাকির জন্য একজন সাধারণ গরীব চাষিকে বার বৎসর বন্দী করে রেখেছে, আর তারই ফলে অন্নাভাবে বন্দীর ভাই ভাইপো মারা গেছে। আবার ছেলের শোকে বৃদ্ধ বাবাও মারা গেছে। এই অত্যাচারের

২৪২, ২৭৬, ৩০০, ৩০২, ৩২৪ 'স্বর্গারোহন' পালার চরণ সংখ্যা।

কাহিনী শুনে রাজা নিজেই বিচলিত হয়ে পাত্রকে (মন্ত্রীকে) তিরস্কার করেছেন, — রাজা তার শ্যালক তথা মন্ত্রীকে বলতে বাধ্য হয়েছেন —

'তোমা হৈতে হৈল পাত্র গৌড়ে অবিচার।
বুঝি জরাসন্ধের এ হৈল কারাগার।।' (৭২)

তারপরেই রাজা যখন জানতে চাইলেন সামন্ত রাজাদের কার কি বাকি আছে, তখন মহুরি জানিয়েছেন ত্রিষষ্ঠগড়ে (ঢেকুর গড়) বছরে জমাবন্দী তিন লাখ, ছ'সাল কর দেই নাই,

'তলপ আঠারো লক্ষ ছয় সনে চাই। তের লাখ পিছিলা হালের আট মাস।
পাঁচ লাখ উসুল কাগজে লেখা পাই।। একুনে পণের লক্ষ বাকি তার পাশ।।'(৯০)

আর একটি ঘটনায় দেখা গেল কাঙুরের বিশলাখ কর বাকি। সেই দেখে রাজা রেগে আগুন হয়ে পাত্রকে (মন্ত্রীকে) বললেন - তুমি টাকা খেয়ে ওদের কর আদায় কর নাই।

'সদরের কায়েত কাগজ দিল হাতে। কোচ কাঙুরের নাহি দেয় রাজকর।
কাঙুরের বাকি বিশ লাখ লিখে তাতে।। (২১০) টাকা খেয়ে তার তুমি হয়েছ নফর।।
বাকি দেখে রাজা হৈল জলন্ত আগুন। আপন কল্যান যদি বাঞ্ছা থাকে মনে।
পাত্রকে বলেন কিছু বাক্য নিদারুন।। দল লয়ে হানা দেগে কাঙুর ভূবনে।।'(২১৬)

আরও কিছুদিন পরের একটা ঘটনা — গৌড়ের রাজার এক বিশেষ দরবারে সকল রাজা এসেছেন, শুধু ঢেকুরের সামন্তরাজ সোম ঘোষ বা তার ছেলে ইছাই ঘোষ ছাড়া। ইছাই নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে। মুহুরীর কাছ থেকে বাজা আরও জানতে পারলেন সোম ঘোষরা প্রায় কুড়ি বছর কর দেয় নাই। সেই শুনে রাজা 'কোপেতে আগুন সাততাল।' এবং পাত্রকে বললেন —

'অদ্যবধি ঢেকুরে গোয়ালা বেটা রায়। তার প্রতিকার না কর‍্যাছ এতদিন।
স্বতন্তর রাজা হৈয়া দেশ লুট্যা খায়।। বুঝি প্রায় টাকা খায়্যা হৈয়াছ অধীন।।' (১০০)

কাব্যের এই সমস্ত অংশ থেকে দেখা গেল সাধারণ গরীব প্রজাদের সামান্য দু -এব কাহন কর বাকির জন্য 'এক দন্ড বিলম্বে কোমরে দেয় দড়া' আর তারজন্য তাদের দীর্ঘদিন বন্দী থাকতে হয়। অপর পক্ষে অনেক প্রভাবশালী রাজা সামন্তদের দীর্ঘদিনের কয়েক লাখ টাকা বাকি থাকলেও রাজার গোচরে আনা হয় না। তাই রাজা যখন জানতে পারেন গরীবদের উপর এই অত্যাচার তখন রাজা তার মন্ত্রীকে বলেছেন- 'তোমা হৈতে হৈল পাত্র গৌড়ে অবিচার। কিম্বা যখন কোন কোন সামন্তরাজ দীর্ঘদিন কর দেয় নাই তখনও রাজা বলতে বাধ্য হয়েছেন ' টাকা খেয়ে তার তুমি হয়েছ নফর'। বা 'বুঝি প্রায় টাকা খায়্যা হৈয়াছ অধীন।' রাজাও বুঝতেন মন্ত্রী আমলারা টাকা খেয়ে বেশ কিছু গোলমাল করে।

কবি তাঁর কাব্যে সেকালের রাজা, প্রজা, সামন্ত, মন্ত্রী-আমলাদের কর রাজস্ব ইত্যাদি আদায়ের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের যে চিত্র তুলে ধরেছেন এ তাঁর কল্পনা প্রসূত কোন বর্ণনা নয়, তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ ঘটনারই প্রতিফলন। কবি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে বীরভূমের রাজনগরের রাজা আসফুল্লাহ খাঁর পক্ষে উকিল হিসাবে আঠারো বৎসর কাজ করেছেন।

সরকারী প্রাপ্য আদায়ে আমলাতান্ত্রিক পক্ষপাতিত্ব

নবাব ও রাজ দরবারে দীর্ঘ আঠারো বৎসর ওকালতি করার সুবাদে কবি নরসিংহ বসু আমলাদের এই চাটুকারি চরিত্র খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর কাব্যে এই জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই যে মন্ত্রী আমলাদের পক্ষপাতিত্ব কবির লেখা তিনশ বছর আগেকার ঘটনাব মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। এই জিনিস আমরা একালেও আকছার দেখতে পাই। আমরা প্রায়ই দেখি আয়কর, বিক্রয় কর, বিদ্যুৎ বিল, পৌর কর, ইত্যাদি সরকারী প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে ছোট ছোট গ্রাহক বা ভোক্তাদের দেয় তারিখ পাঁচ সাত দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই লাইন কাটা, জরিমানা করা, আরও নানা উপায়ে হয়রানি করা হয়। অপরপক্ষে বড় বড় গ্রাহক, ভোক্তা, চিত্রতারকাদের দীর্ঘদিনের দেয় অর্থ বহু ক্ষেত্রে লাখ লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেলেও বিশেষ কিছু করা হয় না। কিন্তু আইন সকলের জন্য একভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

২০। স্বজন পোষণ ঃ স্বজন পোষণে একাল সেকালের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না। আমরা এই কাব্যে দেখতে পাচ্ছি রাজা গৌড়েশ্বর তার শ্যালক মহামদকেই মহামন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং যে কোন কাজে তার যুক্তিকেই সব সময় গ্রহণ করতেন। কাব্যের মহামদ ছিলেন বাশডিঞা গড়ের রাজা বেণুরায়ের পুত্র। বেণুরায় বাশডিঞা ছেড়ে গৌড়ে চলে এলে গৌড়েশ্বর রমতী নগরে তার ঘর বাড়ি তৈরী করে দিলেন, এবং রাজকন্যা ভানুমতিকে বিবাহ করলেন আর শ্যালক মহামদকে মহামন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করলেন।

'দেশ ছাড়ি গৌড়কে গেলেন বেণু রায়। বাড়ি ঘর কৈল রাজা রমতী নগরে।
কহিলা সকল কথা ভূপতির পায়।। ভানুমতি কন্যা বিভা দিল গৌড়েশ্বরে।।
পাত্র হৈল মহামদ রাজার শ্যালক।
কুমন্ত্রী থাকিলে তুয়া দেশের কন্টক।।' (৬৯২)

মহাপাত্র যে কুমন্ত্রী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লাউসেনকে হত্যার জন্য তার জন্মের পর থেকেই বার বার চক্রান্ত করে গেছে, আর রাজা সেই চক্রান্ত ধরতেই পারেন নাই। কিন্তু যখন মহাপাত্রের কোন কোন অন্যায় কাজ রাজা বুঝতে পেরেছেন তখন তাকে তিরস্কার করেছেন, ঘুষ নেবার অভিযোগ এনেছেন, এমনকি রমতী থেকে প্রজারা যখন ময়না চলে যাচ্ছে তখন রাজা গৌড়েশ্বর রাজসভায় দাঁড়িয়ে মহাপাত্রকে অপমান করে দরবার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন —

'রমতীর লোক বৈসে ময়না নগরে। রাজ্যের দিলাম ভার ভাঙ্গিল মুলুক।
সমাচার পাইল ভূপতি গৌড়েশ্বরে।। উপযুক্ত না হয় দেখিতে তোর মুখ।।
ক্রোধ কর্য়া চাহেন পাত্রের পানে রায়। আজি হৈতে যদ্যপি আসিবি দরবার।
বলেন তোর অবিচারে মোর দেশ ভাঙ্গা যায়।। সমুচিত শাস্তি পাবি দিবি গুনাগার।।
এত বলি পাত্রকে উঠায়্যা দিল রায়।
কপাল হৈলে মন্দ দেড়ি পায় পায়।।' (৫০০)

কাব্যের এই অংশ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিজের শ্যালক মহামন্ত্রীকে রাজা তিরস্কার করে দরবার থেকে বার করে দিচ্ছেন। কবি এখানে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখিয়েছেন যে — মন্ত্রী আমলা যে যত প্রভাবশালী হউক না কেন এমন কি নিজের শ্যালক হলেও তার সাজা হওয়া

৬৯২ 'নিশাস্থাপনা পালা'র চরণ সংখ্যা, ১০০ মায়ামুন্ড দিবাপালার চরণ সংখ্যা।

উচিত। এখানেই কিন্তু সেকালের সঙ্গে একালের তফাত। একালে দেখা যায় রাজার স্নেহধন্য যদি কেউ হন তিনি গুরুতর অপরাধ করলেও রাজা রাজসভায় দাঁড়িয়ে তাকে আড়াল বা রক্ষা করার জন্যই বেশি ব্যস্ত থাকেন।

২১। বেগার খাটানো ঃ বিনা পয়সায় লোকজন খাটানোকে বেগার খাটানো বলে। আগেকার দিনে রাজা, জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাঁদের ব্যক্তিগত কাজের জন্য প্রজাদের অনেক সময় বিনা পয়সায় খাটিয়ে নিতেন। অবশ্য বেগারদের কিছু খেতে দেওয়া হতো। ছোটবেলায় এইরকম ঘটনা গ্রামেও দেখেছি।

কাব্যের অঘোর বাদল পালায় দেখা যায় রাজা গৌড়েশ্বর তাঁর রাজধানীতে ধর্মপূজার জন্য মন্দির নির্মাণ করতে ইচ্ছুক। তার জন্য তিনি ভান্ডার থেকে দশলক্ষ টাকা ব্যয় করতেও প্রস্তুত। কিন্তু কথায় আছে 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।' এখানেও ঠিক সেই রকম অবস্থা। মন্ত্রী মহামদ বললো — এত টাকা খরচ করার কি দরকার, বেগার খাটিয়ে ধর্মের ঘর তুলে দেব।

'ভূপতি বলেন পাত্র অবধান কর। ভান্ডার হইতে লেও দশলক্ষ টাকা।
মাঝ গাঁয়ে তুল ধর্ম গাজনের ঘর।। খরচের নামে পাত্র মুখ কৈল বাঁকা।।'(১১৬)

পাত্র বললো — 'এত ব্যয় কি কাজে করিতে চাহ রায়', আরও বললো —

'সাগর বন্দিল রাম দিয়া কত ধন। এত বলি বিদায় রাজার বরাবর।
ধর্মঘর তুল্যা দিব ধর্যা লোকজন।। ইন্দ্রজাল কোটালেরে ডাকিল সত্বর।।'(১২২)

তারপর মহামদ ইন্দ্রজাল কোটালকে বেগার ধরে আনতে বললো — ইন্দ্রজাল ঢোল পিটিয়ে হাঁড়ি, ডোম, পোদ, পুড়া, চামার, চন্ডাল, বাগদি, বাইতি, ঠাই, ধানুক, ধীবর এইসব নানা জাতির বেগার ধরে নিয়ে এল মন্দির নির্মাণের জন্য।[১]

'রাত্রে দিনে বেগার খাটিছে শয় শয়। সুপ্রতুল দেউলে সুন্দর দেয় কোড়া।
কেহো কুড়ে কাদা চাঠে কেহো জল বয়। শুভক্ষণে আরম্ভিল দেওয়ালের গড়া।।'(১৫০)

আজকের দিনে জমিদারি প্রথা আর নাই, তাই বেগার খাটার রীতিও নাই বললেই চলে, তবে গ্রাম অঞ্চলে কোন কোন জায়গায় এখনও বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁদের চাষ আবাদের সময় সম্পূর্ণ বিনা পয়সা না হলেও অর্ধেক মজুরিতে জন কিষাণের ব্যবস্থা করে থাকে।

২২। মজুরী প্রদান পদ্ধতি ও শ্রমের বিনিময়ে খাদ্য ঃ সমাজ ব্যবস্থার গোড়ার দিকে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল পণ্যদ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য। এমন কি শ্রমের বিনিময়েও দেওয়া হত দ্রব্য। তারপর বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গরু, ছাগল প্রভৃতি পশুর ব্যবহার এল। এরপর এল কড়ির ব্যবহার। পরবর্তীকালে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রার প্রচলন হল। তারপর আসে কাগজী মুদ্রা, বর্তমানে দেশীয় কাজ কারবারে ধাতব মুদ্রার সঙ্গে কাগজী মুদ্রার প্রচলনই বেশি।

কাব্যের উল্লিখিত ঘটনায় আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত কড়ি। কিন্তু দিনমজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে চাল ও কড়ি দুটোই

৫০০ 'কাভুর মহিম যাত্রা পালা'র , ১২, হরিশ্চন্দ্রের উপখ্যানের চরণ সংখ্যা।

ব্যবহৃত হত। রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় ধর্মরাজের পূজার জন্য যখন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেই নির্মাণ কার্যে শ্রমিকদের বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে কাব্যে উল্লেখ আছে -

' জনপ্রতি সের চাল কিছু দিল কড়ি।
বেতন দিনান্তে দেন দুই পণ কড়ি।।' (১২)

একালেও গ্রাম অঞ্চলে কৃষি শ্রমিকদের চাল আর টাকা মিশিয়ে বেতন দেওয়া হয়। বর্ধমান জেলার কবির গ্রামেই দেখেছি চাষের সময় শ্রমিকদের জনপ্রতি দুসের চাল, আর নগদ ত্রিশ বা চল্লিশ টাকা মজুরি হিসাবে দেওয়া হয়। আবার যদি ভিন অঞ্চল থেকে যেমন বাঁকুড়া বা পুরুলিয়া থেকে সাঁওতাল-বাউরী মজুরদের নিয়ে আসা হয় তাদের বেতনের কিছু অংশ টাকায় আর কিছু অংশ সিধা অর্থাৎ চাল, ডাল, কাঁচা তরিতরকারি, মরিচ-মসলা, কয়লা ঘুঁটে তেল ইত্যাদি দিতে হয়।

গ্রাম্য শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেকাল একালের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। সেকালে জনপ্রতি একসের চাল আর কিছু কড়ি এবং নগদ বেতন দু'পণ কড়ি। এখন সে জায়গায় হচ্ছে দু'সের চাল আর চল্লিশ টাকা নগদ। উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য প্রায় একই রকম দাঁড়াচ্ছে। তখন একপণ কড়ি বা এক আনায় দু সের চাল পাওয়া যেত, অর্থাৎ দু'আনায় চারসের চাল এবং জনপ্রতি আরও একসের চাল ও কিছু কড়ি বা একসের চাল, একুনে একজন মজুরের দিনান্তে রোজগার হত ছয়সের চাল এখনও রোজগার হয় দু সের চাল ও চল্লিশ টাকা অর্থাৎ দশ টাকা কেজি দরে মোট ছ'সের চাল বা নগদ ৬০ টাকা। তফাত হচ্ছে — সেকালে ছিল 'সের' আর এখন হয়েছে 'কে.জি'।

২৩। 'চিন্তিতে পরের মন্দ আপনাকে ধরে': ফলে শুভশক্তির কাছে অশুভ শক্তির বিনাশ ঃ

ধর্মপুত্র লাউসেনের প্রতি তার মামা (গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী) মহামদের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার, অবশেষে ন্যায়, ধর্ম সত্যের জয়, শুভশক্তির কাছে অশুভ শক্তির বিনাশঃ-

গৌড়েশ্বরের পক্ষে প্রথম ঢেকুর যুদ্ধে অংশ নিয়ে ঢেকুরের সামন্তরাজ কর্ণসেনের ছয় পুত্র ইছাই এর অনুচর লোহাটা বজ্জরের হাতে নিহত হলে সেই শোকে কর্ণসেনের রাণী ও পুত্রবধূরা মৃত্যুবরণ করেন। কর্ণসেন মনের দুঃখে রাজ্যপাট ছেড়ে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু রাজা গৌড়েশ্বর তাঁকে পুনরায় সংসার ধর্মে ফিরিয়ে এনে তাঁর পরমা সুন্দরী শালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে বিয়ে দেন। সেই সময় রঞ্জাবতীর দাদা মহামন্ত্রী মহামদ গৌড়েশ্বরের নির্দেশে কাঙুর যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে মায়ের কাছে যখন শুনলেন যে গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিয়ে দিয়েছেন তখন রেগে আগুন —

' ইহা শুনে পাত্র হৈল জলন্ত আগুন।
কি বলিলে জননী বচন নিদারুণ।।' ৬০৬

'মনে ছিল বিভা দিব ভাল ঘর বরে।
দোজবরে বুড়া মোর ভগ্নি বিভা বরে।।
স্থির করি তার আমি না রাখিব বংশ।
বাসুদেব সনে পণ করেছিল কংশ।।'(৬১২)

১১৬, ১২২, ১৫০ 'অঘোর বাদল পালা'র লাইন সংখ্যা। (১) ঐ পালার ১৪০ লাইন সংখ্যা থেকে নেওয়া।

এরপর থেকে পাত্র মহামদ মনের আগুনে নিরন্তর জ্বলতে থাকে—

'মনের আগুনে পাত্র পোড়ে নিরন্তর'

আর ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করতে থাকে কিভাবে কর্ণসেন, রঞ্জাবতী আর তাঁদের পুত্র লাউসেনকে হত্যা করা যায়।

বিবাহের পর রঞ্জাবতী-কর্ণসেনের কোন সন্তান সন্ততি না হওয়ায় মহামদ রাজসভায় কর্ণসেনকে আঁটকুড়ো বলে গালাগালি দিয়ে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর অনেক তপস্যা আর সাধনার ফলে প্রভূ নিরঞ্জনের আশীর্ব্বাদ ও বরে রঞ্জাবতীর কোলে লাউসেন জন্মগ্রহণ করলে সকলের খুব আনন্দ হল, রঞ্জাবতী স্বামী কর্ণসেনকে বললেন মা, বাবা, দাদা, দিদি ও গৌড়েশ্বরকে সত্ত্বর সংবাদ দিতে। কর্ণসেন চিঠি লিখে নাপিত ও রজককে সংবাদ দিতে গৌড়ে পাঠালেন। রঞ্জার পুত্র হয়েছে শুনে গৌড়েশ্বর, ভানুমতি, (রঞ্জারদিদি), মা মন্থরা ও বাবা বেণু রায় যারপরনাই আনন্দিত হলেন এবং সংবাদ দাতা নাপিত ও রজককে নানা ধনরত্নে ভূষিত করলেন। তৎকালীন সমাজে একটি বিশেষ প্রথা ছিল পরিবারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সেই সংবাদ নাপিতের মাধ্যমে কন্যার পিত্রালয়ে কিম্বা কন্যা পিত্রালয়ে থাকলে পাত্রের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। আর সেই সংবাদ পেয়ে বিশেষ করে পুত্রসন্তান হলে আনন্দ অনুভূতির নিদর্শন হিসাবে সংবাদদাতাকে জামা, কাপড়, অর্থ, অলঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা মর্য্যাদা জ্ঞাপন করা হত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়ার্ধ পর্যন্ত এই প্রথা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে। তবে বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী প্রায় হাতের মুঠোয়, তাই লোক মারফত সংবাদ প্রেরণের যুগ শেষ। এখন সংবাদ দাতা হচ্ছে ফোন, ই-মেল, এস. এম. এস ইত্যাদি। যাইহোক রঞ্জাবতীর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদে মহামদ ছাড়া গৌড়ের সকলের আনন্দ আর সংবাদ দাতা নাপিত, রজকের নানা প্রকার প্রাপ্তিযোগের কথা কবির কলমে —

'রঞ্জার হয়েছে পুত্র শুনি নৃপবর।
সভাসহ উল্লসিত রাজা গৌড়েশ্বর।।
ঘরে ঘরে কৌতুক আনন্দ নাট গীত।
ভানুমতি রাণী শুনে হৈল হরষিত।।
মন্থরার মনের সম্পূর্ণ মনোরথ।
মনে হয় ধেয়ে যাই কিন্তু দূর পথ।।
বেণু রায় শুনিয়া আনন্দে নাই ওর।
পূর্ণচাঁদ পেয়ে যেন মাতিল চকোর।।'(১৯০)

রজক নাপিতে রাজা দেন নানা ধন।
ভান্ডার খুলিয়া দেন অমূল্য রতন।।
গায় হতে উতরিয়া দিল খাসা জোড়া।
পর্বত্যে টাঙ্গন তাজি দিল দুই ঘোড়া।।
দুইকানে সোনা দিল দু'হাতে তোডর।
মাথায় অম্বর দিল হাতের খঞ্জর।। (২০০)
ভানুমতি ভূষণ দিলেন পাট শাড়ি।
বাধাই সাধয়ে দোঁহে ফিরে ফিরে বাড়ি।।

'অল্পকালে রঞ্জার হৈল বংশধর।
পরম আনন্দ মনে রাজা গৌড়েশ্বর।।
টাকা কড়ি বিস্তর দিলেন বেণু রায়।
বসন ভূষণ মন্থরার স্থানে পায়।। (২০৪)

'ভূপতির স্থানে দোঁহে হৈল বিদায়।
নানা ধন পরিপূর্ণ লয়ে ঘর যায়।।' (২০৮)

সকলের মধ্যে এই যে আনন্দ উচ্ছাস এর কিন্তু কোন মূল্য নাই রঞ্জাবতীর দাদা

মহামদের কাছে - সকলের মন যখন আনন্দে ভরে উঠেছে তখন মহামদের মাথায় যেন বাজ পড়েছে — কিন্তু কেন? সে প্রশ্নের উত্তরে পরে আসছি, উপস্থিত মহামদের মনের অবস্থা আর তার চিন্তা ভাবনার স্বরূপ কি রকম তা দেখা যাক —

'সবার আনন্দ মন হরিষ অন্তর।
পাত্রের মুণ্ডেতে যেন পড়িল বজ্জর।।' (২১০)
'ভাবিতে চি (ন্তিতে) পাত্রে অন্ন রুচে নাই। ২১৩
রঞ্জার ঘুচিবে কবে পুত্রের বড়াই।।
কোন চক্রে আঁটকুড়া হয় কর্ণসেন।
হেট মাথা হয়ে পাত্র মনেতে ভাবেন।।
কহিতে লাগিল কিছু রাজার গোচর।
অবধানে শুন মহারাজ গৌড়েশ্বর।।'
২১৮

সাত পাঁচ চিন্তা করে মহামদ রাজাকে বললেন --- আমি সব সময় উচিৎ কথা বলি, — রঞ্জা ধর্মরাজের বরে পুত্র সন্তান লাভ করেছে, সুতরাং এই সন্তান দেবতা না অসুর তা কেউ বলতে পারে না। আর তার প্রমাণ ইছাই। সোম ঘোষ দেবীর বরে ইছাইকে লাভ করেছিল, সেই ইছাই ঢেকুরের স্বতন্তর রাজা হয়ে বসল, আপনাকে মানল না। সেই কারণেই বলছি —

'জন্মিল তোমার রিপু নিবেদন করি।
কৃষ্ণ যেমন জন্মিল কংশের হয়ে অরি।। (২৪০)
পরিণামে বিপাক পড়িবে নৃপবর।
রাজ্যভার নিবে রাজা রঞ্জার কাঙুর।। ২৪২

এইভাবে রাজা গৌড়েশ্বরকে ভয় দেখাতে লাগলো আর মনে মনে অনুতাপ করতে লাগল - নাপিত আর ধোপা অনেক ধনরত্ন নিয়ে চলে গেল আর সেইজন্য —

'হাত ধরে ইন্দারে বলেন পাত্রবর।
মাঝ পথে নাপিত ধোপাকে গিয়ে ধর।।
চড় দিয়ে কেড়ে আন যত ধন কড়ি।
ইন্দাকে ইনাম দিল মাথার পাগড়ি।।'(২৫৪)

ইন্দা ধোপা আর নাপিতকে মারধোর করে সব কেড়ে নিয়ে এল। 'সকল নিলেক কেড়্যা সংশয় জীবন। নগ্ন হয়ে দুজনার ঘরকে গমন।।' যেখানে তাব মা বাবা, দিদি জামাইবাবু আনন্দ সংবাদে খুশি হয়ে নাপিত ধোপাকে বিস্তর ধনরত্ন দিয়েছিল সেখানে মহাপাত্র মহামদ কেন সব কেড়ে নিয়ে এল? শুধুই কি তার বোন রঞ্জাবতীর দোজবরে বৃদ্ধ বরে বিয়ে হয়েছে বলে সেই রাগে? রঞ্জাবতী তো নিজে ভালবেসে বিয়ে করে নাই, রাজা গৌড়েশ্বর পাত্র নির্বাচন করেছেন, রঞ্জাবতীর মা বাবা আনন্দ সহকারে সেই বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন, সেখানে রঞ্জাবতীর মত একজন লাজুক নির্মল চরিত্রের মেয়ে, যে তার জামাইবাবুকে দেখে ঘরের কোণে লুকিয়ে পড়ে। তার পক্ষে মা, বাবা, দিদি, জামাইবাবুর মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের মতো মানসিকতাই থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং দোজবরে রাজা কর্ণসেনকে বিয়ে করার জন্য রঞ্জাবতীকে বিন্দুমাত্র দোষ দেওয়া যায় না। সেকালে মা বাবা যে পাত্র নির্বাচন করতেন মেয়েরা অবলীলাক্রমে সেই পাত্রকে মেনে নিতেন। আর কর্ণসেন তো ঢেকুর যুদ্ধে ছয় পুত্র, পাটরাণী আর পুত্রবধূদের হারিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। গৌড়েশ্বরই তাঁকে আবার সংসারী করলেন, রঞ্জাবতীর সঙ্গে বিয়ে দিলেন। তাই কর্ণসেনেরও কোন দোষ দেওয়া যায় না রঞ্জাবতীকে বিয়ে করার জন্য। দোষ যদি কারুর কিছু থাকে তা হল রাজা গৌড়েশ্বরের। মহামদ তার বোন রঞ্জাবতীকে খুবই ভালবাসত এটা ঠিকই - কিন্তু রাজা গৌড়েশ্বরের নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহের

৬১২ 'রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা'র, ১৯০, ২০০, ২০৪, ২০৮, ২১৩, ২১৮, ২৪০, ২৪২, ২৫৪- 'লাউসেন চুরি' পালার চরণ সংখ্যা।

সংবাদ শুনেই বলেছে ' স্থির করি তার আমি না রাখিব বংশ।' কোন দাদাই তার বোনের এত বড় সর্বনাশের কথা চিন্তাই করতে পারে না যদি না তার নিজের স্বার্থে ঘা পড়ে। দোজবরে বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে তার পরমা সুন্দরী বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্য মহামদ তো গৌড়েশ্বরকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই। উল্টে রঞ্জাবতী কর্ণসেনের বংশ ধ্বংশ করার প্রতিজ্ঞা করেছে। যেমন করেছিল কংস। কংস তার বোন দেবকীর সব সন্তানদের হত্যা করার ব্যবস্থা করেছিল, নিজেকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। এখানেও একটা অজানা ভয় বা আশঙ্কা মহামদকে চেপে ধরেছিল যখন সে জানতে পারল গৌড়েশ্বর তাঁর প্রিয় পাত্র কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিয়ের দিয়েছেন। মহামদ ভালো করেই জানতো যে গৌড়েশ্বর তাঁকে অন্তর থেকে পছন্দ করেন না। তার অন্যায় কাজ কর্মের জন্য গৌড়েশ্বরের কাছে প্রায়ই ধমক খেতে হয়। যেমন রাজা শিকারে যাবার সময় বন্দীশালে বন্দীদের দুঃখ দুর্দশা দেখে বলেছিলেন ---

' পাত্র মহামদে রায় বলিল বচন।
এত অবিচার দেশে কিসের কারণ।।' ৬৬

'তোমা হৈতে হৈল পাত্র গৌড়ে অবিচার।
বুঝি জরাসন্ধের এ হৈল কারাগার।।' (৭২)

এরপর রঞ্জাবতীর বিয়ের ঠিক আগেই রাজা গৌড়েশ্বর যখন দেখলেন কাঙুরের রাজার কুড়ি লক্ষ টাকা রাজকর বাকি তখন ---

'বাকি দেখে রাজা হৈল জলন্ত আগুণ।
পাত্রকে বলেন কিছু বাক্য নিদারুণ।।
কোচ কাঙুরের নাহি দেয় রাজকর।
টাকা খেয়ে তার তুমি হয়েছ নফর।।

আপন কল্যাণ যদি বাঞ্ছা থাকে মনে।
দল লয়ে হানা দেগে কাঙুর ভুবনে।।
রাজকর দেয় যদি করিবে আসান।
নহে তার মাথা কেটে আন বিদ্যমান।।' (২১৮)

রাজকর আদায় কিম্বা কাঙুরে রাজার মাথা কেটে আনা তো দুরের কথা মহামদ ছ'মাস ধরে গন্ডকী নদীর ধারে বসে নদী পার না হতে পেরে রিক্ত হস্তে একরকম পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে রাজার কাছে ফিরে এসেছে। আর ফিরে এসেই যখন শুনল রাজা গৌড়েশ্বরের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিয়ের কথা — তখনই তার মনে দানা বেঁধে গেছে এক অজানা ভয় অজানা আশঙ্কা, তা হল আসন হারানোর ভয়। মন্ত্রীত্ব খুয়ানোর ভয় বা আশঙ্কা। তাই দেবতার বরে রঞ্জাবতীর পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদে তার মাথায় যেন বজ্রপাত হয়েছে। তার নিজের মনের অবস্থাটা রাজা গৌড়েশ্বরের উপর দিয়ে চালাবার চেষ্টা করেছে। রাজার মনে ভয় সঞ্চার করার জন্য রঞ্জার পুত্র সন্তানকে ' জন্মিল তোমার রিপু', 'রাজ্যভার নিবে রাজা রঞ্জার কুঙর।' ইত্যাদি কথা রাজাকে বলেছে। এসব আসলে তার নিজের মনের ভয়, সে ভাবছে - ' জন্মিল আমার রিপু', ' নিবে মন্ত্রীত্বের ভার।' তাই মনের জ্বালা মেটাবার জন্য নাপিত ধোপাকে মেরে ধরে তাদের সমস্ত জিনিস কেড়ে নিয়েছে আর রঞ্জার শিশু পুত্রকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিয়েছে ময়না থেকে রঞ্জার বংশধরকে চুরি করে আনার।

' পাত্র বলে ইন্দা যাকু ময়না নগরে।
চুরি করে আনুক রঞ্জার বংশধরে।।' (২৭২)

৬৬, ৭২ আদ্য ঢেকুর পালা'র, ২১৮ 'রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা'র চরণ সংখ্যা।

চিন্তিতে পরের মন্দ আপনাকে ধরে

মহারাজও ভয় পেয়ে পাত্রের পরামর্শ অনুসারে ইন্দাকে ময়না পাঠালেন রঞ্জার ছেলেকে চুরি করে আনার জন্য। ইন্দা ও তার লোকজনেরা ময়না থেকে রঞ্জার ২১ দিনের ছেলেকে চুরি করে নিয়ে এল। চোরেরা পথে ক্লান্ত হয়ে শিশু লাউসেনকে বেনা বনে শুইয়ে রেখে ভাঙ্গ খেতে গেল। সেই অবসরে ঠাকুর নিরঞ্জন হনুমানকে পাঠিয়ে চোরের ওপর বাটপারি করে ঐ শিশুকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে এলেন এবং রঞ্জার কোলের শিশু রঞ্জাকে ফিরিয়ে দিলেন। চোররা ফিরে এসে শিশুকে না দেখতে পেয়ে একটা কুকুরকে কেটে সরায় করে সেই রক্ত নিয়ে গিয়ে রাজা ও পাত্রকে দেখাল - এবং মিছে করে বললো- একুশ দিনের ছেলে পথে মারা গেল, তাই তাকে কেটে এই রক্ত এনেছি। রঞ্জার ছেলে নিধন হয়েছে শুনে পাত্রের আনন্দের সীমা নাই

' ভাগিনার নিধন শুনিয়া পাত্রবর।
আনন্দে অবধি নাই হরষ অন্তর।।' (৭০২)

এবং রাজাকে বললেন ---

' শত্রু কাটা গেল রাজা কপালের বলে।
দান কর পুরাণ শুনহ কতুহলে।।' ৭০৮

' ত্রিভূবনে দুষ্ট নাই শত্রুর সমান।
রিপুরক্তে রাজন উচিত হয় স্নান।।' (৭১২)

এই বলে রিপু রক্ত ভেবে রাজাকে কুকুরের রক্তে স্নান করালো, তার ফলে সাময়িক ভাবে রাজার কুকুরের মতো দশা হল।

যাইহোক রঞ্জার যতই বৃদ্ধ দোজবরে বিয়ে হোক না কেন, তারজন্য তার দাদার যতই মনে কষ্ট হোক না কেন সেই বোনের ছেলেকে অযথা কোন মামা শত্রু আখ্যা দিতে পারে না। কিম্বা পৈশাচিক আনন্দে 'ভাগ্নার রক্ত 'কে রিপু রক্তবলে রাজাকে স্নান করতে বলতে পারে না যদি না সে মনে মনে ঐ শিশু পুত্রকে 'রিপু' বলে ভাবে। সুতরাং মহামদ যে রঞ্জাবতী কর্ণসেন আর তাঁদের শিশুপুত্রের বিনাশ চাইছে - তার মূলে রয়েছে তার অজানা আশঙ্কা আর ভয়। তাই বার বার লাউসেনকে সে মারতে চেয়েছে।

লাউসেনকে চুরি করে এনে হত্যার ষড়যন্ত্র যখন সফল হল না তখন পাত্র সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সুযোগ একদিন এসে গেল, লাউসেন বড় হতে তাকে মল্লযুদ্ধ শেখার জন্য মহামদকে মল্লগুরু পাঠাতে বলেছে রঞ্জাবতী। এই সুযোগে মহামদ রমতী নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা সারঙ্গ ধলকে ময়না পাঠালেন - আর বলে দিলেন —

' মল্লযুদ্ধ শিখিবেন আমার ভাগিনা।
সংসার মাঝে মাল নাহি তোমা বিনা।।'৮০৪

মল্লযুদ্ধ শিখাইতে ধরিয়া দু পায়।
পাথরে কাছাড়্যা তাকে যেন প্রাণ যায়।।

'এক কার্য তোমাকে দিলাম আমি ভার।
ভাগিনা কে নিধন করিবে এই বার।। (৮১০)

আমার ভাগিনা বল্যে না করিও শঙ্কা।
লাউসেন বধিলে পাইবে লক্ষ তঙ্কা।।' (৮১৪)

কিন্তু এবারও মহামদের আশা পূর্ণ হল না। দেবতার বলে বলীয়ান লাউসেনই মালদের নিধন করলেন। —

' হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া করিল তার গুঁড়া।
পড়িল সারঙ্গধল পর্বতের চূড়া।।

ভীমসেন কৈল যেন কিচক নিধন।
বধিল সারঙ্গধলে রঞ্জার নন্দন।।' (১২৩০)

২৭২, ৭০২, ৭০৮, ৭১২, 'লাউসেন চুরি পালা'র চরণ সংখ্যা।

সারেঙ্গধল নিহত হওয়ার পরে মহামদ মনস্তাপ-আগুনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। আর মনে মনে চিন্তা করছিল কি করে রঞ্জাকে আঁটকুড়ি করা যায় ---

' মনস্তাপ আগুনে এতক দিন পুড়ি। মনে করে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ি।।' ১৬৮

এমনি সময় হঠাৎ একদিন দপ্তর থেকে বাড়ি ফেরার পথে গৌড়েতেই লাউসেনকে লাউদত্ত কামারের ঘরে দেখে আর তার পরিচয় পেয়ে —

'কৃষ্ণ দেখ্যা যেমন কাঁপিলা কংশাসুর।
তরাসে পাত্রের প্রাণ করে দুর দুর।। (১৬০)
বলে যাকে বধিবারে ছিল মোর মনে।
বিধাতা সাপক্ষ মোর আনিলসেজনে।।'

মহাপাত্র বাড়ি না গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গৌড়েশ্বরের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে ভয় দেখিয়ে বললো — মহারাজ কাল ভোরে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি - দু'জন বিদেশী গৌড়দেশে এসেছে তারা ' অকস্মাৎ আসিয়া বসিল রাজ্য পাটে।' 'বুঝিবা তোমার রাজত্ব আর নাঞি থাকে।।' পাত্রের এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে-তার মনের ভয়। আর রাজাকে এই ভয়টা দেখিয়ে নিজের কার্য সিদ্ধি করতে চাইছে। রাজাকে বললো ঢেড়া দিয়ে জানিয়ে দিন শহরে কারো ঘরে আত্মীয় কুটুম্ব বা কোন বিদেশী থাকলে সে যেন আজ রাত্তির মধ্যেই শহর ছেড়ে চলে যায়। আর দু'জন চর পাঠিয়ে দিয়ে দেখতে বললো --- লাউসেন রাত্রে কোথায় থাকে। ঢেড়া শুনে বিকালে লাউসেন- কর্পূর লাউদত্তের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভৈররী গঙ্গার ধারে একটা বকুল তলায় আশ্রয় নিল। মহামদের চররা এসে মহামদকে সেই সংবাদ জানিয়ে গেল। তখন মহামদ ঠিক করল রাত্রের অন্ধকারে ঘুমন্ত লাউসেনের বুকে হাতি চাপিয়ে তাকে বধ করবে। এই ভেবে রাজার অজান্তে গদা মাহুতকে ডেকে নির্দেশ দিল —

'ভৈরবী গঙ্গার ধারে বিদেশী দু'জন।
হাথি চাপাইয়া তায় কর গা নিধন।।'
'মনে আন্ না কর‍্যা দেখিয়া কুমার।
এ কাজ সাধিলে পাবে বস্ত্র অলঙ্কার।।' (২৮৮)

গদা মাহুত হাতি নিয়ে ভৈরবী গঙ্গার ধারে বকুল তলায় গিয়ে দূর হতে দেখল চাঁদ পারা দুটি ছেলে নিদ্রামগ্ন, ওদের দেখে —

' মাহুত ব্যাকুল রূপ দেখ্যা দু'জনার।
বলে কি কর‍্যা এমন শিশু করিব সংহার।।
ধিক মোর জীবনে ঈশ্বরে কব কি।
পারাধীন হৈয়া আমি নিরর্থক জি।।' (৩২৮)
'বিনা অপরাধে যদি বধিব কুমার।
নিদান এ পাপে মোর নাহিক নিস্তার।।
কান্দে গঁদা মাহুত বিপাক ভাবে মনে।
এহাকে না মাল্যে পাত্র বধিবে জীবনে।।'(৩৩৪)

এখানে একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে - একজন বেতনভুক মাহুত, যাকে লোভ দেখানো হয়েছিল ঐ শিশু কুমারকে হত্যা করলে অনেক বস্ত্র অলঙ্কার পাবে, সেও ঐ শিশু দেখে বলেছে -' কি কর‍্যা এমন শিশু করিব সংহার।' পরের চাকুরি করার জন্য নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়েছে। পাত্রের নির্দেশে ঐ শিশুদের হত্যা করতে হবে বলে কেঁদে ফেলেছে। কিন্তু তার নিজের মামা মহামদের অন্তরে সামান্যতম স্নেহ ভালবাসা সঞ্চার হয় নাই। তার একটাই উদ্দেশ্য-যে কোন ভাবে যত নিষ্ঠুর উপায়ে হক্ না কেন রঞ্জার ছেলেকে মারতে হবে। এটা কখনই রঞ্জার প্রতি স্নেহ ভালবাসার লক্ষণ হতে পারে না। যাইহোক মাহুত বাধ্য হয়ে শিশুদের কাছে হাতিকে নিয়ে গেল। কিন্তু

৮১০, ৮১৪, ১২৩০ 'মালবধ পালা'র, ১৬০, ১৬৮, ২৮৮ 'হস্তী বধপালা'র চরণ সংখ্যা।

চিন্তিতে পরের মন্দ আপনাকে ধরে

মহামদের আশা পূর্ণ হল না, কারণ ' রাখে হরি তো মারে কে!' হাতি শিশুদের কাছে গিয়ে কড় পেতে বসে পড়লো, মাহুত অঙ্কুশ মারতে হাতি মাহুতকেই মারতে গেল।

'অঙ্কুশ হাতির মুন্ডে হানিল বহুত।। শুন্ড দিয়া গলায় বদনে খায় চুম।।
আগু নাহি হয় হাথি পাত্যা বসে কড়। হরি যার সাপক্ষ তাহার কারে ডর।
পায় শুন্ড বুলাইয়া চরণে করে গড়।। (৩৪০) কোলে কর‍্যা সেনকে রহিলা মায়াধর।।
পুনরপি অঙ্কুশ হানিল ছয় সাত।'৩৪১ প্রহ্লাদে রাখিল যেন গজবৃন্দ মাঝে।
'করিবর না চাটে মাহুতে করে ধূম।৩৪৩ সেই রূপে সেনকে রাখিল ধর্মরাজে।।' (৩৪৮)

অগত্যা মাহুত বকুল তলায় হাতি বেঁধে রেখে এসে পাত্রকে সব কথা বললো।
পাত্র সব কথা শুনে মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে ঠিক করলো — হাতি চোর বলে লাউসেনকে বেঁধে আনবো, এবং সেই মতো ইন্দা কোটালকে পাঠিয়ে দিল - লাউসেনের হাতে পায়ে গলায় কোমরে শেকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসার জন্য। কোটাল লাউসেনকে বেঁধে —

'উপনীত করিল পাত্রের বরাবরে। মনে করে এহার করিব অপমান।
লাউসেন দেখ্যা পাত্র জ্বলিলা অন্তরে।। বাশুলীর পূজা দিব দিয়া বলিদান।।'(৫৫০)

লাউসেনকে বলি দেবার অভিপ্রায়ে তাকে বন্দীশালে পাঠালো —

' লাউসেনে কোটাল রাখিল বন্দীশালে। জটে দড়ি দিয়া বান্ধে চালের বাতায়।
চারিদিগে তাহার তুষের ধুয়া জ্বলে।। পাথর বসাল্য বুকে হাড়ি দিল পায়।।' (৫৭০)

লাউসেন বন্দীশালে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে পড়ে একমনে ঠাকুর মায়াধরকে ডাকতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠ থেকে ঠাকুর মায়াধর বন্দীশালে লাউসেনের দুঃখ দুর্দশা দেখে হনুমানকে পাঠিয়ে তার বাঁধন মুক্ত করে দিয়ে স্বপ্নে রাজা গৌড়েশ্বরকে বলতে বললেন। হনুমান রাজাকে স্বপনে বললো —

' রাজা হয়্যা নাঞি কর প্রজার বিচার। মন্ত্রী বেটা দুষ্ট তোর বড় অবিচারী।
এই পাপে তোমার নরক হবে সার।। (৬৬০) দুর্জনে দিয়াছ করে দেশে অধিকারী।।'

আরও বললো লাউসেন ধর্মের সেবক, সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিল। ত'র মামা তোমার মন্ত্রী মিছে মিছি তাকে হাতি চোর অপবাদে বন্দীশালে রেখে দিয়েছে , তার জীবন সংশয়। তুমি তাকে মুক্ত করে সসম্মানে বিদায় দেবে। অন্যথায় তোমার সর্বনাশ হবে।

রাজা গৌড়েশ্বর সকাল হতেই তাড়াতাড়ি দরবারে এসে সকলকে স্বপ্নের কথা জানালেন, এবং মহামদকে নির্দেশ দিলেন - শীঘ্র করে বন্দীকে রাজসভায় নিয়ে আসার জন্য। তখনও মহামদ কৌশল করছে লাউসেনকে হত্যা করার জন্য। তাই মিথ্যা করে রাজাকে বললো — মহারাজ হাতে নাতে ঐ চোরকে ধরেছি, ও হাতি চুরি করে পালাচ্ছিল, সেজন্য ওকে বন্দীশালে রেখেছি। আজ্ঞা হলে ওকে এখনই শূলি দিই।

' আজ্ঞা হয় তাহাকে ত্রিশুল লয়্যা দি। রিপু চোর দুষ্টকে রাখিয়া ফল কি।।' (৭১৪)

মন্ত্রী মহামদের এই কথায় রাজা গৌড়েশ্বর খুব রেগে গেলেন। এর আগে একবার

মহামদের কথায় ‘ রিপুরক্তে’ (যা প্রকৃতপক্ষে কুকুরের রক্ত) স্নান করে নিজে কুকুরের দশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই লাউসেনকে শূলি দেবার কথা বলায় —

‘ এত শুনি পাকাল নয়নে রাজা কয়। ভাল মন্দ সভা মাঝে করিব বিচার।
বুঝি মোর কথা তোর চিত্তে নাহি লয়।। বুঝ্যা সুঝ্যা তাহার করিব প্রতিকার।। (৭২০)
আপন হুকুমে বান্দ্যা দিতে চাস শূলি। আপন কল্যাণ যদি ইচ্ছা থাকে মনে
আমি কিছু নাহিনু ঠাকুর তুঞি হলি।। সত্বর আনহ মোর আগে বন্দীজনে।।’ ৭২২

মহামদের প্রতি রাজার এই সমস্ত উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে - মহামদের অনেক যুক্তি পরামর্শ রাজা মেনে নিলেও তার প্রতি রাজা খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। মহামদও এটা ভালো করেই বুঝতেন। এই জন্যই তার ভয় বা আশঙ্কা। যাইহোক রাজার মনের ভাব বুঝে মহামদ বন্দীশাল থেকে লাউসেনকে আনতে গেল, গিয়ে দেখে লাউসেন বন্ধন মুক্ত।

‘সেনকে বন্ধন মুক্ত দেখিয়া পাতর। (বলে) টাকা খায়্যা কোটাল বান্ধিয়া নাই রাখে।
ক্রোধ কর্য়া উঠে পোতামাঝির উপর।। যদ্যপি পালায়্যা যাত্য ঠেকিত বিপাকে।।’ ৭৩০

তাদের আরও বললো - তোদের কি - ! রাজা আমাকেই সব দোষ দিত। এই বলে লাউসেনকে আবার বাঁধল।

‘এত বলি লাউসেনে বান্ধে পিছ মোড়া। ধর্য়া লেহ দোসাদু কোমরে দিয়া ডোর।
গলায় জিঞ্জির দিল হাথে হাথ কড়া।। শহরে পড়িল সাড়া আইসে হাতি চোর। (৭৩৬)

কিন্তু নগরের লোকজন লাউসেনের রূপ দেখে ‘করে হায় হায়।’

‘সভে বলে এইজন হাতি চোর নয়। মিছা দোষ দিয়াছেন পাত্র মহাশয়।।’ (৭৪০)

তখন পাত্রও মনে মনে ভাবল - রাজাও একে কখনই চোর বলবে না, শুধু শুধু আমারই দোষ হবে, তাই একে ভূতের মতো সাজাতে হবে। —

‘এত বলি পাঁশ মাটি লেপ্যা দিল গায়। গলার জিঞ্জির গলে হৈল্য মাল্য ছড়া।
কস্তুরি চন্দন হৈল্য ধর্মের কৃপায়।। হয়্যা গেল বলয় হাথের হাথ কড়া।।’ (৭৪৮)
নিগড় নূপুর হৈল চরণ যুগলে।

এইসব দেখে পাত্র ভাবল বেটা ভোজবাজি জানে। কিন্তু এসব ভোজবাজি নয়। এযে ধর্মের কৃপা ধর্মের জয় সে কথা পাত্র বুঝল না। যাইহোক পাত্র ঐ অবস্থাতেই রাজসভায় লাউসেনকে নিয়ে এল। ‘ রূপ দেখ্যা মোহিত হৈল গৌড়েশ্বর।’

‘সভাজন দেখিয়া বিস্ময় পাইল মনে। পাত্র চোর বলে কি কর্য়া এমন মহাজনে।।’ (৭৫৪)

সবাই বল্লেন এই কুমার কখনই চোর হতে পারে না। রাজা তখন রেগে পাত্রকে বললেন ---

‘নেস্তভার রাজ্যের দিয়াছি আমি তোকে। তোর পাপে মোর রাজ্য রয় বা না রয়।
মিছা অপবাদ দিয়া দায়ি কর মোকে।। সমুচিত সাজায় করিতে তোকে হয়।।’ (৭৬০)

আর লাউসেনকে বললেন — আমি তোমার সাপক্ষ তুমি নির্ভয়ে তোমার সব পরিচয় দাও।

‘পরিচয় পাল্যে বন্দী করিব ছাড়ান। ঘোড়া জোড়া দিব আর বাড়াব বিভব।

৩২৮, ৩৩৪, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৫৫০, ৫৭০, ৬৬০, ৭১৪, ৭২০, ৭২২, ৭৩০ ‘হস্তী বধ পালা’র চরণ সংখ্যা।

চাকর রাখিব বাড়া করিব সম্মান।। (৭৮০)　　রাজ্য ভার তোমাকে সঁপিব আজি সব।।'

মহামদের এইটাই তো প্রধান ভয়। রাজা যদি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেই জায়গায় লাউসেনকে বসায়। যাই হ'ক্ লাউসেন জোড়হাত করে তার সব পরিচয় দিলেন। আর সারেঙ্গধল বধ থেকে আরম্ভ করে পথে যা যা ঘটেছিল - যেমন বাঘ বধ, কুমির বধ, কামাচারী নয়নী, আর গোলাহাটের সুরক্ষা বেউশ্যার কথা, তাদের নাক কান কাটা সব নিবেদন করলেন। তারপর গৌড়ে পৌছাবার পর মামা মহামদের অত্যাচার, লাউদত্ত কামারের ঘরে লাউসেনদের দেখে আর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে বিদেশী বলে সেখান থেকে বিতাড়ণ, তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় হাতি দিয়ে হত্যার চেষ্টা, ঠাকুরের কৃপায় প্রাণ রক্ষা এবং সবশেষে হাতিচোর বলে বন্দীশালে হাতে পায়ে কোমরে বেঁধে, বুকে পাথর চাপিয়ে মেরে ফেলার উপক্রম। প্রভু ধর্মরাজের কৃপায় বন্দীশাল থেকে মুক্ত হয়ে রাজসভায় আগমন। এ সবই বর্ণনা করলেন।

রাজা গৌড়েশ্বর লাউসেনের কাছ থেকে তার পরিচয় পেয়ে এবং মহামদের নিষ্ঠুর সব আচরণের কথা শুনে গর্জে উঠে মহামদকে খুব তিরস্কার করলেন।

'লাউসেন যদ্যপি দিলেন পরিচয়।　　তাহা হৈতে পাত্রকে অধিক দেখি বাড়।।
মহামদে গর্জিয়া নৃপতি কিছু কয়।। (৮৭০)　　এত বলি পাকাল নয়নে রাজা চায়
নির্দয় তোমার পারা সংসারে বা কে।　　সভাজনে দেখ্যা শুন্যা করে হায় হায়।।
ভাগিনা তোমার বটে কোলে কর্য্যা লে।।'　　নাকে হাত দিল দেখ্যা ভূঞা রাজাগণ।
'লোকে বলে পথে গলা কাটে বাটপাড় ।৮৭৫　　সভে বলে পাত্রের পাষন্ড বড় মন।।' (৮৮০)

মহম্মদ এগুচ্ছে না দেখে রাজা নিজেই লাউসেনকে কোলে তুলে নিলেন ---

'লাউসেনে কোলে কর্য্যা বসিল ভূপতি।　　সর্বকাল সহজে তোমার মামা খল।।' (৮৮৪)
বদন কমলে চুম্ব দেন ঘন অতি।।　　'গায় জোড়া আছে ঘোড়া আন বলে ভূপ।
বলেন কুলের প্রদীপ কুল কর্য্যাছ উজ্জ্বল।　　লাউসেনে দিব এ কুটুম্ব অপরূপ।।' ৮৮৮

লাউসেনের প্রতি রাজার আচরণ দেখে এবং তাকে ঘোড়া জোড়া দেবেন শুনে মহামদের মাথায় আবার যেন বাজ পড়ল, ' এত শুনি পাত্রের মাথায় পড়ে বাজ।' (৮৮৯) কিন্তু এ পাত্র দমবার পাত্র নয়, রাজার ইচ্ছা বানচাল করার জন্য এবং লাউসেনকে কৌশলে হত্যা করার অভিপ্রায়ে নিজের ভাগ্নাকে অস্বীকার করে রাজাকে বললো ---

'এ নহে ভাগিনা মোর ভূতাল্যা তস্কর।　　'আপনার উপরে বিপত্য দেখ্যা রায়।
ভোজবাজি দেখিয়া ভুলিলে নৃপবর।।'　　মোকে মামা বলে প্রাণ বাঁচাইতে চায়।।'৯০২
চোরের চরিত্র রায় নানা অনুষঙ্গ।　　'কোথাকার ভূতাল্যা ভাগিনা বল্যা কয়।
যেখানে যেমন দেখে সেখানে সে বন্দ।।'　　তস্করে কর্য্যাছ কোলে রাজা মহাশয়।।' (৯১২)
৮৯৪

এইসব কথা বলে মহামদ রাজার মন ভাঙ্গাতে লাগল, আর মনে মনে লাউসেনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তাই রাজাকে আরও বললো --- ও তো সভার মাঝে অনেক বড়

৭৩৬, ৭৪০, ৭৪৮, ৭৫৪, ৭৬০, ৮৭৫, ৭৮০ 'হস্তীবধ পালা'র চরণ সংখ্যা।

বড় কথা বলেছে, বলেছে সারেঙ্গধল মালকে বধ করেছে, কামদল বাঘকে হত্যা করেছে, তারাদিঘীর কুমির মেরেছে, গোলাহাটের বিখ্যাত বেউশ্যা সুরক্ষার, যার ঘরে ছ'কুড়ি নাগর বাঁধা আছে, তার নাক কান কেটে এনেছে - এইসব বলে মহারাজ নিজের বড়াই নিজেই করছে। যদি এ প্রকৃতই বীর হয় তাহলে আপনার পাটহাতি মাণিক রাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করুক তবেই জানব ও আমার ভাগ্না। --- আর তখন তাকে বসন ভূষণ ময়নার জায়গির সব দেবেন। ---

'পাটহাথি রাজার মাণিক রাজ আছে। নতুবা প্রিত্যয় কি বা এমন কথায়।
বুঝিব এহার বল যাক তার কাছে।। নিরর্থক ঘোড়া জোড়া কেন দিবে রায়।
তার সনে বুঝিয়া যদ্যপি করে জয়। যদ্যপি বধিতে পারে মাণিক বারণ।
তবে এ ভাগিনা মোর শুন মহাশয়।। তুরঙ্গ বসন দিবে ময়না ভূবন।।' (৯৫০)

পাত্রের কথা শুনে লাউসেন বললেন আমি হাতির সাথে যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু - মহারাজ, মামা আমার সব ঢাল খাঁড়া অস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন, সেগুলি আমায় ফেরত দিতে হবে। রাজার কথায় পাত্র লাউসেনের ঢাল খাঁড়া ও সব অস্ত্র ফেরত দিয়ে গদা মাহুতকে বললো--

' লাউসেন ভাগিনা যুঝিবে হাতি সনে। হাথিকে মাতাল কর খাওইয়া মদ।
পূর্ণ হইল মানস যা ছিল মোর মনে।। যেন লাউসেনে লীলায় করিয়া ফেলে বধ।।
বারবার এবার বুঝিয়া লব ভাই।
লাউসেন মৈলে ঘুচে আপদ বালাই।।'(৯৮২)

এখানে মহামদ নিজের মুখেই বলেছে 'লাউসেন মৈলে ঘুচে আপদ বালাই। মহামদ বরাবরই লাউসেনকে 'আপদ বালাই' ভেবে এসেছে। তাই আতুরের শিশু অবস্থা থেকে একের পর এক চক্রান্ত করে লাউসেনকে হত্যার চেষ্টা করে চলেছে। আর মহামদের বিভিন্ন উক্তি থেকেই এটা পরিস্কার যে দোজবরে বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ হওয়ার রাগেই বারবার লাউসেনকে হত্যার চক্রান্ত করছে এটা ঠিক নয়। প্রকৃত কারণ হল মহামদ প্রথম থেকেই লাউসেনকে 'আপদ বালাই' রূপে দেখে আসছে। তা না হলে এমন নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে না। ভেবে এসেছে - যদি কোন দিন রাজা গৌড়েশ্বর কর্ণসেন রঞ্জাবতীর উপর স্নেহবসত তাদের ছেলেকে মন্ত্রীত্বের আসনে বসিয়ে দেয়, সে তাই অঙ্কুর থেকেই 'আপদ-বালাই'কে বিনাশ করার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু - 'হরি যার সাপক্ষ তাহার কারে ডর। কোলে করে সেনকে রাখে মায়াধর।।' এক্ষেত্রেও তাই হল - মাহুত হাতিকে মদ খাইয়ে মাতাল অবস্থায় রাজসভায় নিয়ে এল। রাজসভার সকলে ভয়ে অস্থির। বলাবলি করতে লাগলো -

'নৃপতি যুঝাবে হাথি বালকের সনে। এত অবিচার যুক্তি দিল কোন জনে।।' ১০৪২

এরপর বীর দর্পে পাত্র এগিয়ে এসে রাজাকে বললো ---

'ভাগিনা কোথায় গেল আইল বারণ। এতক্ষণ আছিলে করি ভারিভুরি।
হাতির সহিত আস্যা যুঝুক এখন।। কার্যকালে জানা যায় কপট চাতুরি।।'(১০৫০)

মামার গঞ্জনা বাক্যে মনে ব্যথা পেয়ে জোড়হাত করে লাউসেন রাজাকে বললেন আপনার আশীর্ব্বাদে আমি হাতি বধ করব। এই বলে গুরুর দেওয়া পাটের পাছড়া কোমরে বেঁধে, গায়ে রাঙ্গা মাটি মেখে, ধর্মরাজের চরণ বন্দনা করে ---

৮৭০, ৮৮০, ৮৮৪, ৮৮৯, ৮৯৪, ৯০২, ৯১২, ৯৫০, ৯৮২ ' হস্তীবধ পালা'র চরণ সংখ্যা।

'হাথির সহিত বীর যুঝিবারে যান। শঙ্করী চরণে শিবে করিবে কল্যাণ।
চান্দরায়ে কৃপা কর প্রভূ ভগবান। ভনে নরসিংহ সাপক্ষ ভগবান।।' (১০৬৬)

হাতির সঙ্গে এক শিশু যুদ্ধ করতে যাচ্ছে দেখে সবাই শিশুকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলো -- 'মনে মনে করে লোক পাত্র যাকু ক্ষয়। সভে বলে সমরে শিশুর হোক জয়।।' এর পর --

'গজে আর মানুষে বাজিল রণ রঙ্গ।'

এক সময় হাতি সেনকে একটু বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল, 'সভাজন দেখ্যা সব হায় হায় করে। পাত্র বলে ভাগিনা গেল্য যমঘরে।।; কিন্তু 'ঈশ্বর রাখেন তারে অশেষ উপায়ে।' লাউসেন প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে প্রথমে মাহুতকে পরে হাতিকে বধ করলেন।

'এমনি পাথরে তুল্যা দিলেক আছাড়। পাট হাথি নিধন দেখিয়া সর্বজন।
মরিল মাণিক রাজ চূর্ণ হৈল হাড়।। সভে বলে ধন্য ধন্য রঞ্জার নন্দন।।' (১১৪৬)

রাজাও লাউসেনের বীরপনা দেখে মহানন্দে সভার মাঝেই বললেন ---

'নৃপতি বলেন শুন গৌড়ের পাতর। হেন যোগ্য ভাগিনা এহানে বাস আন।
মহাবীর লাউসেন রঞ্জার কুঙর।। সংসারে নাহিক খল তোমার সমান।।'(১১৫৪)

এতকান্ডের পরও মহাম্মদ পরাজয় স্বীকার না করে রাজাকে জানালো — 'দেবতা ইহার যদি পক্ষাবল বটে। হাতিকে বাচ্যায়া দেউক রাজার নিকটে।।' (১১৭০) তখন লাউসেন বল্লেন

' আমি কি জীয়াব হাথি জীয়াবে ঈশ্বর।' (১১৮০)

'এতবলি পুষ্পজল মাল্য তপোধন। জয়ধ্বনি চৌদিগে সেনের হৈল জয়।
মাহুত সহিত জিয়া উঠিল বারণ।। লাউসেন কোলে কৈল রাজা সদাশয়।।'(১১৮৪)

সভার লোকজন আবার লাউসেনের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। রাজা তাঁর গা থেকে উত্তরিয় খুলে লাউসেনকে পরিয়ে দিলেন, আর ঘোড়াশাল থেকে তার পছন্দ মত যে কোন ঘোড়া নিয়ে আসতে বললেন ---, লাউসেন ঘোড়াশালে গিয়ে সূর্যের সাত ঘোড়ার এক ঘোড়া ছোটখোঁটা 'অস্তির পাখরকে' নিয়ে এলেন। রাজা লাউসেনকে নানা আভরণ ও শিরোপা দিয়ে পাত্রকে নির্দেশ দিলেন দপ্তরে এর নাম লিখে নাও। রাজ আজ্ঞায় বাধ্য হয়ে পাত্র দপ্তরে লাউসেনের নাম লিখল। রাজা আরও জানালেন —

'লেখ্যা দেও সনন্দ ময়না জায়গীর। একথা শুনিয়া সভে হইল হরিষ।
উপযুক্ত এমন রাখিবা মহাবীর।। (১২৪০) পাত্রের মুন্ডেতে ফের পড়িল কুলিশ।।'

পাত্র মনে মনে ভাবতে লাগল রঞ্জার বেটা রাজার কাছে এত সম্মান পেল। কি করে একে যম ঘরে পাঠানো যায়। তখনই তার চোখ পড়ল খোট্টা ঘোড়ার দিকে, আর মনে মনে বলল ভাগনা -- 'খোট্টা ঘোড়া আন্যাছে যাবেক যমঘরে।' এই অনুমান করে ভাগ্নার অনিষ্ট কামনায় রাজাকে বললো ----

'ঘোড়া চড্যা ঘোড়া লেকু রাজার গোচর। তবে জায়গীর দেব লেখ্যা লব নাম।
যানা যাউক সিফাই কেমন ধনুর্দ্ধর।। নিরর্থক মজাবে ময়না হেন গ্রাম।।' (১২৫০)

মনে ভাবলো এই খোট্টা ঘোড়া চড়ে ভাগ্না পড়ে মরবে। আর ওকে জায়গীর দিতে হবে না। কিন্তু হরি যার সহায় তার ভয়ের কিছু নাই। লাউসেন লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠতেই

১০৪২, ১০৫০, ১০৬৬, ১১৪৬, ১১৫৪, ১১৭০, ১১৮০, ১১৮৪ **'হস্তীবধ পালা'র চরণ সংখ্যা।**

রবির রথে ঘোড়া পক্ষীরাজের মতো আকাশ পথে উঠে সব তীর্থ ঘুরতে চলে গেল। কিন্তু পাত্র ভাবল এবার ঘোড়া সহ উপর থেকে পড়ে ভাগ্নার মৃত্যু অনিবার্য, তাই —

'মনে মনে হরষিত পাত্র মহামদ।
ভাল হৈল মৈল বেটা ঘুচিল আপদ।।' (১২৭২)

সভার লোকজন অধীর আগ্রহে আকাশ পানে চেয়ে আছে, কখন লাউসেন ঘোড়াসহ নেমে আসবে সেই আশায় —

'দেখিতে দেখিতে ঘোড়া হৈল্য উপনীত।
(স)ভাসহ মহারাজা দেখ্যা হরষিত।।
ঘোড়া হৈতে উতরিল রঞ্জার নন্দন।
আপনি নৃপতি উঠ্যা দিল আলিঙ্গন।।
পরওনা নৃপতি লিখন দস্তখতে।
জায়গীর ময়না হইল আজি হইতে।।' (১২৮০)

মহারাজা গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ঘোড়া জোড়া ময়নার জায়গীর দিয়ে সম্মান করলেন। মহারানী ভানুমতিও (রঞ্জাবতীর দিদি অর্থাৎ লাউসেনের মাসি) নানা বসন ভূষণ অলঙ্কার দিয়ে সসম্মানে লাউসেনকে ময়না পাঠালেন। এখানে আমরা দেখলাম ন্যায়, ধর্ম, সত্যের জয়।

কিন্তু মহামদ দেখল এতকান্ড করেও রঞ্জার বেটাকে মারতে পারলাম না, উল্টে মহারাজা-মহারাণী তাকে সম্মান দিয়ে ময়না পাঠালেন। তাই সে মরমে মরে রইল। আর সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

এর কিছু দিনের মধ্যে লাউসেনের সুশাসনে আর পাত্রের অপশাসনে রমতি থেকে লোকজন ময়না গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করল। এই সংবাদে রাজা গৌড়েশ্বর রেগে সভামাঝে পাত্রকে অপমান করে দরবার থেকে বার করে দিলেন।

' ক্রোধ কর্য্যা চাহেন পাত্রের পানে রায়।
বলেন তোর অবিচারে মোর দেশ ভেঙ্গে যায়।।
রাজ্যের দিলাম ভার ভাঙ্গিল মুলুক।
উপযুক্ত না হয় দেখিতে তোর মুখ।।' (৪৯৬)
এত বলি পাত্রকে উঠায়্যা দিল রায়।' (৪৯৯)

রাজসভা মাঝে পাত্র তার এই অপমানকেই লাউসেনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভাবতে লাগল। গদাধর ভাটকে দিয়ে ভৈরবীর জলে নৌকার উপর রাতের বেলায় ঢাক ঢোল নানা বাদ্য বাজিয়ে কামান দেগে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো যা শুনে রাজা ভয় পেয়ে ভাবলেন কেউ বোধহয় গৌড় আক্রমণ করতে এসেছে। তাই পাত্রকে ডাকিয়ে এনে হানাদারদের তাড়িয়ে দিতে বললেন। পাত্র জানাল - লোক মুখে শুনলাম কাঙুর রাজ কর্পূর ধল এসেছে। আমি ওকে এক্ষুণি তাড়িয়ে দিয়ে আসছি। কিন্তু কর্পূরধল কে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে, কাঙুর আক্রমণ করতে হবে। এই কথা শুনে রাজা বললেন কাকে কাঙুর যুদ্ধে পাঠানো যায় ঠিক কর।

'এত শুনি পাতর ভাবেন মনে মনে।
কামরূপ পাঠাইব রঞ্জার নন্দনে।। (৬২০)
যদ্যপি জিনিতে পারে পরম মঙ্গল।
নহে গন্ডকীর জলে যাউক রসাতল।
কন্টকে কন্টক দূর করিবা বিহিত।
শত্রু দিয়া শত্রু নাশ এই সে উচিত।।'৬২৪

এখানেও মহামদ লাউসেনকে তার 'শত্রু' বলে উল্লেখ করেছে (যদিও মোটেই তা

১২৪০, ১২৫০, ১২৭২, ১২৮০ 'হস্তীবধ পালা'র চরণ সংখ্যা।

নয়)। আর এই ভাবনাটাই তার মনে অহোরাত্র আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে আর তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে হিংস্র আচরণের দিকে, রঞ্জাবতী-কর্ণসেন আর লাউসেনের অনিষ্টের দিকে, লাউসেনকে যে কোন ভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টায়। আর সেই চেষ্টাতেই ময়না থেকে লাউসেনকে আনিয়ে তাকে কাঙুর যুদ্ধে পাঠানো হল। কিন্তু ভগবান নিরঞ্জন যার সহায়, যে ন্যায়, ধর্ম সত্যের পথে অবিচল, তার জয় হবেই। তাই ধর্মের কৃপায় লাউসেন তাঁর প্রধান সহচর কালুবীরের সাহায্যে কাঙুর জয় করে ফিরে এলেন। আর শুধু কাঙুর জয়ই করলেন না। কাঙুর রাজ কর্পূরধলের মনও জয় করে তার কন্যা কলিঙ্গাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে আনলেন হিসাব করে সমস্ত বকেয়া রাজস্ব সহ কাঙুর রাজ কর্পূরধলকে। এই সব দেখে তো রাজা মহাখুশি। লাউসেনকে সঙ্গে সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন যা খুশি তুমি নিয়ে যাও। লাউসেনের অনুরোধে কর্পূরধলকে ঘোড়া জোড়া দিয়ে রাজা বিদায় দিলেন। এদিকে লাউসেনের এত জয় জয়কার দেখে মহামদের মাথায় আবার যেমন বজ্রাঘাত পড়ল —

'বজ্রাঘাত পাষণ্ডের পড়িল মাথায়।।' (১০২০)

পাত্রের মনের আগুন আরও বেশী করে জ্বলতে লাগল। সে মনের জ্বালা নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলো।

রাজা গৌড়েশ্বর একদিন তাঁর অধীনস্ত সমস্ত রাজাদের দরবারে ডেকেছেন নানা বিষয় আলোচনার জন্য। রাজা দরবারে এসে রাজন্যবর্গের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কোন্ কোন্ রাজা এসেছেন বা না এসেছেন। দেখলেন ঢেকুরের সোম ঘোষ বা ইছাই ঘোষ ছাড়া সব রাজাই এসেছেন। তখন কায়স্থ মুহুরী খাতাপত্র নিয়ে এসে জানালেন সকল রাজাই রাজকর মিটিয়ে দিয়েছে, শুধু ঢেকুরের ইছাই ঘোষ কুড়ি বছরের খাজনা দেয় নাই।

' সকল দেশের রাজা দেয় রাজকর। ঢেকুরেতে পূজা নাহি বিংশতি বৎসর।।' (৯০)

এই কথা শুনে রাজা তো রেগে আগুন। পাত্রকে খুবই বকাবকি করে বললেন ---- গোয়ালা বেটা অদ্যাবধি কর না দিয়ে দেশ লুটে খাচ্ছে ---

' তার প্রতিকার না কর্‌য়াছ এতদিন।
বুঝি প্রায় টাকা খ্যায়া হৈয়াছ অধীন।। (১০০)

' সব রাজা আস্যাছেন না আসে সোম ঘোষ।
বুঝিলাম এসব প্রপঞ্চ তোর দোষ।।'

এই কথা শুনে পাত্র মহামদ মনে মনে ঠিক করল এই সুযোগে রঞ্জার ছেলেকে ঢেকুর যুদ্ধে পাঠিয়ে দেব, আর এই যুদ্ধে সে নিশ্চয়ই মরবে। —

' অধোমুখে মহাপাত্র ভাবে মনে মনে।
ঢেকুর পাঠায়্যা দিব রঞ্জার নন্দনে।।' ১০৮

সাত পাঁচ মনেতে অনেক অনুভব।
রঞ্জার ঘুচিবে কবে পুত্রের গরব।।

'বিষম ঢেকুর গড় কেবা করে জয়। ১১৩
এবার ভাগিনা তথা মরিবে নিশ্চয়।।

চারিজনা রাউতি হবেক কবে রাঁড়ি।
ময়নার কবে ফেলা যাবে মরা হাড়ি।। (১২০)

বারে বারে বেটা সব ঠাঞি জয় করে।
এবার ঢেকুর গেলে যাবে যম ঘরে।।

কতদিনে কর্ণসেনে করি আঁটকুড়া।
পুত্রশোকে কতদিনে মরিবেক বুড়া।।'

মহামদের এইসব উক্তি থেকেই তার কুটিল ও হিংস্র মনোভাব প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। সে চাইছে লাউসেনকে হত্যা করে রঞ্জাবতীকে পুত্রহারা করবে, কর্ণসেনকে আটকুড়া করে যমঘরে পাঠাবে। সর্বোপরি নিরীহ নিরাপরাধী তার কন্যাসম লাউসেনের চার পত্নীকে বিধবা (রাঁড়ি)

৪৯৬, ৪৯৯, ৬২০, ৬২৪, ১০২০, 'কাঙুর মহিম যাত্রা'র চরণ।

করে , ময়নার রাজবাড়ি থেকে মরা হাড়ি ফেলে তবে সে শান্তি পাবে। এটা কি বৃদ্ধ দোজবরে কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিয়ে হয়েছিল বলে, কিম্বা রঞ্জাবতী এই বিবাহে আপত্তি জানাই নাই বলে তার প্রতিক্রিয়া? না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। সব দাদাই তার ছোট বোনকে খুবই ভালবাসে কিন্তু এটা ভালবাসার লক্ষণ নয়। আগেকার দিনে মা বাবা মেয়েকে যে পাত্রে পাত্রস্থ করতেন মেয়েরা মুখ বুজে তা মেনে নিতো। তাছাড়া মহামদ তো কোনোদিন তার মা বাবা বা বোনকে বলে নাই যে মহামদ নিজে বোনের পাত্র নির্বাচন করবে। তার মনের কথা অন্য কেউ জানবে কি করে? তাই মহামদের এই কুটিল হিংস্র মনোভাবের পিছনে রয়েছে তার কর্মচ্যুত হওয়ার ভয়। তাই লাউসেনকে ঢেকুর যুদ্ধে পাঠাবার জন্য রাজাকে বললেন —

‘ বিস্তর চাকর আছে বস্যা ক্ষেম খায়।
ভালমন্দ কাহাকেও নহি লাগে দায়।।’১২৬

‘যদি রাজা জয় ইচ্ছা করেন ঢেকুর।
লাউসেনে পাঠাও সে বটে মহাসুর।।’ (১৩০)

লাউসেনকে প্রকৃত বীর এবং ধর্মরাজের কৃপাপুষ্ট ভেবেই গৌড়েশ্বর তাঁকে ঢেকুর যুদ্ধে পাঠালেন, যুদ্ধের প্রথম পর্বেই লাউসেনের প্রধান সহচর কালুবীর সিং ইছাই এর প্রধান অনুচর লোহাটা বজ্জরকে নিহত করে।

‘ নাকানি চুবানি খায় লোহাটা বজ্জর।
পাড়ের ওপরে উঠে ধনুকের নর।।

ধাত্তাধাই কালুবীর ধরে তাড়াইয়া।
টাঙ্গি দিয়া তার মুন্ড নিলেক কাটিয়া।।’ ৭৬৮

লাউসেন তখন কালুবীরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন এই বেটাই আগের যুদ্ধে আমার ছ'ভাইকে কেটেছিল। এর মুন্ড গৌড়েশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দাও। তিনি দেখে খুব আনন্দিত হবেন। লোহাটা বজ্জরের মুন্ড দেখে গৌড়েশ্বর খুবই আনন্দিত হলেন, কিন্তু পাত্রের মাথায় যেন আবার বাজ ভেঙ্গে পড়ল ---

‘লোহাটার মরণে হরিষ নৃপবর।
বলেন এই বেটা কাট্যাছিল আমার লস্কর।

লাউসেন ধন্য বল্যা বাখানিল রায়।
শুনিয়া কুলিশ পড়ে পাত্রের মাথায়।।’(৭৮৬)

আর তখনই মহামদ আরও নিষ্ঠুর পৈশাচিক এক চক্রান্ত মাথায় নিয়ে এল। যা কোন দাদা তার ছোট বোনের বিরুদ্ধে করতে পারে না, আর আমরা সেই চক্রান্ত কল্পনাই করতে পারি না, কিন্তু কুচক্রী, উচ্চাভিলাষী, হিংস্র কুটিল মহামদের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। তাই লোহাটার কাটা মুন্ড দেখে ---

‘ মনে মনে করে পাত্র ইবে করি কি।
এই মুন্ড ময়নাকে পাঠাইয়া দি।
লাউসেন কাটা গেল ঢেকুর ভুবনে।
তার মুন্ড মহারাজা পাঠাল্য আপনে।।

পুত্রশোকে রঞ্জাবতী ত্যাজিবে জীবন।
অনুমৃতা হবেক রাউতি চারিজন।।
কর্ণসেন বুড়া বেটা ত্যজিবে জীবন।
এ কৌশল সিদ্ধ হবে আমার মনন।।’ (৮০০)

লোহাটার কাটা মুন্ডুকে নিয়ে আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারি মত কোন পদ্ধতিতে নিপুন কামিলা দিয়ে হুবহু লাউসেনের মুখের মত মুন্ডু তৈরী করে রঞ্জাবতীর কাছে পাঠাবার জন্য কামিলাদের ডেকে বললো--- ‘এ মাথার উপরে গড়িয়া দেহ লাউসেনের মাথা।’ আরও নির্দেশ দিল —

‘বর্ণভেদ কর্‍্যা যেন চিনিতে না পারে।
সেনের বলিয়া মুন্ড পাঠাব রঞ্জারে।।’

এত বলি প্রত্যক্ষ সভাকে দিল পান।
রাতারাতি করে সভে মস্তক নির্মাণ।।’(৮২৪)

৯০, ১০০, ১০৮, ১১৩, ১২০, ১২৬, ১৩০, ৭৬৮ ‘ মায়ামুন্ড পালা’র চরণ সংখ্যা।

চিন্তিতে পরের মন্দ আপনাকে ধরে

তারপর এই মায়ামুন্ড ইন্দ্রজাল মেটের হাতে দিয়ে বল্লো ---

' অবিলম্বে যাহ তুমি ময়না নগর।	'বল্য ঢেকুর মহিমে মৈল তোমার তনয়।
সমাচার দেওগা রঞ্জার বরাবর।।	তার মুন্ড পাঠাল্য ভূপতি মহাশয়।।'(৮৫০)

অবশ্য এ ব্যাপারে গৌড় রাজ কিছুই জানেন না। যাইহক্ পাত্রের কথামত ইন্দা মায়া মুন্ড নিয়ে

' রাতারাতি উপনীত ময়না নগরে।	বলে ঢেকুর সমরে মৈল তোমার নন্দন।
মুন্ড লৈয়া দিলেক রঞ্জার বরাবরে।।'৮৫৬	সে মুন্ড পাঠ্যায়্যা দিল তোমাকে রাজন।।' (৮৬০)

এই তো দেখা গেল বড় দাদাব নিষ্ঠুর কাজের নমুনা। এটা কি ছোট বোনের বৃদ্ধ দোজবরে বিয়ে হয়েছে বলে? বা ছোট বোন এই বিয়েতে অমত করে নাই বলে তার প্রতিক্রিয়া? না, সাধারণভাবে তা কখনই হতে পারে না যদি না তার মনে বিশেষ স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটা তার প্রচন্ড হিংসার বহিঃপ্রকাশ। তাই সে বার বার লাউসেনকে হত্যা করতে চেয়েছে, তার মা বাবা এবং নব বিবাহিত স্ত্রীদের বিধবা করতে কিম্বা হত্যা করতে চেয়েছে। যাই হক্ তার অনুমান অনুযায়ী মায়ামুন্ডকে লাউসেনের মুন্ড ভেবে রঞ্জাবতী মাটিতে আছাড় কাছাড় করতে করতে অচেতন হয়ে পড়লেন। কর্ণসেন মূর্ছা গেলেন আর সেনের চার স্ত্রী বৈধব্য জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনুমৃতা বা সহমরণের জন্য কালিন্দীর ঘাটে গেলেন ---

' হাতেমুন্ড রঞ্জাবতী করেন রোদন।	'অভাগী মায়ের প্রাণ ধরা নাহি যায়।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হৈয়া অচেতন।।'৮৬৪	শুনিয়া মূর্চ্ছিত হৈল কর্নসেন রায়।।' (৮৯৪)

এদিকে চর্তুদলে চেপে 'চারিজনা রাউতি চলিলা আগ্নিখেতে'

কিন্তু ভগবান সবসময় ন্যায় ও সত্যের পক্ষে থাকেন, তাই লাউসেনের পত্নীরা যখন অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিতে যাবেন তখনই হনুমানকে গণকের ছদ্মবেশে ময়না পাঠিয়ে আসল ঘটনা জানিয়ে দিলেন এবং ছদ্মবেশী হনুমান মায়ামুন্ড থেকে প্রলেপ উড়িয়ে দেখালেন যে এটা লাউসেনের মুন্ড নয়, লোহাটা বজ্জরের মুন্ড, আর বললেন লাউসেন ঢেকুরে কুশলেই আছেন। এই কথা শুনে ও লোহাটার মুন্ড দেখে সবাই আনন্দিত মনে বাড়ি ফিরে গেলেন।

লোহাটার মৃত্যুর পর ভগবান নিরঞ্জনের কৃপায় লাউসেন ইছাইকে হত্যা করে সমস্ত বকেয়া কর সহ ইছাই এর পিতা সোমঘোষকে গৌড়ে নিয়ে এলেন। এতে গৌড়েশ্বরের খুবই আনন্দ হল, কিন্তু পাত্রের মাথায় যেন আবার বাজ ভেঙ্গে পড়লো ---

' ইছাই নিধন হল্য শুনিয়া রাজন।	ধন্য ধন্য বলে সভে রঞ্জার কুঙর।
লাউসেনে নৃপতি দিলেন আলিঙ্গন।।	শুনিঞা পাত্রের মুন্ডে পড়িল বজ্জর।।
বাপধন বলিয়া মুখের চুম্ব খান।	মনে করে বেটার সকল ঠাঞি যশ।
নানা ধন দিয়া রাজা করিল সম্মান।।	পুনর্বার দিব লেঠা যাকু দিন দশ।।' (১১০৮)

মহামদের মাথাতে সব সময় একটা চিন্তাই ঘুরছে কি করে রঞ্জার ছেলেকে যমঘরে পাঠানো যায়। দরবারে ভাগবত পাঠ হচ্ছে, রাজা একমনে ভাগবত শুনছেন, কিন্তু পাত্রের মন অন্যদিকে, তাই কবির কথাতেই বলা যায় —

' ঠক না বড়ের চিত্ত স্থিরতর নয়।
সদা চিন্তা যাহাতে পরের মন্দ হয়।।'

৭৮৬, ৮০০, ৮২৪, ৮৫০, ৮৫৬ ' মায়ামুন্ড পালা'র চরণ সংখ্যা।

'হেট মাথা করিয়া ভাবিছে মহামদ। মনে মনে মন্ত্রনা করিল সরোদ্ধার।
লাউসেনে কোন রূপে করি আমি ক্ষয়।। ধর্মপূজা করা তার করিব সংহার।।
রঞ্জা আটকুড়ি হল্যে বড়সুখ পাই। বাম হাথে ফুল দিব তার নাম ধর্যা।
কোন মন্ত্র জপি কোন সিদ্ধ পীঠে যাই।। করিলে বিরূপ পূজা সে যাবেক মর্যা।।' (৮২)

এই চিন্তা করে মহামদ গৌড়েশ্বরকে বললো - মহারাজ ধর্মপূজা করে রঞ্জার বেটা সকল স্থান জয় করেছে, আপনিও ধর্মপূজা করুন যাতে যুগে যুগে গৌড়ের অধিপতি হতে পারবেন আর আমি আপনার পাত্র হয়ে থাকতে পারব। পাত্রের যুক্তিতে রাজা ধর্মপূজার আয়োজন করলেন এবং একমনে ধর্মের পূজা করতে লাগলেন, কিন্তু পাত্রের মন অন্যদিকে -

'একভাবে পূজেন ভূপতি গৌড়েশ্বর। তিন দিনে যদি লাউসেন মর্যা যায়।
দু'মন করিয়া পূজে মামুদ্যা পাতর।। তার বড় বেটা বলি দেব দাদুড় ঘাটায়।।' ২৬৮
বাম হাতে গন্ধ দেই বামহাতে ফুল। 'মনে এই মানস করিয়া পাত্রবর।
মনে বলে সেনে ধর্ম করহ নির্মূল।। ফুল জল দেই ধর্ম পাদুকা উপর।।' (২৭২)

এখানে দেখা গেল লাউসেনের মৃত্যু কামনায় পাত্র বাঁ হাতে ধর্মের পূজা করছে, আর লাউসেনের তিনদিনের মধ্যে মৃত্যু হলে তার শিশু পুত্রকেও বলি দেবে বলে মানত করেছে। এই ঘটনা থেকেও মহামদের নিষ্ঠুর হিংস্র মনের পরিচয় পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু কারুর মৃত্যু কামনায় ঠাকুরের পূজা করলে ঠাকুর সে পূজায় সাড়া দেয় না, উল্টে সেই বিপদে পড়ে। এখানেও তাই হল। বাঁ হাতে পূজা দেওয়া আর তার সঙ্গে অন্যের মৃত্যু কামনা করায় ঠাকুরের বাম অঙ্গ জ্বালা পোড়া করতে লাগল! ঠাকুর অঘোর বাদল দিয়ে সব ভাসিয়ে দিলেন। ঝড় বৃষ্টি বাদল আর থামে না। তখন আবার লাউসেনের ডাক পড়ল, লাউসেন গৌড়ে এসে রাজাকে আর তার মাতুলকে প্রণাম করে বললেন —

'বিষম ধর্মের ঘর এক মন চাই। দু'মন করিলে পড়ে আপদ বালাই।।' (৪৬২)

মহামদ বৃষ্টি বাদল আর শীতে কাতর হয়ে জোড়হাত করে লাউসেনকে বললো —

'ভাগিনা বাঁচাও প্রাণ ঘুচাও বাদল।' (৪৫৭)

লাউসেন তখন ভক্তিভাবে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রভূ নিরঞ্জনের পূজা করতে লাগলেন —

'ভক্তের অধীন ধর্ম্ম ভকত বৎসল। কৃপাদৃষ্টে ঘুচালেন অঘোর বাদল।।' (৪৭০)

গৌড়ের সকলে লাউসেনকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। রাজা মহানন্দে লাউসেনকে নানা ধনরত্ন দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। কিন্তু যে পাত্র লাউসেনের হাতে ধরে বাঁচাতে বলেছিল বেঁচে যাওয়ার পর 'সেই পাত্র বলে এহাকে আদর এত কেনে।' 'ঝড় বিষ্টি বাদলের রীত এই বটে,যাইহোক রাজা পাত্রের কথা না শুনে লাউসেনকে নানাভাবে সম্মানিত করলেন।

এদিকে অঘোর বাদলে ধর্মপূজা অসমাপ্ত রেখে পাত্র ঘট বিসর্জন করে দিয়েছে। তার প্রভাবে গৌড়ে নেমে এসেছে অমঙ্গলের ধারা, চারিদিকে মড়ক লেগেছে। প্রজারা গৌড় ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, রাজা তখন পাত্রকে শুধালেন কার পাপে গৌড়ের এমন অবস্থা হল। পাত্র আসল কারণ না বলে ভাগ্নাকে যমঘরে পাঠাবার কথা ভাবতে লাগল।

৮৬০, ৮৬৪, ৮৯৪, ১১০৮, ' মায়ামুন্ড ও ইছাইবধ পালা'র চরণ সংখ্যা।

চিন্তিতে পরের মন্দ আপনাকে ধরে

'হেঁট মুখে নাবড়ি ভাবেন পাত্রবর।
ভাগিনাকে কি কর‍্যা পাঠাই যম ঘর।।
বারে বারে বেটা সব কার্য্য করে জয়।

এবার পাঠাব দিতে পশ্চিমে উদয়।। (৫১০)
পশ্চিমে উদয় রবি কভূ না হইবে।
এবার সেনের বেটা সেখানে মরিবে।।' ৫১২

এবার মহামদ এমন একটা পরিকল্পনা করল যা দেবতারও প্রায় অসাধ্য। তাই রাজাকে বুঝালো বার দন্ড পশ্চিমে যদি রবির উদয় দেখেন তাহলে আপনি এই পাপ থেকে মুক্তি পাবেন। আর এই কাজ একমাত্র লাউসেনের দ্বারাই সম্ভব। আর পশ্চিমে উদয় দিতে যাবার আগে তার মা বাবাকে গৌড়ে পণবন্দী রেখে যেতে হবে, তা না হলে ও বেটা পালিয়ে যাবে। তাই ওর মা বাবা এখানে না আসা পর্যন্ত - ও বন্দী থাকবে। ও'র মা বাবা এখানে এলে ওকে পশ্চিমে উদয় দিতে ছাড়া হবে। এই বলে লাউসেনকে বন্দীশালে পাঠালো।

'লাউসেনে বন্দীশালে নিল পোতা মাঝি।
পাত্র বলে বেটাকে দিলাম ভাল বাজি।।
ইন্দ্রজালে বিরলে বলেন পাত্রবর।
এমন বান্ধিবে যেন যায় যম ঘর।। ৬২৮
লাউসেন মর‍্যা গেলে পাবে নানা ধন।
জায়গীর কর‍্যা দিব ময়না ভূবন।। (৬৩০)
পাত্রের বচনে ইন্দা গেল কারাগারে।
বত্তিশ বন্দনে বান্ধে রঞ্জার কুমারে।।
হাথে হাথকড়ি দিল গলায় শিকল।
বুকে তুল্যা দিলেক পাথর জগদল।। ৬৩৪

ডাডুকি দিলেক পায় ভারি দশমন। ৬৩৫
গলায় দিলেক হাড়ি শংশয় জীবন।।
জটে দড়ি দিয়া টাঙ্গি চালের বাতায়।
উমা মুড়ি খাল্য সেন তুষের ধুআয়।।' ৬৩৮
খরসান খুর সব রাখে দুই পাশে।
নড়িতে চড়িতে মাংস কাটে অনায়াসে।। (৬৪০)
সোনার শরীর হৈল ধূলায় ধূসর।
কান্দেন করুণা কর‍্যা রঞ্জার কুঙর।।
দেখ্যা শুন্যা কর্পূর কান্দিয়া অচেতন।
বলেন এবার দাদার দেখি সংশয় জীবন।।'(৬৪৪)

মহামদ তার ভাগনা ধর্মসেবক, নিরপরাধ, পরোপকারী লাউসেনকে বন্দীশালে পাঠিয়ে যে নির্মম অমানবিক অত্যাচার করেছে তা কোন মামা সাধারণ অবস্থায় (কংস ছাড়া) করতে পারে বলে ভাবা যায় না। কিন্তু একটা মিথ্যা ভয় আর হিংসা তাকে করে তুলেছে পশুর অধম। লাউসেনের উপর মহামদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তার ছোটভাই কর্পূর কাঁদতে কাঁদতে ময়না গিয়ে রঞ্জাবতী ও কর্ণসেনকে গৌড়ে নিয়ে এলেন। পাত্রের হুকুমে রঞ্জাবতী আর কর্ণসেনকে ভাল করে বেড়ি দিয়ে বন্দীশালে রেখে লাউসেনকে মুক্ত করে পশ্চিমে উদয় দিতে যেতে বললো, --- আর সেটাও তাকে লিখে দিয়ে যেতে হল। 'দিবেক পশ্চিমোদয় লেখ্যা পড়্যা লেও।' লাউসেন লিখিত মুচলেখা দিয়ে মায়ের কাছ থেকে পথঘাটের বিবরণ জেনে নিয়ে ব্রাহ্মণ পন্ডিত, হরিহর ঢাকি ও সঙ্গযাতদের সঙ্গে নৌকা যোগে হাকন্ড ভুবন যাত্রা করলেন ধর্মপূজা করে পশ্চিমে উদয়ের বর পাবার জন্য। নদী নালা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে প্রাণ হাতে করে সেতুবন্ধ পেরিয়ে ভারতের পশ্চিমে হাকন্ড ভুবন পৌঁছালেন। সেখানে গিয়ে ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে সাধনা আরম্ভ করলেন।

এদিকে পাত্র ভাবতে লাগলো ভাগ্নাকে পশ্চিমে রবির উদয় দিতে পাঠিয়েছি, যা মোটেই সম্ভব নয়, সেনের বেটা সেখানে অবশ্যই মরবে, আমি ময়না দখল করব। লাউসেনের

৮২, ২৭২, ৪৬২, ৪৫৭, ৪৭০ 'অঘোর বাদল পালা'র চরণ সংখ্যা।

পত্নীদের হাড়িমুচিদের বিলিয়ে দেব, আর ওর ছেলে চিত্রসেনকে পার্বতীর কাছে বলি দেব।

'অধোমুখে পরামর্শ করে মনে মন।
ময়না করিব নষ্ট এই মোর পণ।।' ৩৭০

আমি হেথা সাথে লয়্যা রাজার লস্কর।
মহামারি দিব গিয়া ময়না উপর।।' (৩৮০)

'পশ্চিমে উদয় রবি কদাচ না হবে। ৩৭৭
এবার সেনের বেটা সেখানে মরিবে।।

'হাড়ি মুচি গনে দিব সেনের যুবতী। ৩৮৩
চিত্রসেনে বলি দিয়া পূজিব পার্বতী।।'

এই অংশ থেকেও মহামদের একটা হিংস্র কদর্য নীচ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মহামদ পুত্রবধূ-সম সেনের পত্নীদের হাড়ি মুচিদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার আর শিশু চিত্রসেনকে বলি দেবার পরিকল্পনা করছে। এই পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে পাত্র দলবল নিয়ে ময়না আক্রমণ করল, ছলে বলে কৌশলে পাত্র ও তার চরেরা কালুবীর ও তার ছেলেদের হত্যা করল। এরপর নিতান্ত বাধ্য হয়ে লাউসেনের বড়রাণী কলিঙ্গা, যিনি সমরে খুব নিপুণ ছিলেন, লাউসেনের ঘোড়া অভির পাখরকে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কলিঙ্গা যুদ্ধে আসছে দেখে

'হাসান হুসেন ডাক্যা বলে পাত্রবর।
সাবধানে মিঞা সব কলিঙ্গাকে ধর।।

নিকা কর‍্যা লয়্যা রাখ মহল ভিতরে।
এমন ঢেমন মায়্যা না দেখি সংসারে।। (২২০৪)

পাত্রের এই সব কথা শুনে হাসান হুসেন খুব আনন্দিত হয়ে নানা রকম উপহাস করতে করতে কলিঙ্গাকে চারিদিকে ঘিরে ধরল। কলিঙ্গা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে প্রাত্রের বহু সৈন্যকে নিহত করল। 'কলিঙ্গার রণ দেখ্যা পাতরের ভয়। মনে করে আজি প্রাণ রয় বা না রয়।।' কিন্তু হঠাৎ করে তার তীর শেষ হয়ে যায়, তখন চার দিক থেকে যবন সেনারা ঘিরে ফেলে কলিঙ্গাকে মেরে ফেলে। কলিঙ্গার মৃত্যু সংবাদে ময়নায় নেমে এল শোকের ছায়া।

এদিকে হাকন্ড ভূবনে প্রায় দশমাস ধরে আরাধনা করেও লাউসেন যখন পশ্চিমে উদয়ের বর পেলেন না তখন নিজের দেহকে ন'খন্ড করে যজ্ঞকুন্ডে আহুতি দিলেন। তখন প্রভূ ধর্মরাজ যজ্ঞকুন্ডের কাছে এসে লাউসেনের খন্ডিত দেহ জোড়া লাগিয়ে তাতে নিজের পদ্মহাত বুলিয়ে লাউসেনের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন, এবং লাউসেনের অনুরোধে পশ্চিমে রবির উদয়ের বর দিলেন আর সেই অনুরোধ রক্ষার জন্য সূর্যকে ডেকে বললেন --- তোমাকে এক অসাধ্য সাধন করতে হবে যেটা তোমার একচক্র রথে সম্ভব নয়। সে কাজটা হল তোমাকে পশ্চিমে উদয় দিতে হবে, তাবজন্য তুমি আমার রথে আরোহন কর। এই রথ অনুক্রমে বাইশ চক্রে ঠিক পশ্চিমে উদয় হবে। প্রভূ নিরঞ্জনের কথামত সুর্যদেব ঠাকুরের রথে চেপে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে অনুক্রমে পশ্চিমে উদয় দিলেন।

'ঘোর অন্ধকার রাতি দ্বিতীয় প্রহর।
সহস্র কিরণেতে উদয় দিবাকর।।

সর্ভে হরি হরি বল পশ্চিমে উদয়।
শঙ্খধবনি জয়ধবনি চারিদিকে হয়।।' (৩৩৭৮)

রাজা গৌড়েশ্বরও সেই দৃশ্য দেখে দান ধ্যান করলেন, কিন্তু পাত্রের মাথায় যেন বাজ পড়ল।

'গৌড়ে থাক্যা দেখেন ভূপতি গৌড়েশ্বর।
ভূপতি বলেন ধন্য রঞ্জার কুঙর।।' (৩৪০০)

'অশ্ব গজ অন্ন ভূমি দিলেন বিস্তর।
দেখিয়া পাত্রের মুন্ডে পড়িল বজ্জর।।'

তখন সে রাজাকে বললো - পশ্চিমে উদয় কখনও শুনি নাই, জয়া ধোপার ঘরে আগুন লেগেছিল সেই জ্যোতি দেখে আপনি অকালে দান করছেন।

পশ্চিমে উদয় দেখার পর লাউসেন গৌড়ে ফিরে আসেন, মনে মনে বলেন প্রথমে

৫১০, ৬৩০, ৬৩৪, ৬৪০, ৬৪৪' অঘোর বাদল পালা'র চরণ সংখ্যা।

বন্দীশালে গিয়ে মা বাবার সঙ্গে দেখা করে পরে রাজার সঙ্গে দেখা করব।

'এত বলি বন্দীশালে যান লাউসেন। অন্নহীন মলিন বসন বেড়ি পায়।
দূর হৈতে পিতা মাতা দুহাকে দেখেন।। সেন দুঃখ দেখ্যা দুহার করেন হায় হায়।।' (৬০)

লাউসেন গৌড়ে এসে বন্দীশালে মা বাবার সঙ্গে দেখা করেছে এই সংবাদ পোতা মাঝি সঙ্গে সঙ্গে পাত্রকে দিয়ে এল ---

'অবিলম্বে পাত্র চলিলা কারাগারে। লাউসেনে দেখিয়া সর্বাঙ্গ গেল জ্বল্যা।
(মনে কত গালি পাড়ে ভগিনী) রঞ্জারে।। চুলে ধর্‍্যা অপমান চোর বেটা বল্যা।।' (৯২)

তারপর চুলের মুঠি ধরেই লাউসেনকে রাজার কাছে নিয়ে গেল ---

'চোর বল্যা চুলে ধর্‍্যা করে অপমান। দুই পায়ে ভায়ের ধরিয়া রঞ্জাবতী।
ধরা লয়্যা চল্যা গেল রাজার বিদ্যমান।। সকরুণ হয়্যা রাণী করেন মিনতি।।' (১০৮)

রাণী রঞ্জাবতী ভায়ের দু'পা ধরে লাউসেনকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন — কিন্তু,

'খল কি সরল হয় না শুনে বচন। কহিতে লাগিল পাত্র রাজ সন্নিধান।
লাউসেনে বান্দ্যা লয়্যা করিলা গমন।। পৃথিবীতে ধূর্ত নাঞি ভাগিনা সমান।।'(১০৬)

তারপর লাউসেনের নামে মিছে করে বললো --- ও' রাজসভায় বলে গেল পশ্চিমে উদয় দেবে কিন্তু কোথাও না গিয়ে ঘরে লুকিয়েছিল, আর কলিঙ্গার বেশ ধরে আমাদের দলবলকে কেটে শেষ করেছে, আমাকেও কাটতে চেয়েছিল, ভাগ্যের জোরে আমি প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি। আবার এখানে এসে ওর মা বাবাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, আর তখন সবাই আমারই দোষ দিত। তাই আমি ওকে আপনার কাছে ধরে এনেছি। মামার কথা শুনে লাউসেন জোড়হাত করে রাজাকে হাকন্ডে ধর্মপূজার কথা, নিজের দেহ ন'খন্ড করে প্রাণত্যাগ করার কথা, তারপর ধর্মের কৃপায় প্রাণ ফিরে পেয়ে পশ্চিমে রবির উদয়ের সব কথা বললেন।

এই কথা শুনে পাত্র উপহাস করে বললো - ভাগ্না মিছে কথা বলতে খুব ভাল জানে, যদি ওর দেহ ন'খন্ড করেছিল সে দাগ কোথায় গেল, ---

'এত শুনি হাস্যা পাত্র চান চারিপানে। 'যদি নব খন্ড হয়্যা কর্‍্যা ছিল প্রাণত্যাগ।
মিছা কথা কহিতে ভাগিনা ভাল জানে।।' ১৫০ গায়ে তবে অবশ্য থাকিত অস্ত্র দাখ।।
এত বলি মহাপাত্র হাসে খল্‌খল্‌।
ভনে নরসিংহ যার ধর্মপক্ষাবল।।' (১৬০)

পাত্রের কথায় আর উপহাসের জবাবে লাউসেন ঠাকুর নিরঞ্জনকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলেন

'অকস্মাৎ গায়ে উঠে নবখন্ড দাগ। মনে মনে করে পাত্র করি কি উপায়।
যেইখানে কাতি দিয়া কাট্যাছিল মাস।।' ১৯২ সম্মান পাইল বেটা রাজার সভায়।।
রাজসভা দেখিয়া সকলে সচকিত। ১৯৫ কোন বুদ্ধে ইহার করাই অপমান।
গৌড়েশ্বর ভূপতি দেখিয়া ভয়ে ভীত।। কি উপায়ে ভাগিনা যমের ঘর যান।।
লাউসেনে সম্মান করিল নৃপবর। কতদিনে আটকুড়ি হয় রঞ্জাবতী।
দেখিয়া পাত্রের মুন্ডে পড়িল বজ্জর।। কর্ণসেন কবে বা যাইবে অধোগতি।।' ২০৪

৩৭০, ৩৭৭, ৩৮০, ৩৮৩, ২২০৪, ৩৩৭৮, ৩৪০০, ৩৪০৪ পশ্চিম উদয় পালার,
৬০, ৯২, ১০৮, 'স্বর্গারোহন পালা'র চরণ সংখ্যা।।

এত কান্ডের পরও ভাগ্নাকে যমঘরে পাঠাবার চিন্তায় পাত্রের ঘুম নাই, — তাই রাজাকে বলল

'ভাল বঠে ভাগিনা ভোজের বাজি জানে।
এক বাজি এখনি দেখাল্য এই খানে।।' ২১০
'কখন না শুনি রবি পশ্চিমে উদয়। ২১৭
কলিযুগে দেবতা মানুষে কথা কয়।।
কখন শুনেছ রবি রাত্রে দেয় দেখা।
ভারথ পুরাণেতে কোথায় আছে লেখা।।
ভাল বঠে ভাগিনা দেখায় ভোজবাজি।
মিছা কথা কহিয়া হইল মর্দ্দ গাজি।।' (২৩২)

এই বলে মনে মনে খুব গর্ব অনুভব করতে লাগল, ভাবল ভাগনাকে উ পযুক্ত জবাব দিয়েছি, আর রক্ষে নাই, কারণ ভাগ্না লিখে দিয়ে গিয়েছিল পশ্চিমে উদয় দেবে, কিন্তু সে কাজ পারে নাই, তাই এবার তার নির্ঘাত শূলি হবে। এমন সময় লাউসেন জোড়হাত করে গৌড়েশ্বরকে জানালেন মহারাজ আপনার সামনে মিছে কথা বলার আমার কি যোগ্যতা আছে, আর —

'আগে হতে ইহা আমি জানি মহাশয়।
মাতুলের আমাকে না হবেক প্রত্যয়।।
একারণে সাক্ষী আমি কর্য্যাছি সেখানে।
বিশেষ সকল কথা হরিহর জানে।।' (২৪২)

প্রভূ নিরঞ্জনের কৃপায় দিবাকর যখন পশ্চিমে উদয় দিলেন, হরিহর ঢাক বাজিয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়েছিল। পাত্র মনে মনে ভাবল হরিহরকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে লাউসেনকে যম ঘরে পাঠাবো।

'এত অনুমান কর্য্যা চলিল তুরিত।
রাজার ভান্ডারে যায়্যা হল্য উপনীত।।
সিন্দুকে আছিল এক সহস্র মোহর।
চুরি কর্য্যা লয়্যা পাত্র চলিল সত্বর।।
উপনীত হল্য পাত্র বাইতির ঘরে।
ঘন ঘন পাতর ডাকেন হরিহরে।।' ২৬০
'এত শুনি বাইতিকে বলে পাত্রবর।
আন্যাছি তোমার তরে সহস্র মোহর।' ২৬৬
'পশ্চিমে উদয় দিয়া লাউসেন রায়।
তোমাকে মান্যাছে সাক্ষী রাজার সভায়।। (২৭০)
যদি তুমি বলহ উদয় দেই নাঞি।। ৩৪০৪
রাজার সম্মুখে রহে আমার বড়াঞি।।'

হরিহর খুবই ধর্মভীরু, একনিষ্ঠ ধর্মের সেবক কিন্তু হঠাৎ লোভে পড়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি হয়ে গেল। তখন বৈকুন্ঠে বসে প্রভূ নিরঞ্জন দেখলেন মহা বিপদ। হরিহর মিথ্যা সাক্ষী দিলে সেবক লাউসেন মহা বিপত্তির মধ্যে পড়বে। তাই তিনি দেবী সরস্বতীকে ডেকে বললেন — তুমি গৌড়ের রাজসভায় হরিহরের কণ্ঠে গিয়ে বসবে, আর তার মুখ দিয়ে পশ্চিমে উদয়ের সমস্ত ঘটনা সত্য করে বলবে। হরিহর কোশাকুশিতে তিল তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে পাত্রের নির্দেশে —

'যেই মিথ্যা বলিতে বাইতি দিল মন।
সত্য কথা সরস্বতী বলাল তখন।।' (৩৮২)

হরিহর বাইতি রাজসভায় দাঁড়িয়ে লাউসেনের হাকন্ডে গিয়ে দশমাস ধরে ধর্মপূজা, নিজের দেহ ন'খন্ড করা, তারপর প্রভূ নিরঞ্জনের দয়ায় বর লাভ, বার দন্ড দিবাকরের পশ্চিমে উদয়, আর সেই সময় হরিহরের বাদ্য বাজানো সবই জানালো। তখন —

'সেনকে বসাল্য রাজা আপন গোচর। হাথে ধর্য্যা গৌরব করিল নৃপবর।।' (৪০০)

হরিহর সত্যকথা বলায় এবং লাউসেনকে রাজা সম্মান করায় —

১০৬, ১৫০, ১৬০, ১৯২, ১৯৫, ২০৪, ২১০, ২১৭, ২৩২, ২৪২, 'স্বর্গরোহন পালা' চরণ সংখ্যা।

চিন্তিতে পরের মন্দ আপনাকে ধরে

'মনে করে পাতর সম্মান পাল্য বেটা।

পুনর্বার এহাকে কি দিব আমি লেঠা।।' (৪০৪)

লাউসেন প্রভূ ধর্মরাজের কৃপায় প্রায় দেবতারও অসাধ্য পশ্চিমে রবির উদয় দিয়েছে জানতে পারায় মহামদ নতুন করে চিন্তা করতে লাগল, লাউসেনকে কি করে জব্দ করা যায়, আরও ভাবল তার আগে হরিহরকে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে। খল কুচক্রী মহামদ তো জানে না সত্যকে রক্ষা করার জন্য ভগবান নিরঞ্জন সরস্বতীকে পাঠিয়ে হরিহরের মুখ দিয়ে সত্য কথা বলিয়েছেন। সে মনে মনে ভাবল —

'চোর বল্যা ধরাবো বাইতি হরিহরে। সমুচিত সাজায় এহাকে চাহি দিতে।।'

এই কথা ভেবে মহাপাত্র রাজাকে গিয়ে জানালো — সিন্দুকেতে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ছিল সে সব চুরি হয়ে গেছে। সেই কথা শুনে রাজা কোটালকে বললো যে কোন উপায়ে চোর ধরে নিয়ে আসতে হবে। কোটাল হরিহরের মুখ দেখেই ধরে ফেলল — এর কাছেই রাজকোষের সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আছে — তখন সেই স্বর্ণমুদ্রাসহ হরিহরকে রাজসভা নিয়ে গেল। মহাপাত্র রাজাকে বলল - মহারাজ 'শুলি দিলে এহার উচিত শাস্তি হয়।' এই বলে ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে শুলি দেবার জন্য হরিহরকে নিয়ে গেল। বহু লোক হরিহরের শুলি দেখতে ভৈরবীর ঘাটে উপস্থিত। শুলির আগে গঙ্গা স্নান করতে করতে হরিহর কাতর ভাবে প্রভু নিরঞ্জনকে ডাকতে লাগল - এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। হরিহর সারাজীবন ধরে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের সেবা করে এসেছে তাই হরিহরের ডাকে ঠাকুর হনুমানকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন — পাত্ররা হরিহরকে যেইমাত্র শূলে চাপাবে তুমি তাকে কোলে করে নিয়ে চলে আসবে। হনুমান ঠাকুর নিরঞ্জনের নির্দেশমত হরিহরকে শূলিকাঠে চাপাবার সঙ্গে সঙ্গেই কোলে তুলে বৈকুণ্ঠে নিয়ে চলে গেল। এই দৃশ্য দেখে সকলেই অবাক। তবে একটা লক্ষ্যনীয় বিষয় হরিহর জীবনে একবার মাত্র পাত্রের পাল্লায় পড়ে পাপ কাজ মনে এনেছিল, তারই ফলে তাকে সকলের সামনে শুলে চাপতে হয়েছিল, পরে উদ্ধার পেল। হরিহর বৈকুণ্ঠে চলে যাওয়ায় রাজা পাত্র দুজনায় সকলের সামনে বিপাকে পড়ে গেল।

অবশ্য হরিহরের স্বর্গে যাওয়ায় পাত্র ভাবল এই শুলি কাঠের গুণেই হরিহর স্বর্গে গেল। 'মনে করে এ শূলিতে চড়িবেক যে। অবলীলা বৈকুণ্ঠে যাবেক চল্যা সে।।' (৫২৪) আরও ভাবল হরিহরকে এখানে জব্দ করা গেল না, তাই আমার বড় ছেলেকে এই শূলিতে চাপিয়ে স্বর্গে পাঠিয়ে দিই, ওখানে গিয়ে সে হরিহরকে জব্দ করবে। এই ভেবে পাত্র তার বড় ছেলেকে বললো —

'হরিহর আমাকে দিয়াছে মনস্তাপ। তার সনে স্বর্গে বাদ সাধ যায়্যা বাপ।' (৫৩২)

পাত্রের বড় ছেলে তার বাপের মতো নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, বাস্তব জ্ঞানশূন্য নয়, সে তার বাবাকে জানাল - এখানের মতো স্বর্গে ঝগড়া বিবাদ করা যায় না, আরও জানাল —

'ধর্মের সেবক সেই বাইতি হরিহর। অপাপ শরীর সেই পাপ নাহি তার।
ধর্ম আরাধনে সেবা করিল বিস্তর।। একারণে ধর্ম তারে করিলা উদ্ধার।। (৫৪০)
স্বচক্ষে দেখ্যাছে ধর্ম হাকন্ড ভুবনে। আমি কবে কোন দেবে কর্যাছি সেবন।
অতি শুদ্ধ সেবক জানিয়া নিরঞ্জনে।। কোন গুণে কে বা লবে বৈকুণ্ঠ ভুবন।।'

২৬০, ২৬৬, ২৭০, ৩৮২, ৪০০, ৪০৪, 'স্বর্গারোহন পালা'র চরণ সংখ্যা।

পাত্র তখন হিংসায় এমনই উন্মত্ত যে ছেলের যুক্তিপূর্ণ কথা তার কানে গেল না, উল্টে ছেলেকে বকাবকি করে শূলে চাপিয়ে দিল, হীরাধার শূল তার ব্রহ্মতালু ভেদ করে বেরিয়ে গেল। তখন 'পাত্র বলে এ বেটা কর‍্যাছে বড় পাপ'। তাই 'পাপের কারণে স্বর্গে যাত্যে নাঞি পারে। তার ছোট ভাই ছিল ধর‍্যা আন তারে।।' তাকেও শূলিতে চাপিয়ে দিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। এইভাবে আরও চার ছেলেকে শূলে চাপাল, সবাই মারা গেল। পাত্র ভাবল সবাই পাপি, তাই কেউই স্বর্গে গেল না, তখন ঘরেতে তার ছ'মাসের এক শিশু ছিল, মনে করল ছ'মাসের শিশু পাপ পুণ্য কিছু জানে না, এ নিশ্চয় স্বর্গে যাবে, আর হরিহরকে জব্দ করবে। চোখের সামনে পরপর ছ'জন ছেলের এই মর্মান্তিক মৃত্যু দেখেও পাত্রের এতটুকু চেতনা হল না। পরের মন্দ করার অভিপ্রায় আর প্রবল হিংসা তাকে ভাববার এতটুকুও সুযোগ দিল না যে হীরাধার শূলে চাপালে এই ভাবেই মৃত্যু হয়। তার বড়ছেলের সাবধান বাণীও তার কানে ঢোকে নাই। তাই হরিহরের সঙ্গে বিবাদ করার জন্য মায়ের কোল থেকে ছ'মাসের শিশুকে কেড়ে নিয়ে এসে শূলে চাপিয়ে দিল। শূলের ধর্ম - সে তো শিশু বুড়ো বোঝে না। তাই শিশুর বাপের অহমিকায় তাকে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো। এইভাবে পাত্রের সাত সাতজন পুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটল। কবি তাই এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন —

'চিন্তিতে পরের মন্দ আপনাকে ধরে।' (৫৮৫)

কবি এখানে আর একটা বিষয়ও দেখিয়েছেন সেটা হল - সমাজে যেমন কিছু শয়তান লোক আছে, তেমনি অনেক ভাল লোকও আছেন। যাঁরা পরের দুঃখে বিশেষ কাতর হয়ে পড়েন। যে ভাই তাঁকে ও তাঁর স্বামী কর্ণসেনকে দশমাস বন্দীশালে রেখে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা দিয়েছে। পুত্র লাউসেনকে বার বার হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে, পুত্রবধূকে হত্যা করেছে, সেই ভাইয়ের ছেলেদের মৃত্যুতে রঞ্জাবতীর বুক ফেটে গেছে, পুত্র লাউসেনকে বলেছেন — ভাইপোদের বাঁচিয়ে দিতে, ধর্মের কৃপায় লাউসেন তার মামার ছেলেদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

'পাত্রের তনয়ে সেন দিল জিয়াইয়া। লাউসেনে বিস্তর সম্মান করিল রায়।' ৫৯৪
গৌড়েশ্বর ডরাইল চরিত্র দেখিয়া।। 'দেখ্যা শুন্যা পাত্রের মাথায় পড়ে বাজ।।' (৫৯৯)

যেখানে লাউসেন তার মামার সাত সাতজন ছেলেকে ধর্মের আশীর্ব্বাদে প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন, মহারাজা তাকে বিস্তর সম্মান করলেন সেখানে মামা মহাপাত্র লাউসেনকে আশীর্ব্বাদ না করে, তাকে বুকে টেনে না নিয়ে তখনও লাউসেনের ক্ষতির চিন্তা করে যাচ্ছে। এখানেই কবি দেখাতে চেয়েছেন সমাজে স্বার্থপর অহঙ্কারী মানুষ কত নীচ কত নিষ্ঠুর হতে পারে। এরা পশুর চেয়ে ভয়ঙ্কর। তাই মহামদ ভাবছে এখনও কিভাবে লাউসেনকে অপদস্থ করে শেষ করে দেওয়া যায় -, আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ---

'পাত্র বলে শুনহে গৌড়ের চূড়ামনি। জানিল এহার হন ধর্ম পক্ষাবল।
ভাগিনা জিয়ায় মরা দেখিলে এখনি।। তবে দেকু জিয়াইয়া মর‍্যাছে যত দল।।' (৬০৬)

লাউসেন আদিত্যের অংশ হলেও মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে এসেছেন, সে রক্ত মাংসে

৫২৪,৫৩২,৫৪০, 'স্বর্গারোহন পালা'র চরণসংখ্যা।

গড়া মানুষ, তারও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। লাউসেনের মামা মহামদ লাউসেনকে একুশ দিনের দিন থেকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে আসছে, বার বার তাকে মারবার চেষ্টা করে আসছে, নানা ভাবে অপমান করেছে। কিন্তু লাউসেন ন্যায়, ধর্ম ও সত্যের পথে অবিচল ছিলেন বলে সব সময় ভগবান তাকে রক্ষা করেছেন। লাউসেন কোন সময়েই মামাকে অসম্মান করেন নাই, কিন্তু আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না, তার অন্তর থেকে একটা অভিশাপ বেরিয়ে এল।

'বারে বারে নানা দুঃখ দিলেক নিষ্ঠুর। কৃপা কর্য্যা ধর্ম উদ্ধারেন সব ঠাঞি।।
কৃষ্ণের মাতুল যেন ছিল কংশাসুর।। অনুতাপে অভিশাপ দিল সদাগর।
বিপক্ষতা করিতে কখন ছাড়ে নাঞি। পাত্রের সর্বাঙ্গে হৈল ধবল পাথর।।
হাত পা গলিয়া গেল খস্যা পড়ে মুখ।
ধর্মপথ ছাড়িয়া পাতর পায় দুখ।।'(৬১৬)

এখানে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে কোন মানুষ সে যতই প্রভাবশালী বা শক্তিশালী হউক না কেন, যদি বারবার অন্যায় অত্যাচার করে যায় একদিন না একদিন তার পতন হবেই! অত্যাচারী অহঙ্কারী গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী - মহামদেরও তাই হল. তার সারা শরীর ধবল কুষ্ঠে গলে গেছে। তাকে ভোগ করতে হয়েছে মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণা দায়ক এক রোগ, কুষ্ঠ ধবল রোগ। মন্ত্রী মহামদের এই নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রনা দেখে রাজা গৌড়েশ্বর লাউসেনের হাতে ধরে অনুরোধ করে বলেছেন — তার মামাকে ক্ষমা করে দিতে ---

'গৌড়েশ্বর রাজা দেখ্যা হল্য সচকিত। অপরাধ মার্জনা করহ বাপধন।
হাথে ধর্য্যা সেনের কহেন যথোচিত।। যথোচিত শাস্তি হৈল ক্ষেমহ এখন।।' (৬২০)

রাজার অনুরোধে ক্ষমার অবতার লাউসেন তার মামার সর্বাঙ্গের কুষ্ঠ ধবল ভাল করে দিলেন, কিন্তু পাপের চিহ্ন হিসেবে শুধুমাত্র তার মুখের মধ্যে কুষ্ঠ ধবল রয়ে গেল।

'ধর্মবর পুত্রে পাত্র দিয়েছিল দুঃখ।
নিদর্শন ধর্মের ধবল রহে মুখ।।' (৬৩০)

আমরা দেখছি এইভাবে ভগবান যুগ যুগ ধরে শুভশক্তির দ্বারা অত্যাচারী অশুভ শক্তিকে বিনাশ করেছেন, কিম্বা কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। অসুরদের হাত থেকে দেব সমাজকে রক্ষা করার জন্য এক মহাশক্তি রূপে আবির্ভূতা হয়ে দেবী দুর্গা দুর্গম অসুর, 'মহিযাসুর', প্রভৃতি অত্যাচারী অসুরদের বধ করেছেন। তাই আমরা 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' দেবীর পূজা করি অশুভ শক্তির বিনাশকারিণী রূপে। রামচন্দ্র এই দেবী দুর্গার পূজা করে অত্যাচারী রাবণকে বধ করলেন, শ্রীকৃষ্ণ একদিকে তার মামা অত্যাচারী কংসকে নিহত করেছেন, আবার সত্য, ন্যায়, ধর্মের পথে অবিচল থাকা পান্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে কৌরবদের ধ্বংসের পথ প্রশস্থ করেছেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক ন্যায়, ধর্ম, সত্যের প্রতীক লাউসেনরূপী আদিত্য সর্বত্রই ধর্মের কৃপায় জয়লাভ করে অবশেষে অত্যাচারী মামাকে দিয়েছেন কঠিন শাস্তি। তার পাপের ফল যাতে সবাই দেখতে পায় সে কারণ তার শাস্তির চিহ্ন তার মুখে রেখে দিয়েছেন।

৫৮৫, ৫৯৪, ৫৯৯, ৬০৬, ৬১৬, ৬২০, ৬৩০, 'স্বর্গারোহন পালা'র চরণ সংখ্যা।

এমনি ভাবে শুভশক্তি দ্বারা অশুভশক্তির বিনাশ প্রত্যক্ষ করার জন্য পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বহু জায়গায় এমনকি পশ্চিমবাংলার খড়গপুর সহ কোন কোন জায়গায় একটি বিশেষ উৎসব পালিত হয় যার নাম 'দশেরা।' ঐ সব অঞ্চলে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম ন'দিন অর্থাৎ 'প্রতিপদ' থেকে 'নবমী' পর্যন্ত এই ন'দিন ধরে নবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, আর দশমী অর্থাৎ 'বিজয়া দশমী'র দিন অনুষ্ঠিতহয় 'দশেরা' উৎসব। ওঁদের মতে 'বিজয়াদশমী' কথাটির তাৎপর্য হল - শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে নিহত করে সীতাদেবীকে লঙ্কা থেকে উদ্ধার করে আশ্বিনের শুক্লপক্ষের দশমীর দিন বিজয়দর্পে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন, সেই কারণে এই শুক্লাদশমীর দিনকে 'বিজয়াদশমী' বলে অভিহিত করা হয়। আর ঐদিন দশেরা উৎসবে রাবণ, মেঘনাদ, কুম্ভকর্ণের বিরাট কুশপুত্তলিকা প্রস্তুত করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে দেখানো হয় কিভাবে শুভশক্তির দ্বারা অশুভ শক্তির বিনাশ সাধন হয়, আর শুভশক্তির জয় হয়। এই ভাবে দশেরা উৎসব বহু বছর ধরে পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু ২০০৪ খ্রিঃ দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ একস্‌টেনশন অঞ্চলের শ্রীরামলীলা কমিটি তাদের ঐ বহুদিনের ট্রাডিশান ভেঙ্গে প্রাচীন ঘটনার সাথে সমকালীন এক ঘটনাকে যুক্ত করে অভিনব পদ্ধতিতে 'দশেরা উৎসব' পালন করেন। ঐ বছর (২০০৪ খ্রিঃ) 'নবরাত্রি' উৎসব চলাকালীন বহু আকাঙ্খিত অত্যাচারী জঙ্গল দস্যু বিরাপ্পান তামিলনাড়ুর 'বিশেষ এক বাহিনীর' পাতা ফাঁদে নিহত হয়। 'নবরাত্র' উৎসব চলাকালিন সময়ে এই বিরাট জয় এসেছে বলে শ্রীরামলীলা কমিটির মতে এই ঘটনাও শুভশক্তির দ্বারা অশুভশক্তির বিনাশের ঘটনা। তাই তাঁরা রাবণের কুশপুত্তলিকার পাশে বিরাপ্পনের কুশপুত্তলিকা তৈরী করে তাতেও অগ্নিসংযোগ করেছেন শুভ শক্তির দ্বারা অশুভ শক্তির বিনাশ দেখানোর জন্য। এইসব দেখে গীতার মূল্যবান ক'টি চরণ মনে আসে। যেখানে শ্রী ভগবান বলছেন —

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। (৭)
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থয় সম্ভবামি যুগে যুগে।। (৮)
(গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ম ও ৮ম শ্লোক সংখ্যা।)

•

২৪। কবির দেবদেবী পীরপয়গম্বর বন্দনার সামাজিক তাৎপর্য ঃ

কবি তার কাব্যের বন্দনা পালায় বহু দেবদেবী, পীরপয়গম্বর, তীর্থভূমির বন্দনা করে কাব্য শুরু করেছেন। অসংখ্য দেবদেবী পীরপয়গম্বর ও তীর্থক্ষেত্রের বন্দনার মধ্য দিয়ে কবি একদিকে যেমন তাঁদের প্রতি দেখিয়েছেন গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি, অপর দিকে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন আমাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে বিভিন্ন দেবদেবী, পীরপয়গম্বর ও তাঁদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পীঠস্থান বা তীর্থস্থানের প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট ভাবে। কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, হরিদ্বার, অমরনাথ, দেওঘর, পুরী, কন্যাকুমারী, রামেশ্বরম, তিরুপতি,

---

৫৮৫, ৫৯৪, ৫৯৯, ৬০৬, ৬১৬, ৬২০, ৬৩০, 'স্বর্গারোহন পালা'র চরণ সংখ্যা।

কাঞ্চি, কামরূপ-কামাখ্যা, নবদ্বীপ, তারকেশ্বর, মক্কা-মদিনা, প্রভৃতি হাজার হাজার তীর্থস্থান ভিত্তিক জনপদের অধিবাসীদের জীবন জীবিকা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ঐ সব তীর্থস্থানের যাত্রী সমাগমের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। ঐ সব অঞ্চলের দোকান, বাজার, হোটেল, পরিবহন ব্যবস্থা, আঞ্চলিক শিল্প-বাণিজ্য, এমনকি সরকারের রাজস্বের একটা উৎসই হচ্ছে তীর্থযাত্রী। যেমন জম্মু কাশ্মীরের পহেলগাঁও অঞ্চলের প্রধান রাজস্ব ব্যবস্থাটাই দাঁড়িয়ে আছে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া করের ওপরেই।

পূজা পার্ব্বণের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন পুরোহিত, মালাকর, কুমোর, কামার, নাপিত, ঢাকি, ফল-ফুল-মিষ্টি, দশকর্মা বিক্রেতা, মৃৎশিল্পী, ডাক-সাজ শিল্পী, মঞ্চশিল্পী, প্রতিমা বা দেবদেবীর অঙ্গসাজ নির্মাণ শিল্পী, শোলা-শিল্পী, প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজে পায় এইসব পূজা পার্বণ থেকেই। আবার মৃৎশিল্পি, ডাকসাজ শিল্পী, শোলা শিল্পীরা তাঁদের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করে শুধু নিজেদের জীবিকা অর্জন করেন তাই নয়, এঁদের তৈরী প্রতিমা, প্রতিমার সাজ, শোলার তৈরী দেবদেবী বিদেশে পাঠিয়ে সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা আনতেও সাহায্য করে থাকেন। এছাড়া বহুক্ষেত্রে দেখা যায় পূজা পার্বণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পীঠস্থানে বিশেষ সময়ে মেলা বসে। এই মেলার স্থায়িত্ব কোথাও একদিন, কোথাও সাতদিন, কোথাও একমাস, আবার কোথাও দু'মাস, এইসব মেলার বিক্রেতারা সারা বছর ধরে এক মেলা থেকে আর এক মেলা ঘুরে তাদের পসরা সাজিয়ে জীবিকা অর্জন করে। আর এইসব ভ্রাম্যমান বিক্রেতারা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নয়, সব সম্প্রদায়ের মানুষই থাকেন, এমন কি বিদেশীরা পর্যন্ত মেলায় অংশ গ্রহন করেন।

পূজা পার্ব্বণ উৎসব অনুষ্ঠানের প্রভাব পোশাক পরিচ্ছদ বা বস্ত্র শিল্পের ওপর কম নয়। দুর্গাপূজো, দশেরা, নবরাত্রি, ইদ্ প্রভৃতি উৎসবে যে পরিমান জামা কাপড় কেনা বেচা হয় তাতে এই শিল্পের শ্রমিক, মালিক, কর্মচারী সকলেই উপকৃত হন।

আর একটা ব্যাপার কোন তীর্থস্থান বা পীঠস্থানের মন্দির বা মস্‌জিদের কাছ দিয়ে গেলে দেখা যায় সহায় সম্বলহীন, দীনদরিদ্র, পঙ্গু, রোগগ্রস্ত এক শ্রেণীর মানুষ, যাদের দেখার কেউ নাই, যাদের সাহায্য করার কেউ নাই, যাদের অর্থউপার্জনের কোন পথ নাই, কিন্তু বাঁচার অধিকার আছে, তার জন্য একমাত্র পথ ভিক্ষা। আর ভিক্ষার একটা উপযুক্ত স্থান হচ্ছে তীর্থস্থানের মন্দির মসজিদের দু'পাশের রাস্তা।

দেখা যাচ্ছে দেবদেবী, পীর পয়গম্বর, মন্দির-মস্‌জিদ, পীঠস্থান, তীর্থস্থান শুধুমাত্র ধর্মঅর্জনের স্থান নয়, পুণ্য অর্জনের সাথে জীবিকা অর্জনের স্থান, তাই কবি তাঁর কাব্যের বন্দনা পালায় বিভিন্ন পীঠস্থানের দেবদেবী পীর পয়গম্বরের বন্দনার মাধ্যমে ধর্মের সঙ্গে মানুষের

আর্থসামাজিক দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যেন বলতে চেয়েছেন আমরাও যেন ঐ সব পীঠস্থানে গিয়ে কিছুটা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। আর সেই কারনেই কবি অন্যান্য পীঠস্থানের সঙ্গে রাঢ়ের লৌকিক দেবদেবীরও বন্দনা করেছেন যেমন — শাঁকারীর শঙ্করী, বাসুদেব, পঞ্চানন, মহাদেব, নিজালয়ের শ্যামারূপা, শঙ্করীর সম্মুখে ষষ্ঠীবুড়ি ময়নার সেনবাড়ীর ধর্মরাজ, কাঙুরের কামাখ্যাদেবী, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ঠাকুরাণী, ঢাকায় ঢাকেশ্বরী, মন্ডল গ্রামের দেবী বিষহরি, তারাপুরের বিকটাখ্যা দেবী, মোহুলার রঙ্কিণী দেবী, মঙ্গলকোটের শুভ মঙ্গল চন্ডী, দশঘরার বিশালাক্ষী দেবী, তমলুকের বর্গভীমা, গোগ্রামের ভগবতী, গোমায়ের ফুল্লরা, কিরাটী কোনারের কৃষ্ণকালী, কালীঘাটের কালিকা মুন্ডমালী, রাজবল হাটের রাজবল্লভী, বর্ধমানের মা সর্ব্বমঙ্গলা, বিক্রমপুরের বাসুলির মা, অম্বিকার সিদ্ধেশ্বরী, শিয়াখালার রঙ্কিণী ঠাকুরাণী, শ্রীরামপুরের জয়দুর্গা, বালিডাঙ্গার ভবানী রাঢেশ্বরী, লায়াবাড়ের বাসুলী, লাটুগ্রামের জয়দুর্গা, সেজপুরের দশভুজা দুর্গা, ঝিকুরের জয়চন্ডী, আমতার মালাইচন্ডী, বিষ্ণুপুরের দেবী চেঙ্গমুড়িকানি, সাটিনন্দীর লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, জয়ন্তীপুরের সর্বমঙ্গলা, সাজপুরের বীরজার পা, ঋষিপুরে সিদ্ধকালী, কেতুগ্রামের বহুলক্ষী, পোষলা গ্রামের দেবী ঝাকিমাই, বোড়োর বলরাম, পুড়িচার বিশালাক্ষী, বোঁয়াই এর বসন্তচন্ডী, চাবলার বিশালাক্ষী, পিনকুটির পিতাম্বরী, ক্ষেপুতের ক্ষেপাই, সগড়াই এর সগড়াই চন্ডী, বাজিৎপুরের কঙ্কাবতী, হরিপালের দেবী চন্ডালের ঝি ভদ্রকালী মা, ঢেকুরের শ্যামারূপা দেবী দুর্গা, কুলীন গ্রামের শিবানী, তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথ, দামিন্যার চক্রাদিত্য, কাইতির বাণেশ্বর, শ্রীপুরুষোত্তমের জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা, তীর্থভূমি - বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, বারাণসী, পুষ্কর, প্রয়াগ, দ্বারকা, প্রভাস, গয়া, নৈমিষ্যারণ্য, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, বদারিকাশ্রম, এছাড়া তিনি বন্দনা করেছেন — কোটাশিমূলের সইদ পীর আলি, মন্দারণের পীর ইসমালি, দিল্লীর সৈয়দ মোর্তুম ও সেখ চিল্লি, শাখড়ার পাঁচপীর ও জীয়রুণের কদম্ব রসুল. শাহ বাহারাম, দফর খান গাজি, শাহদোড় মোকামের পীর, আর মক্কা মদীনার ঘর যেখানে দিবানিশি থাকেন পয়গম্বর। যে সমস্ত দেবদেবী পীরপয়গম্বরের নাম কবি জানেন না তাঁদেরও বন্দনা করে বলেছেন —

'যে যে দেবদেবীর নাহি জানি নাম।
তাঁহাদের চরণে রইল আমার প্রণাম।।' (১২৮)
'কত পীরপয়গম্বর নাম নাহি জানি।
সবার কদমবন্দ জোড় করি পাণি।।' (১৬৬)

পূজা অর্চনার সামাজিক তাৎপর্যের দিকে লক্ষ রেখে পরিশিষ্ট অংশে কয়েকটি দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করা হল। তার আগে কবির কলমে বন্দনা পালার কিছু অংশ —

'শাঁকারীতে বন্দ দেবী শঙ্করীর পা।
কাতর কিঙ্করে ডাকে কৃপা কর মা।।

'কাইতির বানেশ্বর বন্দ সাবধানে।
বাণভূপতির পাট কেবা নাহি জানে।।'

বাসুদেব রাঢেশ্বরী আর পঞ্চানন।
মহাদেব মনসা বন্দিব একমন।।'
'নিজাসয়ে শ্যামারূপা বন্দ সাবধানে।
অপার মহিমা যার আগমে পুরাণে।।'
'কাঙুরে কামাখ্যা বন্দ জোড় করি পাণি।
ক্ষীরগ্রামে বন্দিব যোগাদ্যা ঠাকুরাণী।।'
'কিরিটী কোনার মধ্যে বন্দ কৃষ্ণ কালী।
কালী ঘাটে কালিকা বন্দিব মুন্ডমালী।।'
'বন্দ সর্ব্বমঙ্গলা নিবাস বর্ধমান।
হিংলার দেবী বন্দ হয়ে সাবধান।।'
'সোনাটিকরির মধ্যে বন্দ বিষহরি।
আমতার মালাই বন্দ জোড় হাত করি।।'
'সান[illegible] [illegible]ড়োর বলরাম।
পুড়িচার বন্দ বিশাল[illegible] [illegible]নুপাম।।'
'বোঁড়ায়ে বসন্তচন্ডী বন্দ [illegible]জাক্ষী।
জোড়হাতে বন্দ চাবলার বিশালাক্ষী।।'
'হরিপালে বন্দ দেবী চন্ডালের ঝি।
ভদ্রকালী মাতার উপমা দিব কি।।
শ্যামারূপা দেবী বন্দ ঢেকুরের গড়ে।
ছাগমেষ যেখানে অনেক বলি পড়ে।।
কুলীন গ্রামের মধ্যে বন্দিব শিবানী।
বাঁধগাছা মধ্যে বন্দ রঙ্কেশ্বরী ঠাকুরাণী।।'

'শ্রী পুরুষোত্তম বন্দ প্রভূ জগন্নাথ।
তিনসন্ধ্যায় বাজারে বিকায় পিঠা ভাত।।
'বৃন্দাবন বন্দ আর মথুরা গোকুল।
কুরুক্ষেত্র বন্দ যাতে কৌরব নির্ম্মূল।।
হরিদ্বার বারাণসী পুষ্কর প্রয়াগ।
পিন্ডারক প্রভাস দ্বারকাপূর্ণভাগ।।
তীর্থকূপ নবদ্বীপ গয়ার অসুর।
বন্দিব বিষ্ণুর পাছু মুক্তির ঠাকুর।।'
'নবদ্বীপ বন্দ সৃষ্টি মিত্র পুরন্দর।
শ্রীচৈতন্য বন্দ ভাই জুড়ি দুই কর।।'
'বড়বেলুনের পাট চাবলার কুলি।
বন্দিব কুলীন গ্রামে লোটাইয়া ধূলি।।
কোটশিমূলে বন্দ সইদ পীর আলি।
মন্দারণে বন্দি গাব পীর ইস্‌মালি।।'
'সৈয়দ মুর্তম বন্দ আর সেখ চিল্লি।
যার কথা বিখ্যাত সকল দেশ দিল্লী।।
শাখড়ায় চাপানিধি বন্দ পাঁচ-পীর।
দোবের সাহেব বন্দ খোয়াদে খিদির।।
কটক ঢাকায় বন্দ কদম্ব রসুল।
জীয়ারুণ গেলে লোক দেয় নানা ফুল।।
শাহবাহারাম বন্দ হয়ে সাবধান।
বন্দ মনে খোশ করে যত আছে গান।।'

১২৮, ১৬৬, ১৬০ বন্দনা পালার চরণ সংখ্যা।

পরিশিষ্ট - ১

কবি বন্দিত ও একালের শাঁকারি ও রাঢ় বাংলার অনান্য কয়েকটি গ্রামের দেবদেবী ও তাঁদের পূজাপদ্ধতির বর্ণনা ঃ

কবি নরসিংহ বসু যেমন তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যের বন্দনা পালায় প্রথমেই তাঁর জন্মভূমি শাঁকারির অধিষ্ঠাত্রী দেবী অষ্টভুজা শঙ্করী মা, নিজগৃহের শ্যামারূপা-কালী মা, বাসুদেব, পঞ্চানন, শ্রীধর গোপাল, ষষ্ঠীবুড়ি এবং আরও অনান্য স্থানের দেবদেবী, পীর-পয়গম্বরের বন্দনা করে কাব্য শুরু করেছেন, তেমনি কবির ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী বর্ণনা এবং কাব্যের বিভিন্ন সামাজিক দিক বিশ্লেষণের পূর্বে তাঁর বংশধর হিসেবে (কবির অধস্তন নরমপুরুষ) তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই সমস্ত দেব দেবী, পীর পয়গম্বরকে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে কয়েকটি দেবদেবী ও তাদের পূজাপদ্ধতির সম্পর্কে কিছু বিবরণ এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কবির জন্মভূমি শাঁকারি গ্রামের দেবদেবীর কথা দিয়েই এখানে শুরু ঃ—

শাঁকারি বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের খন্ডঘোষ থানার অন্তর্গত একটি উন্নত বর্ধিষ্ণু-মন্দিরময় গ্রাম, মৌজা ম্যাপের ছ'টি সীট নিয়ে এই গ্রামটি গঠিত। এত বড় এবং ঘন বসতিপূর্ণ গ্রাম দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে আর দেখা যায় না। গ্রামের ৫নং সীটে দেখানো আছে জনবসতি এলাকা, এখানেই আছে বহু প্রাচীন মন্দির ও দেবদেবীর অবস্থান। গ্রামটি বর্ধমান স্টেশন থেকে প্রায় ১৫-১৬ কি.মি দক্ষিণ পশ্চিমে বা দামোদর নদের কাঠগোলা (ইদিলপুর-উদয়পল্লী) ঘাটের ঠিক পাঁচ-ছয় কিমি দক্ষিণে অবস্থিত। বর্ধমান স্টেশনের কাছে তিনকুনিয়ার বাস টার্মিনাস থেকে শাঁকারি যাবার সরাসরি বাস পাওয়া যায়। সকাল ৭-৪৫ মি., ৮-৫০মি., ১০-৪৫মি., ১২-৪০মি., দুপুব ২-২০মি., ৩-৫০মি., বিকাল ৪-৫০মি., সন্ধ্যা ৬-২০মিনিটে বাস ছাড়ে। (অবশ্য বাসের সময়পরিবর্তনীয়)

আবার শাঁকাবি থেকে বর্ধমান যাবার বাস পাওয়া যায় সকাল ৬টা, ৭.৩০মি, ৯.৩০মি, ১০.৩০মি, দুপুর ১২-৩০মি, ২-৩০মি, বিকাল ৩-৪৫মি. এবং ৫-১০মি। বাসরুটের নাম 'শাঁকারি - বর্ধমান।' শাঁকারী (Sankari) এসেছে মনে হয় 'শঙ্করী' মায়ের নাম থেকেই। গ্রামের ইংরাজি নাম 'Sankari' কথা থেকেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়।

কবি নরসিংহ বসু বন্দিত শাঁকারী গ্রামের প্রাচীন দেবদেবীর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন - গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অষ্টভুজা শঙ্করী মা, কবির গৃহদেবী শ্যামারূপা কালীমা, বাসুদেব, সিংহ বাহিনী দেবী, বুড়োশিব (মহাদেব), পঞ্চানন প্রভৃতি। এছাড়া গ্রামে রয়েছেন প্রহ্লাদ চন্দ্র মজুমদার পরিবারের রাধা গোবিন্দ জিউ, বাত্রমেসে সিদ্ধেশ্বরী কালী মা, রক্ষাকালী মা, দে পরিবারের চতুর্ভুজা দুর্গা মা, ভট্টাচার্য পরিবারের দশভুজা দুর্গা মা, ঘোষ পরিবারের জয়দুর্গা মা, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ও মজুমদার পরিবারেব কালী মা, হালদার পরিবারের বিরাজ দুলাল রাধাগোবিন্দ জিউ, 'কয়াল' পরিবারের সিদ্ধেশ্বরী মা, ডোমেদের কালীমা, ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত সোনার গৌরাঙ্গ, ডঃ অধীর শরণ বসু প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মঠ, আর সুন্দর পরিবেশে সুন্দর গঠনে রায়বাহাদুর ভুবন মোহন বসু প্রতিষ্ঠিত শতাব্দী প্রাচীন আরও একটি মন্দির রয়েছে, যে মন্দির দক্ষিণ দামোদরের খন্ডঘোষ থানার বহু গ্রামের বহু মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছে। সেই মন্দিরের নাম 'শাঁকারী উচ্চ বিদ্যালয়।' (Sankari High School) এখন যেটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় ও শারদীয়া দুর্গোৎসবের মহাপূজার সময়
শাঁকারীর শ্রীশ্রীশঙ্করী মা। পৃষ্ঠা - ১২৮, ১২৯

চকগ্রামের ঠাকুরণগড়ের কাছে শাঁকারীর শঙ্করী মায়ের আবির্ভাব স্থল।
পৃষ্ঠা - ১২৬

শ্রাবণী পূর্ণিমায় শঙ্করী মায়ের বাৎসরিক পূজায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ।
পৃষ্ঠা - ১২৮

মহাষ্টমীর দিন শাঁকারীর শ্রীশ্রীশঙ্করী মায়ের মন্দিরে সন্ধিপূজার সময় নির্ধারণে 'তামি' (জলঘড়ি)। পৃষ্ঠা - ১২৯

পৌষ সংক্রান্তিতে শাঁকারীর শঙ্করী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গনে ভোগরান্নার কাজে ব্যস্ত পুরোহিত ও সেবাইতবৃন্দ। পাশে 'শঙ্করী পুকুর'। পৃষ্ঠা - ১৩২

পৌষ সংক্রান্তিতে শকরী মায়ের ভোগরান্নার ব্যবস্থা। পৃষ্ঠা - ১৩২

শাঁকারীতে কবিগৃহে দীপান্বিতা মহাঅমানিশায় শ্রীশ্রীকালীমায়ের পূজার ঘটস্থাপন।
পৃষ্ঠা - ১৩৭

কবিগৃহে কালীমায়ের দীপান্বিতা মহাপূজা। পৃষ্ঠা - ১৩৭

কবির গৃহে কালীমায়ের পূজার আয়োজন।
পৃষ্ঠা - ১৩৭

কবিগৃহে মহাপূজায় সপরিবারে লেখক। পৃষ্ঠা - ১০

কবির বংশধর লেখকের পরিবারে শ্যামারূপা মায়ের পদধূলি দান।
পৃষ্ঠা - ১৪০

কবিগৃহে কালীমা নিরঞ্জনের পূর্বে মন্দির প্রাঙ্গনে লঠিখেলা। পৃষ্ঠা - ১৪০

কবিবংশের প্রস্তর নির্মিত
শ্রীশ্রীশ্যামারূপা মা।
পৃষ্ঠা - ১৪৯

শাঁকারীর শ্রীশ্রীবাসুদেব জীউ।
পৃষ্ঠা - ১৫২

শিবের ও ধর্মরাজের গাজনের 'শালেভারের' পাটা।
পৃষ্ঠা - ১৫২

শাঁকারীর শ্রীশ্রীবুড়োশিবের গাজনের সন্ন্যাসীদের অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়ে ঝাঁপ।
পৃষ্ঠা - ১৫৪

শাঁকারীর প্রহ্লাদচন্দ্র
মজুমদার পরিবারের
রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির।
পৃষ্ঠা - ১৫৫

শাঁকারীর শ্রীশ্রীসিংহবাহিনী
দেবীর ধ্বংসপ্রাপ্ত
টেরাকোটা মন্দির।
পৃষ্ঠা - ১৫৫

শাঁকারীর ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী 'সোনার' গৌরাঙ্গ পৃষ্ঠা - ১৫৬

শাঁকারীর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির। পৃষ্ঠা - ১৫৭

শাঁকারীর অধীর
শরণ বসু প্রতিষ্ঠিত
রামকৃষ্ণ আশ্রম।
পৃষ্ঠা - ১৫৭

শাঁকারীর ভুবনমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত শতাব্দী প্রাচীন শাঁকারী উচ্চবিদ্যালয়।
পৃষ্ঠা - ১০০

শাঁকারীর রায় পরিবারের শ্রীশ্রী'ভাঁড়ে' মা। পৃষ্ঠা - ১৩০

শাঁকারীর দে পরিবারের চতুর্ভুজা দেবী দুর্গা। পৃষ্ঠা - ১০০

ঢেকুরের গড় জঙ্গলে
ইছাই এর
শ্রীশ্রীশ্যামারূপা
মায়ের বর্তমান রূপ।
পৃষ্ঠা - ১৬৪

ঢেকুরের গড় জঙ্গলে
শ্যামারূপা মায়ের
মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি।
(উত্তরদিকে অবস্থিত)
পৃষ্ঠা ১৬৪

গড় জঙ্গলে শ্যামারূপা
মায়ের কাছে পূজার
আসনে পুরোহিত
ভূতনাথ রায়।
পৃষ্ঠা - ১৬৪

বনবিভাগের সৌজন্যে গড় জঙ্গলে শ্যামারূপা মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের জন্য নির্মিত আচ্ছাদন। পৃষ্ঠা - ১৬৪

ঢেকুরের গড় জঙ্গলে 'রাজা সুরতের ঘট স্থাপনের পাথর।' পৃষ্ঠা - ১৬৫

ঢেকুরের গড় জঙ্গলে প্রাচীন রাজাদের লক্ষ্মী জনার্দন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। পৃষ্ঠা - ১৬৫

অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে ভগবতীর জন্য নির্মিত ইছাই এর বিগ্রহবিহীন দেউল
পৃষ্ঠা - ১৬৬

ইছাই-এর দেউল সংলগ্ন 'দেউল পার্ক'। পৃষ্ঠা - ১৬৬

বর্ধমানাধিষ্ঠাত্রী অষ্টদশভূজা
মা সর্বমঙ্গলা ও তাঁর
'নবরত্ন' মন্দির
পৃঃ - ২৪, ৯৮, ৯৯

মালাইচণ্ডী দেবী
(আমতা, হাওড়া)
পৃঃ- ২৪, ৯৮, ৯৯
সৌজন্যে ঃ
ড. সুকুমার মাইতি
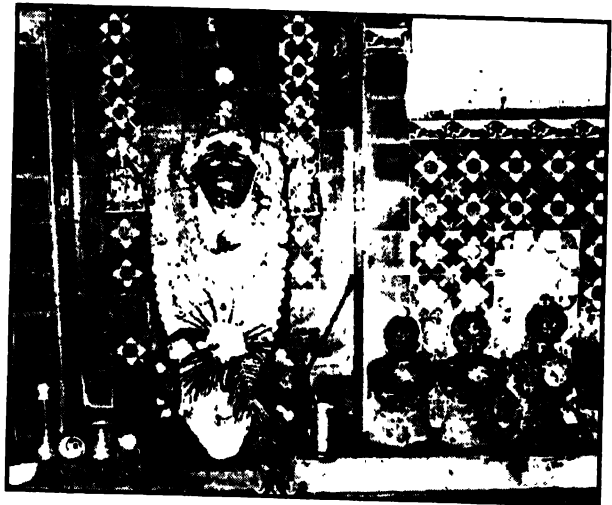
রাজবল্লভী দেবী
(রাজবলহাট, হুগলী)
পৃঃ - ২৪, ৯৮
সৌজন্যেঃ
ড. সুকুমার মাইতি

দেবী বর্গভীমা
(তমলুক, মেদিনীপুর)
পৃঃ - ৯৮
সৌজন্যেঃ ড. সুকুমার মাইতি

বোঁয়াইয়ের শ্রীশ্রীবসন্ত চণ্ডীমায়ের মন্দির।
পৃষ্ঠা - ১৬৬
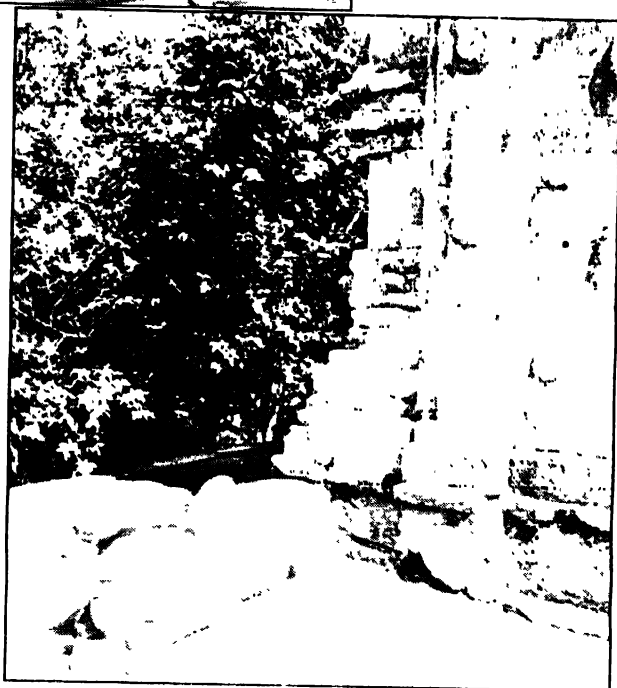
কুলীন গ্রামের গোপেশ্বর মন্দিরে বাবার ষাঁড়।
পৃষ্ঠা - ১৬৮

বোড়োর শ্রীশ্রীবলরাম জীউ। পৃষ্ঠা - ১৭০
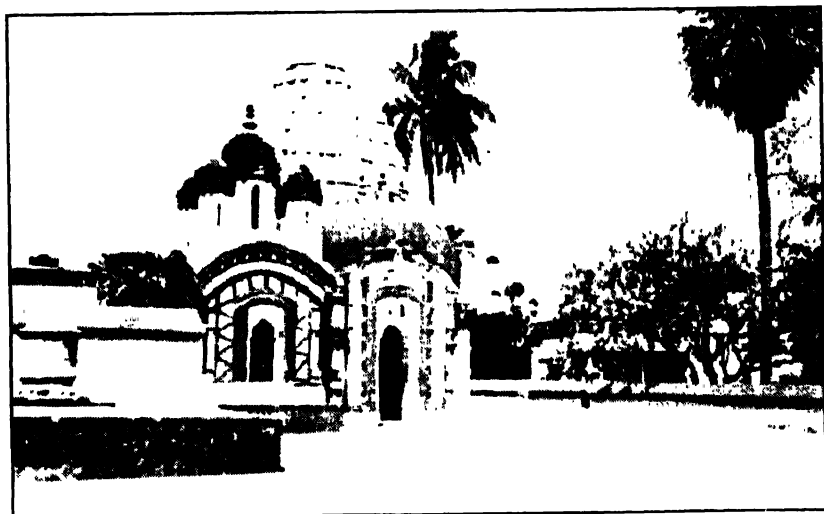
বোড়োর শ্রীশ্রীবলরাম মন্দির। পৃষ্ঠা - ১৭০

দক্ষিণকুলের বাসদেও বা বাসুদহ পুকুর যেখানে বলরাম জীউর নির্মাণের কাঠ ছিল।
পৃষ্ঠা ১৭১

বোড়োর অনন্ত সায়র পুকুর যেখানে ঐ কাঠ পরে পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা - ১৭১

বোড়োর বলরাম মন্দির
প্রাঙ্গণে ভক্ত বৃন্দ।
পৃষ্ঠা - ১৭০

কামরূপ কামাখ্যা মন্দিরে
দেবীর দর্শনপ্রার্থী কন্যা মঞ্জরী।
পৃষ্ঠা ৯৯
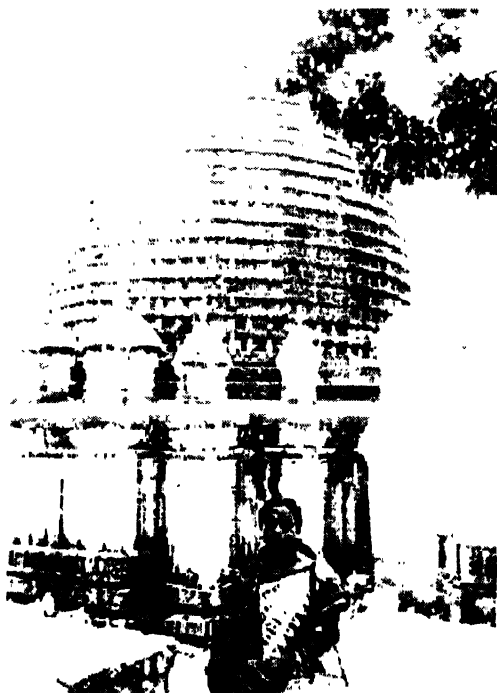
খুদকুড়ির শ্রীশ্রীরাঘবেশ্বর জীউর সম্মুখে পূজা আসনে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা ১৭১

খুদকুড়ির শ্রীশ্রীরাঘবেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণ। পৃষ্ঠা - ১৭১

গৌড় থেকে ময়নার পথনির্দেশকাব ক্ষেত্রে ড সুকুমাব মাহতি সম্পাদিত 'নবসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল গ্রন্থের' চিত্র অনুসবণ কবা হয়েছে।
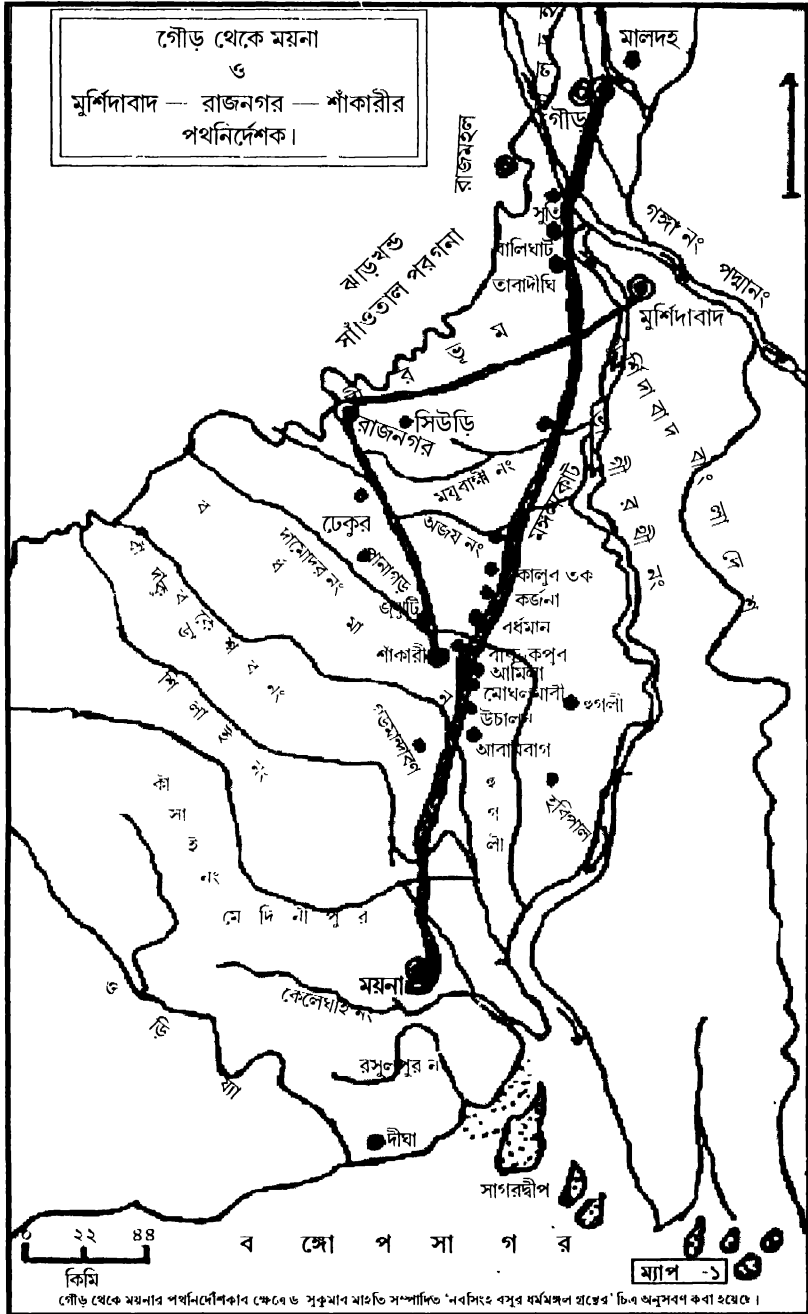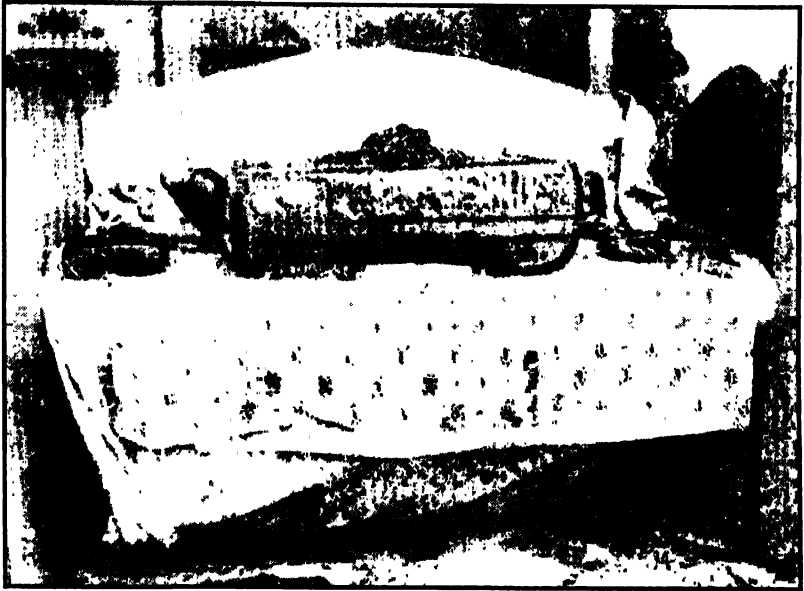
লাউসেন পূজিত ধর্মরাজ 'বাঁকুড়া রায়' (বৃন্দাবন চক, ময়না, মেদিনীপুর)
পৃঃ - ২৪, ৯৮। সৌজন্যে ঃ ড. সুকুমার মাইতি

দেবী চণ্ডালের ঝি
(হরিপাল, হুগলী)
পৃঃ - ২৪, ৯৮, ৯৯
সৌজন্যে ঃ ড. সুকুমার মাইতি
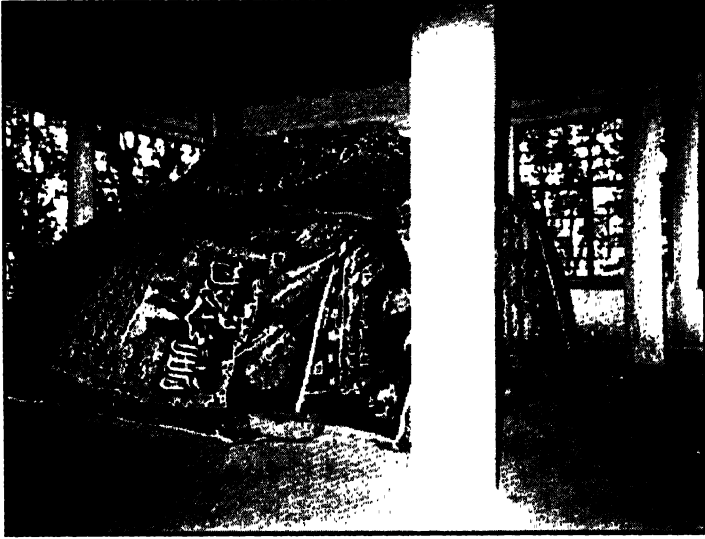
গড় মান্দারণে (হুগলী) 'বড় আস্তানায়' পীর বাবার দরবার ও দরগা। পৃঃ-২৫, ৯৮, ৯৯

গড় মান্দারণে পীর বাবার দরবার ও দরগায় যাবার সিঁড়ির অংশ বিশেষ

গৌড় ও ময়না থেকে হাকন্ডের পথ
পাকিস্থান
ভারত
গৌড়
মেদিনীপুরের ময়না
বাংলাদেশ
সাগরদ্বীপ
কপিল মুনির
আশ্রম
বিশাখাপত্তনম
হা
ক
ন্ড
যা
ই
তে
আরব সাগর
চেন্নাই
সেতুবন্ধ রামেশ্বর
কন্যাকুমারী
শ্রীলঙ্কা
ভারত মহাসাগর
ম্যাপ ২

শাঁকারীর বিভিন্ন
দেবদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণ
দে পালপাড়ার দুর্গামায়ের মন্দির
ভাঁড়ে মা
কপাল কালীমা
শঙ্করী পুকুর
শঙ্করী মায়ের
মন্দির
মজুমদার
কালীমা
ভট্টাচার্য দুর্গামা
শ্যামা
রূপা
মন্দির
নরসিংহ বসুর
ভিটা ও
কালীমন্দির
গৌরাঙ্গ মন্দির
ভুবনমোহন বসুর বাড়ি
শাঁকারী হাইস্কুল
শ্যামকুণ্ড
পুকুর
রামকৃষ্ণ মঠ
ম্যাপ —৩

যাতায়াতের পথ :
১। মুর্শিদাবাদ — রাজনগর
২। রাজনগর — শাঁকারী
৩। বর্ধমান — রাজনগর (ভায়া - বসুধা)
৪। বর্ধমান — ঢেকুর (ভায়া দুর্গাপুর)
৫। বর্ধমান — শাঁকারী
৬। বর্ধমান — জুঝুটি
৭। বর্ধমান — বোঁয়াইচণ্ডী
৮। বর্ধমান — কুলীন গ্রাম
৯। বর্ধমান — বোড়োবলরাম
0 10 20
মুর্শিদাবাদ
রামপুরহাট
রাজনগর
সাঁইথিয়া
সিউড়ী
ইলামবাজার
বোলপুর
ঢেকুর
বসুধা
দুর্গাপুর
আউশগ্রাম
খানা জং
বর্ধমান জং
তিনকুনিয়া
মেমারী
কুলীন গ্রাম
জুঝুটি
কেশবপুর
শাঁকারী
সেহারাবাজার
মোঘলমারী
বোঁয়াইচণ্ডী
বর্ধমান - বাঁকুড়া রোড
ম্যাপ — ৪

পরিশিষ্ট - ১. শাঁকারীর শ্রীশ্রীশঙ্করী মা

১। শাঁকারির শ্রীশ্রী শঙ্করী মা ঃ শঙ্করী মা শাঁখারি গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পরিচিতা, তিনি গ্রামের সকলের মা, তাই কবি নরসিংহ বসু তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যের বন্দনা পালা থেকে শুরু করে স্বর্গারোহন পালা পর্যন্ত সর্বত্রই শঙ্করী মায়ের চরণ বন্দনা করেছেন, কৃপা প্রার্থনা করেছেন, মা যে কবি এবং কবি পরিবারের সব সময় সাপক্ষে তাও বারবার উল্লেখ করেছেন, কবি বন্দনা পালায় প্রথমেই শঙ্করী মায়ের চরণ বন্দনা করে বলেছেন ---

শাঁখারিতে বন্দ দেবী শঙ্করীর পা।
কাতর কিঙ্করে ডাকে কৃপা কর মা।।'(৬)

এরপর স্থাপনা পালায় তাঁর আত্মপরিচয় প্রদানকালে শঙ্করী মায়ের কৃপার কথা উল্লেখ করে বলেছেন ---

'অষ্টভূজা শঙ্করীর কৃপাবলোকনে।
নানা দেশে রোজকার করি নানা স্থানে।।' (২৮)

আবার 'আদ্য ঢেকুর' পালায় ইছাই ঘোষের অত্যাচারে রাজা কর্ণসেন ঢেকুর ছেড়ে গৌড়ে চলে আসার বর্ণনা প্রসঙ্গে, এবং তার পরবর্ত্তীকালে কবির পিতামহ মথুরা বসু তাঁর আদি নিবাস বসুধা গ্রাম ত্যাগ করে শাঁখারিতে বসতি স্থাপনের প্রসঙ্গে কবি শঙ্করী মায়ের কৃপার কথা, এবং মা শঙ্করী যে সব সময় তাঁদের সাপক্ষে রয়েছেন তা উল্লেখ করে লিখেছেন ---

'বসুধা মিরাস ছাড়ি শাঁখারিতে ঘর বাড়ি
করিলেন মথুরা বসুজা।
সত্যবাদী সদাচার সদাই সাপক্ষ যার
আপনি শঙ্করী অষ্টভূজা।।' (৩৭৪)

এছাড়া কাব্যের শেষ অংশে স্বর্গারোহণ পালায় লাউসেন যখন কালুবীর প্রভৃতি প্রজাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন তখন কবিও শঙ্করী মায়ের কৃপার কথা উল্লেখ করেছেন ---

'লাউসেন হাসিয়া কালুকে দিল বর। বসুবংশে অবতংশ মথুরা বসুজা।
ঝাপড় হইয়া থাক পৃথিবী ভিতব।। সদা যার সাপেক্ষ শঙ্করী অষ্ঠভূজা।।' (৯০২)

দেবী শঙ্করী মা'র আর্বিভাব ও প্রতিষ্ঠা ঃ সবার মা শাঁকারির শঙ্করী মা একরকম নিজেই আর্বিভূতা হয়ে শাঁকারিতে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন নিজের ইচ্ছায়। শাঁকারীর উত্তর পাড়ায় 'দত্ত (রায়)' পরিবারের প্রাণপুরুষ রাঘব দত্ত (রায়) মহাশয় দ্বারা। এই রায় পরিবারেরই সুযোগ্য সন্তান ধর্মপ্রাণ হরিসাধন রায় ও বঙ্কুবিহারী রায় মহাশয়ের তথ্য অনুসারে — আজ থেকে কুড়ি-একুশ পুরুষ-আগে হুগলি জেলার 'নওয়া' গ্রামের গণেশ দত্ত শাঁকারি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র রাঘব দত্ত(রায়) মহাশয় বাংলার নবাব হুসেন শাহের সেরেস্তায় গোমস্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নবাব রাঘব দত্তের কাজকর্মে খুশি হয়ে তাঁকে পরপর দু'টি উপাধী প্রদান করেন - যথাক্রমে ' হাজরা' এবং 'রায়'। রাঘব দত্ত মহাশয় 'রায়' পদবী বেশি ব্যবহার করতেন, তাই সেই থেকে এই দত্ত পরিবার শাঁকারি গ্রামে 'রায় পরিবার নামেই খ্যাত। অবশ্য মা শঙ্করীর কাছে বাৎসরিক বা কোন পূজার সংকল্প করার সময় 'রায়' পদবীর পরিবর্ত্তে 'দত্ত দাসস্য' বলে 'সংকল্প' করা হয়। যাইহোক শঙ্করী মায়ের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে হরিসাধন

রায় মহাশয় জানালেন — শাঁকারি গ্রামের প্রায় এক দেড় কিমি উত্তরে 'চক' নামে একটি গ্রাম আছে, ঐ গ্রামের দক্ষিণে 'দেব খাল' নামে একটি খাল, আর ঐ খালের কাছেই 'ঠাকরুণ গড়' নামে পুকুরের মধ্যে মাকে পাওয়া যায়। রাঘব দত্ত(রায়) মহাশয় একদিন স্বপনে দেখেন যে এক দেবীমূর্ত্তি তাঁকে বলছেন 'চকের' কাছে 'ঠাকরুণ গড়' পুকুরে তিনি রয়েছেন, তাঁকে যেন ওখান থেকে নিয়ে এসে শাঁকারিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাঘব দত্ত(রায়) মহাশয় স্বপনে মায়ের এই নির্দেশ পেয়ে 'চকে'র 'ঠাকরুণ গড়' থেকে মাকে নিয়ে এসে শাঁকাবি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। যে দিন শঙ্করী মাকে শাঁকারিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় সে দিন ছিল রাখী পূর্ণিমা, ঝুলন পূর্ণিমা বা শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন। মায়ের প্রতিষ্ঠার এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছর শ্রাবণী পূর্ণিমা বা ঝুলন পূর্ণিমার দিন মায়ের বিশেষ বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শঙ্করী মা যে 'ঠাকরুণ গড়ে' আবির্ভূতা হয়েছিলেন সেই পীঠস্থানে বর্তমান সেবাইত গণের অন্যতম সেবাইত হরিসাধন রায় মহাশয় ও গৌরচন্দ্র রায় মহাশয়ের তত্বাবধানে শঙ্করী মায়ের একটি 'স্মৃতি মন্দির' নির্মিত হয়েছে। 'চক' গ্রামবাসীরা ঐ মন্দির দেখাশুনা করেন। শ্রাবণী পূর্ণিমায় মায়ের বিশেষ বাৎসরিক পূজার দিন শাঁকারি থেকে মায়ের পুরোহিত মশায় বাজনাবাদ্য সহ ঐ মন্দিরে পূজা দিয়ে আসার পর শাঁকারীর মূল মন্দিরে মায়ের পূজা আরম্ভ হয়।

মায়ের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার সময় ঃ শঙ্করী মা কত সালে বা কোন সময়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এ সম্পর্কে সঠিক সাল তারিখ জানা না গেলেও এইটুকু বলা যায় শঙ্করী মা শাঁকারিতে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন খ্রিঃ সপ্তদশ শতাব্দীর আগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে, তার কারণ কবি নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল রচনার পূর্বে বা তাঁর পিতামহ মথুরা বসুর শাঁকারিতে বসতি স্থাপনের পূর্বেই শঙ্করী মা শাঁকারিতে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন তা কবির কাব্যের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়।

কবি নরসিংহ বসু তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা শুরু করেন ১৬৩৬ শকাব্দের ১০ই ভাদ্র অর্থাৎ ইং ১৭১৪ খ্রিঃ ২৭ শে আগষ্ট, বাং- ১১২১ সালের ১০ই ভাদ্র।
অর্থাৎ কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, আর এর প্রায় আশি-নব্বই বছর আগে অর্থাৎ খ্রিঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কবির পিতামহ মথুরা বসু শাঁকারিতে বসতি স্থাপন করেন। মথুরা বসু শাঁকারিতে বসতি স্থাপনের আগেই শঙ্করী মা শাঁকারিতে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন তা দেখতে পাই কবির লেখা থেকেই।

তাই দেখা যাচ্ছে শঙ্করী মা খ্রিঃ সপ্তদশ শতাব্দীর আগে থেকেই শাঁকারিতে বিরাজমান, এছাড়া হরিসাধন রায় মহাশয়ের বিবরণ অনুযায়ী হুসেন শাহের রাজত্বকালে রাঘব রায় মশাই 'ঠাকরুণ গড়' থেকে মাকে শাঁকারিতে নিয়ে আসেন। আর হুসেন শাহের রাজত্বকাল ছিল ১৪৯৪খ্রিঃ - ১৫২৫খ্রিঃ। তাই দু'দিক থেকে মিলিয়ে বলা যায় শঙ্করী মা ষোড়শ শতাব্দীতে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে শাঁকারিতে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। অবশ্য মায়ের বর্ষীয়ান সেবাইত শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী রায় মহাশয়ের মতে শঙ্করী মা সাত আট'শ বছর আগে শাঁকারিতে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন।

শাঁখারি/শাঁকারী/শাঁকারি এই তিন রকম বানান বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় ব্যবহৃত হয়েছে। হরিসাধন রায়, ও গৌরচন্দ্র রায় মহাশয়ের অকাল প্রয়াণে লেখক বিশেষ মর্মাহত, তাঁদের আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

পরিশিষ্ট - ১. শাঁকারীর শ্রীশ্রীশঙ্করী মা

মাতৃমূর্তির বর্ণনা ঃ শঙ্করী মায়ের মূর্তিটি কষ্টি পাথরে নির্মিত অষ্টভুজা দেবী দুর্গামূর্তি। মূর্তির-উচ্চতা প্রায় চার ফুট, এবং প্রস্থে প্রায় দু'ফুট। মা সিংহারূঢ়া, অসূর দলনী। ছিন্ন-মুন্ড মহিষের মধ্য হতে এক অসুর নির্গত হয়েছেন, যাঁকে মহিষাসুর বলা হয়। মা ত্রিশূল দিয়ে সেই অসূরকে সংহার করছেন। মায়ের বিভিন্ন হস্তে রয়েছে বিভিন্ন অস্ত্র বা দ্রব্য যেমন উর্দ্ধ বাম হস্তে রয়েছে চক্র বা ঢাল, তার নিচের হস্তে রয়েছে ধনুক, তার নিচের হস্তে ধরে আছেন অসূরকে আক্রমণরত এক নাগসাপের লেজ, আর বাম দিকের একেবারে নিচের হস্ত দ্বারা মা ঐ অসূরের চুলের মুঠি ধরে আছেন। আর উর্ধ দক্ষিণ হস্তে রয়েছে পদ্ম বা শঙ্খ, তার নিচের হস্তে রয়েছে খড়গ, তার নিচের হস্তে রয়েছে ধনুকের বাণ, সবার নিচে দক্ষিণ হস্ত দিয়ে মা ত্রিশূল দ্বারা মহিষাসুরকে আঘাত করছেন। আর মহিষাসূর মহিষ থেকে নির্গত হয়ে তরবারি দিয়ে আক্রমণরত, সেই অবস্থায় সিংহ মহিষাসূরের দক্ষিণ হস্ত দংশন করছে। একখন্ড পাথর খোদাই করেই এই সমস্ত কিছু অতি নিপুন ভাবে নির্মিত হয়েছে। সিংহ, মহিষাসুর সহ মায়ের এই শান্ত স্নিগ্ধ মূর্তিটি প্রচীন শি ল্প ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। এই অপূর্ব শিল্পমন্ডিত মাতৃ মূর্তি নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ খালের পাশে পুকুরের মধ্যে কিভাবে এলেন তা গবেষণার বিষয় বলে আমার মনে হয়। আর এই গবেষণায় হয়ত আরও নতুন কিছু তথ্যও জানা যেতে পারে।

মায়ের মন্দির ঃ শাঁকারির উত্তর-পশ্চিম অংশে গ্রামের মধ্যে সবথেকে উঁচু জায়গায় সাধারণ ভূমি থেকে ৮/১০ ফুট উঁচুতে মায়ের মন্দিরটি অবস্থিত। প্রায় ১২ /১৩টি সিঁড়ি বেয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে উঠতে হয়, তারপর আরও দু'তিনটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। মায়ের মন্দির তিনটি অংশে বিভক্ত। মূল মন্দির , মূল মন্দিরের সামনে নাট মন্দির, আর নাট মন্দিরের সামনে পাথরের ভৈরবসহ বলিদানের স্থান।

মায়ের সেবাইত হরিসাধন রায়, বঙ্কুবিহারী রায়, মনোরঞ্জন রায়, গৌরচন্দ্র রায়, রোহিনী কুমার সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট সেবাইত গণের উদ্যোগে মন্দিরটির সংস্কার সাধন করা হয়েছে, এবং মায়ের মূল মন্দিরের পূর্ব গায়ে একটি ভোগ ঘর নির্মিত হয়েছে। মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে রয়েছে মায়ের একটি নিজস্ব পুকুর নাম — 'শঙ্করী পুকুর'। পৌষ সংক্রান্তি ও ১লা মাঘ মায়ের বাৎসরিক ভোগের সময় এই পুকুরের মাছ দিয়েই মায়ের ভোগের টক র'ন্না করা হয়।

মায়ের পূজা-পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ

নিত্যসেবা ও সন্ধ্যারতি ঃ প্রতিদিন একসের চালের পূজা দিয়ে মায়ের নিত্যসেবা আর সন্ধ্যায় আধপোয়া আখের গুড় বা মিষ্ঠান্ন দিয়ে নিত্য সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈশাখ মাসের ঠান্ডা ভোগ ঃ বোশেখ মাসে প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময় নানা রকম ফল ও ভিজে ছোলা সহ ঠান্ডা ভোগ দেওয়া হয়।

বাৎসরিক অনুষ্ঠান ঃ

শ্রাবণী পূর্ণিমা (ঝুলন পূর্ণিমা) ঃ শঙ্করী মা শাঁকারিতে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন এক শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন। তাই প্রতি বছর শ্রাবণী পূর্ণিমা বা ঝুলন পূর্ণিমার দিন মায়ের বিশেষ পূজা

অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বা বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। মায়ের সমস্ত পূজার দায় দায়িত্বে থাকেন 'রায়'(দত্ত) পরিবার, কিন্তু শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন মায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুসারে রায় পরিবার ছাড়াও গ্রামের বিশেষ বিশেষ পরিবার থেকে মায়ের পূজার 'নৈবেদ্য' ও বলিদানের 'ছাগ' উৎসর্গ করার রীতি আছে। ঐদিন মায়ের বেণারসী শাড়ি ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা স্নিগ্ধ মূর্তির পদতলে গিয়ে দাঁড়ালে মনে পাওয়া যায় অনেক ভরসা, অনেক প্রেরণা, অনেক শান্তি। মা যেন সকলকে অভয়দানের জন্য সদা ব্যাগ্র। মায়ের এই দিনের পূজাকে 'গ্রাম ষোলআনার' পূজাও বলা যেতে পারে। 'রায়' পরিবারের পূজাও নৈবেদ্যের সাথে বিশেষ বিশেষ পরিবার থেকে আসা পূজাও নৈবেদ্য-সহযোগে মায়ের পূজা শেষে 'ছাগ' বলিদানের ব্যবস্থা আছে। গ্রামের বিশেষ বিশেষ পরিবারের প্রাধান্য ও 'গোত্র' অনুসারে 'বলিদান' হয়ে থাকে। (১) প্রথমে মায়ের পুরোহিত পরিবার 'কাশ্যপ গোত্রে'র বলিদান, 'উচলো' পুকুর নামে মায়ের এক পুকুরের আয় থেকে 'কাশ্যপ' গোত্রের বলিদানের ছাগের ব্যয় মেটানো হয়। (২) কাশ্যপ গোত্রের বলিদানের পর মায়ের প্রধান সেবাইত 'রায় পরিবার' অর্থাৎ 'মৌদ্‌গোল্য' গোত্রের বলিদান, এরপর (৩) কবি নরসিংহ বসু পরিবার 'গৌতম গোত্রে'র বলিদান, এরপর (৪) মল্লিক (৫) বিষ্ণু, (৬) হারু বা হারাধন বসু, (৭) মিত্র, (৮) দে, (৯) উত্তম দাঁ, (১০) গোপ, (১১) নাপিত, (১২) মোদক, (১৩) দেব কোটাল, (১৪) তেলুয়া গ্রাম, (১৫) শিকার পুর গ্রাম, (১৬) তুলশী-বাগদি, (১৭) সতীশ ডোম। এখানে যেভাবে গোত্র বা নাম উল্লেখ করা হল, সেই ভাবে পর পর গোত্র বা নাম ডাকা হয় এবং 'বলিদান' সম্পন্ন হয়। সবশেষে বিপ্লবী রাস বিহারী ঘোষ মহাশয়ের সম্মানেও একটি বলিদানের ব্যবস্থা ছিল।

মায়ের শ্রাবণী পূর্ণিমার বিশেষ পূজা উপলক্ষে গ্রামের সকলেই মায়ের মন্দিরে উপস্থিত থাকেন। এমনকি যাঁরা চাকরির উদ্দেশ্যে বাইরে থাকেন তাঁরাও গ্রামে এসে মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হন। পূজা শেষে অপরাহ্নে মন্দির প্রাঙ্গণে ও তার আশে পাশে মেলা বসে, মেলায় বিভিন্ন রকমের দোকান গুলোর মধ্যে অধিকাংশই ভ্রাম্যমান দোকান, এই ভ্রাম্যমান দোকান মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ায়। এইসব দোকানের মালিকদের মধ্যে অনেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও আছেন। তাঁরাও শঙ্করী মায়ের শ্রাবণী পূর্ণিমার এই মেলার দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন।

শারদীয়া দুর্গোৎসবে শঙ্করী মায়ের মহাপূজা ঃ

মা শঙ্করী অষ্টভুজা দেবী দুর্গা। তাই শারদীয়া দুর্গোৎসবে মায়ের মহাপূজা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সহকারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মায়ের এই পূজোয় আজও রয়েছে বেশ কিছু প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। মায়ের এই মহাপূজো আরম্ভ হয় মহাসপ্তমীর তেরো দিন আগে কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে 'কৃষ্ণা নবম্যাদি কল্পারম্ভ' ও বোধনের মধ্য দিয়ে। যেমন ১৪১১সালে মায়ের বোধন আসে ২০শে আশ্বিন। এই বোধনের দিন থেকে মহাপূজো পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ঢাক ঢোল সহযোগে পূজা আরতি সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। এর সাথে যথারীতি মহাষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত মহাসমারোহে মায়ের শারদীয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

মহাসপ্তমী পূজা ঃ শারদীয়া পূজোর চারদিন মাকে বেণারসী শাড়ি ও নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়, তার পর মহাসপ্তমীর পুণ্য লগ্নে নবপত্রিকা ও কলাবৌ-স্থাপনের মধ্য দিয়ে মায়ের এই

দিনের পূজা আরম্ভ হয়। যদিও সামগ্রিক ভাবে মায়ের সমস্ত কিছু পূজা পার্বণের দায়িত্বে থাকেন 'রায়' পরিবার, কিন্তু মহসপ্তমীর পূজার নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি যাবতীয় দায়দায়িত্ব অর্পণ করা আছে কবি নরসিংহ বসু পরিবারের ওপর। তাঁরা নিজ ব্যয়ে এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাই ঐদিন রায় পরিবারের সাথে নরসিংহ বসু পরিবারের সদস্যদের নামেও 'সংকল্প' হয়ে থাকে।

মহাষ্টমী পূজা ঃ শঙ্করী মায়ের মহাষ্টমী পূজা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল — সন্ধিপূজো ও বলিদানের সময় নির্ধারনের 'তামি' বা জলঘড়ির ব্যবহার।

আমরা জানি মহাষ্টমীর সন্ধিপূজা আর সন্ধিক্ষণের 'বলিদান' নির্দ্দিষ্ট সময় সূচী অনুসারে আরম্ভ ও সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু আজ থেকে প্রায় চার-পাঁচশ বছর আগে খুব সম্ভবত আধুনিক ঘড়ির প্রচলন ছিল না। তাই শঙ্করী মায়ের সন্ধিপূজা ও বলিদানের সময় নির্ধারনের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, মায়ের কাছে এই পদ্ধতির নাম 'তামিপাতা'। একে এক ধরনের জলঘড়িও বলা যায়। আমার মতে এই পদ্ধতিটি প্রাচীন হলেও যথেষ্ঠ বিজ্ঞান সম্মত।

'তামি-পাতা', সন্ধিপূজা-বলিদান ঃ 'তামি' বা 'তামি-পাতার' নিয়মটা হচ্ছে —একটা বড়মাপের মাটির গামলা বা খাপ্‌রিতে কানায় কানায় জলভর্ত্তি করে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সাথে সাথে ঐ জলের ওপর নির্দ্দিষ্ট ওজনের ও নির্দ্দিষ্ট মাপের ছিদ্রযুক্ত একটি তামার বাটি রাখা হয়। ছিদ্রটি এমন মাপের করা আছে যাতে একদন্ড সময়ে বাটি জলের মধ্যে ডুবে যায়।
(একদন্ড = ২৪মি., আড়াই দন্ড = ১ ঘন্টা)। এইভাবে বাটি কতবার ডুবছে তার হিসেব রাখার জন্য খাপ্‌রির গায়ে চুনের দাগ দেওয়া হয়। তার আগে গাণিতিক পদ্ধতিতে ঠিক করে নেওয়া হয় সন্ধিপূজা, ' তৈরী পূজা' ও বলিদানের পূর্বে বাটি কতবার জলে ডুববে। দিনের বেলায় সন্ধি পূজা হলে — সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে, আর রাত্রিতে সন্ধিপূজা হলে সূর্য্যাস্তের সাথে সাথে সমবেত গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে - 'তামিপাতা' হয়। অর্থৎ মাটির গামলার জলে ঐ বিশেষ ছিদ্রযুক্ত বাটি স্থাপন করা হয়। এই বাটি সন্ধিপূজোর আগে কতবার ডুববে তা নির্ণয় করার জন্য সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের স্থানীয় সময়ে যখন জলে বাটি স্থাপন করা হয় সেই সময় থেকে সন্ধিপূজো, তৈরী পূজো ও বলিদানের সময়ের পার্থক্য নির্ণয় করে সেই সময়কে ২৪ দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় বাটি ডোবার সংখ্যা। কারণ বাটি এক'দন্ড' বা ২৪ মিনিটে একবার ডুবে যায়। যেমন ১৪০৮ সালে সন্ধিপূজা আরম্ভের সময় ছিল রাত্রি ১০.৩৮মিনিটে (স্থানীয় সময়) আর সূর্য্যাস্তের সময় ছিল বিকাল ৫.২মিনিট., ঐ সময়ে 'তামি পাতা' হয়। ঐ সময় থেকে সন্ধিপূজার সময়ের ব্যবধান হয় (১০.৩৮ - ৫.০২) = ৫ঘন্টা ৩৬মিনিট. বা ৩৩৬মিনিট। ঐ সময়ের বাটি জলে ডুববে — (৩৩৬মি.÷২৪মি.) = ১৪বার। অর্থাৎ ১৪ 'তামির' পর সন্ধি পূজোর হাঁক দেওয়া হয় এবং সন্ধিপূজো আরম্ভ হয়। এরপর আর একবার বাটি ডোবার পর ' তৈরী পূজো'র হাঁক ও বলিদানের ব্যবস্থা। আবার ১৪১১সালে সন্ধিপূজোর সময় ছিল অপরাহ্ন ৪.১১মি. (স্থানীয় সময়), এবং ঐদিন সূর্য্যোদয়ের সময় ছিল সকাল ৫.৩৯ মি.। ঐ বছর যে মুহূর্তে 'তামি পাতা' হয় সেই সময় থেকে অর্থাৎ সুর্যোদয়ের সময় থেকে সন্ধিপূজো আরম্ভের

সময়ের ব্যবধান হয় — (বি. ৪.১১ বা ১৬.১১ - ৫.৩৯ মি.) ১০ঘন্টা ৩২মি. বা ৬৩২মি, সেবার ২৬/১/২ বার অর্থাৎ ২৬/১/২ 'তামি' পর সন্ধিপূজো আরম্ভ হয়। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি এই আমলে তামি পাতার সময় বাটি ডোবার সংখ্যা নির্ণয়ের কাজ সুচারু ভাবে সম্পন্ন করতেন বা তদারকি করতেন রায় পরিবারের বিশেষ গণ্যমান্য সদস্য রাধাবল্লভ রায় মহাশয়, তাঁর পরে এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন — হরিসাধন রায় মহাশয়। আর 'তামি পাতার' বাটি কত বার ডুবছে তা দেখা, চুনের দাগ দেওয়া, আবার সঙ্গে সঙ্গে বাটিকে জলের মধ্যে রাখা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে জুবিলা গ্রামের রামকৃষ্ণ আচার্য পরিবারের উপর, বর্তমানে ঐ পরিবারের সদস্য সাতকড়ি আচার্য্য এই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। অবশ্য এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁদের কিছু জমি দেওয়া ছিল। বর্তমানে উন্নত তথ্য প্রযুক্তির যুগেও সময় নির্ণয়ের এই প্রাচীন ধারা যথা নিয়মে অব্যাহত রেখেছেন মায়ের সেবাইত বৃন্দ, বরং তাঁরা আধুনিক যুগের ঘড়ির সঙ্গে ঐ প্রাচীন পদ্ধতির মেল বন্ধন ঘটিয়ে মায়ের পূজার সময় নির্ণয় করে থাকেন।

মায়ের মহাষ্টমীর সন্ধির পূজোর আরও কিছু প্রাচীন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। - যেমন ঘড়ি না থাকার জন্য গ্রামের বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের অন্যান্য পূজা মন্ডপে যাতে সন্ধি পূজার ও বলিদানের সময় জানতে অসুবিধা না হয়, বা সঠিক সময় জানতে পারেন তার জন্য-সন্ধি পূজার সময় আগত হলে নির্দিষ্ট সংখ্যক 'তামি' ডোবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উঁচু মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্ত থেকে সমবেত কণ্ঠে তিনবার হাঁক দিয়ে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয় — 'বাপ সকল সব সন্ধি পূজোয় বসো।' এই হাঁক শোনার পর গ্রামে ও আশেপাশের গ্রামে সন্ধিপূজো আরম্ভ হয়, ঘড়ি অনুসারে আজও পূজা আরম্ভ হয় না। এরপর সন্ধি পূজার শেষে আর বলিদানের আগে প্রস্তুত হয়ে থাকার জন্য অনুরূপ ভাবে হাঁক দিয়ে তিনবার বলা হয় — 'বাপ সকল সব তৈরী পূজোয় বসো।' তারপর নিস্তব্ধভাবে মায়ের মন্দিরে সেই মহাসন্ধিক্ষণের জন্য অপেক্ষা, আর কাতর ভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা করা বলিদানের অনুমতি দিতে। কারণ মায়ের সন্ধিপূজার বলিদান পঞ্জিকার সময় অনুসারে হয় না, বলিদান হয় মায়ের অনুমতির উপর নির্ভর করে। মা তাঁর মাথা বা পা থেকে ফুল ফেলে সেই অনুমতি দান করেন। তাঁর পরই মায়ের মূল মন্দিরের সামনেই সন্ধিপূজার বলিদান হয়। আর মায়ের বলিদানের পর গ্রামের অন্যান্য পূজা মন্ডপে বলিদান হয়। মায়ের বলিদানের পরই সেই খাঁড়া (খড়্গ) নিয়ে কামার ও অন্যান্যরা ঢাক ঢোল সহ যান রায়পরিবারেরই ভাঁড়ে মার (মূর্ত্তি বিহিন-ঘটে পটে) পূজা মন্ডপে, সেখানে বলিদানের সব ব্যবস্থা প্রস্তুত করা থাকে। কামার গিয়েই ওখানে বলিদান করেই বাজনা বাদ্দি সহ সকলে মিলে মায়ের কাছে আবার ফিরে আসেন, ইতিমধ্যে গ্রামের অন্যান্য পূজা মন্ডপ থেকে পুরোহিত, সেবাইত সকলে মিলে ঢাকঢোল সহ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি জানাতে মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হন। এরপর মায়ের আরতি ও হোমের পূর্ণাহূতি দিয়ে মহাষ্টমীর পূজা সমাপ্ত হয়। পূজা শেষে শঙ্করী মায়ের বিশিষ্ট সেবাইতরা বাজনা-বাদ্দি সহযোগে গ্রামের সব পূজামন্ডপে যান শুভেচ্ছা সফরে।

শঙ্করী মায়ের সন্ধিপূজায় আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে দুর্গাপূজার চারদিন মা দুর্গার কাছে যে ধ্যান করা হয় তা হয় শ্রীশ্রীদুর্গামায়ের ধ্যান। যার কিছু অংশ —

'ওঁ জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরম্।
লোচনত্রয়ং সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাম্।
অতসী পুষ্পবর্ণাংভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্।
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্।'

'ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।'
'শত্রুক্ষয়কারীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পাহাম।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকাম ফলপ্রদাম্।'
'উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাচ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডাবতী চৈব চণ্ডরূপতি চণ্ডিকা।
অভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্।'

কিন্তু সন্ধিপূজার সময় মা দুর্গার যে ধ্যান করা হয় তা মায়ের চামুণ্ডা মূর্তির ধ্যান করা হয়। কারণ মা ভগবতী দুর্গা চণ্ডমুণ্ড অসুর বধ করে মুণ্ডমালী রূপ নিয়েছিলেন। তাই সন্ধিপূজায় মায়ের ধ্যানটি হল —

' কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা।
দ্বীপি চর্ম পরীধানা শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা।
অতি বিস্তার বদনা জিহ্বা ললন ভীষনা।
নিমগ্না রক্ত নয়না নাদা পূরিতদিঙ্মুখা ।'

মা দুর্গা বা মা শঙ্করীর যে মূর্ত্তির সামনে এই ধ্যান করা হয় সেই মূর্ত্তির সঙ্গে মায়ের এই ধ্যানের মূর্ত্তির কোন মিল নাই, তাই সন্ধি পূজার সময় শঙ্করী মাকে চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, কালীমায়ের মত মূর্ত্তিতে পরিণত করা হয়। তখন মায়ের ঐ চামুণ্ডা মূর্ত্তির সামনে পুরোহিত মশাইদের সমবেত কণ্ঠে ধ্যান সকলকে শিহরিত করে তোলে। সকলে নির্বাক হয়ে মাকে কাতর প্রার্থনা জানায় পূজা গ্রহণ করার জন্য।

মহানবমী ও বিজয়া দশমী ঃ মহানবমীর দিন ও মহাধূমধাম করে মায়ের পূজো অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন মায়ের মূল বলিদানের পর মানতের বলিদান থাকলে সেই বলিদানও হয়। মহানবমীর সন্ধ্যায় মায়ের নাট মন্দিরে বসে একটি মিলন বাসর। ঐ বাসরে উপস্থিত থাকেন মায়ের পুরোহিত, মূল সেবাইত বৃন্দ এবং মায়ের পূজার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য পরিবারবর্গের ব্যক্তিগণ, যেমন নরসিংহ বসু পরিবার এবং অনেকে। পুরোহিত মশাই উপস্থিত সকলের কপালে হোমের ফোঁটা পরিয়ে দেন ও প্রসাদ বিতরণ করেন। এরপর মায়ের পূজো সম্পর্কে কিছু আলোচনা ও কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও মাঝে মধ্যে হয়।

বিজয়া দশমীতে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, বেণারসী পরিহিতা মাকে অনেক দিন দেখা যাবে না। এরপর মা থাকবেন সাধারণ সাজে লাল পেড়ে শাড়ি পরে। শঙ্করী মায়ের কাছে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে শুধুমাত্র বিজয়া দশমীর দিন পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া যায়, তবে সরাসরি নয়। বেলপাতায় মায়ের নাম লিখে পুরোহিত মশাইএর হাতে দিতে হয়, তিনি ঐ বেলপাতা মায়ের চরণে নিবেদন করেন। এরপর ঘট

বিসর্জ্জনের মধ্য দিয়ে মায়ের শারদীয়া পূজা সমাপ্ত হয়।

মায়ের রাসযাত্রার পূজা ঃ সাধারণ ভাবে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু শঙ্করী মায়ের রাসযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় পরের পূর্ণিমায় অর্থাৎ অগ্রানের মার্গী পূর্ণিমাতে।

পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি ও ১লা মাঘের ভোগ উৎসব ঃ প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তি ও ১লা মাঘ মায়ের কাছে খিঁচুড়ী ও পায়েস ভোগ হয়। সেই সাথে মাছ পোড়া, বেগুন পোড়া, মাছের টক ইত্যাদি থাকে। তবে পৌষ সংক্রান্তির ভোগ পুরোহিত পরিবার, মূল সেবাইত পরিবার - রায় পরিবারের খিঁচুড়ী ও পায়েস ভোগ এবং বিশেষ বিশেষ দু'একটি পরিবারের যেমন বঙ্কুবিহারী রায় ও উমাচরণ বসু পরিবারের পায়েস ভোগ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

১লা মাঘের ভোগ খুব বড় আকারের হয়ে থাকে। এইদিন যাতে গ্রামের সকলেই মায়ের প্রসাদ পায় তার ব্যবস্থা করা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণেই বড় বড় উনুনে ভোগ রান্না হয়, আর মায়ের মন্দিরের পাশেই মায়ের নিজস্ব পুকুর 'শঙ্করী পুকুরের' মাছ দিয়ে এই ভোগের জন্য মাছের টক রান্না করা হয়। ঐ দিন গ্রামের সকলেই মাছের টকসহ মায়ের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হন। ছেলে বেলায় যখন গ্রামে ছিলাম, আর এখন যে বছর ঐদিনে গ্রামে যাবার সুযোগ সৌভাগ্য হয় তখন মায়ের ঐ বিশেষ ভোগ প্রসাদ পাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

আষাঢ়ে নবমী ঃ আমাদের কৃষি এখনও মৌসুমি বায়ু নির্ভর। বিশেষ করে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এই নির্ভরশীলতা অনেক বেশী ছিল। সময় মতো বৃষ্টি না হলে চাষিরা দিশেহারা হয়ে পড়তেন, নানা জায়গায় নানা পূজা অনুষ্ঠিত হত। শাঁকারিতেও উমাচরণ বসুর উদ্যোগে সময়মতো বর্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর আষাঢ়ে নবমী তিথিতে শঙ্করী মায়ের কাছে গ্রাম যোলআনার একটি বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হত। গ্রামের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে সম্মিলিত ভাবে মহাসমারোহে মায়ের এই আষাঢ়ে নবমীর পূজা করতেন, এমনকি গ্রামের সমস্ত ঢাকিরা সমবেত ভাবে ঐ দিনের পূজোয় বাজাতে আসতেন। কারণ ভাল বর্ষা হলে তো সকলেই আনন্দের ভাগিদার হতে পারে। পরবর্ত্তীকালে ডি. ভি. সি'র সেচের জল অল্পবিস্তর আসায় ক্রমে ক্রমে এই পূজো বন্ধ হয়ে যায়।

সকলের পূজা ঃ গ্রামের যে কোন বাড়িতে যে কোন উৎসব হলে যেমন বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতে ইত্যাদি, অনুষ্ঠান হলে কিম্বা বাড়িতে কোন দেব দেবীব পূজা হলে শঙ্করী মায়ের কাছে পূজা করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হয়।

মায়ের পুরোহিত বর্গের-সংক্ষিপ্ত-তালিকা ঃ মায়ের মূল পুরোহিত পরিবার হচ্ছেন গ্রামের কাশ্যাপ গোত্র ভূক্ত 'চক্রবর্ত্তী পরিবার'। এছাড়া চক্রবর্ত্তী পরিবারের দৌহিত্র হিসাবে 'বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার' ও আরও দু একটি ব্রাহ্মণ পরিবার মায়ের পুরোহিত হিসাবে পূজার দায়িত্বে রয়েছেন। মায়ের বর্তমান পুরোহিত বর্গের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো — (১) শ্রী রনজিৎ চক্রবর্ত্তী পিতা° ভোলানাথ চক্রবর্তী, (২) শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী, পিতা° শিবনাথ চক্রবর্ত্তী (৩) শ্রী হারাধন চক্রবর্ত্তী পিতা° হরিহর চক্রবর্ত্তী, (৪) শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী পিতা° আশুতোষ

চক্রবর্ত্তী (৫) শ্রী উমাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শ্রী ভবানী চক্রবর্ত্তী, শ্রী লক্ষীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রী চন্দন চক্রবর্ত্তী, সুনিল বরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রী সুশান্ত চক্রবর্ত্তী — পিতা ঁ গোপী কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী । (৬) শ্রী রামানন্দ চক্রবর্ত্তী পিতা ঁ শিবরাম চক্রবর্ত্তী, (৭) ঁ ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী , ঁ অনিল চক্রবর্ত্তী , শ্রী ষষ্টীচরণ চক্রবর্ত্তী ।

দৌহিত্র হিসাবে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার ও অন্যান্য পুরোহিত পরিবার ঃ

১। শ্রী সুনীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা ঁ গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা ঁ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩। শ্রী সচ্ছিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা ঁ সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শঙ্করী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা ঁ শ্রী আনন্দ বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। শ্রী দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী উমাপ্রসাদ, শ্রী গৌরী প্রসাদ, শ্রী ভবানী প্রসাদ, শ্রী সুন্দর প্রসাদ পিতা ঁ অনিল বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। শ্রী সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা ঁ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। শ্রী আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা ঁ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, — (বর্তমানে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূজার পালার দায়িত্বে আছেন- শ্রী রণজিৎ চক্রবর্ত্তী পরিবার,) ৮। রাম মুখোপাধ্যায় -, (রাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্ধমানের ১০৮ শিব মন্দিরের পৌরহিত্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁর অংশের শঙ্করী মায়ের পূজার দায়িত্বে রয়েছেন — শ্রী কালিদাস রায়।) ৯। শ্রী পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রী সোমনাথ চক্রবর্ত্তী, পিতা ঁ অপূর্বলাল চক্রবর্ত্তী, ১০। ঁ ষষ্ঠী চক্রবর্ত্তী, ১১। শ্রী জয়ন্ত কুমার রায়, শ্রী অচিন্ত কুমার রায়, পিতা ঁ শক্তিপদ রায়।

মায়ের সেবাইতবর্গের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ

মায়ের মূল সেবাইত হলেন গ্রামের রায় পরিবার এবং ঐ পরিবারের দৌহিত্র পরিবার। মায়ের শ্রাবণী পূর্ণিমা, শারদীয়া মহাপূজা বা অন্যান্য বাৎসরিক পূজায় মায়ের এই সেবাইতবৃন্দের নামে সঙ্কল্প হয়ে থাকে। সন ১৪১০ সালে শারদীয়া মহাপূজায় শ্রীশ্রী শঙ্করী মায়ের সেবাইত গণের সঙ্কল্পের তালিকা ঃ—

১। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী গোপাল কৃষ্ণ দত্ত দাস।
২। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী শান্তি সাধন দত্ত দাস।
৩। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী অজিত কুমার দত্ত দাস।
৪। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী শিব সাধন দত্ত দাস।
৫। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী শিশির কুমার দত্ত দাস।
৬। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী গৌরী শঙ্কর দত্ত দাস।
৭। গৌতম গোত্র - শ্রী রাধাগোবিন্দ বসু দাস।
৮। গৌতম গোত্র - শ্রী কাশীনাথ বসু দাস।
৯। শান্ডিল্য গোত্র - শ্রী রোহিনী কুমার সরকার দাস।
১০। বাৎস্য গোত্র - শ্রী গোপাল চন্দ্র সরকার দাস।
১১। বাৎস্য গোত্র - শ্রী রঞ্জিত কুমার সরকার দাস।
১২। কাশ্যপ গোত্র - শ্রীপরেশচন্দ্র সরকার দাস।

১৩। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী বঙ্কুবিহারী দত্ত দাস।
১৪। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী ভোলানাথ দত্ত দাস।
১৫। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী গৌরচন্দ্র দত্ত দাস।
১৬। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী পরেশচন্দ্র দত্ত দাস।
১৭। গগর্ষি গোত্র - শ্রী সদানন্দ দত্ত দাস।
১৮। গগর্ষি গোত্র - শ্রী রাখহরি দত্ত দাস।
১৯। গগর্ষি গোত্র - শ্রী শ্যামল কান্তি দত্ত দাস।
২০। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী দিলীপ কুমার দত্ত দাস।
২১। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী অঞ্জন কুমার দত্ত দাস।
২২। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী তাপস কুমার দত্ত দাস।
২৩। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী তপন কুমার দত্ত দাস।
২৪। মৌদ্‌গল্য গোত্র - শ্রী রাঘব চন্দ্র দত্ত দাস।
২৫। ভরদ্বাজ গোত্র - শ্রী অলোক কুমার দত্ত দাস।
২৬। শাণ্ডিল্য গোত্র - শ্রী গুরু প্রসাদ সিংহ দাস।
২৭। মৌদ্‌গল্য গোত্রায়া - শ্রীমত্যা যোগমায়া দাস্যা।
২৮। কাশ্যপ গোত্রায়া - শ্রীমত্যা গুরু প্রিয়া দাস্যা।
২৯। কাশ্যপ গোত্রায়া - শ্রীমত্যা দেব প্রিয়া দাস্যা।
৩০। তালিকা দাতা - শ্রী মনোরঞ্জন দত্ত দাস।

এছাড়া শারদীয়া মহাসপ্তমীতে নরসিংহ বসু পরিবারের উপর মায়ের সেবা পূজার বিশেষ দায়িত্ব থাকায় ঐদিন নরসিংহ বসু পরিবারের সদস্যদের নামেও 'সঙ্কল্প' হয়। তাঁরা মহাসপ্তমী পূজার ব্যয়ভার বহন করে মায়ের সেবায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

মায়ের নিত্য পাট, ফুলতোলা, সন্ধ্যা দেখানোর দায়িত্ব দেওয়া আছে-গ্রামের 'মালাকার' পরিবারের ওপর। মায়ের প্রাঙ্গণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও অন্যান্য কাজের দায়িত্বে রয়েছেন ' কোটাল ও সতীশ ডোম-পরিবার।'

শঙ্করী মায়ের পুরোহিত বর্গের নামের বিবরণ দিয়েছেন — শ্রীশ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী। সেবাইতবর্গের তালিকা দিয়েছেন — শ্রী মনোরঞ্জন রায়।

২। কবি নরসিংহ বসুর গৃহদেবী শ্রীশ্রীকালী মা ঃ

কবি নরসিংহ বসুর নিজগৃহের শ্রীশ্রী কালীমা শাঁকারি অঞ্চলে 'বোসেদের কালীমা'বলে বিখ্যাত। কবি তাঁর কাব্যের বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করার সময় নিজগৃহের দেবীর বন্দনা প্রসঙ্গে লিখেছেন —

'নিজালয়ে শ্যামারূপা বন্দ সাবধানে।
অপার মহিমা যার আগামে পুরাণে।।' (১২)

এই কাব্যাংশ থেকেই দেখা যাচ্ছে কবির কাব্যরচনা কাল ১৬৩৬ শকাব্দের বা বাংলার ১১২১ সালের (ইং - ১৭১৪খৃঃ) পূর্ব হতে কবি পরিবারে শ্যামা মা পূজিতা হয়ে আসছেন। তবে বর্তমানে দেখা যায় বসু পরিবারের দু'টি ধারায় দু'টি শ্যামারূপা কালী মা পূজিতা হচ্ছেন নরসিংহ বসুর আমল থেকেই। এর মধ্যে নরসিংহ বসুর বংশধারার মৃন্ময়ী শ্রীশ্রী শ্যামারূপা কালীমা, অপরটি সদাশিব চরণ ও শঙ্করী চরণ বসুর বংশধারার প্রস্তর মূর্ত্তির শ্যামারূপা কালীমা। তবে বসু পরিবারে শ্যামা মায়ের পূজা দু'টি ধারায় বিভক্ত হলেও পূর্বে যে একই ধারায় আবদ্ধ ছিল তার প্রমাণ হিসাবে দেখা যায় দুই কালী মায়ের কাছে একই নারায়ণ (শিলা) পূজিত হন পর্য্যাক্রমে একমাস নরসিংহ বসুর কালী মায়ের কাছে, আর একমাস শ্যামারূপা মায়ের কাছে। এর আর একটা প্রমাণ হচ্ছে শ্রীশ্রী দীপান্বিতা কালী পূজার পর দিন শ্যামারূপা মা তাঁর প্রত্যেক সেবাইতদের বাড়িতে পদধূলি দেন, সেই সময় নরসিংহ বসু পরিবারেও মা তাঁর পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ দিতে যান, এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় এক সময় নরসিংহ বসু পরিবারও শ্যামারূপা মায়ের সেবাইত ছিলেন। আর কালী মায়ের সেবাইত নরসিংহ বসু পরিবার ও শ্যামারূপা মায়ের সেবাইত বিজয় গোবিন্দ বসু, প্রকাশ বসু পরিবার যে একই বংশ ধারায় অন্তর্গত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় করালী চরণ বসুর বিবাহের আগে পর্যন্ত এই দুই পরিবারের মধ্যে অশৌচ পালনের নিয়ম দেখে। দু'টি ধারায় দু'টি কালীমা পূজিতা হচ্ছেন বহুকাল আগে থেকেই। প্রথমে কবির মৃন্ময়ী কালীমায়ের প্রতিষ্ঠা, পূজা পদ্ধতি ও অন্যান্য কিছু বিষয়ে আলোচনা করছি —

কবি নরসিংহ বসুর মৃন্ময়ী দেবী কালীমায়ের প্রতিষ্ঠা ঃ ঘটনা পরম্পরা থেকে বুঝা যায় যে কবি তাঁর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনার পর অবসর জীবনে মৃন্ময়ী কালীকা দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন যিনি আজও মহাসমারোহে পূজিতা হয়ে আসছেন। কবি বংশের অপর একটি শাখায় তাঁরই বসতবাড়ির একেবারে পশ্চিম গায়ে প্রস্তর নির্মিত শ্যামারূপা কালীমা অধিষ্ঠিত থাকার পরও কবি তাঁর মৃন্ময়ী কালীমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে। এক কিংবদন্তী-অনুসারে প্রতিবেদকের পিতা স্বর্গীয় উমাচরণ বসু গবেষক ডঃ সুকুমার মাইতি মহাশয়কে যে বিবরণ দিয়েছিলেন সেই বিবরণ অনুযায়ী (নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থের পৃঃ ৬০) দেখা যায় এক সন্ন্যাসীর নির্দেশে এই মৃন্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে সন্ন্যাসী নিজে কবি গৃহের কিছুটা দক্ষিণে স্বর্গীয় প্রহ্লাদ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের রাধা-গোবিন্দ জীউ মন্দিরের বারান্দায় এই মৃন্ময়ী কালীমায়ের মূর্তি গঠন করেন। রাধা-গোবিন্দ মন্দিরে কালী মূর্তি নির্মাণের একটা তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়। সন্ন্যাসী হয়ত দেখাতে চেয়েছিলেন 'যিনিই কৃষ্ণ তিনিই কালী' আর এই ব্যাপারে রাধা গোবিন্দ জিউ'র সেবাইত মজুমদার পরিবারের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপর্ণ। তাঁরাও উদার মনোভাব নিয়ে ঐ মন্দিরে কালীমূর্তি নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু ব্যবস্থা করে দেওয়াই নয়। প্রতি বছর শ্রীশ্রী

দীপান্বিতা শ্যামা মায়ের মহাপূজার দিন এই মজুমদার পরিবার থেকে বসু পরিবারের কালীমায়ের কাছে একটি বিশেষ ' নৈবেদ্য' পাঠানো হয়। মহাপূজার পর ঐ নৈবেদ্য তাঁদের পুরোহিত মশাইকে অর্পণ করা হয়।

যাইহক সন্ন্যাসী মূর্তি নির্মাণ করে নরসিংহ বসুর বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং নিজেই মায়ের পূজা করেন, এবং পূজা শেষে মৃন্ময়ী দেবী প্রতিমার মধ্যে যে চিন্ময়ী দেবী সত্তার আবির্ভাব হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য সন্ন্যাসী মায়ের দক্ষিণ হাতের আঙ্গুল থেকে রক্ত বের করে দেখান, আর সেই রক্ত একটি মাটির কটোরায় করে দেবীর বেদীমূলে স্থাপন করে বলেছিলেন মা এখান থেকে কোথাও যাবেন না। তোমরা ভক্তিভাবে মায়ের পূজা ক'রো। সেই থেকে এই মৃন্ময়ী দেবী কালিকা কবির কুল দেবীরূপে পূজিতা হয়ে আসছেন। এই অঞ্চলের সকলের মুখেই শোনা যায় ' বোসেদের কালী মা খুব জাগ্রত'। কিন্তু কালী মা তো ' বোসেদের', ' ঘোষেদের', ' মিত্রিদের' আলাদা আলাদা হয় না। কালীমা এক ও অভিন্ন। তিনি সর্বত্র সমান ভাবে বিরাজমান এবং জাগ্রত, তবে ভক্তের একাগ্র ভক্তিই দেবী বা দেবতাকে বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করে রাখেন। যেমন সাধক রামপ্রসাদের সাধনার জোরেই মা কালী তাঁর কন্যারূপে অবতীর্ন হয়ে তাঁকে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করেছিলেন। সাধক কমলাকান্ত, ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব তো তাঁদের ভক্তির প্রভাবে মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, খেয়েছেন, মাকে বেঁধে রেখেছেন। নরসিংহ বসুর ভক্তি, তাঁর সাধনাই মাকে ' বোসেদের' বাড়িতে আটকে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার মাইতি মহাশয় তাঁর গবেষণা পত্র এবং তাঁর সম্পাদিত 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন — দেবীর প্রতি এঁদের কি প্রকার ভক্তি বিশ্বাস আজও অটুট তার পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কবির অধস্তন অষ্টম পুরুষ কবি উমাচরণ বসুর গবেষককে লিখিত একখানি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করছি (পৃঃ ৬০)

"শ্রীশ্রী ব্রহ্মময়ী কালীমায়ের বাৎসরিক মহাপূজা অনুষ্ঠিত হইবার আর সামান্য দিন বাকি আছে মাত্র। তাই এই কয়দিন আমরা সকলেই খুব ব্যস্ত থাকি যতক্ষণ না তিনি দয়া করিয়া তাঁহার পূজা নিজে গ্রহণ করেন। আমাদের প্রতি মায়ের কত যে করুণা তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নরসিংহ বসুর ভক্তিজোরে প্রতিষ্ঠিতা আনন্দময়ী মা সেই কত কাল পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের ন্যায় অধম ব্যক্তির নিকট ঘোর অমানিশাতেও কিভাবে পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেই সময় মায়ের চিন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিলে সকলেরই মনে পূর্ণ আনন্দের উদ্রেক হইবে এবং মায়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইবে, দর্শন না করিলে লিখনে ইহা ব্যক্ত করা যায় না।" মায়ের পূজা সম্পর্কে উমাচরণ বসুর এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ সুকুমার মাইতি মহাশয় লিখেছেন —

'ভক্তি বিশ্বাসের অপূর্ব নিদর্শন ইহা অপেক্ষা আর কি হতে পারে! এই দেবীই আপদে বিপদে এঁদের রক্ষা করে আসছেন।' দেবী যে শুধু এই পরিবারকে রক্ষা করে আসছেন তাই নয়, যে কোন ভক্তকেই মা রক্ষা করে আসছেন। আর সেটা বুঝা যায় মায়ের বাৎসরিক মহাপূজার দিন মায়ের সেই অপরূপা চিন্ময়ীরূপ দর্শনের জন্য আর পূজা নিবেদন করার জন্য মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে অগণিত ভক্তের সমাগমে। সকলেই ভক্তিভরে মায়ের কাছে পূজা নিবেদন করেন, তাঁদের 'মানত' করা 'মানসিক' নিবেদন করেন। এই মানসিকের মধ্যে যেমন থাকে স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার, শাঁখা-শাড়ি মিষ্টান্ন, তেমনি থাকে ছাগ

বলিদান। এই মহাপূজার সময় বসুপরিবারের সদস্যগণ যে যেখানেই থাকুন না কেন সকলেই গ্রামের বাড়িতে মায়ের পূজা করার জন্য উপস্থিত হন।

দেবী মূর্ত্তি ঃ— দেবী মৃন্ময়ী চতুর্ভুজা কালিকা মূর্ত্তি। যেমনটি তাঁর ধ্যানে উল্লেখ আছে - 'করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী-চতুর্ভুজাম। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুন্ডমালা বিভূতিতাম।।' এই মূর্ত্তি প্রতিবছর দীপান্বিতা কালীপূজার পূর্বে গঠন করা হয়, এবং মহাপূজার পরের দিন সন্ধ্যায় গ্রাম প্রদক্ষিণের পর কবি পরিবার প্রতিষ্ঠিত 'বসুপুকুরে' নিরঞ্জন দেওয়া হয়।

মায়ের বাৎসরিক মহাপূজা ঃ প্রায় তিন'শ বছর ধরে দীপান্বিতার মহাঅমানিশায় মায়ের বাৎসরিক মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। দীপান্বিতা অমবস্যা তিথির মধ্যরাত্রে মায়ের এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মায়ের মহাপূজায় কাঁচি সাড়ে চারমন অর্থাৎ এক'শ কুড়ি কেজি ধানের আতপ চালের ৩২টি নৈবেদ্য হয় পূজা দিনে, এর পরের দিন তিনটি নৈবেদ্য হয় এর মধ্যে শঙ্করী মায়ের কাছে একটি নৈবেদ্য নিয়ে যাওয়া হয়। পূজার দিন ৩২ টি নৈবেদ্যর মধ্যে ২টি পাঁচ সের করে আর বাকিগুলি আড়াইসের করে চালের, সঙ্গে নানা ফল, লবাত মুড়ি ও কদমা দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হয়। আর একটি অঙ্গোট কলাপাতার মধ্যে পাঁচসের আতপ চাল কুচো ফল মূল মিষ্ঠান্ন সহযোগে কুচো নৈবেদ্য দিতে হয়। এছাড়া মুড়কি, নারকেল নাড়ু, লুচি ও ক্ষীর সহ ভোগ দেওয়া হয়। একটি পাথরের থালায় শুধু ফলের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। আর একটি পৃথক নৈবেদ্য কয়ালদের সিদ্ধেশ্বরী কালীমায়ের কাছে পাঠানো হয়।

সমস্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত করার পর মহানিশায় বাজনা বাদ্দি সহ শোভাযাত্রা করে বসুপুকুর থেকে ঘট পূর্ণ করে নিয়ে এসে দেবীর সামনে 'ঘট' স্থাপন করা হয়। এরপর লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী পূজা করে এসে মায়ের মন্দিরে মহাপূজা আরম্ভ হয়। মহাপূজা আরম্ভের আগে গুরু ও পুরোহিত বরণ করা হয়। এই পরিবারের যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ সদস্য তিনি গুরু ও পুরোহিত মশাইদের বরণ করেন, এবং এই পরিবারের জন্য ও সকল ভক্তগণের জন্য সুচারুরূপে মায়ের পূজা করার প্রার্থনা জানিয়ে বলেন - ' বিষ্ণুরোম কার্ত্তিকে মাসে তুলা রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে মহানিশা দীপান্বিতা অমাবস্যাংতিথৌ গৌতম গোত্রঃ শ্রী শক্তিপদ বসুদাসস্য (বর্তমান বর্ষিয়ান সদস্য) কাশ্যপ গোত্রং শ্রীমন্তং শ্রীকান্ত দেবশর্ম্মানং (বর্তমান পূজারী) / শ্রী হারাধন দেবশর্ম্মানং (তন্ত্রধারক) মহাকাল ভৈরব সহিতং শ্রীমৎ দক্ষিণা কালিকা পূজার্থং / পূজার্থং তন্ত্রধারক কর্মকরনায় তুভ্যমহং বৃনে।' পুরোহিত মশাইরা তার উত্তরে বলেন — 'ওঁ বৃতোহস্মি।' ঐ বর্ষিয়ান সেবাইত পুনরায় আবেদন জানান — 'যথা বিহিতং বৃতকর্ম্ম-কুরু।' পুরোহিত মশাইরা সম্মতি জানিয়ে বলেন— ' যথাজ্ঞানং বৃত কর্ম্ম করবাণি।'

এরপর শুরু হয় মহাপূজা। মায়ের মহাপূজার জন্য এই বংশের পুরোহিতগণের অন্যতম পুরোহিত স্বর্গীয় হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি পুঁথি স্বহস্তে লিখেছিলেন। দীর্ঘদিন সেই পুঁথি দৃষ্টে মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাতে লেখা পুঁথিটি দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে জীর্ণকায় হয়ে পড়ায় অন্য পুঁথি দৃষ্টে বর্তমানে মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মূল মহাপূজার পর 'মানসিকের' পূজা শুরু হয়। এই পূজার শেষে ছাগ বলিদানের কার্য্য সম্পাদন হয়। 'এখানে একটা কথা উল্লেখ করছি — লেখক, নরসিংহ বসুর অধস্তন নবম-পুরুষ, এই পশুবলিদান বর্তমান সামাজিক

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে প্রাণে সমর্থন করেন না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে বলিদানের মূল উদ্দেশ্য এখন পাল্টে গেছে। বলিদানের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে যে ষড় রিপু আছে - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ষড়রিপুর প্রতীকি বলিদান হচ্ছে পশু বলিদান। কিন্তু বর্তমানে আমরা কি দেখি - রিপু বলিদানের পরিবর্তে রিপু বর্ধন। দেখি বলিদানের 'মাংস প্রসাদের' ওপর মানুষের লোভ, লোভ থেকে ক্রোধ, তারপর ক্রোধ থেকে উত্তেজনা। তাই বর্তমানে এই পশু বলিদানকে আর সমর্থন করা যায় না। এ সম্পর্কে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের আচার্য্য স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ১৪.৪.১৯২৬ তারিখে শ্রী উমাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পত্রের কিয়দাংশ এখানে উল্লেখ করলাম —

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ শরণম্ রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড়-পোষ্ট,
হাওড়া-জেলা।
১৪.৪.১৯২৬

"শ্রীমান উমাপদ ,

তোমার চিঠি পাইলাম। ....।
মা কালীর পূজায় পশু বলিদান না দিয়ে অনুকল্পে কলা, কুমড়ো ইত্যাদি বলি দিতে পার, মা তাহাতে অপ্রসন্ন হবেন না। ....।
তোমরা আমার খুব আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও। তোমাদের খুব ভক্তি বিশ্বাস হউক। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্খী
শিবানন্দ।"

যাইহোক প্রতিবেদকের একার প্রচেষ্টায় মা কালীর কাছে পশু বলিদান বন্ধ করে পরিবর্তে কলা, চালকুমড়ো ইত্যাদি দ্রব্যের বলিদান প্রবর্ত্তন করা এখনও সম্ভব হয় নাই। পুরাতন রীতি অনুযায়ী 'বসু পরিবারের' একটি ছাগ বলিদান হয়, এছাড়া যাঁরা ছাগ বলিদান 'মানত' করেন তাঁদেরও মায়ের কাছে ছাগ বলিদান দেওয়া হয়। অবশ্য প্রতিবেদকের অনুরোধে মানতকারিদের 'ছাগ বলিদান' মানতের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দ্রব্য 'মানত' করার কথা বলা হয়। বলিদানের পর আরতি, তারপর হোম এবং সব শেষে 'পুষ্পাঞ্জলি' দিয়ে মহা অমানিশার পূজা শেষ হয়। পূজা শেষ হতে ভোর বা সকাল হয়ে যায়।

মহাপূজার দ্বিতীয় দিন ঃ- মায়ের মহাপূজা দর্শনের জন্য গ্রামের সব ব্রাহ্মণ পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিমন্ত্রন জানানো হয়, এবং পরের দিন সকালে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য সামান্য প্রসাদ বিতরণের আয়োজন থাকে, তাঁরা ঐ সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করে মায়ের মহাপূজা সম্পন্ন করতে বসু পরিবারকে সাহায্য করে থাকেন।

এরপর মায়ের কাছে নিবেদিত প্রথম বত্রিশটি নৈবেদ্য কুলপুরোহিত, কুলগুরু, গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ এবং পূজার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে বৃত্তি হিসাবে প্রদান

(স্বামী শিবানন্দ মহারাজের চিঠিটি 'উদ্বোধন' পত্রিকা বৈশাখ ১৪০৯ - ৪র্থ সংখ্যার সৌজন্যে গৃহীত ও উদ্ধৃত হইল। ভ্রাতৃপ্রতীম শ্রীহারাধন চক্রবর্ত্তী -এই পত্রিকা সরবরাহ করে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন।)

করা হয়। এই বৃত্তির একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বৃত্তির তালিকা —

	বৃত্তি প্রাপকের নাম	বৃত্তির পরিমান
১।	যে পুরোহিত পালা -	২টি (৫ সের চালের)
২।	৺ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর - পক্ষে	
	৺ হরিহর চক্রবর্ত্তী - পক্ষে	
	শ্রী হারাধন চক্রবর্ত্তী —	১টি (আড়াই সের চালের)
৩।	৺ ঘোষাল ঠাকুরানীর পক্ষে	
	৺ হরিহর চক্রবর্ত্তী - পক্ষে	
	শ্রী হারাধন চক্রবর্ত্তী —	১টি (,,)
৪।	৺ গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় -	১টি (,,)
৫।	৺ কালী ভট্টাচার্য্য পক্ষে	
	৺ প্রবোধ ভট্টাচার্য্য —	১টি (,,)
৬।	কেদার ভট্টাচার্য্য পক্ষে	
	৺ বিজয় ভট্টাচার্য্য —	১টি (,,)
৭।	৺ সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী-পক্ষে	
	৺ গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী —	১টি (,,)
৮।	পুরাতন পুরোহিতের জন্য	
	৺ সত্য মাষ্টার মশাই —	১টি (,,)
৯।	৺ হরিসত্য চক্রবর্ত্তী-পক্ষে	
	৺ বাদল চক্রবর্ত্তী —	১টি (,,)
১০।	ফুল বেলপাতা চাঁদমালার	
	জন্য-মালাকার —	১টি (,,)
১১।	মাটির বাসন, ঘট ইত্যাদির	
	জন্য - কুম্ভকার —	১টি (,,)
১২।	প্রতিমা গঠনকারী —	১টি (,,)
১৩।	বলিদানের কর্মকার —	১টি (,,)
১৪।	হোমের ঘৃত ও হোমের	
	কাঠের জন্য আচার্য্য —	১টি (,,)
১৫।	কলাপাতা, কলাপেটো ও নৈবেদ্য	
	বিতরনের জন্য নাপিত —	১টি (,,)
১৬।	কুল পুরোহিত ৩জন	
	প্রত্যেকে ৪টি করে —	১২টি (,,)
১৭।	গুরুদেব —	৪টি (,,)
		৩২টি

১৮। পূজার পর দিন ৩টি নৈবেদ্য
৩ জন পুরোহিত ১টি করে — ৩টি
৩৫টি

১৯। কুচো নৈবেদ্য ঃ-
প্রতিমা নিরঞ্জনের বাহক ১টি
ও বাজনদার দের দেওয়া হয় ১টি

মহাপূজার দ্বিতীয় দিনে আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় — যেমন বসু পরিবারের অপর ধারায় পূজিতা শ্যামারূপা মায়ের আগমন — দ্বিতীয় দিনে পূজার শেষে শ্যামারূপা মা তাঁর বর্তমান সকল সেবাইতগণের বাড়িতে ও নরসিংহ বসু পরিবারে গমন করেন ও পদধূলি দান করেন। বাজনা বাদ্যি শঙ্খধ্বনি দিয়ে মাকে বরণ করে তাঁর পদধূলি মাথায় নিয়ে আশীর্বাদ-ভিক্ষা করা হয়।

এরপর ঢাক ঢোল সহ শোভা যাত্রা করে শঙ্করী মায়ের কাছে পূজা দিতে যাওয়া হয়। শঙ্করী মাকে নূতন কাপড় পরিয়ে তাকে ভক্তি ভরে পূজা করে কালীমায়ের কাছে এসে দধিকর্মার পূজা হয়। পূজার শেষে চ্যাং মাছ বলিদান, আরতি, তারপর লক্ষ্মীপূজা, শেষে ঘট বিসর্জন— বিসর্জনের সময় বলা হয় — " গচ্ছ গচ্ছ দেবী স্বস্থানে যায়্যা বস্যা। পূজা আবাহন কালে পূণর্বার আস্যা।।"

সন্ধ্যায় প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা, বিদায় সুরে মাকে বিদায় জানাতে বহু মানুষের সমাগম হয় মন্দির প্রাঙ্গণে, ডোমপড়া, কয়ালপাড়া, শঙ্করীতলা প্রভৃতি পূজা মন্ডপ থেকে কালী মা, সিদ্ধেশ্বরী মা ও তাঁর সেবাইতরা মন্দির প্রঙ্গণে উপস্থিত হন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কালুডোমের স্মরণে বসু পরিবার থেকে ডোমপাড়ার কালীমাকে বাজনা বাজিয়ে নিয়ে আসা হয়। ডোম পাড়ার যুবা বৃদ্ধা সকলে মায়ের কাছে এসে লাঠি খেলা প্রদর্শন করেন। এটা যেন তাদের ব্রত। বাজনার তালে তালে বহুক্ষণ ধরে চলে লাঠি খেলা। মায়ের পূজাকে কেন্দ্র করে কয়াল পাড়া ডোমপাড়ার সঙ্গে যে মেলবন্ধনের ব্যবস্থা করে গেছেন পূর্বপুরুষেরা সেটা মনে হয় সমাজের তথাকথিত জাতপাতের গন্ডিকে ছিন্ন করে সুসম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই তাঁরা এই ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। আনন্দের কথা পূর্বপুরুষদের প্রবর্তিত ব্যবস্থা আজও অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরে গর্ব অনুভব করি। লাঠি খেলার শেষে মাকে বরণ করে আঁচলে কনকঞ্জলি নিয়ে মাকে চোখের জলে বিদায় জানানো হয়। শোভাযাত্রা সহযোগে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মাকে 'বসু-পুকুরে' নিরঞ্জন দেওয়া হয়। মাকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করার সময় কোথাও মাকে মাথা থেকে নামানো যায় না। মাকে নিরঞ্জন করার পর পুকুর ঘাট থেকেই মায়ের উদ্দেশ্যে একটি গান করতে করতে পূজা মন্দিরে ফিরে আসেন সেবাইতরা। সেই গানটি হচ্ছে —

ওমা দিগাম্বরী নাচ গো।
নাচ গো নাচ গো শ্যামা নাচ গো।।
(মা) যেমনি নাচ শিবের ঘরে তেমনি নাচ আমার ঘরে।
ওমা দিগম্বরী নাচ গো।।
মা তোর রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর বাজে গো।
ওমা দিগম্বরী নাচ গো।।

(এই গানটি স্বর্গীয় করালীচরণ বসু প্রবর্ত্তন করেছিলেন।)

পরিশিষ্ট - ১. কবির গৃহদেবী শ্রীশ্রীকালী মা

অমাবস্যার পূজা ঃ প্রতি মাসের অমাবস্যার উপবাসের দিন সকালের দিকে মায়ের অমাবস্যার পূজা হয়। ঐ দিন বসুপরিবারের পূজা ছাড়াও গ্রামের বহু বাড়ি থেকে অনেকে পূজা দিতে আসেন।

নিত্য সেবা পূজা ঃ মায়ের মন্দির সংলগ্ন কুঠুরিতে কবির মাতা নব মল্লিকা দেবী প্রতিষ্ঠিত মহাদেব ও নারায়ণের নিত্য সেবা বহু পূর্ব থেকেই হয়ে আসছে। কিন্তু কালীমায়ের কাছে পৃথক ভাবে নিত্য সেবার ব্যবস্থা ছিল না। স্বর্গীয় উমাচরণ বসুর বড় পুত্রবধূ বা লেখকের স্ত্রী শ্রীমতি নমিতা বসু মায়ের কাছে পৃথক ভাবে নিত্য সেবা না হওয়ার অভাব মনের মধ্যে প্রবল ভাবে অনুভব করেন। তাই তিনি নিজ উদ্যোগে ও নিজ ব্যয়ে মায়ের নিত্যসেবা প্রবর্ত্তন করেন, এবং দীর্ঘ কুড়ি বাইশ বছর এই ব্যয় ভার বহন করে আসেন। শ্রীমতি বসুর এই আগ্রহ দেখে এই পরিবারেরই সদস্য ডাঃ শিশির কুমার বসু তাঁর সম্পত্তি থেকে মায়ের নিত্য সেবার ব্যবস্থা করতে বলেন। এবং তাঁর উইলেও সে কথা উল্লেখ করে যান। বর্তমানে শিশির কুমার বসুর উইল অনুসারে তাঁর ট্রাস্ট ফান্ড থেকে অন্যান্য পূজার সাথে মায়ের নিত্যসেবার ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়ের উৎস ঃ নরসিংহ বসুর আমল থেকেই তাঁর শ্যামা মায়ের বাৎসরিক পূজা, মাসিক অমাবস্যার পূজা, মহাদেব-নারায়ণের নিত্যসেবা ও শঙ্করী মায়ের সপ্তমী পূজা, শ্রাবণী পূর্ণিমা পূজার জন্য জমি পুকুর মিলিয়ে প্রায় সাত একর মত সম্পত্তি রয়েছে। যার বর্তমান খতিয়ান নম্বর ২৮৭৪ কৃঃ এবং দখলকার শ্রীশ্রী শ্যামরূপা, জয়দুর্গা (শঙ্করী) ও কুলানাথেশ্বর (মহাদেব) দেবত্তর। সেবাইত দখলিকার -ঁ চণ্ডীচরণ বসুর পক্ষে শক্তিপদ বসু গং- দু'আনা ছ'গন্ডা দু কড়া দু ক্রান্তি, উমাচরণ বসুর পক্ষে তারাপদ বসু গং- দু আনা ছ গন্ডা দু কড়া দু ক্রান্তি, ঁ করালীচরণ বসুর পক্ষে শ্যামাপদ বসু গং- দু আনা ছ গন্ডা দু কড়া দু ক্রান্তি, নারায়ণ দাস বসুর পক্ষে ও ঁ শিশির কুমার বসুর পক্ষে --পাঁচ আনা ছ'গন্ডা দু কড়া দু ক্রান্তি, তারাপদ বসু ও দেবাশিষ সেন গং- (উইল অনুসারে)। ঁ বামাচরণ বসুর পক্ষে গতিপদ বসু গং - তিন আনা তের গন্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না, সেটা হল সম্পত্তির অংশ নিরুপণের ক্ষেত্রে টাকা, আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি প্রভৃতি সংখ্যার ব্যবহার আজ আমাদের গণিত শাস্ত্র থেকে বিলুপ্তির পথে। আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এই বিশেষ সংখ্যা চিহ্ন বা তার ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। যদিও দলিল-পর্চায় এই সংখ্যা তত্ত্বের ব্যবহার এখনও রয়েছে। অবশ্য বর্তমানে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে কম্পিউটারের ব্যবহার চালু হওয়ায় পুরাতন আনা-গন্ডা-কড়া-ক্রান্তির পরিবর্ত্তে বিশেষ দশমিক পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন আগেকার দলিল পর্চাতেও বিভিন্ন ব্যক্তির অংশের পরিমাণ জ্ঞাপনের জন্য একমাত্র আনা-গন্ডা-কড়া-ক্রান্তির ব্যবহারই রয়েছে তাই আমাদের ছেলে মেয়েরা যাতে আনা-গন্ডা-পয়সা-কড়া-ক্রান্তি ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশিত সম্পত্তির অংশের সাথে বর্তমানের দশমিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত সম্পত্তির অংশের মধ্যে একটা সম্পর্কস্থাপন করতে পারে তাই অপ্রাসঙ্গিক হলেও সেই সম্পর্কের একটা ছোট্ট তালিকা এই পরিশিষ্ট অংশের শেষে উল্লেখ করলাম। ।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহ বসু মা কালীর সেবার জন্য তাঁর সম্পত্তি 'থেকে জমি ও পুকুর মিলিয়ে প্রায় সাত একর সম্পত্তি দেবত্তর হিসাবে দিয়ে গেছেন। তারপর

উমাচরণ বসুও তাঁর অংশের দেবত্তর সম্পত্তি ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে পাঁচ ছ'বিঘা জমি তাঁর অংশের দেব সেবার জন্য অর্পণ করে গেছেন। শিশির কুমার বসু তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অর্ধেকটাই দেব সেবার জন্য অর্পণ করে গেছেন। এটা এঁদের দেবদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তির একটা নিদর্শন বলা যেতে পারে।

অবশ্য কবি নরসিংহ বসুর মায়ের প্রতি ভক্তি, মায়ের প্রতি সাধনার ধারা তাঁর পরবর্ত্তী সব বংশধররাই বাজায় রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে ড. সুকুমার মাইতি মহাশয় তাঁর সম্পাদিত 'নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল' গ্রন্থে (পৃঃ ৫৬) বলেছেন - " কবির শক্তি সাধনার ধারাটি পরবর্ত্তী বংশধারার মধ্যেও যে প্রবাহিত রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বংশধরদের নামকরণের মধ্যে — যেমন ভবানীচরণ, শিবচরণ, শঙ্করীচরণ, চন্ডীচরণ, বামাচরণ, উমাচরণ, করালীচরণ, শক্তিপদ, দেবীপদ, শ্যামাপদ, শঙ্করীপদ, তারাপদ, অভয়পদ, ইত্যাদি এরই উদাহরণ, কবির অধস্তন অষ্টম পুরুষ উমাচরণ বসুও একজন শক্তিমান শাক্তপদ কর্তা, কিন্তু কবি নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল যেমন দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত অবস্থায় প্রাচীন পুঁথির পাতায় আবদ্ধ ছিল, তেমনি পান্ডুলিপি আকারে রয়ে গেছে উমাচরণ বসুর কবিতাগুলি। এই অপ্রকাশিত শাক্তপদাবলীও বাংলা সাহিত্য ভান্ডারে অমূল্য সম্পদ।" এখানে কৃতজ্ঞতা সহকারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাননীয় ডঃ সুকুমার মাইতি মহাশয় উমাচরণ বসুর ঐ শাক্ত কবিতা গুলি প্রকাশের জন্য কবিতার পান্ডুলিপি বর্তমান গ্রন্থকারের কাছ থেকে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন বাইরে থাকার জন্য বর্তমান গ্রন্থকার এখনও সব পান্ডুলিপি হাতে পান নাই। তাই উমাচরণ বসুর ঐ শাক্তপদাবলী গুলি প্রকাশ করা গেল না। প্রসঙ্গক্রমে ভাই কৃষ্ণপদ বসুর নিকট হতে পাওয়া পিতা উমাচরণ বসু রচিত কয়েকটি শাক্ত গীতি এখানে মুদ্রিত হল —

মায়ের কৃপা (সঙ্গীত)

উমাচরণ বসু

(মা) তোমার কৃপাতে সবই সম্ভবে।
যে ভাবে এভবে সদাই তোমারে।।
সে হয় নিশ্চিন্ত, পায় তব অন্ত।
অনন্ত হলেও তোমায় দেখে সে সাকারে।।
বিশ্বাসেতে বস্তু মেলে মার কাছে।
বিশ্বাস করিয়া বল "মা" রয়েছে।।
বিশ্বাস হারালে সব হবে মিছে।
ঘুরিয়া মরিবি নিবিড় আঁধারে।।

যপি মার নাম জানাও হৃদি মাঝে।
কুলকুন্ডলিনী, সহস্রারে বিরাজে।।
উর্দ্ধমুখী কর তারে সর্ব কাজে।
তাঁরি দয়াতে লভিবি মায়েরে।।
উমাচরণ বলে, কায় মন বোলে।
মাকে ডাকিলে, মা রাখিবেন কোলে।
কিবা সম্পদে কিবা বিপদে।
রক্ষিবে থাকিয়া তোমারি অন্তরে।।

শ্রীশ্রী.কালীমায়ের কাছে প্রার্থনা

— উমাচরণ বসু

মনের ঘরে আড়াল দিয়ে মা যেন ভুলায়ও না তোমার অসীম দয়া।
জীবনে মরনে সকল সময়ে দিও মা তোমার পদ ছায়া।।
জীবন পথে হয়ে সারা,
যখন ডাকি মা তোমায় তারা,
তুমি দেখাও তোমার স্বরূপ দ্বারা, মৃন্ময়ীতেই চিন্ময়ী অভয়া।।
কিন্তু মা মোর মরণের পরে,
অজানা সেই অন্ধকারে,
তোমার ব্রহ্মরূপের জ্যোতি দ্বারে নিয়ে যেও হর জায়া।।
আমার সাধন ভজন, নাই আয়োজন।
ঐ রাঙ্গা চরণ পূজার মতন।।
(তবু পূজাবো চরণ), মন রাঙ্গা জবা ফুলে, আঁখি গঙ্গাজলে।
হৃদিপদ্ম বিল্লদলে, ভক্তি অর্ঘ্য দিয়া।।
মনের মানস নানা আয়োজনে,
জ্ঞানের ষোড়য উপকরণে,
ভক্তিতে নৈবেদ্য সাজায়ে যতনে, আঁখির আরতি দীপ জ্বালিয়া।।
(তব) চরণ মহিমা আমি কি কহিব,
দেবের আদি দেব, যিনি মহাদেব,
পরশে কখন শব, কভু শিব সমাধি কায়া।।
ত্রিলোচন তাই সব ত্যজিয়ে,
কৈলাশ ছাড়িয়ে শ্মশানে গিয়ে,
হয়ে মহাকাল, আছেন কোলে নিয়ে, মহাকালী মহাযোগমায়া।।
শ্মশান করিয়া যোগের স্থান,
শিব করেন তজপা ধ্যান,
নিজে হয়েছ মা বিপরীত রতাতুরাহ আছ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় নিয়া।।
অন্ত তোমার, কেহ না পায় কখন, অনন্ত যার বিশ্বমায়া।
শরণাগত উমাচরণ।
পায় যেন ঐ রাঙ্গা চরণ।।

মায়ের কাছে মিনতি (শ্যামা সঙ্গীত)

— উমাচরণ বসু

শ্রীপদে শিবরানী পরশ আমারে।
(আমি) গোপনে নিরজনে হৃদি পদ্মাসনে বসায়ে মনে মনে পূজিব তোমারে।।
শরণ নিয়েছি পদে বিপত্তারিণী।
তুমি শরণাগত, পরিত্রাণপরায়ণী।।
জীবণে মরণে দিও ঐ চরণ দুখানি।
অন্তত শেষের দিনে ভব পারাবারে।।
(তুমি) অনাদির আদি, শক্তি রূপিনী।
বিরিঞ্চি, মহেশ, বিষ্ণুর জীননী।।
নব সৃষ্টির তরে হলে হরের ঘরণী।
দনুজদলনী হলে দেবতায় রক্ষিবারে।।
পদরত্ন ভান্ডারে মাগো, আশ্রয় নিয়েছি আমি।
শিব যদি সরিয়ে দেয়, রক্ষা কর মা তুমি।।
উমাচরণ এই মিনতি করিছে দিবারাতি।
শেষের দিনে, নিজগুণে বস এসে তার শিয়রে।।

পরিশিষ্ট - ১. কবির গৃহদেবী শ্রীশ্রীকালী মা

এই উমাচরণ বসুর ভক্তিভাবের আরও পরিচয় মেলে ড. সুকুমার মাইতি মহাশয়কে লেখা পত্রগুচ্ছের মধ্যেও। মায়ের প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁর লেখা ঐ পত্রগুচ্ছ হতে দু একটি নিম্নে উদ্ধৃত হল —

ওঁ শ্রীশ্রী কালীমা শরণং

গ্রাম - শাঁকারী

পোঃ - শাঁকারী

জেলা - বর্ধমান

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মাননীয় সুকুমার বাবু-আপনার চিঠি পেয়ে ভারি খুশি হলাম। আপনার সেবা যত্নের তো কোন ব্যবস্থা ছিল না। তথাপি আপনার মহত্বগুণে আপনি সুখ্যাতি করেছেন। শ্রীশ্রী ব্রহ্মময়ী কালীমায়ের বাৎসরিক মহাপূজা অনুষ্ঠিত হবার সামান্য দিন বাকি আছে মাত্র। তাই এই কয়দিন আমরা সবাই খুব ব্যস্ত থাকি যতক্ষণ না তিনি দয়া করে তাঁর পূজা সুচারুরূপে গ্রহণ করেন। আমাদের প্রতি মায়ের কত যে করুণা তাহার নিদর্শন এই যে নরসিংহ বসুর ভক্তিজোরে প্রতিষ্ঠিতা আনন্দময়ী মা সেই আমল হতে আজ পর্যন্ত আমাদের ন্যায় অধম ব্যক্তির কাছেও বহু সরঞ্জাম সম্বলিত ঘোর অমানিশায় দয়া করে কিভাবে তাঁর মহাপূজা গ্রহণ করে আসছেন। সে সময় মায়ের সজীব চিন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করলে সকলের মনে পূর্ণানন্দের উদ্রেক হবে এবং মায়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করবে। দর্শন না করলে লিখনে ইহা ব্যক্ত করা যায় না।

আপনার সাফল্যের জন্য আমি কায়মনে মায়ের কাছে প্রার্থনা করব। মা নিশ্চয়ই কৃপা করবেন এবং আপনার সফলতার জন্য স্বর্গীয় নরসিংহ বসুর আশীর্ব্বাদ আহ্বান করব। মা আপনার মঙ্গল করবেন। অনুসন্ধানে কায়স্থ পত্রিকায় লিখিত "নরসিংহ বসু ও ধর্ম্মমঙ্গল"এ বীরভূমের আসাদুল্লাহ খাঁয়ের আমলের বিবরণ সহ মঙ্গল কাব্যের কিছু কিছু লেখা রয়েছে। মনে হয় ইহা দেখেছেন, না হলে বইখানি এখানে রয়েছে। এখানের মঙ্গল। আপনার নিত্য কুশল কামনা করি। আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মা মঙ্গল করবেন।

ইতি - শুভাকাঙ্খী

শ্রী উমাচরণ বসু

ওঁ শ্রীশ্রী কালীমা শরণং

শাঁকারী
২৩/০১/৭০

দীর্ঘায়ু নিরাপদেষু,

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ,

মাননীয় সুকুমার বাবু - আপনার চিঠি পেয়েছি। মা কালীর কৃপায় সকলে ভাল আছেন জানিয়া সুখী হলাম। মা আপনার কার্য সফল করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।

মায়ের ইচ্ছায় আমি এখন পর্য্যন্ত কর্মসমুদ্র হইতে তীরে উঠিতে পারি নাই, তবে উঠিতে আরও ১০ / ১২ দিন লাগিবে। তারপর আপনার নির্দেশমত ঐ সমস্ত লিখে পাঠাবো। আমার একদন্ড বিশ্রাম নাই রাত্রি ১২টার সময় না হলে।

তারাপদ পৌষমাসে বাড়ি এসেছিল। কর্মস্থানে গিয়ে মায়ের দয়াতে ভালোই আছে। মায়ের অনুগ্রহে এখানের অন্যান্য সকলে ভালো আছে। আপনি আমার অন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবেন। মা মঙ্গল করুন।

ইতি- শুভাকাঙ্খী
শ্রীউমাচরণ বসু

মায়ের পুরোহিত বর্গ ঃ নরসিংহ বসুর বর্তমান পুরোহিত বৃন্দ তিনটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। (১) স্বর্গীয় হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিবার (২) স্বর্গীয় জ্ঞানদা প্রসাদ ও শিবনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের পরিবার এবং (৩) স্বর্গীয় রাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবার। ঁ হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পক্ষে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রী হারাধন চক্রবর্ত্তী পিতার আসন অলঙ্কৃত করে নিষ্ঠার সাথে মায়ের পূজায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। ঁ শিবনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পক্ষে তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র শ্রী শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী সেই আসন অলঙ্কৃত করে আসছেন। ঁ রাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষে বর্তমানে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী মায়ের পূজায় ব্রতী হয়েছেন। ঁ রাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘদিন মায়ের পূজা করেছেন, কিন্তু মায়েরই কৃপায় তিনি বর্ধমানের নবাবহাটের ১০৮ শিবমন্দিরের পূর্ণ সময়ের পুরোহিত রূপে পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রী দেবী মুখোপাধ্যায়কেও ১০৮ শিব মন্দিরের পূজার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাই তাঁরা পরিবর্ত্ত পুরোহিত হিসাবে কালীমায়ের পূজার দায়িত্ব দেন শ্রী কালীদাস চক্রবর্ত্তীকে। তিনিও খুব ভক্তিভরে মায়ের পূজা করে থাকেন।

মায়ের সেবাইতবৃন্দের একটি বংশ লতিকা ঃ

প্রায় ন'শ বছর আগে বা দ্বাদশ শতকের দশরথ বসুকে এই বংশের প্রথম পুরুষ ধরে এই তালিকা প্রস্তুত হয়েছে।

পরিশিষ্ট - ১. কবির গৃহদেবী শ্রীশ্রীকালী মা
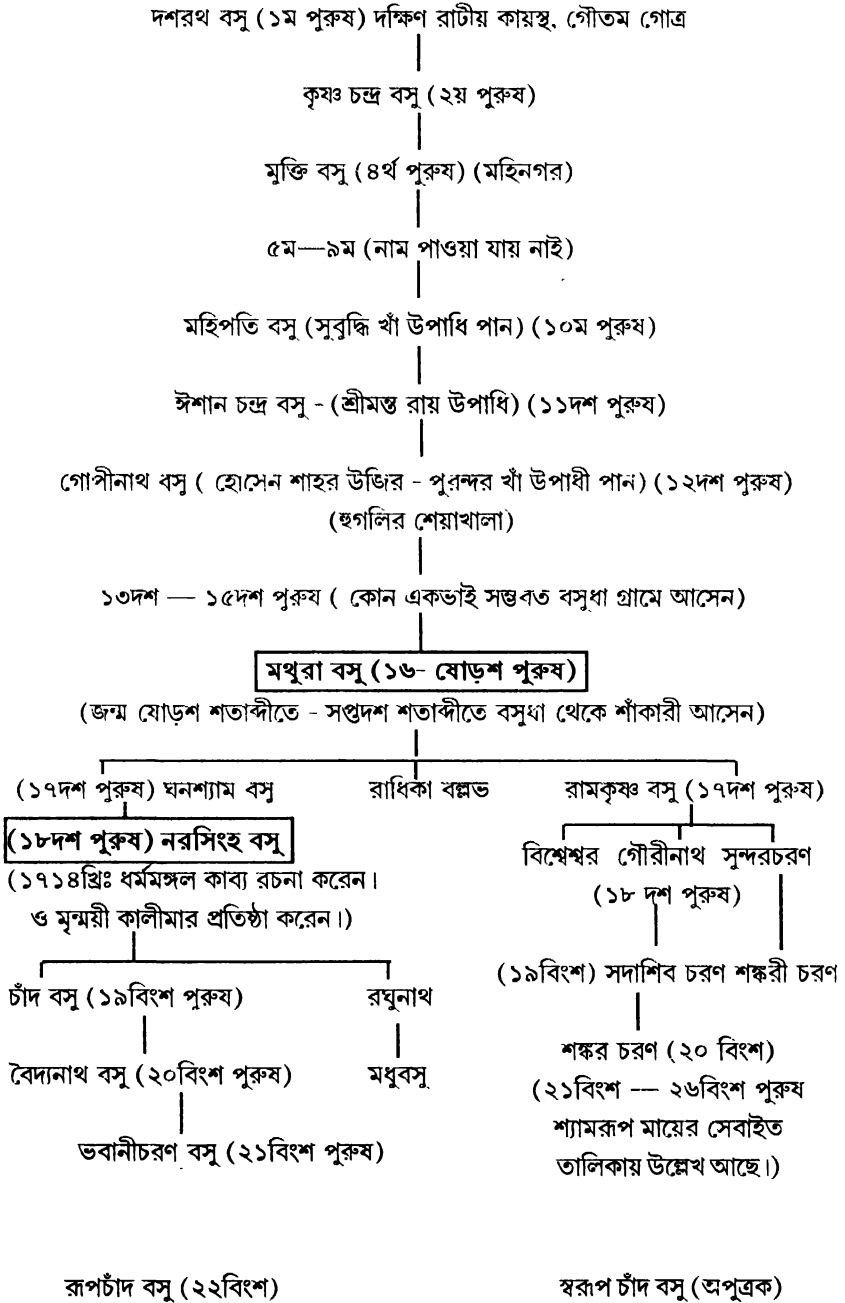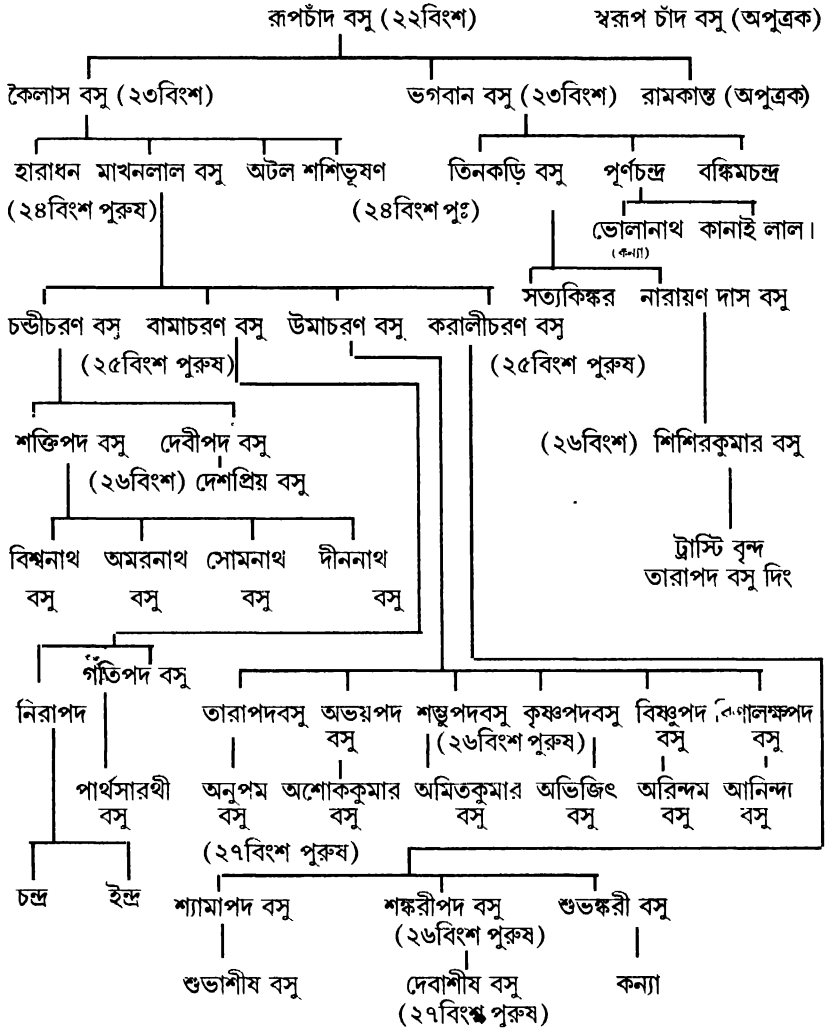
এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বংশের পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ অধ্যাপক নারায়ণ দাস বসুর পুত্র শিশিরকুমার বসু ছিলেন একজন চক্ষু-বিশেষজ্ঞ, কলকাতার আর.জি.কর কলেজ হাসপাতালে ও কলকাতার বহু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন, আজন্ম কলকাতায় অভিজাত্যের মধ্যে মানুষ হয়েও গ্রামকে ভোলেন নাই। কোন দেবদেবীকে কোনোদিন অবহেলা করেন নাই, মা কালী, মা শঙ্করীর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি। তাই তার অবর্তমানে মায়ের

---

১) এই বংশের ২৪বিংশ পুরুষ বিজয় গোবিন্দ বসু ও তাঁর পুত্র কালিপ্রসাদ বসু এবং কবির অধস্তন অষ্টম পুরুষ উমাচরণ বসুর নিকট সংরক্ষিত বংশ তালিকা থেকে এবং শঙ্করীপদ বসু ও বিশালক্ষ বসুর নিকট প্রাপ্ত তথ্য থেকে বংশ তালিকা দেওয়া হল। তালিকায় অসঙ্গত ত্রুটি মার্জনীয়। কারণ সব নাম পাওয়া যায় নাই।

সেবাপূজার যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তাই তিনি এক উইল দ্বারা লেখককে ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রী দেবাশীষ সেনকে ট্রাস্টি নিযুক্ত করে তাঁদের তত্ত্বাবধানে তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি কালীমা, শঙ্করী মা প্রভৃতি দেবদেবীর সেবাপূজার জন্য অপণ করে গেছেন এবং বাকি অর্ধেক নেপালচন্দ্র মিত্রকে তার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য দিয়েছেন। তাঁর উইলের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করলাম ঃ—

" I appoint Sri Tarapada Basu, Sri Debasis Sen and Sri Bijay Kr. Sen as the Trustees and executor of my 50% (fifty percfent) Property lying at P.o. & Vill Sankari, Dist : Burdwan. I also hereby direct that the income comes out of the Properties will be spent on the maintenance of Temple, Nilya Puja, Salary of pujari, and expences of annual festivals to be held in the said temple, and rest amount will be spent for philanthropic adivities at the post & vill - Sankari, in the Dist : Burdwan. ....

Witness :
1. Chandan Ghosal, Cal - 4.
2. Sudhindranath Chatterjee, Cal - 4 S/d. Sisir kumar Basu.
3. Sailendra kr. Dutta, Cal - 5. Signature.

৩) শাঁকারীর কবিবংশের শ্রীশ্রীশ্যামারূপা দেবী ঃ পূর্বেই উল্লেখ করেছি কবি বংশের অপর একটি ধারায় শ্যামারূপা কালীমা পূজিতা হয়ে আসছেন বহু পূর্ব হতেই, বলা যেতে পারে এই ধারাটি কবির 'কনেষ্ঠ খুড়োর' অর্থাৎ ছোট কাকার বংশধারা।
কবি তাঁর বন্দনা পালায় যে শ্যামারূপার কথা বলেছেন —

'নিজালয়ে শ্যামারূপা বন্দ সাবধানে।
অপার মহিমা যার আগমে পুরাণে।।'

ইনিই সেই শ্যামারূপা মা বলে ধরা হয়। কবির বংশধারা ও শ্যামারূপা মায়ের সেবাইতদের বংশধারা একই মূলবংশের অন্তর্গত এক দু'পুরুষ আগে পর্য্যন্ত উভয় ধারার মধ্যে অশৌচপালনের রীতি ছিল। সাতপুরুষ হয়ে যাবার পর সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়, কিন্তু শ্যামারূপা মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক এখনও অব্যাহত আছে।

মায়ের মূর্ত্তির বিবরণ ঃ মা কালো পাথরের চতুর্ভুজা কালী-মূর্ত্তি। উচ্চতা প্রায় এক ফুট।

মায়ের পূজা-পার্ব্বণ, নিত্যসেবা ঃ মায়ের দু'টি মন্দির আছে। একটিতে মা বার মাস থাকেন, সেখানে মায়ের নিত্যসেবা ও সন্ধ্যায় শীতল হয়। মায়ের নিত্যবসবাসের মন্দিরটির বর্তমান রূপ দিয়েছেন অধস্তন নবমপুরুষ সেবাইত স্বর্গীয় রামলাল বসুর কন্যাদ্বয় স্বর্গীয়া দাক্ষায়ণী দাসী

ও স্বর্গীয়া নারায়ণী দাসী এবং জামাতা স্বর্গীয় ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার যিনি নিজের বাড়িতে সোনার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

বাৎসরিক পূজা ঃ মায়ের দ্বিতীয় মন্দিরে দীপান্বিতা কালীপূজার দিন বাৎসরিক মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মায়ের বাৎসরিক পূজার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - রাত্রির চারপ্রহরে চারবার পৃথক পৃথক ভাবে মায়ের পূজা হয়, এবং চার প্রহরে চারবার বলিদান, চারবার আরতি ইত্যাদি সবই পৃথক পৃথক ভাবে হয়। পূর্বে চার প্রহরেই চারবার ছাগ বলিদান হত। কিন্তু রামলাল বসুর সেবাইত হিসাবে ভবেন বাবু ছাগ বলিদানের পরিবর্ত্তে চালকুমড়ো বলিদান প্রবর্তন করেন, কারণ তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ গৌরাঙ্গ দেবের সাধক। শ্যামারূপা মায়ের বাৎসরিক পূজার দিনে ঘট বিসর্জনের পর মাকে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর সকল সেবাইতদের বাড়িতে এবং পূর্বের সেবাইত কবি নরসিংহ বসু পরিবারে। সবশেষে মা ঐদিন পুরোহিত মশাইদের বাড়িতে থাকেন।

শ্যামারূপা মায়ের পৌরহিত্যের দায়িত্বে রয়েছেন — শ্রী শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রী রনজিৎ চক্রবর্ত্তী, শ্রী হরাধন চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি পুরোহিতবৃন্দ।

শ্যামারূপা মায়ের বর্তমান সেবাইতবৃন্দের একটি বংশধারা এখানে তুলে ধরা হল, যে ধারার একটি অংশ কবি নরসিংহ বসুর বংশধারার মধ্যে আছে।

শাঁকারীর শ্রীশ্রীশ্যামারূপা মা
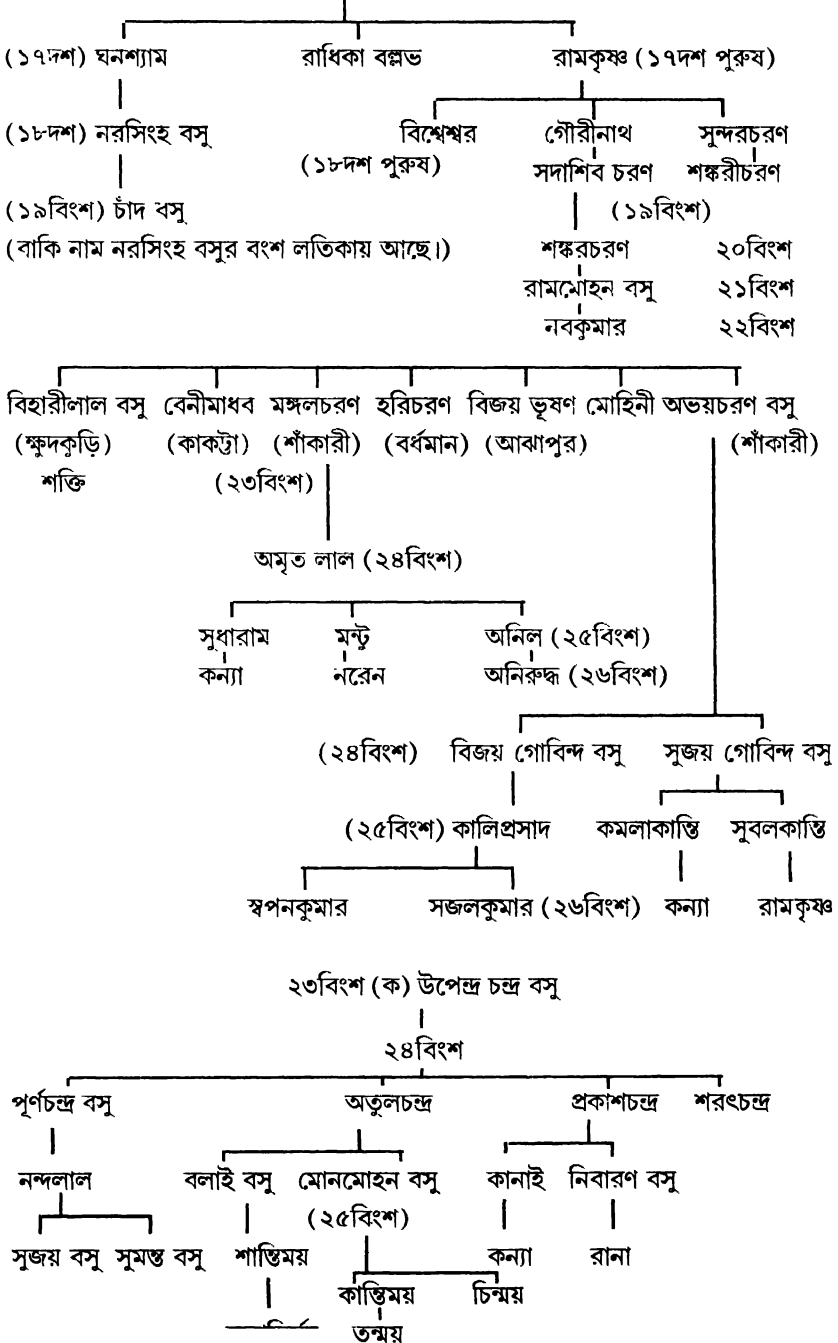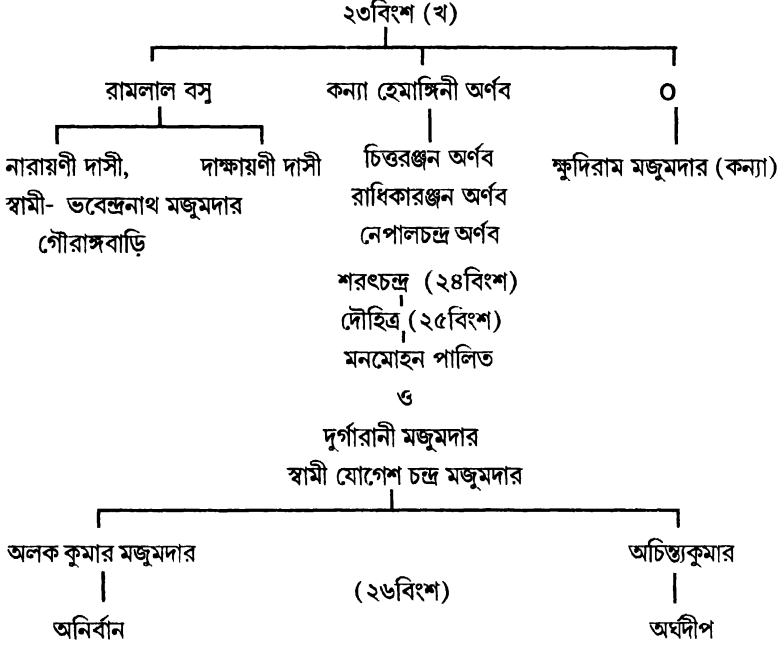
৪) শাঁকারীর শ্রীশ্রীবাসুদেব জীউ ঃ

> 'বাসুদেব রাঢ়েশ্বরী আর পঞ্চানন।
> মহাদেব মনসা বন্দিব একমন।।'(৮)

কবি তাঁর গ্রামের প্রাচীন দেবতা বাসুদেবকে একমনে বন্দনা করেছেন। কবির বসতবাটীর ঠিক পূর্বদিকে 'বাস দেউল' পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত বাসুদেব জীউর মন্দির। একসময় শাঁকারীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ার কিছু অংশ এই বাসুদেব জিউর নাম অনুসারে 'বাসুদেব পুর' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্ত্তি কালে শাঁকারী মৌজার অন্তর্ভূক্ত হয়।

শাঁকারীর বাসুদেব জীউ ঠিক কোন সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে অনুমিত হয় বাসুদেব জীউ শঙ্করী মায়ের সমসাময়িক কিম্বা তারও পুর্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। তবে কোন ক্রমেই পাঁচশত বছরের কম নয়।

মূর্ত্তি ও মন্দির ঃ বাসুদেব বিষ্ণুমূর্ত্তিরই প্রতিচ্ছবি। কালো পাথরের দ্বারা নির্মিত প্রায় পাঁচফুট দীর্ঘ এই মূর্ত্তিটি খোদাই করা পদ্মফুলের ওপর দন্ডায়মান, মূর্ত্তির নিচের দিকে দু'পাশে দুই সখী, দুই সখীর মাথার ওপর প্রায় দন্ডায়মান দুটি ঘোড়া। মূল মূর্ত্তির মাথার দু'পাশে আরও দুটি মূর্ত্তি। মনে হয় একখন্ড পাথর খোদাই করেই মূল মূর্ত্তি ও তার আশে পাশের সব মূর্ত্তি নির্মিত হয়েছে। শাঁকারীর এই বাসুদেব মূর্ত্তিটি প্রাচীন ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। শোনা যায় বাংলা দেশে বর্গীয় আক্রমণের সময় (১৭৪০ — ১৭৫০ খ্রিঃ) এই বাসুদেব ঠাকুরও আক্রান্ত হয়েছিলেন।

কথিত আছে বর্গীরা তাঁর নাক কেটে বা ভেঙ্গে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন তিনি নাকা কাটা অবস্থাতেই ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রদ্ধেয় ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় এই মূর্ত্তি ও মন্দির সংস্কার করেছিলেন। তারপরও দীর্ঘদিন কেটে গেছে। মন্দিরের আর কোন সংস্কার হয় নাই। মন্দিরটি বেশ উঁচুস্থানে অবস্থিত হওয়ায় তার তলদেশে কিছু ক্ষয় লক্ষ্য করা গেছে, তার ওপর আশে পাশে গৃহনির্মাণের চাপে মন্দিরের প্রবেশ পথও ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই দেবতা, এই ভাস্কর্য্য শাঁকারী গ্রামের বিশেষ গৌরব। তাই আমার মনে হয় আমাদের সকলের উচিত এই মূর্ত্তি ও মন্দিরকে রক্ষা করা, তাকে দর্শনীয় করে তোলার জন্য এগিয়ে আসা। অবশ্য শ্রী তারু রায়, শ্রী হারাধন চক্রবর্ত্তী, শ্রী অলক মজুমদার, শ্রী উমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রী সুনীল সরকার প্রভৃতি অনেকেই এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন। তাঁদের সাধুবাদ জানাই, তাঁদের এই কাজে সামান্যতম সহযোগিতা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

সেবাইত ও পুরোহিত বৃন্দ ঃ গ্রামের পশ্চিম পাড়ার 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পরিবার প্রায় আট'ন পুরুষ ধরে এই দেবতার সেবা পূজা করে আসছেন। শ্রী গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্য অনুসারে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার বর্তমানে যে ভিটায় বসবাস করছেন সেই ১৬ কাঠা পরিমান ভিটা বাসুদেব জীউর দেবত্তর ভিটা বলে পরিচিত। 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পরিবারের আদি নিবাস ছিল হল্‌দি গ্রামে। মনে হয় বাসুদেব জীউর প্রতিষ্ঠাতা পরিবার হল্‌দি গ্রাম থেকে এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারকে এই দেব সেবার জন্য শাঁকারীতে এনেছিলেন। এবং ঐ দেবত্তর ভিটা দান করে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারই বাসুদেব জীউর নিত্যসেবা পূজার দায়িত্বে রয়েছেন। বর্তমানে এই পরিবারের যে দু'তিনটি শাখার মধ্যে সেবা পূজার দায়িত্বে বন্টিত রয়েছে তাঁরা হলেন ˘ গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র-পৌত্রগণ, ˘ সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ˘ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র-পৌত্রগণ ও ˘ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র-পৌত্রগণ। আর শ্রী সত্য দত্ত, শ্রী শিবু দত্ত, শ্রী গনেশ ও কার্ত্তিক দত্তরাও এই দেবতার সেবার কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

৫) শাঁকারির শ্রীশ্রীবুড়োশিব (হাটতলা) ঃ শাঁকারী গ্রামে অনেক মহাদেব বা শিব মন্দির রয়েছে। কবি বন্দিত মহাদেব বলতে কবি হয়ত তাঁর মা নবমল্লিকা দেবী প্রতিষ্ঠিত মহাদেব যিনি তাঁর কালীমায়ের মন্দির সংলগ্ন উত্তরদিকের ঘরে পূজিত হয়ে আসছেন তাঁর কথা বলেছেন। অবশ্য কবি শাঁকারী গ্রামের প্রাচীন মহাদেব বা বুড়োশিবেরও বন্দনাও করেছেন। বলা হয় শাঁকারীর বুড়োশিব এবং শঙ্করী মা প্রায় সমসাময়িক দেবদেবী। বুড়োশিবের মন্দির রয়েছে হাটতলার উত্তর-পূর্ব কোনে শ্রী অম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বৈঠকখানার ঠিক সামনে। তবে হাটতলাতে আর একটি শিব মন্দির আছে যেটি হাটতলার উত্তরদিকে মাঝামাঝি অংশে অবস্থিত, অনেকেই এই মন্দিরটিকে বুড়ো শিবের মন্দির বলে ভুল করেন। বহু দিন ধরে বুড়োশিবের পাকা মন্দির ছিল না, ছিল মাটির ঘর। বর্তমানে বুড়ো শিবের পাকা মন্দির হয়েছে। পূজা অর্চনাও বেশ জাঁক-জমক ভাবে হচ্ছে।

বুড়ো শিবের - পূজা অর্চনার বৈশিষ্ট্য ঃ বুড়ো শিবের যেমন আছে নিত্যসেবা তেমনি আছে

বাৎসরিক অনুষ্ঠান, - বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল চৈত্র মাসের শেষের গাজনের অনুষ্ঠান।

বুড়োশিবের গাজন ঃ চৈত্র সংক্রান্তি ও চড়কের তিনদিন আগে থেকেই গাজনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে যায়। এই গাজনের যাঁরা 'সন্ন্যাসী' হন তাঁদের কঠিন কৃচ্ছ্র সাধন ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই ব্রত পালন করতে হয়। সংক্রান্তির পাঁচদিন আগে গঙ্গাস্নান, তার পরদিন নিরামিষ আহার, তৃতীয় দিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভক্ষণ, - তার পরদিন শুধুমাত্র ফলমূল আহার তার আগে শিবের পূজা সম্পন্ন করা এবং রাত্রে গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব কোনে 'শ্যাম কুন্ড' পুকুর থেকে 'কামাখ্যা' নিয়ে আসা, সাধারণত মূল বা প্রধান সন্ন্যাসী একটি মাটির হাঁড়িতে করে ঐ পুকুর ঘাট থেকে মাথায় করে কামাখ্যা ঠাকুর নিয়ে আসেন বুড়ো শিব মন্দির প্রাঙ্গণে।

এর পরদিন মহানীল পূজা, সারাদিন উপবাস করতে হয় গাজনের সন্ন্যাসীদের। এই দিন সকাল থেকেই চলে সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ সাধান আর দেবতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার কঠিন কঠিন অনুষ্ঠান। এই দিন সকালে প্রত্যেক সন্ন্যাসী বাবার কাছে নিজের মন প্রাণ নিবেদন করে দিয়ে ভাবেন তার প্রাণ বাবার কাছে বিলিন হয়ে গেছে, তাই সে 'মৃত', যে দেহটি রয়েছে সেটি তার 'মৃতদেহ'। তাই মৃতদেহ সৎকার করার জন্য চৌদোলায় চাপিয়ে যেমন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় সেই রকম ঐ সন্ন্যাসীদের 'মৃতদেহ' চৌদোলায় চাপিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে 'শ্মশানে' অর্থাৎ বাবা বুড়োশিবের মন্দির প্রাঙ্গণে আনা হয়। ঐ সব 'মৃতদেহ' দাহ করার জন্য বাবার সামনে চিতা প্রজ্বলিত করা হয়। এরপর মূল সন্ন্যাসী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা চিতার লেলিহান অগ্নিশিখার ওপর ঝাঁপ দিয়ে বাবার সামনে অবতীর্ণ হন। এই ভাবে সকালের ব্রতর প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়। তারপর আরম্ভ হয় নীলের পূজো। প্রায় সারাদিন চলে নীলের পূজো ও বাতি দান।

এইদিন সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠিত হয় 'শালে ভর' দেওয়ার অনুষ্ঠান। ধর্মমঙ্গল কাব্যের আলোচনাতেও আমরা দেখতে পাই কাব্যের নায়ক লাউসেনের মা রাণী রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় চাঁপায়ে ধর্মরাজের গাজনে 'শালে ভর' দিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে ছিলেন, পরে ধর্মরাজ রঞ্জাবতীর প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে পুত্রবর দান করেন। এখনও ধর্মরাজের বা শিবের গাজনে সন্ন্যাসীরা নানা কারণে 'শালে ভর' দেওয়ার মানত করে থাকেন।

'শালে ভর' হচ্ছে গামার বা শালকাঠের তৈরী পাটার মধ্যে গাঁথা অসংখ্য-তীক্ষ্নধার লোহার গজালের ওপড় ঝাঁপ বা শয়ন। শাঁকারীর বাবা বুড়ো শিবের চরণে, কিম্বা খুদকুড়ির বাবা রাঘেশ্বরের চরণে সেবার উদ্দেশ্যে-সন্ন্যাসীরা 'শালে ভর' দেন। শাঁকারীর বুড়ো শিবের চরণে 'শালে ভর' দেওয়ার জন্য সন্ধ্যার পর গ্রামের পশ্চিম পাড়ার 'নারায়ণ সায়র' মহাশ্মশান ঘাটে স্নান করে ঐ গজাল গাঁথা পাটার ওপড় শুয়ে পূর্বপাড়ার বাবার স্থানে আসেন।

পরের দিন চৈত্র সংক্রান্তি বা মহাবিষুব সংক্রান্তি ও শ্রীশ্রীচড়কপূজা, এই দিন সকালের দিকে বড় বসুপুকুরের ঘাটে - ঠাকুরকে বালি চাপা দিয়ে রেখে আসা হয়, এবং বিকেলের দিকে সেখান থেকে বাবাকে মন্দিরে আনা হয়। আসার পথে শঙ্করী মায়ের সেবাইত রায় পরিবারের সদস্যদের, কবি নরসিংহ বসু পরিবারের সদস্যদের এবং আরও কিছু বিশিষ্ঠ ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্যদের সম্মানিক খেজুর ও আকন্দ ফুলের মালা দিয়ে ভূষিত করা হয়, তারপর বাবার মন্দিরের সামনে চড়কের ঝাঁপ হয়।

শাঁকারীর শ্রীশ্রীবুড়োশিব

ধর্মরাজ বা শিবের গাজনে একজন প্রধান বা মূল সন্ন্যাসী থাকেন। ঠাকুরের ব্রত পালনের সব কাজ প্রথমে মূল সন্ন্যাসী করেন তারপর অন্যান্য সন্ন্যাসী তাঁকে অনুসরণ করেন। বর্তমানে শাঁকাবীর বুড়োশিবের গাজনের মূল সন্ন্যাসী হচ্ছেন শ্রী বিশ্বনাথ দাঁ (পিতা কানাইচন্দ্র দাঁ), শ্রী বিশ্বনাথ দাঁ খুব নিষ্ঠার সাথে তাঁর মূল সন্ন্যাসীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৪১১ সালে মূল সন্ন্যাসী বিশ্বনাথ দাঁ ছাড়া আরও চুয়াল্লিশজন বাবার চৈত্র গাজনের জন্য কঠিন সন্ন্যাস ব্রত নিয়েছিলেন।

পুরোহিত ও সেবাইত ঃ বুড়োশিবের যাঁরাই পুরোহিত তাঁবাই সেবাইত। এই পুরোহিত ও সেবাইতগণের মধ্যে রয়েছেন শ্রী অম্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রী রনজিৎ চক্রবর্ত্তী, শ্রী শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ঁ রাম মুখার্জ্জী বা শ্রী রবি মুখার্জ্জীর পরিবার যাঁদের পক্ষে সেবাপূজার দায়িত্বে রয়েছেন শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রী শান্তি চক্রবর্ত্তী।

মেলা ও যাত্রানুষ্ঠান ঃ বুড়ো শিবের গাজন উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে ও হাটতলায় বিশেষ মেলা বসে এবং তিনদিন ধরে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের লোকজন তো বটেই এমনকি ভিট্রা, পলাশডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের লোকেরাও মেলা ও যাত্রা অনুষ্ঠানে ভিড় জমায়।

৬) শাঁকারীর মজুমদার পরিবারের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ ঃ

কবি বন্দিত শাঁকারীর মজুমদার পরিবারের রাধা গোবিন্দ জীউ এবং তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৫৯৫ শকাব্দে বা বাংলার ১০৮০ সালে (ইং ১৬৭৩ খৃঃ)। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে। এই তথ্য পাওয়া যায় মন্দিরের চূড়ার নিচে খদিত লেখা থেকে যেটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন এই পরিবারের ভ্রাতৃপ্রতীম সদস্য শ্রী অমিতকুমার মজুমদার।

শাঁকারীর দক্ষিণ পাড়ার মজুমদার পরিবারের শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জীউর প্রাচীন মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা কাজে সমৃদ্ধ পঞ্চরত্ন মন্দির। এই মন্দিরের নির্মাণ শৈলী কারুকার্য্য ও ভাস্কর্য্য এককথায় অপূর্ব। গ্রামে অনুরূপ আরও একটি মন্দির রয়েছে — সেটি হচ্ছে শ্রীশ্রীসিংহবাহিনীর মন্দির যে মন্দিরের অবস্থান শ্রী গোপাল হালদারের মিষ্টির দোকানের পাশে। সংস্কারের অভাবে সিংহবাহিনীর মন্দিরটি ধ্বংসের মুখে, তবে আনন্দের কথা রাধাগোবিন্দের সেবাইতরা তাঁদের মন্দিরটি সংস্কার করে বেশ আকর্ষনীয় করে তুলেছেন, শাঁকারীর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, কারণ টেরাকোটা কাজে সমৃদ্ধ এই সব মন্দির শাঁকারীর বিশেষ ঐতিহ্য বহন করে।

পূজা-পার্বণ ঃ নিত্যসেবা পূজা ছাড়াও রাধাগোবিন্দ জীউর কতকগুলি বাৎসরিক অনুষ্ঠান মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় যেমন জন্মাষ্টমী, মকর সংক্রান্তি, দোল উৎসব ইত্যাদি। রাধা গোবিন্দ জীউর পুরোহিত ছিলেন কালিপদ চৌধুরি মহাশয়। তাঁর অবর্তমানে পৌরহিত্যের দায়িত্বে রয়েছেন শ্রী গৌরচন্দ্র রায় ও তাঁর পরিবার, আর সেবাইত হিসাবে যাঁরা রয়েছেন সেই মজুমদার পরিবারের সেবাইত গনের একটি বংশ তালিকা দিয়েছেন শ্রী অলক কুমার মজুমদার ও শ্রী অমিত কুমার মজুমদার। ন'পুরুষের সেই সেবাইত তালিকা পর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল। —
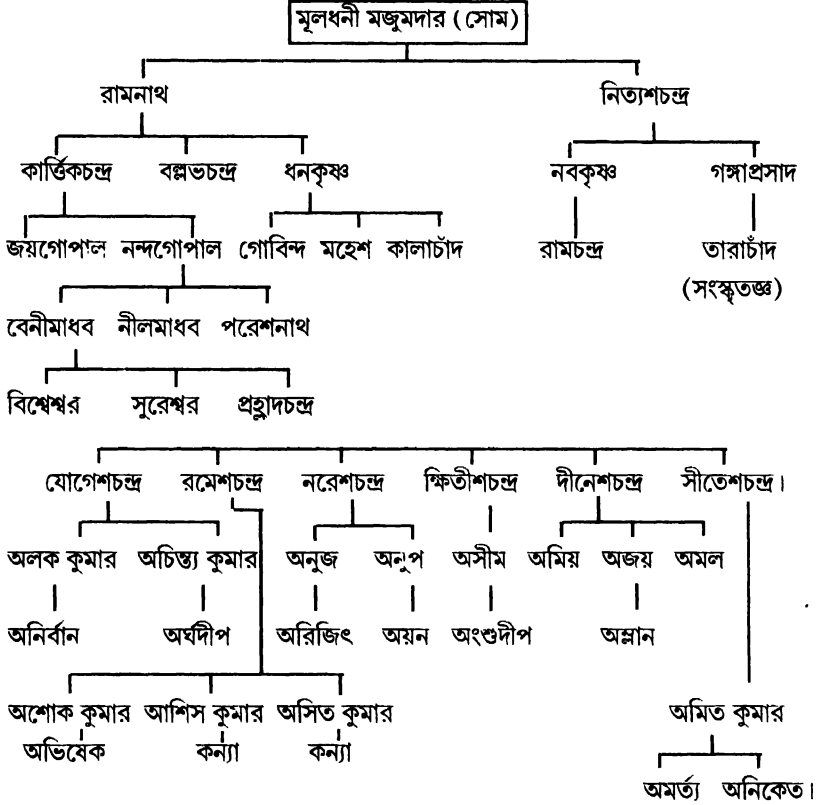
শাঁকারীর প্রাচীন দেবদেবীর মন্দিরগুলির পাশাপাশি বিগত শতাব্দীতেও কয়েকটি দেবালয় নির্মিত হয়েছে, তাবমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গৌরাঙ্গ মন্দির, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মঠ, বিরাজ দুলাল রাধা গোবিন্দ জিউ মন্দির ইত্যাদি —

৭) শাঁকারীর শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ ঃ আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মধ্যে সোনার গৌরাঙ্গ ও গৌরাঙ্গ বাড়ী শাঁকারীর একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বিষয়। বৈষ্ণব সাধক শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কুলদা প্রসাদ ব্রহ্মচারীর ভাবধারায় প্রভাবিত শ্রদ্ধেয় ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর বসতবাটি থেকে কিছু দূরে গৌরাঙ্গ মন্দির তৈরী করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সোনার বরণ শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গদেবকে। প্রায় তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট গৌরাঙ্গদেবের শান্ত-স্নিগ্ধ মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয় একটি নৃত্যরত বালকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। দেখলেই মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এত প্রাণবন্ত মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না।

পূজা-পার্বণ ঃ গৌরাঙ্গদেবের প্রতিদিন তিনবার সেবাপূজা ও আরতি হয়ে থাকে। ভোরবেলায়

মঙ্গলরতি, মধ্যাহ্নের পূর্বে নিত্য সেবা, আব সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি। এছাড়া সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা ও কর্ত্তীন গানও হয়ে থাকে।

বাৎসরিক উৎসবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল - দোল উৎসব। খুব ধুমধাম করে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোলের পরের দিন কর্ত্তীন সহযোগে শোভাযাত্রা করে গ্রাম প্রদক্ষিণ ও ধূলোট হয়। এই ধূলোটের শোভাযাত্রা গ্রামের প্রধান প্রধান দেবালয় গুলিতেও যান, সেখানে হরির লুট দেওয়া হয়। এই ধূলোট ও হরির লুটের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। দোল উৎসব ছাড়াও গৌরাঙ্গের রাস, জন্মাষ্টমী, অন্নকুট ইত্যাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গৌরাঙ্গ মন্দির ঃ গৌরাঙ্গদেবের প্রতিষ্ঠা ও নির্মাতা শ্রদ্ধেয় ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। তাই তাঁর পরিকল্পিত গৌরাঙ্গ মন্দির ও নাট মন্দিরের আধুনিক কারুকার্য্য ও পাথরের ওপর নানা রকম কাজ দেখার মত। গৌরাঙ্গবাড়িও শাঁকারী গ্রামের একটি সম্পদ।

গৌরাঙ্গদেবের পুরোহিতগণের মধ্যে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীব পরিবারবর্গ ও অন্যান্যরা।

গৌরাঙ্গদেবের প্রথম সেবাইত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়, ও তাঁর পত্নী নারায়ণী দাসী, এবং তাঁর দিদি দাক্ষায়ণী দাসী। ভবেনবাবুর মৃত্যুর পব তাঁর চারকন্যা যথা রাধারানী দাসী, তুলসীবালা দাসী, গৌরাঙ্গিনী দাসী, ও কল্যানী বালা দাসী উত্তরাধিকারী সূত্রে সেবাইত হলেও, কলকাতায় অবস্থান করার জন্য সরাসরি শ্রী গৌরাঙ্গের সেবাপূজা পরিচালনা করা অসুবিধে বোধ করায় তাঁরা কিছু স্থানীয় অধিবাসীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে গৌরাঙ্গের সেবাপূজা পরিচালনা করছেন।

৮) শাঁকারীর শ্রীশ্রীরক্ষাকালীমা (হাটতলা) ঃ শাঁকারীর পূর্বপাড়ায় হাটতলার পশ্চিম গায়ে রয়েছেন রক্ষাকালীমা। প্রতিবছর ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রী রক্ষা কালীমায়ের বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রক্ষা কালীমায়ের পূজার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে — পূজার দিনেই মায়ের মূর্ত্তি-নির্মাণ করা হয়। তারপর মধ্যরাত্রে মায়ের পূজা এবং পূজা শেষে মায়ের বিসর্জ্জন। পূর্ব পাড়ার সকলেই একনিষ্ঠ হয়ে মায়ের পূজা করেন, এছাড়া গ্রামের অনেকেই ভক্তিভরে মায়ের কাছে পূজা দিয়ে আসেন। বাৎসরিক পূজা ছাড়াও মায়ের নিত্যসেবা পূজারও ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি মায়ের মন্দিরটি সংস্কার করে রং করা হয়েছে। এইসব কাজে পূর্বপাড়ার অনেকেই আন্তরিক ভাবেই অংশগ্রহণ করেন, তার মধ্যে শ্রীমান তুষার অর্থাৎ তুষার সাহার নাম করতেই হয় কারণ তুষার গ্রামের উন্নয়নের সব কাজে সব সময় এগিয়ে আসে।

৯) শাঁকারীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ঃ শাঁকারী গ্রামের আর একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হল পরম শ্রদ্ধেয় ডাক্তার অধীরশরণ বসু প্রতিষ্ঠিত শাঁকারী রামকৃষ্ণ মঠ ও আশ্রম। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার অধীরশরণ বসু ১৯২৯ সালে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে শান্ত ছায়াশীতল পরিবেশে এই রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় পাঁচ-ছ বিঘা জমির উপর এই আশ্রমটি অবস্থিত। গেট দিয়ে ঢুকে ডানদিকের উত্তর সীমানায় শ্রীশ্রীঠাকুররামকৃষ্ণ দেবের মূল

মন্দির। ডাক্তার বাবুর আমলে ঠাকুরের সেবার জন্য থাকতেন ঠাকুরের মন্দিরের ঠিক পূর্ব দিকের একটি ঘরে বনমালি মহারাজ। আশ্রমের দক্ষিণ দিকে দু'টি ঘরের মধ্যে একটিতে থাকতেন ডাক্তারবাবু নিজে, আর একটি অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আশ্রমের পশ্চিম সীমানায় ছিল আর একটি ঘর যেখানে বর্তমান মহারাজের থাকা ও ডাক্তার খানার জন্য তৈরী হয়েছে একটি পাকা ঘর। আশ্রম প্রাঙ্গণের মাঝে দু'দিকে রয়েছে ফুলের বাগান। এই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে গেলে বা থাকলে মন ভীষণ শান্ত হয়ে যায়। দশম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় বর্তমান লেখককে ডাক্তারবাবু তাঁর পাশের ঘরে থাকার ও পড়াশোনা করার বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই ঋণ অপরিশোধ্য। সেই সময় খুব কাছ থেকে ডাক্তারবাবুর কর্মময় জীবনকে উপলব্ধি করার সামান্য সুযোগ পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম বৃদ্ধ বয়সেও ডাক্তারবাবু অযথা সময় নষ্ট করছেন না। কোন না কোন কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। দেখেছি অবসর সময়ে সূচ হাতে সুন্দর সুন্দর নকসা দেওয়া বড় বড় কাঁথা তৈরী করছেন, চটের আসন তৈরী করছেন। এবং ঐ সব জিনিস অনেককে তৈরী করেও দিয়েছেন। সকাল ৮টার মধ্যে ডাক্তারবাবু মঠ থেকে আসতেন গ্রামে তাঁর পৈত্রিক আবাসস্থলের মধ্যে অবস্থিত ডাক্তারখানায়। বিরাট ডাক্তারখানা, প্রচুর রোগীর সমাগম। দক্ষিণ দামোদরের বহু দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে বহু রোগী তাঁর কাছে আসতেন। বেলুড় মঠের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বামী সারদানন্দজি মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অকৃতদার অধীরবাবু ছিলেন শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দের মহান বাণী 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'- তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল। তাই তিনি ডাক্তারিকে পেশা হিসাবে না নিয়ে সেবা হিসাবে নিয়েছিলেন, আর সেইজন্য দূর গ্রাম থেকে যে সমস্ত গরীব রোগী আসতেন তাঁদের কাছ থেকে ফি বা ওষুধের দাম অনেক সময় নিতেন না, উল্টে পথে জলযোগের জন্য তাঁদের কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিতেন। রোগী দেখার পর আবার ফিরে আসতেন মঠে। বিকালে গ্রামের বহু ব্যক্তি মঠে যেতেন। যেমন শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল রানা মহাশয়, শ্রদ্ধেয় গৌরচন্দ্র রায় মহাশয় ইত্যাদি। এঁরা সব ছিলেন তখনকার দিনে এক একজন দিকপাল শিক্ষক। সৌভাগ্যবশত এঁদের সান্নিদ্ধ পেয়েছি। এঁদের কাছে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এঁদের আন্তরিকতার তুলনা হয় না। এঁরা ছাত্রদের মনের গভীরে প্রবেশ করে সব সমস্যার সমাধান করে দিতেন অতি সহজে। এমনকি সূচ সুতো, ফোঁড়, এ্যানাসিন, এনট্রোকুইনাল থেকে শুরু করে লেখা পড়ার সঙ্গে যুক্ত এমন কোন জিনিস ছিল না যা গৌরবাবুর ফতুয়ার পকেটে পাওয়া যেত না। এঁরা ছিলেন জাত শিক্ষক। প্রতিদিন বিকালে মঠে বসত ধর্মালোচনা সভা, সেখানে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ পাঠ করা হত, এবং তা ব্যাখ্যা করা হত। অমৃতলাল বাবু এইসব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন এবং ব্যাখ্যা করতেন। এই ধর্ম আলোচনা সভার শেষে স্বেচ্ছায় অমৃতলাল বাবু ও গৌরবাবু লেখককে ডেকে নিয়ে পড়াশোনা দেখিয়ে দিতেন, বুঝিয়ে দিতেন, নানা উপদেশ দিতেন। ডাক্তারবাবুও অনেক কিছু শেখাতেন। তাই এঁদের কাছে লেখক চির ঋণী, এঁদের উপদেশ ও আদর্শকে কর্মজীবনে কিছুটা কাজে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছি, কতটা সফল তা বলতে পারবো না, সে বিচারের দায়িত্ব ছাত্রদের।

শাঁকারীর এই রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঠাকুরের নিত্যসেবাপূজা ছাড়াও শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ও শ্রীশ্রী ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব বিশেষ ভাবে পালিত হয়। শ্রীশ্রী ঠাকুরের জন্মতিথিতে সারাদিন ধরে উৎসব হয়। শাঁকারী ও পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামের বহুলোক মঠে বসে ঠাকুরের

খিচুড়ী ভোগ প্রসাদ ভক্ষণ করে ধন্য হন। এছাড়া বর্তমানে মঠের পরিচালন কমিটির উদ্যোগে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে শাঁকারী অঞ্চলে কোথাও রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হত না। মঠে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামবাসীরা খুব খুশি।

১০) জ্বঝুটির শ্রীশ্রীধর্মরাজ ঃ জুঝুটির যে ধর্মরাজঠাকুরের আজ্ঞায় ও কৃপায় কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন সেই জুঝুটি ও জুঝুটির ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজাপার্বণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

জুঝুটি ঃ জুঝুটি গ্রামটি বর্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত দামোদর নদের ঠিক উত্তর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের উল্টোদিকে দামোদরের দক্ষিণ তীরে 'নারিচা' গ্রাম থেকে মাত্র সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণ- পূর্ব দিকে কবির গ্রাম শাঁকারী অবস্থিত। কবি রাজনগর থেকে জুঝুটি মধ্য দিয়ে গিয়ে দামোদর পার হয়ে শাঁকারী যেতেন। অবশ্য দামোদরের উত্তর তীরে জুঝুটি নামে দু'টি গ্রাম পাশাপাশি রয়েছে, একটি মূল জুঝুটি, অপরটি কেন্না জুঝুটি। বর্ধমান শহরের পশ্চিম প্রান্তে ছুরি-কাঁচির শহর কাঞ্চননগর-উদয়পল্লী থেকে দামোদরের বাঁধ ধরে সাইকেল, মটোর সাইকেল, রিক্সা করে মাইল পাঁচ ছয় পথ গেলেই জুঝুটি পাওয়া যাবে। এই পথে গেলে প্রথমে পাওয়া যাবে কেন্না জুঝুটি, তারপর মূল জুঝুটি। দুই জুঝুটিতে দু'টি ধর্মরাজের পূজা হয়। মূল জুঝুটির ধর্মরাজকে বলা হয় বড় ধর্মরাজ আর কেন্না জুঝুটির ধর্মরাজকে বলা হয় ছোট ধর্মরাজ।

বড়ধর্মরাজ ঃ জুঝুটি গ্রামের পূর্বদিকে চড়ক পুকুরের কাছে একেবারে দামোদরের বাঁধের গায়ে খেজুরতলায় বড় ধর্মরাজ আর্বিভূত হন। সেই চড়কপুকুরের উত্তব-পশ্চিম কোণে আজও রয়েছে একটি 'খেজুর তলা'। যেখানে ধর্মরাজের পূজো দেখতে গিয়ে কবি সন্ন্যাসী বেশী ধর্মঠাকুরের দর্শন ও গীতরচনার নির্দেশ পেয়েছিলেন। বর্তমানে অবশ্য গ্রামের মধ্যে 'মন্ডল পরিবারের' তত্ত্বাবধানে তাঁদেরই বাড়ির কাছে মন্দিরে বাবা ধর্মরাজ প্রস্তর নির্মিত কূর্ম মূর্তিতে পূজিত হচ্ছেন, প্রতিবছর বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমাতে বাবার গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ধর্মরাজ ঠাকুরের গাজন অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী পূর্ণিমাতে আর শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয় চৈত্রসংক্রান্তিতে। ধর্মরাজের মন্দিরটিও বেশ প্রাচীন, এই মন্দির সংলগ্ন রয়েছে একটি নাট মন্দির। জুঝুটির ধর্মরাজঠাকুরের দর্শন ও কাব্য রচনার নির্দেশ প্রাপ্তির অলৌকিক ঘটনার কিছু অংশ—

'পথে বড় জল কাদা পেলাম জুঝুটি।
সেখানে ধর্মের পূজা হয় পরিপাটি।।
নয়ন ভরিয়া তথা দেখে মায়াধর।
খেজুর তলায় উপস্থিত তারপর।।

কতদূরে লোকজন রাখিয়া বাহন।
একেলা গেলাম ধর্ম করিতে দর্শন।।
অপূর্ব সন্ন্যাসী এক আসি উপস্থিত।
আশীর্ব্বাদ দিয়া কন দাও কিছু গীত।।' (৭৮)

'ভূমে পড়ে দন্ডবৎ জুড়ি দুই কর।
মাথা তুলে চাহিতে সন্ন্যাসী অগোচর। ৮২

জুঝুটির শ্রী জয়রাম মন্ডল, শ্রী অজিত মন্ডল, শ্রী শচীপদ মন্ডল, শ্রী হরকালী মন্ডল, মহোদয়গন ধর্মরাজের সেবাপূজার দায়িত্বে রয়েছেন। প্রতিবছর বৈশাখী বা বুদ্ধপূর্ণিমায় ধর্মরাজের যে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেই গাজনে মূল সন্ন্যাসী হবেন এই মন্ডল পরিবারের কর্মক্ষম বয়জ্যেষ্ঠ সদস্য। এই নিয়ম অনুসারে বাং ১৪০৯ সালে ১১ই জৈষ্ট বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীধর্মরাজ ঠাকুরের গাজনে মূল সন্ন্যাসী হয়েছিলেন শ্রী অজিত কুমার মন্ডল। মূল সন্ন্যাসী ছাড়াও বহু ভক্ত বাবা ধর্মরাজের সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়াও অনেকে 'প্রণাম

খাটা' বা 'ধূনো পোড়ানোর' মানত করে থাকেন। তাঁরা এই গাজনের দিন ঐ সব 'মানত' বাবার সামনে পরিশোধ করেন। এরপর মন্দিরের পাশের মঞ্চ থেকে গাজনের 'ঝাঁপ' অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ঝাঁপ দেন মূল সন্ন্যাসী। 'ঝাঁপের' পর ছাগ বলিদান হয়। বিকালে চড়ক পুকুরের কাছে খেজুরতলায় চারপাশে মেলা বসে। ওখানে ধর্মরাজের চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ঠাকুরকে ও মূল সন্ন্যাসীকে মালা দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে জুঝুটির ধর্মরাজ ঠাকুর পাশাপাশি পাঁচটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন — যেমন জুঝুটি, ঘোষ কামালপুর, রাঘবপুর, দাদপুর, সবশেষে মোহনপুর বা কেন্না জুঝুটির ছোট ধর্মরাজ ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন। এরপর জুঝুটির বড়ধর্মরাজ ও ছোট ধর্মরাজ যেতেন বর্ধমান রাজবাটী। এখন রাজবাটী আছে কিন্তু রাজা নাই, তাই ওখানে ঠাকুরকে আর নিয়ে যাওয়া হয় না। জুঝুটির ধর্মরাজ ঠাকুরের বর্তমান সেবাইত মন্ডল পরিবারের একটি বংশ ধারা — (এই বংশধারা এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করেছেন পরিবারের বর্ষিয়ান সদস্য শ্রীযুক্ত জয়রাম মন্ডল মহাশয়। তিনি যতদূর তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেই অনুসারে এই তালিকা দেওয়া হল)
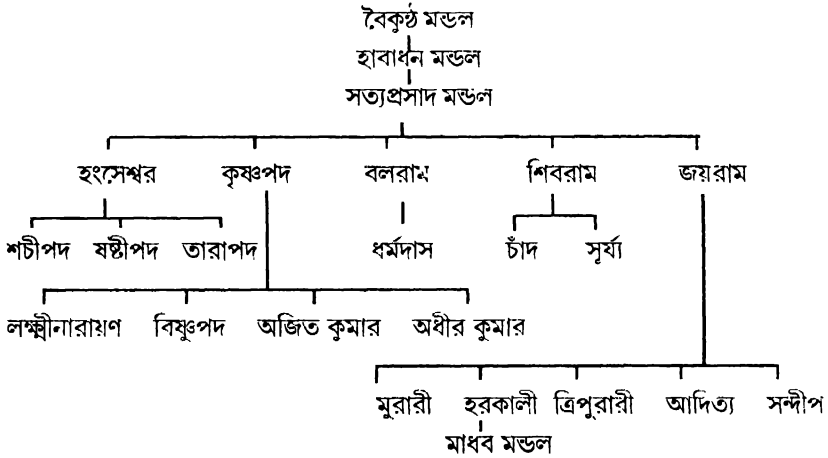
পুরোহিত মন্ডলী — বড়ধর্মরাজের পুরোহিত মন্ডলীর মধ্যে রয়েছেন - চক্রবর্ত্তী পরিবার (বার আনা অংশ) এবং ভট্টাচার্য পরিবার (চার আনা অংশ)। চক্রবর্ত্তী পরিবারের ব্রজগোপাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র দ্বিজপদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পূজা করতেন, কিন্তু বাইরে চাকুরি পাওয়ায় তাঁদের অংশের পূজাও বর্তমানে ভট্টাচার্য পরিবারই সম্পন্ন করে থাকেন। ভট্টাচার্য্য পরিবারের সদস্য হিসাবে পূজা করতেন বিভূতি ভট্টাচার্য্য — তারপর তাঁর পুত্রগন যথা সনাতন ভট্টাচার্য্য, ধনপতি ও মানিক ভট্টাচার্য্য ও মুক্ত ভট্টাচার্য্য পূজা করতেন, এরপর সনাতন ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র হরলাল ভট্টাচার্য্য ও গণপতি ভট্টাচার্য্য এই দায়িত্ব পালন করেন, আর রয়েছেন রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য। পরামাণিকের দায়িত্বে রয়েছেন — বিজয় পরামাণিক পিতা ´ বাদল পরামাণিক।

১১) কেন্না জুঝুটির ছোট ধর্মরাজ ঃ সন্ন্যাসীরূপী ধর্মরাজের স্বপ্নাদেশে মনিমোহন গোস্বামী কেন্না জুঝুটিতে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ঠিক কত বছর আগে এই দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেই তথ্য পাওয়া যায় নাই, মনে হয় কবি নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনার পূর্ব

হতেই এই ধর্মরাজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কথিত আছে প্রতিষ্ঠাতা মণিমোহন গোস্বামী ধর্মরাজের সেবাপূজায় নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তিনি শেষ সময়ে ধর্মরাজের ধ্যান করতে করতে অমৃতলোকে যাত্রা করেন। এবং তার নশ্বর দেহ প্রস্তরিভূত হয়ে ধর্মরাজের প্রতীক কচ্ছপরূপে পরিণত হয়। ধর্মরাজের মন্দিরের পাশেই সেই প্রস্তরখন্ড এখনও রয়েছে।

দেবতার নিত্যপূজা ছাড়াও বৈশাখী পূর্ণিমাতে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দামোদরের তীরে অবস্থিত কুমিরকোলার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার থেকে আসেন বর্তমান সেবাইত ও পুরোহিত শ্রী অজিত কুমার গোস্বামীর পরিবার। অবশ্য বর্তমানে অজিত বাবুর পক্ষে শ্রী মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্মরাজের সেবাপূজার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

(ছোট ধর্মরাজেব আবির্ভাব ও স্বর্গীয় মণিমোহন গোস্বামীর অলৌকিক অবস্থা প্রাপ্তি সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন শ্রী অজিত কুমার গোস্বামী।)

১২) ঢেকুরে ইছাইয়ের শ্রীশ্রীশ্যামারূপা মায়েরপূজার-সেকাল একাল ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি বিশেষ চরিত্র হল ইছাই ঘোষ। কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে ইছাই এর শ্যামামায়ের পূজার বিশেষ বর্ণনা দিয়েছেন, আর তাঁর বন্দনা পালায় শ্যামা মায়ের বন্দনা করে বলেছেন ---

'শ্যামারূপা বন্দ ঢেকুরের গড়ে।
ছাগ মেষ যেখানে অনেক বলি পড়ে।।'

ক) ইছাইয়ের শ্যামারূপামায়ের পূজার সেকাল ঃ ইছাই এর শ্যামা মা হচ্ছেন দুর্গতি নাশিনী দশভুজা দুর্গা, ভক্ত বৎসলা সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী শ্রীশ্রী সর্বমঙ্গলা। কিন্তু তিনি শ্যামারূপা হয়ে ইছাইকে দেখা দিয়েছিলেন। ইছাই ষোল উপচারে ধূপদীপ গন্ধপুষ্প ক্ষির ছানা নৈবেদ্য চন্ডীপাঠ বাজনা বাদ্য সহযোগে কায়মনে শ্যামারূপা মায়ের পূজায় ব্রতী হতেন। 'আদ্য ঢেকুর পালা' ও 'ঢেকুর রণ' পালায় কবি ইছাই এর শ্যামারূপা মায়ের পূজার অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে 'আদ্য ঢেকুর পালা'র কিছু অংশ তুলে ধরছি —

'শ্যামারূপা সিদ্ধ পাঠ ত্রিষষ্ঠের গড়ে।
ইছাই পূজেন শ্যামা চমৎকার পড়ে।।
ঢোল বাজে দামামা নিদান দুর দুর।
শানি বাজে সুন্দর শুনিতে সুমধুর।।
বিপাশায় কাড়াবাজে কাংশ করতাল।
পাঁচতালে মিশাইয়া বাজিছে রসাল।।
জগঝম্প গমকে ঠমকে পড়ে কাঠি।
রণসিঙ্গা তেঘাই বাজনা পরিপাটি।।' ২২৬
'ব্যালিস বাজনা বাজে দেবীর সম্মুখে।২২৯
পূজা আয়োজন সব করেন কৌতুকে।।
কালিকা পুরাণ মত ষোল উপচারে।
গোয়ালার মানস পূজিব অভয়ারে।।
অগুরু চন্দন চুয়া নানা উপহার।
ছাগ মেষ মহিষাদি নানা বলিদান। ২৪৭
লক্ষ বলি গোয়ালা দিলেন সাবধান।।' ২৪৮
'কত ঠাঁই ব্রাহ্মণ করেন চন্ডী পাঠ।
আনন্দের সীমা নাই সদা গীত নাট।।
হবির হবনে হোম করিছেন হোতা।
লোক বলে হেন পূজা কে বা করে কোথা।।
মহাবিদ্যা জপ করে গোয়ালা নন্দন।
যে মন্ত্র জপিয়া সিদ্ধ হরি পঞ্চানন।।
অঙ্গ বলিদান দিল গোয়ালা তনয়।
দেবগণ দেখিয়া অন্তরে পেল ভয়।।
বাসব বলেন পূজেছিনু দশভুজা। ২৬১
তাহা হৈতে বাড়া দেখি গোয়ালার পূজা।। ২৬২
পূজা দেখে পার্বতির পরম পিরিত।

ক্ষীর চিনি ছানা লাড়ু বিশাশয় ভার।।
ফেলি দিল লবাত কেশুর পানিফল। ২৩৫
ইক্ষু আম্র কাঁঠাল কদলী নারিকল।। ২৩৬
পুষ্প পাত্রে নানা ফুল কেশব কাঞ্চন।
জাতি যুথি জবা চাঁপা টগর রঙ্গন।।
বকুল মাধবি লতা মল্লিকা কমল।
করবী কেতরী কুন্দ শ্রীফলের দল।।
চাঁদমালা নানা ফুলে গাঁথা মনোহর।
জয়ন্তী অপরাজিতা দ্রোণ নাগেশ্বর।।
ছয় রসে পরিপূর্ণ সুবর্ণের থালা।
পরিপাটি নৈবেদ্য জ্বলিল দীপ মালা।।
ধূপধূনা অন্ধকার দিবসে রজনী।
ভক্তিভাবে ইছাই পূজেন ত্রিনয়ণী।। ২৪৬

কৈলাসে করেন যুক্তি পদ্মার সাহিত।
বরপুত্র ইছাই আমার পূজা করে।
পূজা নিতে যাই চল গোয়ালার ঘরে।।
সিংহযানে শ্যামারূপা হয়ে অধিষ্ঠান।
বরমাগ ইছাই বলেন বিদ্যমান।।' ২৭২
'সাক্ষাৎ ভবানী দেখে গোয়ালা নন্দন। ২৭৭
ধরণী লোটায়ে কৈল চরণ বন্দন।।' ২৭৮
'সর্বার্থ সাধিকা শিবা মঙ্গল রূপিণী। ২৮৯
শরণ্যে এ্যম্বকে গৌরী নমো নারায়ণী ।। ২৯০
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী তুমি শক্তিভূতা।
সনাতনী গুণাশ্রয়ী সর্বগুণযুতা।।
সর্ব পীড়া হরা পরিত্রাতা দীন জনে।
নারায়ণী নমস্কার তোমার চরণে।।' ২৯৪

উপরের কাব্যাংশ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইছাই নানা উপাচারে ভক্তিভাবে দেবী ত্রিনয়ণীর পূজা করতেন। শুধু ছাগ, মেষ, মোষ বলিদানই নয় ইছাই নিজ অঙ্গ বলিদানও দিয়েছিলেন, যার ফলে দেবতারাও ভীত হয়ে পড়েছিলেন, অন্যদিকে দেবী পার্বতী-ইছাই এর পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে ইছাই এর গড় জঙ্গলে শ্যামারূপে অবতীর্ন হয়ে ইছাইকে দেখা দিয়েছিলেন। আর ইছাই এর স্তবে তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রার্থনা অনুসারে ঐ গড়ের স্বতন্তর রাজা হবার বর দিয়েছিলেন, দেবী আরও বলেছিলেন এখন থেকে এই ত্রিষষ্ঠ গড়ের নাম হবে ঢেকুর গড়।

"ভবানী বলেন আমি দিনু এইবর।
এ গড়ের রাজা তুমি হইলে স্বতন্তর।।
বিপদে সম্পদে যবে করিবে স্মরণ।
সেইক্ষণে আমার পাইবে দর্শন।।(৩০৬)
আজি হৈতে এই গড়ের ঢেকুর নাম রহে।।"

খ) একালের ঢেকুর গড় ও শ্যামারূপা ভগবতীর পূজা-পার্বণ পদ্ধতি ঃ—

পূর্বে যে ঢেকুর গড়ে ইছাই ঘোষ শ্যামারূপা ভগবতীর আরাধনা করে কর্ণসেনকে পরাজিত করে নিজে স্বতন্তর রাজা হয়ে বসেছিলেন। বর্তমানে সেই ঢেকুর গড়, দেউল আর দেবী ভগবতী শ্যামারূপার পূজো-পার্বণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে উল্লেখ করলাম —
এই ত্রিষষ্ঠের গড় সেই সময় থেকে 'ঢেকুর গড়' নামে পরিচিত হল। এই 'গড়' এবং শ্যামামায়ের মন্দির বিরাট এক জঙ্গলের মাঝখানে অবস্থিত! তাই এই 'গড়'কে 'গড় জঙ্গল'ও বলা হয়। এই গড়ের আরও নাম আছে যেমন 'গড় কেল্লা' - 'খেঁড়ো বাড়ী' ইত্যাদি।

বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার অন্তর্গত অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে জঙ্গল ঘেরা 'গড়জঙ্গলে' রয়েছে ইছাই এর মা শ্যামারূপার মন্দির। জঙ্গলের মধ্যে সমভূমি থেকে প্রায় ৫০-৬০টি সিঁড়ি অতিক্রম করে জঙ্গলের ও গড়ের মাথার উপরে উঠে মা শ্যামারূপার মন্দির দর্শন করা যায়। এই মন্দিরই ইছাই এর শ্যামারূপা ভগবতীর মন্দির বলে খ্যাত।

কথিত আছে বিপদে আপদে ইছাই এই মন্দিরে শ্যামারূপা মায়ের কাছে ছুটে আসতেন। কাব্যে দেখা যায় -ইছাই এর স্বঘোষিত স্বতন্ত্র রাজা হওয়ার সংবাদে গৌড়েশ্বর দলবল নিয়ে

ঢেকুরের শ্রীশ্রীশ্যামারূপা মা

ঢেকুর আক্রমণ করলে ইছাই ছুটে যান শ্যামা মায়ের মন্দিরে —

'এত বলি চলিলেন ইছাই কুঙর। অবিলম্বে গেল শ্যামারূপার গোচর।।' (৮১৬)

এই শ্যামারূপার মন্দিরের বর্তমান অবস্থা শ্যামারূপা মায়ের বর্তমানে পূজা পার্বণ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা করে — ইছাই এর মা ভগবতী পার্বতী শ্যামারূপা হলেন কি ভাবে -? কিম্বা ইছাই দেবী ভগবতীকে শ্যামারূপে আরাধনা করতেন কেন? আমরা সাধারণত দেবী ভগবতী দুর্গাকে গৌর বর্ণা রূপে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু দেবী ভগবতী দুর্গার ন'টি রূপ রয়েছে — যেমন ১) শৈলপুত্রী, ২) ব্রহ্মচারিণী, ৩) চন্ডঘন্টা বা চন্দ্রঘন্টা, ৪) কুষ্মান্ডা / কুশন্ডী, ৫) স্কন্দমাতা, ৬) কাত্যায়ণী, ৭) কালরাত্রি, ৮) মহাগৌরী, ৯) সিদ্ধিদাত্রী।

ভগবতী মা দুর্গার নবরূপের মধ্যে সপ্তম রূপটি হল 'কালরাত্রি', এখানে মা কৃষ্ণবর্ণা বা শ্যামারূপা, দেবীর ভয়ঙ্কর তিনটি চক্ষু, দেবী চতুর্ভুজা। দেবীর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হলেও ইনি সবসময় ভক্তদের শুভফল প্রদান করেন। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, দিল্লী, নবদ্বীপের বিশ্বকল্যাণ ফাউন্ডেশনে দুর্গাপূজার সময় যে 'নবরাত্রি উৎসব' অনুষ্ঠিত হয় তার সপ্তম দিনে বা সপ্তমিতে দেবীর কালরাত্রি রূপের পূজা হয়। ভক্তরা দেবী 'কালরাত্রি' শ্যামারূপা মায়ের পূজা করে যা কামনা করেন দেবী তা পূর্ণ করেন। দেবীর পূজা করলে অগ্নি, জল, জন্তু, শত্রু এই সবের কোন ভয় থাকে না। সব রকম ভয়মুক্ত জীবন অতিবাহিত করা যায়। তাই মনে হয় ইছাই ভগবতী মা দুর্গার এই শ্যামারূপটির আরাধনা করতেন। আর মা শ্যামারূপা অভয়া ইছাইকে সব রকম আপদে বিপদে আগলে রাখতেন। কথিত আছে -ইছাই এর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়রা দুঃখে, ক্ষোভে, রাগে মা শ্যামারূপা দেবীর মূর্ত্তিকে অজয় নদীর জলে নিক্ষেপ করেন, তাঁরা মায়ের আর পূজা করেন নাই। অন্য একটি মত অনুসারে মাকে কল্যাণেশ্বরীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ মা অভয়া যা আশঙ্কা করেছিলেন যে ঢেকুরে তাঁর আর পূজা হবে না সেটাই অনেকটা কাজে পরিণত হয়েছিল। ইছাই এর মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ কোলে তুলে কাঁদতে কাঁদতে মা অভয়া বলেছিলেন —

'তোমার সমান ভক্ত কে আছে সংসারে। আজি হতে গেল মোর পূজা ঢেকুরের।।'

এমনকি গড় জঙ্গল থেকে কিছুটা দূরে লোকালয়ের মধ্যে অজয় নদীর একেবারে দক্ষিণ গায়ে শিখর ধারার ইছাই এর যে সুন্দর দেউল রয়েছে সেটিও বিগ্রহবিহীন অবস্থায় ছিল। অবশ্য বর্তমানে ঐ দেউলে একটি শিবলিঙ্গ পূজিত হচ্ছেন। খুব সম্ভবত এই সুন্দর শিখর ধারার মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল দেবী ভগবতীকে জঙ্গলগড়ের মন্দির থেকে নিয়ে এসে নব নির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু ইছাই এর মৃত্যুতে সে সুযোগ আর হয় নাই। কিন্তু এই মন্দির বা দেউল আজও ঢেকুরের তথা বর্ধমানজেলার একটি দর্শনীয় বস্তু।

বাড়িতে গিয়ে ঢেকুরের গড় জঙ্গলেব শ্যামারূপা মায়ের মন্দির যাবার পথ নির্দেশ পেয়ে সেই মেঠো পথে যেতে যেতে একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলাম, তারপর পেলাম মন্দিরে উঠার সিঁড়ি। জঙ্গলের মধ্যে বহু প্রাচীন ভাঙ্গাচোরা প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি সিঁড়ি বেয়ে জঙ্গলের মাথার উপরে উঠে এসে পৌঁছালাম বহু আকাঙ্খিত ঢেকুরের গড় জঙ্গলের শ্যামারূপা মায়ের মন্দির, যা ইছাই এর শ্যামারূপার মন্দির বলে পরিচিত। বেলা তখন প্রায় বারোটা। মা শ্যামারূপা মায়ের কৃপায় মন্দিরে এসেই শ্রীশ্রীমা ও সেই সাথে পুরোহিত মশাই এরও দেখা পেয়ে গেলাম। সাধারণত পুরোহিত মশাই বেলা এগারোটার মধ্যেই পূজা ভোগ শেষ করে বাড়ি ফিরে যান। তবে মায়ের বিশেষ করুণায় ঐদিন বেলা বারোটাতেও শ্রী ভূতনাথ রায় মহাশয়ের দেখা পেয়ে তাঁকে দিয়ে শ্রীশ্রীমাশ্যামারূপার পূজা করালাম। কিন্তু মাকে শ্যামারূপে পেলাম না। মাকে পেলাম শ্বেত পাথরের দশভুজা দুর্গা রূপে। পুরোহিত ভূতনাথ বাবু জানালেন — পরম্পরা অনুযায়ী বলা হয় ইছাই এর শোচনীয় ও মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়রা ক্ষোভে দুঃখে ভগবতী শ্যামারূপা মায়ের মূর্ত্তিটি অজয়ের জলে নিক্ষেপ করেন। সেই থেকে মায়ের পূজা বহুদিন বন্ধ ছিল। বহুদিন পর বর্ধমান মহারাজ ঢেকুরের গড় জঙ্গলে ইছাই এর শ্যামারূপা মায়ের মন্দিরে শ্বেতপাথরের দশভুজা দুর্গা মাকে প্রতিষ্ঠা করে পুনরায় পূজা প্রবর্তন করেন। প্রতিদিনের নিত্যসেবা, পায়েস ভোগ ও দক্ষিণা বাবদ দশ টাকা পাঁচ আনা বরাদ্দ করেন বর্ধমান মহারাজ। আর এই ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য বর্ধমান মহারাজ হেতমপুর রাজাকে ৩৬৫ বিঘা জমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। আর মহারাজের ব্যবস্থা অনুসারেই মায়ের পূজার পৌরোহিত্যের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল বিষ্টুপুরের হরিপদ রায় মহাশয়ের অর্থাৎ ভূতনাথ বাবুর পিতার উপর। এরপর পশ্চিমবঙ্গে নূতন ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্তনের ফলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পর ১৯৫৮ খ্রিঃ হেতমপুরের রাণীমা জ্যোৎস্না কুমারী শ্যামারূপা মায়ের পূজার ব্যয়ভার বহনে তাঁদের অক্ষমতা জানিয়ে দেন। তখন পুরোহিত হরিপদ রায় মহাশয় মাকে শরণ ক'রে মায়ের পূজার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। তারপর ১৯৮৪ সালে হরিপদ বাবুর মৃত্যুর পর পুত্র শ্রী ভূতনাথ রায়, শ্রী শঙ্কর নারায়ণ রায় ও শ্রী দিলীপ কুমার রায় শ্যামারূপা মায়ের পূজা করে চলেছেন। মায়ের অনুগ্রহে অগণিত ভক্তের সহায়তায় বর্ধমান মহারাজ প্রবর্তিত নিত্যসেবা ভোগ ছাড়াও শারদীয়া দুর্গাপূজা ও বাসন্তী পূজার সময় মহাসমারোহে মায়ের পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় এখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়। ঐ সময় মহা সপ্তমীর দিন ১৫ কুইঃ চালের খিচুড়ী ভোগ রান্না ও বিতরণ করা হয়। মহা অষ্টমীর দিন প্রায় ২ কুইঃ ময়দার লুচি ভোগ, মহানবমীর দিনও ভোগ দেওয়া হয়। ভক্তদের সুবিধার্থে বর্ধমান বনবিভাগের দুর্গাপুর বনাঞ্চল শাখার শিবপুর বনদপ্তর মন্দির প্রাঙ্গণে ১৯৯৭খৃঃ একটি আচ্ছাদন নির্মাণ করে দেন, এছাড়া খিচুড়ী রাখার জন্য বিরাট বিরাট পাকা চৌবাচ্ছা নির্মিত হয়েছে। ভূতনাথ বাবুর কথায় মায়ের এই বিরাট ভোগের আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন আসানসোল, দুর্গাপুর, সিউড়ী, বোলপুর, কোলকাতা, প্রভৃতি অঞ্চলের অগণিত ভক্তবৃন্দ।

আজও জঙ্গলের মধ্যে মায়ের পূজা ও মহাপূজার অপূর্ব ব্যবস্থা দেখে মনে হল কবি নরসিংহ বসু তিন'শ বছর আগে যথার্থই লিখেছিলেন —

'শ্যামারূপা সিদ্ধপাঠ ত্রিষষ্ঠের গড়ে।
ইছাই পূজেন শ্যামা চমৎকার পড়ে।।'

আর এটা মনেপ্রাণে অনুধাবন করেই কবি লিখেছেন, কারণ কবি নিজেও ছিলেন একজন ভবানী সাধক। এই প্রসঙ্গে মায়ের অপার করুণার একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। যেদিন

ঢেকুরের শ্রীশ্রীশ্যামারূপা মা

ঢেকুরের গড় জঙ্গলে মা শ্যামারূপার মন্দির আর মাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম সেদিন মনে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়েই ঐ জঙ্গলে গিয়েছিলাম। ঐ গড় জঙ্গলে ইছাই এর শ্যামারূপা মায়ের পূজার যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন, আর মা অভয়া যে ভাবে ইছাই কে সর্বদা রক্ষা করতেন বা তাকে ভালবাসতেন--- ইছাই এর জন্য কৈলাশ থেকে মা ঢেকুরে চলে আসতেন, পুত্রহারা মাতার ন্যায় ইছাই এর মৃত্যুর পর 'শ্যামারূপা কান্দেন ইছাই করা্যা কোলে।' এ সবই কবির কল্পনা কিম্বা এর সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক আছে ? এই সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ঢেকুরে যাওয়া। মনে হয় মা শ্যামারূপা এই অধমের মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। আর এই অধম মায়ের অপার করুণার কথা মনে প্রাণে বুঝতে পারলেন, যখন ভূতনাথ বাবুর কাছে ইছাই এর ওপর মায়ের করুণার কথা শুনতে শুনতে বেলা একটা বেজে গেছে তখন। কথা শেষে ভূতনাথ বাবু হঠাৎ বললেন — 'চলে যাবেন না, মায়ের ভোগ খেয়ে যাবেন।' প্রথমে বুঝতে পারি নাই, ভেবে ছিলাম নিত্য পায়েস ভোগ প্রসাদ একটু দেবেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভেঙ্গে গেল, - মায়ের মন্দিরের সামনে বসিয়ে শালপাতার থালায় গরম খিঁচুড়ী, তরকারী, আর পায়েস ভোগ খুব যত্ন করে পেট ভরে খাওয়ালেন। খেতে খেতেই বুঝলাম মায়ের কি অপার করুণা। জনমানব শূন্য গভীর জঙ্গলে ক্ষুধাতুর অনাহূত একজন মানুষ ভর দুপুরে নানা ব্যাঞ্জন সহ গরম গরম খিঁচুড়ি খাচ্ছে। এও কি সম্ভব! তবে এটা গল্প নয় সত্যি। খাওয়ার শেষে ভূতনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, মায়ের তো পায়েস ভোগ হয়, আজ পায়েসের সাথে খিঁচুড়ি হওয়ার কারণ কি ? — ভূতনাথ বাবু জানালেন – কলকাতা থেকে কয়েকজন ভক্তের আসার কথা আছে, আর এই জঙ্গলে তো খাবার দাবার কিছু পাওয়া যায় না। তাই এঁদের সুবাদে মায়ের এই বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা। আর আপনিও একজন অতিথি। বিশেষ করে আপনি এসেছেন মায়ের খোঁজে। তখন ভাবলাম আমি যদি একদিন আগে বা পরে আসতাম তখন হয়ত ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গেই দেখা হত না, মায়ের দর্শন পেতাম না, খিঁচুড়ি খাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু মা ঠিক একটি নির্দিষ্ট দিনে আমাকে ঢেকুরের গড় জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেছেন, আর দেখিয়েছেন তাঁর অপার করুণা। আর দেখিয়েছেন — আগে গড় জঙ্গলে শ্যামারূপা মায়ের মন্দিরে শুধুমাত্র ইছাই-ই মায়ের পূজা করতেন, — কিন্তু এখন এই মন্দিরের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। সকলেই মায়ের পূজা করতে পারে। মা যে সকলের মা।

খাওয়া দাওয়ার পর মায়ের করুণার কথা ভাবতে ভাবতে মাকে প্রণাম জানিয়ে ভূতনাথ বাবুর কাছে বিদায় নিলাম, তিনি তাঁর একজন অনুচর দিয়ে আমাকে জঙ্গল পার করে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ঐ পথ প্রদর্শকের সঙ্গে যেতে যেতে জঙ্গলের মধ্যে দেখা গেল সেন রাজাদের আমলের কিছুর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও প্রাচীনত্বের স্মৃতি নিয়ে যেন উঁকি দিচ্ছে। সমস্ত ধ্বংস স্তূপে লাগানো আছে একটি করে ফলক। এই সমস্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেখতে পেলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চিহ্ন। দেখলাম একটা উঁচু জায়গায় একটা ফলকে লেখা আছে — 'রাজা সুরথের ঘট স্থাপনের পাথর' শ্রীশ্রী চণ্ডীতে উল্লেখ আছে যে কোল্‌দের অত্যাচারের সুযোগে রাজধানীর দুষ্টচক্র অমাত্যরা রাজা সুরথকে রাজ্যচ্যুত করেন, তখন তিনি নিজের রাজ্য ছেড়ে বনে চলে যান। পথে তাঁর সাথে দেখা হয় সমাধি নামে এক বৈশ্যের সাথে, এঁর অবস্থা অনেকটা তাঁরই মতো। এঁরা উভয়ে যুক্তি করে মেধস মুনির আশ্রমে গিয়ে মুনির সঙ্গে তাঁদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর মুনির নির্দেশে তাঁরা দুজনে একটি নদীর ধারে বনের

মধ্যে গিয়ে মা চন্ডীর আরাধনা করতে লাগলেন এবং নিজেদের গায়ের মাংস কেটে দেবী চন্ডীকে অর্ঘ্য দেন। দেবী পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে সুরথ ও সমাধিকে বর দিলেন। দেবীর বরে রাজা সুরথ তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন, সমাধি মনু পদ লাভ করলেন। অজয় নদীর ধারে ঢেকুরের জঙ্গলে সুরথ রাজার দেবীপূজার ঘট স্থাপনের পাথর দেখে মনে একটা কথা উদয় হচ্ছে - অজয় নদীর ধারে এই বনের মধ্যেই কি সুরথ রাজা দেবী চন্ডীর আরাধনা করেছিলেন? এ বিষয়ে গভীর গবেষণা দরকার।

যাইহক্, ভূতনাথ বাবুর লোকটির সঙ্গে জঙ্গল পার হয়ে দেবী ভগবতীর জন্য ইছাই নির্মিত দেউলের দিকে পা বাড়ালাম। প্রায় তিন কিলোমিটার মেঠো পথ অতিক্রম করে অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে ইছাই এর 'বিগ্রবিহীন' দেউলে এসে উপস্থিত হলাম। সুন্দর পরিবেশে শিখর ধার এই দেউলটি অবস্থিত। একদিকে বয়ে গেছে অজয় নদী - আর একদিকে রয়েছে লেক সহ সুন্দর উদ্যান। বর্তমানে প্রশাসনিক উদ্যোগে এই উদ্যান বা পার্ক নির্মিত হয়েছে - এর নাম দেওয়া হয়েছে 'দেউল-পার্ক'। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভগবতীর জন্য নির্মিত এই দেউলে বিগ্রহ স্থাপনা করা হয় নাই। তাই এটি বিগ্রহ বিহীন অবস্থাতেই ছিল। বর্তমানে ঐ দেউলে একটি শিব লিঙ্গ স্থাপনা করা হয়েছে। 'দেউল পার্ক' এখন সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে।

১৩। **বোঁয়াই'য়ের শ্রীশ্রীবসন্ত চন্ডী মা ঃ** 'বোঁয়ায়ে বসন্তচন্ডী বন্দ পঙ্কজাক্ষী।' বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বর্ধমান-বাঁকুড়া জেলার সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে পূর্বতন 'বি.ডি.আর' লাইনের উপর, এবং বর্তমান বর্ধমান - বোঁয়াই চন্ডী, (ভায়া সেহারা বাজার) বাসরুটেব উপর বোঁয়াই চন্ডী- অবস্থিত। এই গ্রামের জাগ্রতা দেবী 'বসন্তচন্ডী'। বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের এই জাগ্রতা দেবী বসন্তচন্ডীর মূর্ত্তিটি কালো পাথরের অষ্টভুজা ত্রিনয়নী দুর্গা মূর্ত্তি। দেবীর উচ্চতা প্রায় পাঁচফুট। দেবীর ডানপাশে রয়েছে একটি পাথরের গণেশ মূর্ত্তি, আর বাঁ দিকে রয়েছেন পাথরের একটি ছোট্ট কালীমূর্ত্তি।

মায়ের মন্দির তিনটি ভাগে বিভক্ত — প্রথমে মূল মন্দির - যার মধ্যে মা অবস্থান করছেন। মূল মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নাট মন্দির, তার পর রয়েছে বলিদানের স্থান, তারই একপাশে রয়েছে পাথরের ভৈরব।

বসন্ত চন্ডী মায়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পূর্বে গ্রাম-গঞ্জে ব্যাপক ভাবে বসন্ত রোগের প্রকোপ ছিল, তখন মানুষ এক অকাট্য ভক্তি আর বিশ্বাস বলে 'মায়ের দয়া' প্রার্থনা করে আরোগ্য লাভ করত। সেই থেকে বহু লোক মায়ের কাছে 'মানত' করতো। মায়ের পূজা দিতে যেতো। আজও অসংখ্য ভক্ত মায়ের পূজা দিতে যায়। প্রতিদিনই মায়ের পূজা ও ভোগ হয়। তবে শনি মঙ্গল বারে ভক্ত সমাগম বেশী হয়। আবার বসন্ত শুরু থেকে অর্থাৎ ফাল্গুন মাস থেকে আষাঢ় পর্যন্ত বিশেষ করে ঐ কয়েক মাসের শনি মঙ্গল বারে মায়ের মন্দির প্রাঙ্গনে মেলা বসে। সেই সময় বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রচুর ভক্ত আসেন। আষাঢ় মাসের অম্বুবাচির সময় ভক্তদের ভিড় যেন উপচে পড়ে, সেই সময় প্রচুর বলিদানও হয়ে থাকে। এছাড়া শারদীয়া দুর্গাপূজাতেও মহাধুমধামে মায়ের পূজা হয়।

বসন্তচন্ডী মায়ের পুরোহিত বর্গের পূজা করার মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে, এবং প্রচন্ড শৃঙ্খলাবোধ আছে। সারা বর্ধমান জেলার বিশেষ করে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের প্রতিটি

গ্রামের প্রতিটি পরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত আছেন, মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত পুরোহিত গণের কাছে একটি মোটা খাতায় প্রত্যেক গ্রামের নাম , পাড়ার নাম, পরিবারের নাম এবং ঐ পরিবারের পুরুষ সদস্যদের নাম আর ঐ পরিবারের পুরোহিতের নাম উল্লেখ করা আছে। কোন ভক্ত বা যাত্রী মায়ের কাছে পূজা নিয়ে দাঁড়ালেই - পুরোহিত মশাইরা গ্রাম, পাড়া ও পরিবারের নাম জিজ্ঞাসা করেন, এবং তাঁদেব নির্দ্দিষ্ট পুরোহিতকে তা তারাই বলে দেন, বা দেখিয়ে দেন, তাই এখানে পূজা দেবার জন্য কোন অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় না। এই ব্যাপারে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি — প্রায় ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর পর গত দু'হাজার তিনের একুশ ডিসেম্বর মায়ের পূজা দিতে বোঁয়াই চণ্ডী গিয়েছিলাম। মন্দিরের সিঁড়িতে ওঠার মুখেই একজন পুরোহিত মশাই, আমার নাম, বাবার নাম ও গ্রাম ও পাড়ার নাম জিজ্ঞাসা করলেন — তাঁর উত্তরে আমি যখন জানালাম - আমি শাঁকারী গ্রামের পশ্চিম পাড়ার উমাচরণ বসুর ছেলে, তখনই তিনি বলে দিলেন — আপনাদের পুরোহিত হচ্ছেন গোপাল ঠাকুর (গোপাল চক্রবর্ত্তী) ও তাঁর পরিবার, গোপাল ঠাকুর মারা গেছেন তাই তাঁর ছোট ভাই পরিতোষ চক্রবর্ত্তী মশাই আপনাদের পূজা করে দেবেন। তাঁর এই কথা শুনে মনে পড়ে গেল ছোট বেলায় বাবার সঙ্গে বাড়ীর সকলে মিলে গরুর গাড়ী করে (তখন - আমাদের গ্রাম থেকে বোঁয়াই আসার অন্য যানবাহন ছিল না।) মায়ের পূজো দিতে আসতাম তখন গোপাল ঠাকুর আমাদের পূজো করে দিতেন, যাইহক্ ঐ পুরোহিত মশাই পরিতোষ বাবুকে ডেকে দিলেন, অন্য কেউ পূজো নিয়ে কড়াকড়ি করেন না দেখে খুবই ভাল লাগল। পরিতোষ বাবুকে প্রণাম জানিয়ে তাঁদের খাতায় আমাদের নাম ঠিকানা আছে কি না একবার দেখতে চাইলাম - , তিনি সঙ্গে সঙ্গে খাতা বের করে দেখালেন, দেখলাম — আমার বাবা উমাচরণ বসু, জ্যাঠামশাই - চণ্ডীচরণ বসু, ছোট কাকা - করালীচরণ বসু - প্রমুখ সকলেরই নাম রয়েছে, — আমি ঐ খাতায় আমার ও আমার পুত্র অনুপম বসুর নাম লিখিয়ে দিলাম। এরপর পরিতোষ বাবু মায়ের কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে খুব ভক্তিভরে পূজা করে দিলেন। সঙ্গে আমাদের এক আত্মীয় ছিলেন — তাঁর পূজাও পরিতোষ বাবু করে দিলেন, কিন্তু তাঁর দেওয়া পূজা ও দক্ষিণার সব টাকা ওঁদের পুরোহিতকে ডেকে পরিতোষ বাবু দিয়ে দিলেন - । পূজো দেবার এই সুন্দর ব্যবস্থা এবং পুরোহিতদের মধ্যে এই সুশৃঙ্খলা আমি আর কোথাও দেখি নাই।

১৪। কুলীন গ্রামের শ্রীশ্রীশিবানী ঃ—

'কুলীন গ্রামের মধ্যে বন্দিব শিবানী।'
'বন্দিব কুলীন গ্রামে লোটাইয়া ধূলি।।''

কুলীন গ্রাম বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত জৌগ্রাম স্টেশনের তিন মাইল উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই এই গ্রাম বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যের আর্বিভাব কাল হচ্ছে ১৪০৭ শকাব্দের ২৩ শে ফাল্গুন শনিবার পূর্ণিমা তিথিতে, (ইং - ১৪৮৬ খ্রিঃ, বাং- ৮৯২ সালে), আর কুলীন গ্রামের মালাধর বসু তারও পাঁচ-ছ' বছর আগে ১৩০২ শকাব্দে (ইং- ১৪৮০ খ্রিঃ, বাং- ৮৮৭ সালে) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' প্রণয়ন করেন। কুলীন গ্রামকে বৈষ্ণব ধর্মের পীটভূমি হিসাবে বলা হয়

'কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চড়ায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়।।'

কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান হলেও কুলীন গ্রামের গ্রাম্য দেবী হচ্ছেন দেবী শিবানী। শিবানী হচ্ছেন — শিবের ঘরনী মা দুর্গা, তাই শারদীয়া দুর্গাপূজায় মহাসমারোহে শিবানীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহানবমীর দিন গ্রামের সকল বাড়ি থেকে মায়ের কাছে পূজা নিবেদন করা হয়। এই দিন ছাগ বলিদানও হয়ে থাকে। তাই বলা হয় মা শিবানীর আবির্ভাব মালাধর বসুর আমলেরও বহু আগে। সেই থেকেই মা কুলীন গ্রামে পূজিতা হয়ে আসছেন।

মা শিবানীর আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল — মা এখানে শৃগালের বেশে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই শিবানী মন্দিরে একটি পাথরের শৃগাল মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। শিবানী ছাড়াও কুলীন গ্রামের বহু প্রাচীন দেব দেবী ও মন্দির রয়েছে — তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোপেশ্বর, গোপাল, জগন্নাথের রথবাড়ি, রঘুনাথ ও ভুবনেশ্বরী, যবন হরিদাসের শ্রীপাট, আখড়া ইত্যাদি।

১৫) পুরীর জগন্নাথ দেবের রথের পট্টডোরী ও কুলীন গ্রামের রথযাত্রা ঃ

কুলীন গ্রামের মালাধর বসু বাংলা সাহিত্যের এক কিংবদন্তী। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' কাব্য গ্রন্থ একটি সাড়া জাগানো গ্রন্থ। শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন করে প্রায় সাত বছর পরিশ্রমের পর ১৪০২ শকাব্দে (ইং- ১৪৮০ খ্রিঃ বাং- ৮৮৭সাল) মালাধর বসু তাঁর এই বিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁর এই গ্রন্থ মালাধর বসুর সঙ্গে কুলীন গ্রামকেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমনকি গৌড়ের ইতিহাসেও একটি বিশেষ স্থান করে দেন। তাই কুলীন গ্রামবাসীরা আজও তাঁকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করেন। আর সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা ˝ চন্ডীচরণ বসুর বাড়ির পশ্চিমদিকে একটি স্মৃতি স্তম্ভ তৈরী করেছেন। আর এই স্মৃতি স্তম্ভের দক্ষিণ দিকে রয়েছে তাঁদের পুরাতন বসতবাটী। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস থেকে জানা যায়-˝ মালাধর বসু ছিলেন খুবই তেজস্বী পুরুষ, তিনি তৎকালীন প্রচলিত কৌলিন্য ও বল্লালী প্রথা অগ্রাহ্য করে, এমনকি তাঁর আত্মীয় হোসেন শাহের উজীর পুরন্দর খাঁর কথাও না শুনে পুরুষোত্তম দত্তের বংশজাত এক কন্যার সাথে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন। তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং তাঁর পুত্র লক্ষীনাথ বসুকে সত্যরাজ খাঁ উপাধি দেন। শ্রী চৈতন্য দেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথমে জগন্নাথ ধামে যান, পরে দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ সেরে পুনরায় জগন্নাথ ক্ষেত্রে ফিরে আসেন। দক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসুর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য দেবের পরিচয় হয়। এবং রামানন্দ সেই সময় শ্রী চৈতন্য দেবের সঙ্গে দ্বারকা থেকে নীলাচল পর্যন্ত আসেন। চৈতন্যদেব রামানন্দকে মিত্র সম্বোধন করতেন। এদিকে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য দেব জগন্নাথ ক্ষেত্রে আসার পর তিনি চৈতন্যদেবের প্রতি ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। এরপর প্রতিবছর রাজা প্রতাপরুদ্র নিজে রথযাত্রার সময় রথের আগে আগে যেতেন। এমনি এক রথযাত্রার সময় হাজার হাজার লোকের মাঝ দিয়ে রথ চলছে, রথের সামনে চৈতন্য মহাপ্রভু নেচে নেচে চলছেন, অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্রও মহাপ্রভুর পাশে পাশে যাচেছন। মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ, নাচছেন, গাইছেন, হাসছেন। এমন সময় হঠাৎ রথের পট্টডোরী ছিঁড়ে গেল। ভক্তবৃন্দের মধ্যে সামনেই ছিলেন কুলীন গ্রামের মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসু, মহাপ্রভু সেই ছেঁড়া পট্টডোরী রামানন্দ বসুর হাতে দিয়ে বললেন —

কুলীন গ্রামের শ্রীশ্রীশিবানী ও রথযাত্রা

'আজি হইতে তুমি হও পট্টডোরীর যজমান
প্রত্যব্দে আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ।'

এরপর প্রতিবছর কুলীন গ্রামের মালাধর বসুর পরিবার থেকে পুরীর জগন্নাথের রথের ডোরী যেত, তারপর রথ টানা হত। সত্যরাজ খাঁ (লক্ষ্মীনাথ বসু) নিজে কুলীন গ্রাম থেকে জগন্নাথ ক্ষেত্রে এই পট্টডোরী নিয়ে যেতেন। কুলীন গ্রামের বসুবংশ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কথিত আছে কুলীন গ্রাম দিয়ে যে সব যাত্রী পুরীর রথযাত্রায় যেতেন তাঁরাও বসু মহাশয়ের কাছ থেকে ডোরী নিয়ে যেতেন। কারণ এই ডোরী কাছে থাকলে পথে বা সীমান্তে কোন ঝামেলায় পড়তে হত না। যেহেতু মহাপ্রভু সত্যরাজখাঁকে পট্টডোরী নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছিলেন, তাই মহাপ্রভুর আদেশে সত্যরাজ খাঁ (লক্ষ্মীনাথ বসু) প্রতি বছর রথযাত্রার সময় কুলীন গ্রাম থেকে রথের ডোরী নিয়ে যেতেন। কিন্তু মানুষের শরীর সবসময় এক রকম থাকে না। তাই বয়সের ভারে সত্যরাজের পক্ষে পায়ে হেঁটে (সেই সময় যানবাহনের অভাবে পায়ে হেঁটেই পুরী যেতে হত।) পুরী যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলো, তখন তিনি পট্টডোরী পাঠাবার ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, মহাপ্রভুর আদেশ যাতে লঙ্ঘিত না হয় তাই মহাপ্রভুর প্রধান সহকারী নিত্যানন্দপ্রভুর কাছে এ ব্যাপারে উপদেশ ভিক্ষা করেন। (শ্রীচৈতন্য দেবের ভক্ত বৈষ্ণবরা চৈতন্যদেবকে 'মহাপ্রভু' এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যকে 'প্রভু' বলতেন।) নিত্যানন্দ প্রভুর পরামর্শে মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খাঁ (লক্ষ্মীনাথ বসু) সম্ভবতঃ ১৪৫৫ - ১৪৫৬ সাকে (ইং- ১৫৩৩-১৫৩৪ খ্রিঃ) কুলীন গ্রামে বলরাম সুভদ্রা সহ জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং রথযাত্রার প্রচলন করেন, আর কুলীন গ্রামের রথকেই শ্রীক্ষেত্রের রথ জ্ঞান করে সত্যরাজ খাঁ সেখানেই রথের পট্টডোরী দেন। তিনি আর পুরী যেতে পারেন নাই। সেই থেকে কুলীন গ্রাম যেন হয়ে উঠল দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র'' । কেউ কেউ বলেন এরপর কুলীন গ্রাম থেকে পট্টডোরী যাওয়া বন্ধ হয়, কিন্তু সত্যরাজ খানের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ, শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভাব শিষ্য, হরিদাস বসুর আমলেও পুরীতে পট্টডোরী পাঠানো হয়েছে। হরিদাস বসু প্রথম জীবন কুলীন গ্রামে অতিবাহিত করেন, এবং পরবর্ত্তী কালে ওকালতি পেশার তাগিদে বোলপুরে বসতি স্থাপন করেন, ওঁর লেখা সৎগুরুলীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থটি খুবই হৃদয়গ্রাহী। হরিদাস বসু কর্মোপলক্ষে বোলপুরে চলে আসার পর ঐ স্থানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর পুত্র গোপীজন বসু দীনজন বসুরাও বোলপুরেই বসবাস করতে থাকেন। এখন বসু পরিবারেই কেউই কুলীন গ্রামে থাকেন না। তাই কুলীনগ্রামের রথ কুলীন গ্রামবাসীর রথে পরিণত হয়েছে। চৈতন্যদেব কুলীন গ্রামের সকলকেই খুব ভালবাসতেন। বসু পরিবারের কুলীন গ্রাম থেকে চলে যাবার পর গ্রামবাসীদের হয়ে ডাঃ ত্রিগুণেন্দ্র নাথ মিত্রর পিতামহ রথপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী কালে ডাঃ ত্রিগুণেন্দ্র নাথ মিত্রের নেতৃত্বে ভূতেন্দ্রনাথ মিত্র, চণ্ডীচরণ বসু প্রভৃতি উৎসাহী ব্যক্তিরা সক্রিয় ভাবে কুলীনগ্রামের রথযাত্রা উৎসব পরিচালনা করতেন। সেই সময় রথযাত্রা উপলক্ষে সারা কুলীনগ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা জগন্নাথের প্রসাদ হিসাবে খিচুড়ি ভোগ খেতেন। মেলা দেখতেন, আর দেখতেন বিকালে জগন্নাথ দেবের রথটানা। এই রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হয় মাসির বাড়ি ভুবনেশ্বরী রঘুনাথ মন্দিরে, সেখানে সাতদিন থাকার পর উল্টোরথের দিন

কুলীনগ্রামের রথযাত্রা - গ্রন্থসূত্র- 'গৌড়ের ইতিহাস' - রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, 'সত্যরাজ-রামানন্দ' - ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 'বর্ধমানের বড়োমানুষ' - সুধীর চন্দ্র দাঁ

ফিরে আসেন জগন্নাথের মূল মন্দিরে। আজ কুলীন গ্রামে রথযাত্রার প্রবর্ত্তক সত্যরাজ খাঁ নাই, রামানন্দ বসু নাই, হরিদাস বসু নাই, জমিদার জীবনকৃষ্ণ মিত্র নাই, নাই ডাঃ ত্রিগুণেন্দ্র নাথ মিত্র, ভূতেন্দ্রনাথ মিত্র, চন্ডীচরণ বসু, কিন্তু কুলীন গ্রামের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা ঐতিহ্য সহকারেই চলে আসছে, পরিচালনা করছেন মৈত্র ও মিত্র পরিবার সহ সকল গ্রামবাসী— যেমন শ্রীপিনাকী মৈত্র, শ্রী সুধাংশু মিত্র, সৌমেন্দ্র মিত্র, শ্যামলেন্দ্র মিত্র, বিমলেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেকে।

কুলীন গ্রামের পথনির্দেশিকা ঃ- বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনের জৌগ্রাম স্টেশন থেকে ট্রেকার বা রিক্সায় সরাসরি কুলীন গ্রাম; কিম্বা জৌগ্রাম স্টেশন থেকে বাসে রানাপাড়া, সেখান থেকে রিক্সায় কুলীন গ্রাম, অথবা বর্ধমান তিনকুনিয়া বাস টারমিনাস থেকে সরাসরি রানাপাড়া, সেখান থেকে রিক্সায় কুলীনগ্রাম যাওয়া যায়।

১৬) বোড়োর শ্রীশ্রীবলরাম ঃ অন্যান্য ধর্মমঙ্গলকারের মতো কবি নরসিংহ বসুও বোড়োর বলরামের বন্দনা করে বলেছেন —

'সাবধানে বন্দিব বোড়োর বলরাম। পুড়িচার বন্দ বিশালাক্ষী অনুপাম।।'

বোড়ো বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের রায়না থানায় অবস্থিত। এই গ্রামের সর্বজন পূজ্য দেবতা হচ্ছেন বলরাম। এই দেবতার নাম অনুসারেই গ্রামের নাম হয়েছে 'বোড়ো-বলরাম' বোড়োর বলরাম এই অঞ্চলের বহু প্রাচীন দেবতা। এই দেবমূর্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে- এই মূর্তি প্রায় তের চৌদ্দ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট নিম কাঠের তৈরী এক বিচিত্র দেবমূর্ত্তি। এই মূর্তির রয়েছে চৌদ্দটি হাত, যার মধ্যে একটি হাতে রয়েছে বলরামের প্রতীক লাঙ্গল, যে কারণে এই মূর্তিটিকে বলা হয় 'বলরাম'। আবার অন্যান্য হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম যা নারায়ণ - বাসুদেবের প্রতীক। আবার মূর্তির মাথাটি রয়েছে তেরটি সাপের ফনা দিয়ে আচ্ছাদিত, ঠিক যেমন যমুনা পারাপারের সময় শিশু শ্রীকৃষ্ণের মাথার উপর দেখা যায়, তাই এই দেবতাকে অনন্ত বাসুদেবও বলা হয়। এই মূর্তিটি আবার ত্রিনেত্র যুক্ত মাথায় জটা ও এক হাতে ডুগডুগি সহ শিবমূর্তির প্রতীকও বলা যায়। আর দেবতার মুখমন্ডলে রয়েছে মোটা গোঁফ। মূর্তির আর একটি ফনা পাশে আছে বলে মনে হয়! এই মূর্তির মাথার চারপাশে অঙ্কিত রয়েছে রাধা কৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবদেবী, একই অঙ্গে বহু দেবতার প্রকাশ। তাই ইনি রাঢ়ের লৌকিক দেবতা।

পূজা-ভোগ-উৎসব ঃ বলরামের নিত্যপূজার সাথে সাথে নিত্য অন্নভোগ হয়ে থাকে। অন্ন ভোগে থাকত বাসমতি আতপ চালের ভাত, তরিতরকারী ও পায়েস। আগে উপস্থিত ভক্তরা বলরাম দেউলে বসে ভোগের প্রসাদ খেয়ে আসতেন। এখন পুরোহিত মশাইকে জানিয়ে রাখলে ভোগের প্রসাদ পাওয়া যায়। নিত্যপূজা ভোগ ছাড়াও সন্ধ্যায় বলরামের আরতি ও কীর্ত্তন হয়। বৈশাখী শুক্লা অক্ষয় তৃতীয়ায় বলরামের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় দেবতার অঙ্গ রাগ ও চক্ষুদান হয়। ঐ সময় অনেক মহিলা বলরাম মন্দিরে 'অক্ষয় সিন্দুর দান' ব্রত গ্রহণ করেন। এছাড়া বৈশাখী পূর্ণিমাতে গাজন উৎসব পালিত হয়, অনন্ত চতুর্দশীতে, মকর সংক্রান্তিতে ও মাঘী পঞ্চমীতেও বিশেষ পূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আবার মকর সংক্রান্তিতে বাহান্ন রকম তরিতরকারি মিষ্টান্ন দ্রব্য সহ 'বাহান্ন ভোগ' দেওয়া হয়, এই ভোগ ১লা মাঘ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বোড়োর মেলায় বালাগড়, দক্ষিণকুল, দেরিয়াপুর, আনগুনা, তিয়াড্ডুল, ধামাস, মেড়াল, মুগড়ো, জগৎপুর, শম্ভুপুর, নতু, হরপুর, প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা সমবেত হন ও মেলা উপভোগ করেন।

মূর্তি রহস্য ঃ — কথিত আছে বোড়োর বলরাম প্রথমে বোড়ো গ্রামে দক্ষিণে দক্ষিণকুল গ্রামের উত্তর-পুর্ব দিকে অবস্থিত এক পুকুরে ছিলেন। বলরামকে অনন্ত বাসুদেব বলা হয় বলে ঐ পুকুরেরও নাম হয় 'বাসদেও' বা 'বাসুদহ'। এরপর বলরাম যান 'অনন্ত সায়র' পুকুরে, সেখানে মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলেনী প্রথমে দেখতে পায় বলরামের কাঠ। এখানে উল্লেখ্য বিষয় হল মন্দিরে বলরামের যে মূর্তি রয়েছে সেই অবস্থায় দক্ষিণ কুলের বাসদেও পুকুরে কিম্বা অনন্ত সায়রে তাঁকে পাওয়া যাই নাই। সেখানে ছিলেন একখন্ড বিরাট কাঠের আকারে। ঠাকুর বলরাম এক কাঠ মিস্ত্রীকে স্বপ্নে এক বিচিত্র মূর্ত্তিতে দেখা দেন, যে মূর্তি আজ মন্দিরে অবস্থান করছেন, এবং ঐ মিস্ত্রীকে নির্দেশ দেন — জেলেনীর ঘরের কাঠ থেকে স্বপ্নে দেখা মূর্তি মত হুবহু এক মূর্তি নির্মাণ করতে। ঠাকুরের কৃপায় মিস্ত্রী - তাঁর স্বপ্নে দেখা দেবতাকে বাটালীর স্পর্শে জীবন্ত করে তোলেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় চার - পাঁচশ বছর ধরে বোড়োর বলরাম দেউলে সেই বলরাম মূর্তি বিরাজ করছেন। যা দক্ষিণ দামোদর তথা সারা বর্ধমান জেলার এক ঐতিহ্যপূর্ণ মূর্তি।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ— বর্ধমান থেকে সরাসরি বোড়ো বলরাম পর্যন্ত বাসের যোগাযোগ আছে। ঐ বাসরুটের নাম বর্ধমান-দেরিয়াপুর-বোড়োবলরাম।

১৭) খুদকুড়ীর শ্রীশ্রীরাঘবেশ্বর জীউ ঃ শাঁকারী গ্রামের উত্তর-পূর্বদিকে খুদকুড়ি গ্রামে রয়েছেন বাবা রাঘবেশ্বর। বাবা রাঘবেশ্বর হচ্ছেন ঐ অঞ্চলের এক জাগ্রত শিবলিঙ্গ, বাবা রাঘবেশ্বর ঠিক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তা সঠিক ভাবে জানা যায় নাই, তবে কেউ কেউ বলেন শাঁকারীর শঙ্করী মায়ের প্রতিষ্ঠাতা রাঘব রায় মহাশয় নাকি খুদকুড়ির রাঘবেশ্বর জীউ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই তাঁরই নাম অনুসারে দেবতারও নাম হয়েছে 'রাঘবেশ্বর'।

রাঘবেশ্বরের পূজা-পার্বণ ঃ রাঘবেশ্বর ঠাকুরের প্রতিদিন সকালের দিকে হয় 'নিত্যসেবা', পূজা আর সন্ধ্যার দিকে হয় 'শীতল'। রাঘবেশ্বর ঠাকুরের পুরোহিত হচ্ছেন শাঁকারীর পশ্চিম পাড়ার গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা। তাঁরাই আবার রাঘবেশ্বরের সেবাইতের দায়িত্বও পালন করেন। এই পরিবারের যাঁদের যে দিন নিত্যপূজার পালা থাকে তাঁরা তাঁদের বাড়ি থেকে পাঁচমুঠো করে চাল নিয়ে নিত্যপূজা করেন। আর শীতলের জন্য দেন মন্ডা। নিত্যসেবা ছাড়া প্রতি সোমবার বাবার বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। যাঁরা বাবার কাছে কোন রোগমুক্তি বা অন্যকিছু মনবাঞ্ছা পূরণের জন্য 'মানত' করেন তাঁরা সোমবারে 'মানতের' পূজা দিতে আসেন।

বাবার বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে চৈত্রসংক্রান্তির গাজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খুব জাঁকজমক ভাবে এই গাজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পাঁচদিন ধরে চলে এই উৎসব। গাজনের সন্ন্যাসীদের প্রায় ছ'সাত দিন ধরে নানা আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। গাজনের সময় 'রাত গাজন' বা 'ফলের দিন' রাত্রে কামাখ্যা দেবীর ঘট আনা, আর 'নীলের দিন' রাত্রে সন্ন্যাসীদের 'শালে ভর' দেওয়া দেখার মত অনুষ্ঠান। রাত গাজনের রাত্রে বাবার মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'ভেতর পুকুর' থেকে মূল সন্ন্যাসী মাথায় করে কামাখ্যা দেবীর ঘট নিয়ে আসেন বাবার কাছে, আর পুরোহিত মশাই বাবার আশীর্ব্বাদী ফুল দিয়ে মূল সন্ন্যাসীকে আশীর্ব্বাদ করেন। এরপর পূজা কমিটির তরফে রাত্রে পুরোহিত, সন্ন্যাসী, ঢাকি, প্রভৃতিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

নীলের দিন রাত্রেও 'ভেতর পুকুর'এ স্নান করে 'শালে ভর' দিয়ে বাবার সামনে আসেন সন্ন্যাসীরা। শেষদিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন বিকালে হয় চড়কের ঝাঁপ। পরের দিন ১লা বৈশাখ শিবের প্রসাদ ভক্ষণের অনুষ্ঠান। সন্ন্যাসীরা তাঁদের ব্রত সমাপ্তের পর এই অনুষ্ঠানে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বর্তমানে এই অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার বহন করেন মাননীয় গণেশ তা, নারায়ণ পাল, সত্যনারায়ণ সাই মহোদয়গণ। বামাচরণ সাঁই মহাশয়ের পিতা বিহারীলাল সাঁই মহাশয় গাজনের ৮টি ঢাকের জন্য ১২ বিঘে জমি, আর মূল সন্ন্যাসীর জন্য ৮বিঘে জমি দিয়ে গেছেন। রাঘবেশ্বরের গাজন উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে তিনচারদিন ধরে মেলা বসে। আর তিনরাত্রি যাত্রা পালা অনুষ্ঠিত হয়। শিবরাত্রিতেও বাবার কাছে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

খুদকুড়ির শ্রীশ্রীক্ষুদিরায় ঃ খুদকুড়ির ক্ষুদিরায় হচ্ছেন 'ধর্মরাজ'। মনে হয় এই দেবতার নাম অনুসারেই গ্রামের নাম হয়েছে খুদকুড়ি। বর্তমানে এই দেবতার সেবার দায়িত্বে রয়েছেন — সত্যনারায়ণ সাঁই। আর পুরোহিত হচ্ছেন শাঁকারির বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার, যাঁরা রাঘবেশ্বর ঠাকুরের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব বহন করেন। মূর্তিটি পিঁড়ির আকারের কূর্ম মূর্তি।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ বর্ধমান- শাঁকারী বাসেই সরাসরি রাঘবেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়।

কুলীনগ্রামের মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসুর পরিবারের একটি বংশধারা ঃ

অধুনা দেবীপুর (স্টেশন) নিবাসী সুশান্ত কুমার বসু ও তাঁর পিতা ব্রজরাখাল বসু মহাশয়ের দেওয়া তথ্য অনুসারে জানা যায়—মালাধর বসুর পৌত্র রামানন্দ বসুর বংশধারার অন্যতম পুরুষ রাধিকা কিশোর বসুর পিতামহ প্রায় দু'শ বছর আগে কুলীন গ্রামের উত্তরে 'বেনাপুর' নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু কুলীন গ্রামের সাথেও তাঁদেব সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তাই সুশান্তবাবুরা প্রায় প্রতি বছরই রথযাত্রার সময় কুলীনগ্রামে উপস্থিত থাকেন।

রামানন্দ বসুর বংশধর রাধিকা কিশোর বসু থেকে একটি বংশলতিকা —
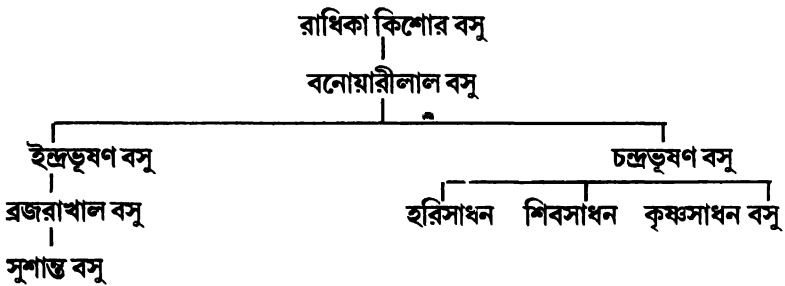
পরিশিষ্ট - ২

সতীর একান্ন মহাপীঠের মধ্যে কবি বন্দিত কয়েকটি মহাপীঠ যেগুলি সহজে দর্শন করা যায় : —

বর্ধমান জেলা ঃ ক্ষীরগ্রামে দেবী যোগাদ্যা, বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে ক্ষীরগ্রাম, এখানে সারাবছর ক্ষীরদীঘিতে দেবী ডোবানো থাকেন, বৈশাখী সংক্রান্তিতে দেবীকে জল থেকে তুলে পূজা করা হয়, ঐ সময় বিরাট মেলা হয়। এখানে সতী দেবীর ডান পায়ের আঙ্গুল পড়েছিল।

বাহুলা ঃ বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রামে অজয় নদীর তীরে অবস্থিত এই পীঠস্থান। এখানে দেবীর বাম বাহু পড়ে।

উজানী ঃ বর্ধমান জেলার গুস্‌করার কাছে কোগ্রাম বা উজানী। এখানে সতীর কুনুই পড়েছিল।

বীরভূম জেলা ঃ বক্রেশ্বর - বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ও আমোদপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে দেবীর মন বা ভ্রূমধ্য পড়ে। শিবরাত্রিতে এখানে বিশেষ পূজা ও মেলা হয়।

নলহাটি ঃ বীরভূম জেলার নলহাটী স্টেশনের কাছে পাহাড়ের ওপর দেবীর মন্দির অবস্থিত। এখানে দেবীর নলা পতিত হয়েছিল।

নন্দীপুর ঃ বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া স্টেশনের পাশে এই পীঠস্থান। এখানে দেবীর হার পতিত হয়।

অট্টহাস ঃ বীরভূম জেলার লাভপুর স্টেশনের কাছে এই পীঠস্থান। এখানে দেবীর ওষ্ঠ্য পতিত হয়েছিল।

কঙ্কলী (কাঞ্চী) ঃ বীরভূম জেলার বোলপুর স্টেশনের উত্তর পূর্বে কোপাই নদীর তীরে দেবীর এই পীঠস্থান, এখানে দেবীর কঙ্কাল পড়েছিল।

কোলকাতার কালীঘাট ঃ এখানে দেবীর চার আঙ্গুল পতিত হয়।

কামরূপ কামাখ্যা ঃ অসমের গৌরহাটির কাছে নীলাচল পাহাড়ে বা নীল পাহাড়ের কামাখ্যা দেবীর মন্দির ও পীঠস্থান। এখানে দেবীর মহামুদ্রা (যোনি) পড়েছিল।

মুর্শিদাবাদের কিরীটকোনা ঃ লালগোলা স্টেশনের কাছে এই পীঠস্থান, এখানে দেবীর কিরীট পড়েছিল।

বিভাস ঃ মেদিনীপুর জেলার তমলুকে এই পীঠস্থান অবস্থিত, এখানে পড়েছিল দেবীর বাম গুলফ।

বৈদ্যনাথ ধাম ঃ ঝাড়খন্ড রাজ্যের দেওঘরে এই পীঠস্থান, এখানে পতিত হয়েছিল দেবীর হৃদয়।

বারাণসী ঃ উত্তর প্রদেশের বারাণসীর গঙ্গার তীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে এই পীঠস্থানের অবস্থান, এখানে পতিত হয় দেবীর কর্ণকুন্ডল।

এছাড়া পুরীতে- নাভি, বৃন্দাবনে- কেশ, হরিদ্বারে- জঠর ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট - ৩

২) দেবত্তর / ব্যক্তিগত সম্পত্তির অংশ জ্ঞাপনের পুরাতন ও বর্তমান দশমিক পদ্ধতির সম্পর্ক ও টাকা, আনা, পয়সা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তির পরিচিতি ঃ

১৬ আনায় — ১টাকা। ২০ গন্ডায় — এক আনা, চার কড়ায় — এক গন্ডা, তিন ক্রান্তিতে — ১ কড়া, এক পয়সা = পাঁচগন্ডা, দু পয়সা = দশগন্ডা, তিন পয়সা = পনের গন্ডা, চার পয়সা = কুড়ি গন্ডা = এক আনা

আনার চিহ্ন ঃ — এক আনা = /. , দু-আনা = ./. , তিন আনা = ১/.
চার আনা = ।. , পাঁচ আনা = ।/. , ছ'আনা = ।./.
সাত আনা = ।১/. , আট আনা = ॥. , ন'আনা = ॥/.
দশ আনা = ॥./ ,এগারো আনা = ॥১/. , বার আনা = ৸.
তের আনা = ৸/. ,চৌদ্দ আনা = ৸./. , পনের আনা = ৸১/.
পুরাতন চৌষট্টি পয়সা = ষোল আনা = ১ এক টাকা = ১০০ পয়সা নূতন।

গন্ডার চিহ্ন ঃ- এক গন্ডা = , দু'গন্ডা = ২ , পাচ গন্ডা = ৫
দশ গন্ডা = ১০ , বারো গন্ডা = ১২ , তের গন্ডা = ১৩
পনেরো গন্ডা = ১৫ যোল গন্ডা = ১৬ , কুড়ি গন্ডা = ২০/

কড়ার চিহ্ন ঃ- এক কড়া= ।. , দু'কড়া= ॥ , তিন কড়া = ৸.

ক্রান্তির চিহ্ন ঃ-এক ক্রান্তি = :/ , দু'ক্রান্তি = :॥

৩) সম্পত্তির অংশ জ্ঞাপনের পুরাতন পদ্ধতি ও বর্তমান দশমিক পদ্ধতি সম্পর্কেব তালিকাঃ

অংশ		অংশ জ্ঞাপনের পুরাতন পদ্ধতি	অংশ জ্ঞাপনের দশমিক পদ্ধতি
সম্পূর্ণ বা ষোল আনা অংশ বোঝাতে -	এক টাকা =	১	১.০০০০
অর্ধেক বা ১/২ অংশ বোঝাতে-	আট আনা =	॥.	০.৫০০০
সিকি বা ১/৪ অংশ বোঝাতে -	চার আনা =	।.	০.২৫০০
১/৩	পাঁচ আনা ছ'গন্ডা দু'কড়া দু'ক্রান্তি =	।/৬॥/	০.৩৩৩৩
১/৬	দু আনা তের গন্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি =	./১৩।/.	০.১৬৬৭
১/১২	এক আনা ছ'গন্ডা- দু'কড়া দু'ক্রান্তি =	/৬॥/.	০.০৮৩৩
চার পয়সা বা ১/১৬ অংশ বোঝাতে	একআনা =	/.	০ ০৬২৫
এক পয়সা বা ১/৬৪ অংশ বোঝাতে-	পাঁচ গন্ডা =	৫	০.০১৫৬

অং	অংশ জ্ঞাপনের পুরাতন পদ্ধতি		অংশ জ্ঞাপনের দশমিক পদ্ধতি
দু'পয়সা বা ২/৬৪ অংশ বোঝাতে-	দশ গন্ডা =	৹১০	০.০৩১৩
তিন পয়সা বা ৩/৬৪ অংশ বোঝাতে-	পনের গন্ডা =	৹১৫	০.০৪৬৯
পাঁচ পয়সা বা ৫/৬৪ অংশ বোঝাতে-	এক আনা পাঁচ গন্ডা =	৴৫	০.০৭৮১
ছ'পয়সা বা ৬/৬৪ অংশ বোঝাতে-	এক আনা দশ গন্ডা =	৴১০	০.০৯৩৮
সাত পয়সা বা ৭/৬৪ অংশ বোঝাতে-	এক আনা পনেরো গন্ডা =	৴১৫	০.১০৯৪
আট পয়সা বা ১/৮ অংশ বোঝাতে -	দু আনা =	৵·	০.১২৫০
১০ পয়সা বা ১০/৬৪ অংশ বোঝাতে-	দু আনা দশ গন্ডা =	৵১০	০.১৫৬৩
বার পয়সা বা ১২/৬৪ অংশ বোঝাতে-	তিন আনা =	৶·	০.১৮৭৫
চৌদ্দ পয়সা বা ১৪/৬৪ অংশ বোঝাতে-	তিন আনা দশ গন্ডা =	৶১০	০.২১৮৮
ষোল পয়সা বা ১৬/৬৪ বোঝাতে -	চারআনা =	।·	১.২৫০০
পাঁচ আনা বা ৫/১৬ অংশ বোঝাতে	=	।৴·	০.৩১২৫
ছয় আনা বা ৬/১৬ অংশ বোঝাতে	=	।৵·	০.৩৭৫০
সাত আনা বা ৭/১৬ অংশ বোঝাতে	=	।৶·	০.৪৩৭৫
আট আনা বা ১/২ অংশ বোঝাতে	=	॥·	০.৫০০০
নয় আনা বা ৯/১৬ অংশ বোঝাতে	=	॥৴·	০.৫৬২৫
দশ আনা বা ১০/১৬ অংশ বোঝাতে	=	॥৵·	০.৬২৫০
এগারো আনা বা ১১/১৬ অংশ বোঝাতে	=	॥৶·	০.৬৮৭৫
বার আনা বা ৩/৪ অংশ বোঝাতে	=	৸·	০.৭৫০০
তের আনা বা ১৩/১৬ অংশ বোঝাতে	=	৸৴·	০.৮১২৫
চোদ্দ আনা বা ১৪/১৬ অংশ বোঝাতে	=	৸৵·	০.৮৭৫০
পনের আনা বা ১৫/১৬ অংশ বোঝাতে	=	৸৶·	০.৯৩৭৫
৭/৪৮ অংশ বোঝাতে-	দু আনা ছ'গন্ডা দু'কড়া দু'ক্রান্তি =	৵৬॥/·	০.১৪৫৮
১১/১৬ অংশ বোঝাতে-	তিন আনা তের গন্ডা- এক কড়া এক ক্রান্তি =	৶১৩।/·	০.২২৯১

কবির স্মরণসভায় কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে উপস্থিত রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যবৃন্দ
১০ই ভাদ্র ১৪১৩, ইং ২৭ আগস্ট ২০০৬

কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপনে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী

নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল ঃ সমাজ ভাবনা

তৃতীয় পর্ব

নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল ঃ গদ্যরূপে রীতিতে

কবি নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন পাত্রপাত্রী ঃ

ঃ স্বর্গলোকের প্রধান প্রধান চরিত্র ঃ

পুরুষ চরিত্র ঃ ধর্মরাজ (ভগবান), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্যদেব (আদিত্য), ধর্মরাজের অনুচর হনুমান, ধর্মরাজের বাহন - উলুক, বিশ্বকর্মা ও অন্যান্য দেবতা।

স্ত্রী চরিত্র ঃ ভগবতী দুর্গা, দুর্গার সখী পদ্মাবতী, ইন্দ্রের রাজসভার প্রধান নর্ত্তকী - অম্বুবতী ইত্যাদি।

ঃ মর্তলোকের প্রধান প্রধান চরিত্র ঃ

ঃ পুরুষ চরিত্র ঃ

১।	ধর্মপাল	-	গৌড়রাজ ।
২।	গৌড়েশ্বর (ধর্মপাল পুত্র)	-	কাব্যের অন্যতম। প্রধান চরিত্র।
৩।	কর্ণসেন	-	ঢেকুর ও ময়নার সামন্তরাজা।
৪।	রামাই পন্ডিত	-	ধর্মরাজের পূজা প্রবর্ত্তক।
৫।	লাউসেন	-	কাব্যের নায়ক (কর্ণসেন পুত্র)।
৬।	কর্পূর	-	লাউসেনের ভাই।
৭।	কর্পূর ধল	-	কামরূপের রাজা।
৮।	গজপতি	-	মঙ্গলকোটের রাজা।
৯।	কালিদাস	-	বর্ধমান রাজ।
১০।	হরিপাল	-	হরিপাল-সিমূল্যার রাজা।
১১।	মহামদ	-	গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী, লাউসেনের মামা (খলনায়ক)।
১২।	বেণুরায়	-	বাঁশডিঞার রাজা ও গৌড়েশ্বরের শ্বশুর।
১৩।	সোমঘোষ	-	ইছাই ঘোষের পিতা।
১৪।	ইছাই ঘোষ		ঢেকুরের স্বঘোষিত সামন্তরাজ।
১৫।	কালুডোম	-	লাউসেনের প্রধান অনুচর।
১৬।	রত্নাকর	-	সাগর-রাজ।
১৭।	লোহাটা বজ্জর	-	ইছাই এর প্রধান অনুচর।
১৮।	গঙ্গাধর ভাট	-	গৌড়েশ্বরের দূত।
১৯।	জয়পতি মন্ডল	-	ময়নার বিশিষ্ট প্রজা, কর্ণসেন ও লাউসেনের সহচর।

২০। মনোহর বিপ্র - লাউসেনের পাঠগুরু।

২১। রাজা গদাধর - জামতি নগরের রাজা।

২২। লাউ দত্ত - রমতি নগরের এক কর্মকার।

২৩। ইন্দা কোটাল - মহামদের চর।

২৪। সারঙ্গ মাল - রমতির মল্লযোদ্ধা।

২৫। গদা পাইক - মহামদের সৈন্য।

২৬। কাম্বা ডোম - মহামদের গুপ্তচর।

২৭। শাকা - কালুবীরের বড় ছেলে।

২৮। শুকা - কালুবীরের ছোট ছেলে।

২৯। রামদাস - ময়নার রজক।

৩০। শ্রীনিবাস - ময়নার নাপিত।

৩১। নন্দ কামার - লাউসেনের ঢাল প্রস্তুত কারক এক কামার।

৩২। পোতা মাঝি - বন্দীশালের দ্বার রক্ষক।

৩৩। কামদেব - মহামদের বড় ছেলে।

৩৪। গদা - গৌড়েশ্বরের মাহুত।

৩৫। হরিহর বাইতি - লাউসেনের ঢাকি।

৩৬। চিত্র সেন - লাউসেনের পুত্র।

৩৭। মহামদের আরও ছয় ছেলে।

ঃ স্ত্রী চরিত্র ঃ

১। রাণী বল্লভা - ধর্মপালের মহিষী।

২। রাণী ভানুমতি - গৌড়েশ্বরের মহিষী।

৩। রঞ্জাবতী - কর্ণসেনের মহিষী, লাউসেনের মাতা, এবং বেণুরায়ের কন্যা ও কাব্যের অন্যতম প্রধান স্ত্রী চরিত্র (ইন্দ্রের নর্ত্তকী শাপ ভ্রষ্টা অম্বুবতী)।

৪। কলিঙ্গা - কাঙুর রাজকন্যা (লাউসেনের প্রথমা স্ত্রী)।

৫। অমলা - মঙ্গলকোট রাজকন্যা (লাউসেনের দ্বিতীয়া স্ত্রী)।

৬। বিমলা - বর্ধমান রাজকন্যা (লাউসেনের তৃতীয়া স্ত্রী)।

৭।	কানড়া	-	হরিপাল রাজকন্যা (লাউসেনের চতুর্থ স্ত্রী)।
৮।	লীলাবতী	-	রাণী বল্লভার বন সখী।
৯।	মন্থরা	-	বেণুরায়ের স্ত্রী ও রঞ্জাবতীর মা।
১০।	সামূল্যা	-	ধর্মরাজের পূজারিণী।
১১।	সানকা নটী	-	গৌড়ের নর্ত্তকী।
১২।	রমা	-	সোমঘোষের স্ত্রী ও ইছাইয়ের মা।
১৩।	কল্যাণী ও মাণিকী	-	রঞ্জাবতীর দুই দাসী।
১৪।	লখ্যা ডুমনী	-	কালুবীরের স্ত্রী।
১৫।	বাইতিনী	-	হরিহর বাইতির স্ত্রী।
১৬।	মউরা	-	শাকার স্ত্রী।
১৭।	নয়নী	-	জামতি নগরের এক দ্বিচারিণী কূল বধূ।
১৮।	সুরক্ষা	-	গোলাহাটের বিখ্যাত বারবনিতা।
১৯।	গোরক্ষা	-	সুরক্ষার দাসী।
২০।	মালিণী	-	গোলাহাটের এক নটী ও ফুলমালা পসারিণী।
২১।	ধুমশী / ধুমসী	-	হরিপাল রাজকন্যা কানড়ার বিশেষ সখী।

ঃ কতিপয় জীবজন্তু ঃ

১।	কামদল	-	শাপভ্রষ্ট বাঘ।
২।	মাণিকরাজ	-	গৌড়েশ্বরের পাট হাতি।
৩।	কপিলা	-	গাভি।
৪।	বটুয়া	-	কুকুর।
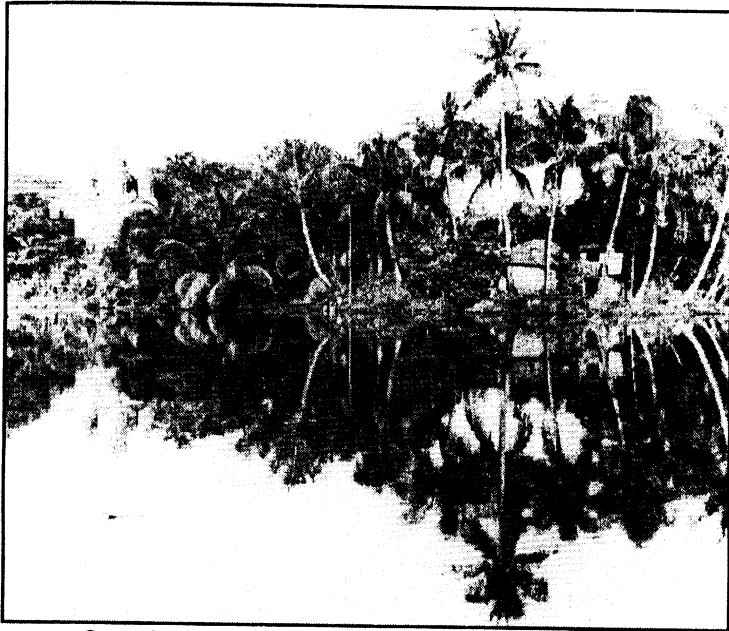
পরিখাবেষ্টিত ময়না (মেদিনীপুর) রাজবাড়ীর বহিঃদৃশ্য ও সংলগ্ন দেবমন্দির
পৃঃ - ১৯৯, সৌজন্যে ঃ ড. সুকুমার মাইতি
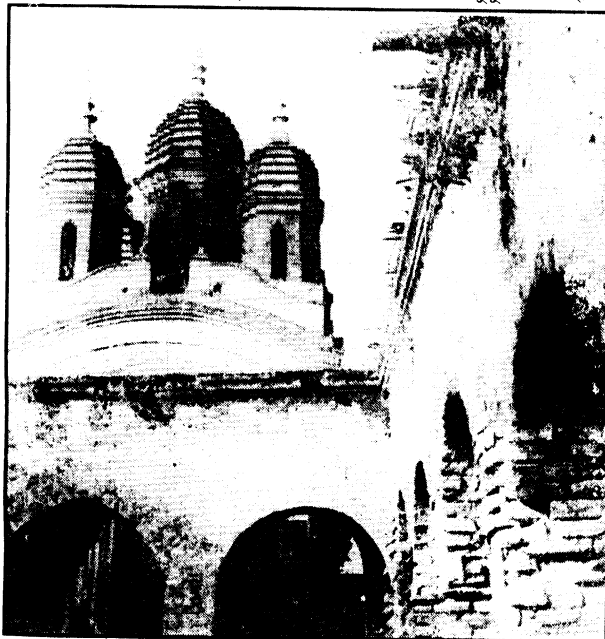
ময়না (মেদিনীপুর) রাজবাড়ীর শ্যামসুন্দর জীউ মন্দির, পৃঃ - ১৯৯
সৌজন্যে ঃ ড. সুকুমার মাইতি

বিশালাক্ষ্মী দেবী
(দশঘরা, হুগলী), পৃঃ-৯৮
সৌজন্যে ঃ ড. সুকুমার মাইতি

ধর্মরাজ (কিয়ারণা, ময়না, মেদিনীপুর)
সৌজন্যে ঃ ড. সুকুমার মাইতি

এক

নিশা স্থাপনা পালা

(ক) সূচনা পর্ব ঃ

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনির প্রেক্ষাপট হল 'গৌড়দেশ' যেটি পঞ্চগৌড়ের অর্ন্তগত, ভৈরবী গঙ্গার ধারে মালদহ জেলায় অবস্থিত। পঞ্চগৌড় বলতে এক সময় বলা হত দক্ষিণে উৎকল, ভৈরবীতীরে গৌড়দেশ, উত্তরাংশে কান্যকুব্জ, মিথিলা, সন্নড় (সারস্বত)। কবি নরসিংহ বসু তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্থাপনা পালার 'সৃষ্টি প্রকরণ' খন্ডে সৃষ্টি রহস্য বর্ণনার শেষ অংশে বিভিন্ন দেশ ও নগর সৃষ্টি প্রসঙ্গে পঞ্চগৌড়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গৌড়ের রাজা ধর্মপালপুত্র গৌড়েশ্বর যিনি কাহিনির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ধর্মমঙ্গল কাব্যের কোন কবি তাঁর নাম উল্লেখ করেন নাই। তাই ঐতিহাসিক বিচারে তিনি কোন ধর্মপালের পুত্র তা নিয়ে নানা মত আছে। অবশ্য এই কাব্যের আর এক চরিত্র ইছাই ঘোষ যে একাদশ - দ্বাদশ শতাব্দীতে ঢেকুরের সামন্তরাজ ছিলেন তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিপি পাওয়া যায়। আর আজও অজয়নদীব তীরে ইছাই এব দেউল ও শ্যামামায়ের মন্দির রয়েছে। ঐ সময় পাল রাজত্বের প্রায় শেষের দিক, সেই সময় পাল বংশের ত্রয়োদশ রাজা ছিলেন শূরপাল দেব এবং চতুর্দ্দশ রাজা ছিলেন রামপাল দেব। তাঁর রাজধানী ছিল গৌড়ের কাছে রামাবতী বা রমতীনগরে যা ধর্মমঙ্গল কাব্যেও উল্লেখ আছে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের কবিরা একাদশ - দ্বাদশ শতাব্দীর গৌড়ের রাজা শূরপাল বা রামপালকে কিম্বা অন্য কোন পালরাজাকে গৌড়েশ্বর রূপে কল্পনা করেছিলেন কিনা বলা যায় না।

তবে কাব্য আর ইতিহাস এক জিনিষ নয়। অনেক সময় কবি বা সাহিত্যকরা ইতিহাস ও সমাজ থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে সমাজের প্রয়োজন মত কাব্য বা সাহিত্য রচনা করেন। সেইভাবেই বিভিন্ন কবি রচনা করে ছিলেন রাঢ় বাংলার এক বিশেষ কাব্য - 'ধর্মমঙ্গল কাব্য', যে কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা হয়, যে কাব্যের কাহিনী আমাদের কাছে উদ্ভাসিত করেছে সমাজের বিভিন্ন দিক। সেই কাব্যের কাহিনীর সূত্রপাত যে গৌড়রাজ্যকে নিয়ে কবি নরসিংহ বসুর ভাষায় সেই গৌড়ের কথা দিয়ে কাহিনী শুরু করছি।

সৃষ্টি প্রকরণের অংশ

'কাশী কাঞ্চী অবন্তী হস্তিনা হরিদ্বার
বৃন্দাবন বারানসী পৃথিবীর সার ।।
অযোধ্যা মথুরা গয়া পাঞ্চাল গুর্জর
দ্বারকা অমরাবতী মণু যুগন্ধর ।।
তৈলঙ্গ ভিলঙ্গ অঙ্গ দ্রাবিড় কর্ণাট ।
মগধ কাশ্মীর মহারাষ্ট্র ও *রাট ।।
পঞ্চগৌড় মধ্যে বিখ্যাত সবার ।
উৎকল দক্ষিণে গৌড় ভৈরবীর ধার ।।
উত্তরাংশে কান্যকুব্জ মিথিলা সন্নড় ।
ভারতভূমের মধ্যে এই পঞ্চ গৌড় ।।
ধর্মের মঙ্গল মহী মন্ডলের সার ।
রচিল 'নৃসিংহ বসু প্রবন্ধ পয়ার।।'(৪৩২)

মনে হয় অনুলেখক নৃসিংহ মিত্র 'নরসিংহ বসু'র স্থলে 'নৃসিংহ বসু' লিখে ফেলেছেন।

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী শুরু হয়েছে এই গৌড়রাজ ধর্মপালকে নিয়ে -

'ধর্মপাল রাজা ছিল গৌড়বনি নাথ ।	কৃষ্ণ সেবা বিনা নাহি রাজার আহার ।
পরম বৈষ্ণব রাজা ভূবন বিখ্যাত ।।	বল্লভাখ্যা রূপবতী মহিষী তাহার ।।'৪৩৮

অবশ্য কাব্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেন ধর্মপাল মহিষী রাণী বল্লভা পুত্র 'গৌড়েশ্বর' আর নায়ক হলেন গৌড়েশ্বরের ছোট শালিকা রঞ্জাবতীর (ইন্দ্রের প্রধান নর্ত্তকী শাপভ্রষ্টা অম্বুবতী) পুত্র-লাউসেন (নররূপী আদিত্য) । এবং খল-নায়ক ছিলেন গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ, এছাড়া অন্যতম পার্শ্ব-চরিত্র কালুবীর সিংহ (ডোম), ঢেকুরের সামন্তরাজ ইছাই ঘোষ প্রমুখ ।

কবির লেখা এই কাব্য কাহিনির সুচনাতে পাওয়া যায় গৌড়রাজ ধর্মপালের রাজত্ব কথা ও রাণী বল্লভা-পুত্র গৌড়েশ্বরের জন্ম রহস্য ।

(খ) গৌড়রাজ ধর্মপাল ও রাণী বল্লভা-পুত্র গৌড়েশ্বরের জন্মরহস্য ঃ

ধর্মপাল ছিলেন গৌড়ের একজন বিখ্যাত রাজা, পরম বৈষ্ণব সেবক, কৃষ্ণের পূজারী। কৃষ্ণসেবা না করে কোন দিন আহার করতেন না। প্রতিদিন ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের নানাবিধ দ্রব্য দান করা, পূরাণ ভাগবত শোনা তাঁর নিত্যকর্মের অন্যতম ছিল। রাজার একবার শিকারে যাবার ইচ্ছা হল, কিন্তু গোবিন্দ সেবার ভার কাকে দিয়ে যাবেন সেই চিন্তা করতে করতে মনে ভাবলেন স্ত্রী বাম অঙ্গের সমান, তাই ঠিক করলেন - স্ত্রী বল্লভাকে গোবিন্দের সেবার ভার দিয়ে যাবেন ।

'এই পরামর্শ মনে করিয়া রাজন ।	মহাবনে যাব আমি করিতে শিকার ।
বল্লভার হাতে ধরে বলেন বচন ।।	কৃষ্ণ সেবা তোমাকে দিলাম আজি ভার ।।'

(৪৪৮)

রাজা আরও বললেন - তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে ভাগবত পাঠ শুনবে, ব্রাহ্মণদের যথাযথ দান করবে, আর খুব সাবধানে কৃষ্ণের সেবা করে আহারাদি করবে, তুমি ছাড়া অন্যের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হবে না । এই বলে রাজা শিকারে গেলেন । এদিকে রাণী সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে পাশা খেলতে খেলতে কৃষ্ণ পূজার কথা, ব্রাহ্মণদের দানধ্যানের কথা, পুরাণ শোনার কথা সব ভুলে গেলেন, আর এসব না করেই খাওয়া সেরে শুতে চলে গেলেন ।

'কৃষ্ণ সেবা মনে পড়ে রাণীর তখন ।'

কৃষ্ণ সেবার কথা রাণীর মনে পড়তেই কপাল চাপড়ে 'হায় হায়' করতে লাগলেন। শিকার শেষে সন্ধ্যা বেলায় রাজা ফিরে এসে রাণী বল্লভাকে জিজ্ঞাসা করলেন - কৃষ্ণের সেবা কিরকম করলে? ব্রাহ্মণদের কত ধন দান করলে ? ভরতপুরাণ কত অধ্যায় শুনেছো, আর কখনই বা জলপান করলে ?

এই শুনে রাণী জোড় হাত করে রাজাকে বল্লেন - আমি তোমায় মিথ্যা কথা বলবো না - পাশা খেলতে গিয়ে সব ভুলে গেছি, কৃষ্ণের পূজা, ব্রাহ্মণদের দানধ্যান, ভাগবত শোনা এ'সব কিছুই না করে ভোজন করে ফেলেছি ।

রাণীর এই কথা শুনে মহারাজা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে রাণীকে বললেন -

'জানা গেল পরম পাষন্ড তুই মাগী ।
সে পাপিষ্ঠ, যেবা নহে কৃষ্ণ অনুরাগী ।।' (৪৮২)

এই বলে রাজা রাণী বল্লভাকে বনবাসে বাল্মীকির আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন । রাণী মনের দুঃখে মুনি আর মুনিপত্মীদের সেবা করে দিন কাটাতে লাগলেন - এই ভাবেই দিন চলছে । অনেকদিন পর রাজা ধর্মপাল আবার শিকারে এসে হরিণের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে বাল্মীকির আশ্রমের কাছে এসে পড়লেন । সেখানে রাণী বল্লভার সঙ্গে রাজার দেখা হয়ে গেল, রাজাকে দেখে রাণী সসম্ভ্রমে জোড় হাত করে রাজার চরণ বন্দনা করলেন । রাজা ঘোড়া থেকে নেমে রাণীকে বললেন - আমি ক্ষুধায় কাতর, রান্না করে আমাকে কিছু ভোজন করাও । এই শুনে রাণী খুব আনন্দিত হয়ে বনসখী লীলাবতীকে বললেন - ইনিই আমার স্বামী, গৌড়ের অধিপতি । ভগবানের কৃপায় ইনি আজ শিকার করতে এসে এই আশ্রমে এসে পড়েছেন, আমাকে রান্না করতে বলেছেন, রাজা এখানেই খাবেন । এই শুনে লীলাবতী হেসে বললো - রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে তোমাকে বনবাসে পাঠিয়েছেন, সুতরাং তাঁকে 'ওষুধ' করে বশ করতে হবে । আর এই ওষুধের গুণে রাজা তোমার বশ হবেনই, এই বলে লীলাবতী রাণীর হাতে ওষুধের শিকড় এনে দিল, আর বললো খাবারের সঙ্গে এই ওষুধ মিশিয়ে দেবে । এই ওষুধের গুণে আজ থেকেই রাজা তোমার প্রতি প্রীত হবেন । রাণী ওষুধ নিয়ে চলে গেলেন এবং রাজার জন্য পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে পরিপাটি করে রাজাকে খেতে দিলেন কিন্তু ওষুধ মেশানো খাবার স্বামীকে দিতে পারলেন না ।

'অন্ন দিয়া মনেতে ভাবেন সুলোচনা । ঔষধ কি করে নাথে করাব ভোজন ।
আমাকে উচিত নহে এমন কল্পনা ।। প্রীত হৌক না হৌক ওষুধে কাজ নাহি ।।
আমি সতী সর্বকাল পতি পরায়ণ । এত বলি ঔষধান্ন খুল্যো এক ঠাঁই ।।' (৫৩৮)

রাণী বল্লভা ছিলেন নিষ্ঠাবান পতি পরায়ণা নারী, যে স্বামী তাঁকে বনবাসে পাঠিয়েছেন সেই স্বামীকে বশ করার জন্য ওষুধে স্বামীর যদি কোন ক্ষতি হয় সেই কথা চিন্তা করে তাঁকে ঔষুধান্ন না দিয়ে ভাল খাবার দিলেন, এবং সেই ওষুধ মেশানো খাবার (অন্ন) গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন, সেই হাঁড়ি ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে গিয়ে পড়লো । সমুদ্র (রত্মাকর) সেই হাড়ির মধ্যে অন্ন দেখে ভাবলেন জগন্নাথদেবের প্রসাদ, - আর প্রসাদ ভেবে সব অন্নই খেয়ে নিলেন । কিন্তু ওষুধান্ন খাওয়ার ফলে রত্মাকরের মন বল্লভার জন্য পাগল হয়ে উঠলো - তখন ধর্মপাল রাজার কলেবর ধারণ করে বল্লভার কাছে ছুটে এলেন । রাজারূপী রত্মাকরকে দেখে বল্লভাও খুব আনন্দিত হলেন । রাজারূপী রত্মাকর সেই রাত্রে আশ্রমে রাণী বল্লভার কাছে রইলেন । রাণী প্রথমে তাঁকে রাজা বলেই ভুল করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর ব্যবহারে বুঝেছিলেন ইনি মহারাজ ধর্মপাল নন -

'মনে মনে ভাবনা করেন রূপবতী । কি রূপে কি জানি কে এলো মায়াধরে ।
মায়া কর্যা আস্যাছে এ'নয় মোর পতি ।। সতীত্ব আমার নাশে প্রতারনা করে ।।' ৫৭৬

এই ভেবে রাণী তখন রাজারূপী রত্মাকরকে বললেন - তুমি কে? তোমার সত্য পরিচয় দাও । তুমি প্রবঞ্চনা করে আমার নারীত্ব হরণ করেছো, আমি তোমায় শাপ দেবো । রাণীর কথায় সমুদ্র ভয় পেয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন - আমি সাগর রাজ জলনিধি, আমায় অন্য কিছু ভেবো না, এটাই হয়ত বিধাতার লিখন ছিল, তবে তোমার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে হবে সুপুরুষ ভূবন বিখ্যাত মহারাজা, আর তোমাকে দিলাম সলিলের অধিকারী এবং বিধাতার কর জপ মালা ও বরুন কাটারি । এই দুটি জিনিষ তোমার ঘরে যত্ন করে রাখবে তাহলে কমলা তোমার ভবন ছেড়ে যাবেন না । আর একটি কথা এই কাটারির স্পর্শে মহাবান থেমে যাবে, আর তোমার বা তোমার বংশের কারও প্রয়োজনে এই জপমালা দেখে ভবানী স্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন । এই বলে সিন্ধু (সাগর) নিজের স্থানে ফিরে গেলেন । এরপর রানী বল্লভা যথা সময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন । সর্বসুলক্ষণ যুক্ত সন্তানের কপালে ছিল রাজদন্ড, আর আজানু লম্বিত বাহু । মুনিপুত্রদের সঙ্গে খেলা করে শিশু বড় হতে লাগলো । এই শিশুই গৌড়েশ্বর নামে খ্যাত হলেন।

(গ) গৌড়েশ্বরের রাজ্যভার গ্রহণ ঃ এদিকে বহুদিন রাজত্ব করার পর রাজা ধর্মপাল ইহলোক ত্যাগ করে স্বর্গধামে চলে গেলেন । রাণী বল্লভা এই সংবাদ পেয়ে পুত্র গৌড়েশ্বরকে নিয়ে গৌড়ে ফিরে এলেন । গৌড়েশ্বর গৌড়ের রাজ্যভার গ্রহণ করে রামের মত প্রজা পালন করতে লাগলেন, প্রজারা খুব সুখে দিন কাটাতে লাগল ।

'পাটে রাজা হইলেন গৌড়েশ্বর রায় ।
জগজনে তাহার যশের গুণ গায় ।।' (৬১৪)

'প্রজার পালনে রাজা রাম অবতার ।
রাজপীড়া নাহি দেশে কোন অবিচার ।।'

'নানা ধনে পরিপূর্ণ সবার আলয় ।
পুণ্য কথা ভাগবত প্রতিঘরে হয় ।।' (৬৪৪)

(ঘ) মহারাজ গৌড়েশ্বরের বিবাহ ঃ (এই ভাবে) মহাসুখে মহারাজ গৌড়েশ্বর রাজত্ব করছেন - এমন সময় বাঁশডিঞার ভূপতি বেণু রায় বাঁশুডিঞা ছেড়ে গৌড়ে চলে এলেন, তার কারণ ওখানে অনাবৃষ্টিতে দেশ প্রায় ছারখার হয়ে গিয়েছিল । তাই ভূপতি বেণু রায় রাজার কাছে এসে সব কথা নিবেদন করলেন -

'মহারাজা চক্রবর্ত্তী রাজা গৌড়েশ্বর ।
মহাসুখে রাজত্ব করেন বরাবর ।।
বাশডিঞা গড়ের ভূপতি বেণু রায় ।
জগজনে যাহার যশের গুণ গায় ।।'

দেশে হল দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি ।
পাপ যোগে মজে গেল বাশডিঞা সৃষ্টি ।।
দেশ ছাড়ি গোউড়কে গেলেন বেণু রায় ।
কহিলা সকল কথা ভূপতির পায় ।।' (৬৮৮)

মহারাজ গৌড়েশ্বর রমতিনগরে ঘরবাড়ী তৈরী করে ভূপতি বেণুরায়কে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন । বেণু রায় প্রীত হয়ে কন্যা ভানুমতির সঙ্গে মহারাজ গৌড়েশ্বরের বিবাহ দিলেন । রাজা শ্যালক মহামদকে মহামন্ত্রী পদে নিযুক্ত করলেন ।

'বাড়ি ঘর কৈল রাজা রমতি নগরে ।	'পাত্র হৈল মহামদ রাজার শ্যালক।
ভানুমতি কন্যা বিভা দিল গৌড়েশ্বরে।।	কুমন্ত্রী থাকিলে তুয়া দেশের কন্টক ।।' ৬৯২

(ঙ) রঞ্জাবতীর জন্ম বৃত্তান্ত এবং ধর্মরাজের পূজা প্রচারের ব্যবস্থা ঃ

একদিন বৈকুণ্ঠে ধর্মরাজ মায়াধরের সভা বসেছে। ধর্মরাজের বাহন উলুক জোড় হাত করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হনুমানও হাত জোড় করে সামনে বসে রয়েছে। সভায় হাস্য পরিহাস চলছে, নারদঠাকুর তানপুরা বাজিয়ে মৃদুসুরে গান ধরেছেন, এমন সময় প্রভু মায়াধর (ধর্মরাজ) হনুমানকে উদ্দেশ্য করে বললেন - সংসারে সবার ঘরে সব দেবতার পূজা হয় কিন্তু আমার পূজা হয় না কেন ? কি ভাবে আমার পূজা প্রচার হয় তুমি একটা উপায় বের কর।

'হেনকালে বলেন ঠাকুর মায়াধর ।	সংসারে আমার পূজা কেহ নাহি করে ।
মন দিয়া শুন কিছু পবন কুঙর ।।	পূজায় প্রচার মোর কোন রূপে হয় ।।
সব দেবতার পূজা সবাকার ঘরে ।	বিশেষিয়া বল দেখি পবন তনয় ।।' ৭০৮

প্রভু নিরঞ্জনের এই কথা শুনে হনুমান জোড় হাত করে বললেন - আমি তিন যুগ ধরে আপনার মহাপূজা দেখেছি, আপনার মহাপূজার গাজন করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র, লঙ্কার রাজা রাবণ, ভোজরাজ, যুধিষ্ঠির, কুশ দত্ত, বিশাই চন্ডাল, এবং মহারাজ হরিশচন্দ্র কিন্তু কলিতে আপনার পূজা প্রচারের জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, আপনাকে একবার ইন্দ্রের সভায় যেতে হবে, এবং ওখানে গিয়ে ইন্দ্রকে আদেশ দিয়ে বলবেন তিনি যেন অম্বুবতীকে নৃত্য করার জন্য আদেশ দেন, এই নৃত্যের সংবাদ শুনে কৈলাশ হতে ভগবতী নৃত্য সভায় আসবেন, ঐ সময় অম্বুবতী নাচের প্রস্তুতির জন্য গঙ্গা স্নান করতে যাবেন, পথের মধ্যে বৃদ্ধা ভগবতীর সঙ্গে তার দেখা হবে, কিন্তু অম্বুবতী বৃদ্ধাবেশী ভগবতী শঙ্করীকে চিনতে না পেরে পথ ছাড়বে না। তখন ভগবতী নর্ত্তকীকে শাপ দেবেন। শাপ ভ্রষ্টা হয়ে নর্ত্তকী অম্বুবতী মর্তে রমতি নগরে বেণু রায়ের কন্যা রঞ্জাবতী নাম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করবে, এবং বৃদ্ধরাজা কর্ণসেনের সঙ্গে তার বিবাহ হবে তখন পুত্র কামনায় রঞ্জাবতী চাপায়ে গিয়ে আপনার (ধর্মরাজের) পূজা করবে এবং 'সালে ভর' দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করবে, সে সময় আপনি তাঁকে প্রাণদান করে পুত্রবর দেবেন আর কাশ্যপ নন্দনকে মর্তে পাঠাবেন, তিনি রঞ্জাবতীর গর্ভে লাউসেন নামে জন্মগ্রহণ করবেন। ঐ ছেলের বিপদে আপদে আপনি সদাসর্বদা তার সপক্ষে থাকবেন। লাউসেনের মাতুল মহামদ সর্বদাই তাঁকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। মাতুলের চক্রান্তে পশ্চিমে সূর্য উদয় দেখাবার জন্য হাকন্ডে গিয়ে লাউসেন আপনার পূজা করবেন। আপনার বরে কয়েক দন্ডের জন্য পশ্চিমে সূর্যের উদয় হলে চারদিকে ধর্মপূজায় পরিপূর্ণ হবে। এই বলে হনুমান ধর্মরাজকে বললো ভবিষ্যতের সব কথা আপনার পায়ে নিবেদন করলাম। ধর্মরাজ অঞ্জনা নন্দনের (হনুমানের) এই সব কথা শুনে বৈকুণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে তিনি ইন্দ্রের সভায় যাবেন, তার জন্য রথ সাজাতে বললেন। পক্ষীরাজ ঘোড়ার রথে চেপে ধর্মরাজ নিরঞ্জন ইন্দ্রপুরির দিকে যাত্রা করলেন। রথের সামনে ব্রহ্মঋষিরা স্তব করতে করতে যেতে লাগলেন - পবন নন্দন হনুমান নিজে চামরের বাতাস দিতে দিতে এগুতে লাগলেন, আর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা রথের

আগু আগু অগ্রসর হলেন ।

নিমেষের মধ্যে ঠাকুর নিরঞ্জন (ধর্মরাজ) ইন্দ্রপুরিতে পৌছে গেলেন, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা আনন্দ চিত্তে তাঁকে অভিবাদন করে রত্ন সিংহাসনে বসালেন । ঠাকুর নিরঞ্জন ইন্দ্রকে বললেন - নর্ত্তকী অম্বুবতীর নাচ দেখার জন্য এসেছি । তুমি নৃত্যের আয়োজন কর । এই শুনে ইন্দ্র আনন্দচিত্তে অম্বুবতীকে ডেকে-বললেন - ধর্মরাজ এখানে এসেছেন তোমার নৃত্য দেখার জন্য, তুমি শীঘ্র আয়োজন কর । এই কথায় অম্বুবতী খুব আনন্দিত হয়ে নৃত্যের প্রস্তুতি নিতে স্নান করতে গেলেন। এদিকে ইন্দ্রের ভবনে নৃত্য হবে শুনে দেবতারা এবং দেব নারীরা ইন্দ্রপুরীর দিকে চললেন, কৈলাশে ভগবতী নৃত্যের কথা শুনে সিংহযানে ইন্দ্রের ভবনের দিকে রওনা হলেন। অম্বুবতী স্নান করতে যাবার পথে স্নান ঘাটের কাছেই ভবানীর দেখা, ভবানী মনে মনে ভাবলেন অম্বুবতীকে শাপান্তর করে মর্তে পাঠাতে হবে তখনই মর্তে ধর্মপূজা প্রচলিত হবে, এই ভেবে ভবানী বৃদ্ধার বেশ ধরলেন, গায়ের চামড়া যেন আলগা হয়ে গেছে, সব চুল পাকা যেন চোখে ভাল দেখতে পান না । এই রকম ভান করে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলছেন । অম্বুবতী বৃদ্ধা-বেশী ভবানীকে বললো - পথ ছেড়ে দে বুড়ি, আমি ইন্দ্রপুরে নৃত্য করতে যাবো, তাই তাড়াতাড়ি স্নানে যাচ্ছি । এই শুনে বৃদ্ধাবেশী ভবানী বললেন - দেখতে পাচ্ছিস্ না, আমি অন্ধ, চোখে ভাল দেখতে পাই না, তুই তো চোখের মাথা খাস নাই, তুই যৌবন গরবে আমাকে এভাবে বললি, যৌবন মানুষের বেশী দিন থাকে না, তুই যৌবনের এত অহংকার করিস্ না, অম্বুবতী তখন বললো- বুড়ীমাগী পথ ছেড়ে দে, আমি স্নানে যাবো, এই বলেই বৃদ্ধা-বেশী ভবানীকে প্রায় ডিঙ্গিয়ে অম্বুবতী জলে ঝাঁপ দিয়ে স্নান সারতে গেল । ভবানীর গায়ে তার পায়ের ধূলোও লাগল । ভবানী অম্বুবতীর এই আচরণ দেখে তাকে শাপ দিলেন । কিন্তু অম্বুবতী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে স্নান সেরে, নানা পোষাকে সজ্জিত হয়ে, অঙ্গে নানা আভরণ পরে, পায়ে নূপুর পরে, গায়ে অগুরু চন্দন মেখে, গলায় চাঁপার মালা পরে বাজনার দলবল নিয়ে ইন্দ্রের ভবনের দিকে যাত্রা করল । কিন্তু ঘর থেকে বের হবার সময়েই বাড়ীর ঈশান কোণে টিকটিকি ডেকে উঠল এবং বাড়ীর বাইরেই দেখল একটা কাল সাপ । এই সব অমঙ্গল দেখে অম্বুবতী বিষন্ন মনে ইন্দ্রের নৃত্য সভায় উপস্থিত হল । সেখানে প্রভু নিরঞ্জনকে জোড়হাতে প্রণাম করে একে একে সব দেবতাদের বন্দনা করলো । তারপর অপরূপ সাজে নানা বাজনার তালে তালে অপূর্ব নৃত্য কলা দেখাতে লাগল । নাচ দেখে দেবতারা সব মোহিত ।

'পাঁচতালে মিশালো রসাল গান গীত । মুখে ঢাকা বসনে কটাক্ষ করে চান ।
নাচেন ত্রিভঙ্গ ঠায়ে দেবতা মোহিত ।। হাত নাড়া সঘন বসন পাক দিয়া ।।
আগু পাছু হয়ে মন্দ মন্দ চলে যান । শুনিতে সুন্দর ধ্বনি তাথেয়া তাথেয়া।। ৮৬০

কিন্তু এই নৃত্যেরই মাঝে অম্বুবতীর মন বিচলিত হয়ে উঠল । তার নাচের তাল কেটে গেল । তখন হনুমান খুব তিরস্কার করে উঠল - বললো, দেব সভায় নাচতে এসে বিচলিত হয় কেন মন, তবে এ তোর দোষ নয়, নটী জাতিই নির্লজ্জ, তাদের কোন স্থান কাল পাত্রের জ্ঞান নাই, এ তোদের যৌবনের দোষ । অম্বুবতী তখন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে প্রভু নিরঞ্জনের (ধর্মরাজ) পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল । কিন্তু ঠাকুর নিরঞ্জন বললেন,

আমার কিছু করার নেই, দেবী ভবানী তোমাকে শাপ দিয়েছেন, তুমি কৈলাশে দেবী ভবানীর কাছে যাও। এই বলে ঠাকুর বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন। ঠাকুর নিরঞ্জনের কথা মত অম্বুবতী কৈলাশ শিখরে গিয়ে দেবী ভগবতীর পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন । দেবী ভগবতী অম্বুবতীকে দেখে বললেন - তুমি যৌবন গরবে আমাকে চোখে দেখতেই পাও নাই, আমাকে অবজ্ঞা করে স্নানে চলে গেলে, তোমার পায়ের জল আমার গায়ে লাগলো । যাই হক্ আমার বাক্য তো ব্যর্থ হবার নয়, তোমাকে মর্তে জন্ম গ্রহণ করতেই হবে । দেবী বলছেন -

'চক্ষে নাহি দেখেছিলে যৌবন গরবে । বেণু রায় নামে রাজা রমতি নগরে ।
মোর বাক্য ব্যর্থ নহে, জন্ম গিয়া ভবে ।। তার কন্যা হয়ে জন্ম মন্থরা জঠরে ।।'

এবং আরও বললেন ওখানে তোমার নাম হবে রঞ্জাবতী, তবে আমাকে বুড়ী দেখে তাচ্ছিল্য করে হেসেছিলে, তাই তোমার বৃদ্ধ বরে বিয়ে হবে । সাত জন্মের পর তুমি পুত্রবতী হবে । এর জন্য প্রথম পাঁচ জন্ম যোগ সাধন করে জীবন ত্যাগ করবে, ষষ্ঠ জন্মে মন্থরার গর্ভে মানবীরূপে রঞ্জাবতী নামে জন্মলাভ করবে, তারপর পুত্র কামনায় ধর্মরাজের পূজায় 'সালেভর' দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করবে । কিন্তু প্রভু নিরঞ্জন তোমার প্রাণদান করে তোমাকে পুত্র লাভ বর দেবেন । তুমি তখন 'লয়বাদিত্য' (লাউসেন) নামে পুত্র সন্তান লাভ করবে ।

দেবীর কাছে এই কথা শুনে আকাশ গঙ্গার ধারে গিয়ে অম্বুবতী যোগ সাধনা করে পাঁচবার দেহ ত্যাগ করার পর ষষ্ঠ বারে রমতি নগরে ভূপতি বেণু রায়ের স্ত্রী মন্থরার গর্ভে জন্ম নিতে গেলেন । দশমাস পরিপূর্ণ হলে রাণী মন্থরা একটি সুন্দর ফুটফুটে কন্যা রত্ন প্রসব করলেন। রাজা বেণু রায় ও রাণী মন্থরা খুব আনন্দিত হলেন । কন্যার রূপের ছটায় তাঁদের ঘর যেন সব সময় আলোকিত হয়ে থাকে । রাজা তাঁর কন্যার নাম রাখলেন রঞ্জাবতী । প্রসূতির পাঁচদিনে পাঁচুটে গেল, ন'দিনে স্নান আর একুশদিনে ষষ্ঠীপূজো করে আঁতুর শেষ হল । কন্যা দিনে দিনে বড় হতে লাগলো । সখিদের সঙ্গে খেলা করে দিন কাটায় ।

'নানা খেলা সতত লইয়া সখিগণ ।
কন্যা দেখে রাজা রাণী উল্লসিত মন ।।' (৯২০)

দুই

আদ্য ঢেকুর পালা

(ক) সোম ঘোষকে ঢেকুরের খাজনা আদায়ের দায়িত্ব প্রদান ঃ

রাজ গৌড়েশ্বর দরবারে বসেছেন, মন্ত্রী মহামদ তাঁর বাঁদিকে বসে, সামনে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা, গায়কেরা গান ধরেছেন, বারভূঞ্যা সব জোড়হাত করে আছেন, ভাঁড়রা নৃত্য করে নানা গান ধরেছে। এমন সময় রাজার শিকারে যাবার ইচ্ছা হল, বললেন - আজ আমি শিকারে যাবো। সঙ্গে সঙ্গে মাহুত হাতি সাজিয়ে নিয়ে এলো। রাজা হাতির পিঠে চেপে শিকারের জন্য বের হলেন - রাজার পিছু পিছু শত শত নফর, চাকর, ঢাল-তলোয়ার নিয়ে চললো, শিকারী কুকুরকেও সঙ্গে নিল।

সিংদরজা পার হতেই রাজার বন্দীশালের দিকে দৃষ্টি পড়ে গেল - রাজা দেখলেন বন্দীশালে রয়েছে অন্নহীন, মলিনবসন, পায়ে বেড়ী দেওয়া অনেক বন্দী, তাদের দেখে রাজার খুব কষ্ট হল। রাজা একে একে সব বন্দীদের সংবাদ নিয়ে তাদের বেড়ী কেটে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে মুক্ত করে দিতে বললেন। এমনি এক বন্দীর কাছে এসে তার নাম ধাম এবং কেন সে বন্দী হয়ে আছে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ঐ বন্দী বললো - আমার নাম সোম ঘোষ, আমি গোয়ালার ছেলে, আমাদের বাড়ি ভাগীরথীর দক্ষিণে বালিঘাট নামক স্থানে। আমার কিছু খাজনা বাকি পড়ে, তার কারণ মন্ত্রীমশাই পূর্বের চেয়ে খাজনা এখন চারগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন, হাজা শুখা কিছু ছাড় নাই, তবুও গরুবাছুর বেচে অনেক খাজনা শোধ দিয়েছি, অল্প কিছু বাকি থাকার জন্য আমার এই দশা। আমি এভাবে বন্দী থাকায় অন্নাভাবে বৃদ্ধ মা - বাবা, ভাই, ভাইপো সব মারা গেছে। বন্দীর এই কথা শুনে রাজা রেগে আগুন হয়ে মন্ত্রী মহামদকে ভীষণ তিরস্কার করে বললেন - দেশে এত অবিচার কেন, তুমি কার কথায় লোকের ওপর এত অত্যাচার করেছো, তোমার জন্য গৌড়ের সুনাম নষ্ট হচ্ছে, এই সব বলে রাজা সোম ঘোষের বেড়ী কেটে দিয়ে তাকে ঘোড়া জোড়া দিয়ে বিদায় করলেন। এরপর রাজা নিজে খাজাঞ্চিকে ডেকে জানতে থাকেন কার কত কর বাকি আছে তখন খাজাঞ্চী বলতে থাকেন কার কত কর বাকি। বললেন - ত্রিষষ্টের (ঢেকুর) সামন্তরাজ কর্ণসেনের বাৎসরিক খাজনা তিন লাখ, ছ'বছরের খাজনা বাকি। তার মধ্যে মাত্র পাঁচলাখ উসুল দিয়েছেন, তাই পিছুকার সালের বাকী রয়েছে তের লাখ। আর হাল সালের আট মাসের ধরে একুনে (মোট) পনের লাখ বাকি পড়েছে। এই শুনে রাজা মন্ত্রী মহামদকে বললেন - এই কর আদায়ের কি ব্যবস্থা নিয়েছো ? এখন কি ভাবে খাজনা উসুল করবে তার উপায় স্থির কর।

মন্ত্রী মহাপাত্র রাজাকে বললেন - সোম ঘোষকে ত্রিষষ্ঠ গড়ের খাজনা আদায়ের মালিকানা দিয়ে কর্ণসেনের কাছে পাঠান, সোম ঘোষ প্রজাদের কাছে গিয়ে খাজনা আদায় করবে, আর কর বাকী থাকবে না। রাজা মন্ত্রী মহাপাত্রের কথা মেনে নিয়ে কাগজে লিখে শীল মোহর (ছাপ) দিয়ে সোম ঘোষকে কর্ণসেনের কাছে পাঠালেন। সোম ঘোষ ত্রিষষ্ঠগড়ের খাজনা আদায়ের ভার পেয়ে সেই লেখা কাগজ নিয়ে গৌড় থেকে ত্রিষষ্ঠের (ঢেকুরের) দিকে রওনা হল। গৌড় থেকে ত্রিষষ্ঠগড় প্রায় আশি ক্রোশ দূরে অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। সোম ঘোষ

সপরিবারে ত্রিষষ্ঠগড়ে গিয়ে পৌছালেন । খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে গৌড়েশ্বর সোম ঘোষকে পাঠিয়েছি - এই সংবাদ শুনে কর্ণসেন ছয় পুত্রসহ সোম ঘোষের সাথে দেখা করতে গেলেন । উভয়ে কোলাকুলি আর পাগড়ী বদল করে মিত্রতা স্থাপন করলেন, সোম ঘোষকে বসবাসের জন্য ভাল ঘর দিলেন । দেশ জমি দেখে সোম ঘোষেরও খুব আনন্দ হল এবং কর্ণসেনকে বললেন - আপনার অনেক টাকা কর বাকী পড়েছে । তার জন্য গৌড়েশ্বর খুবই অসন্তুষ্ট । আর সেই কারণেই আমাকে ত্রিষষ্ঠগড়ের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন । এই শুনে কর্ণসেন বললেন - গত সালে শুখাতে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, প্রজারা খাজনা দিতে পারে নাই । তবে খুবই ভাল হয়েছে, রাজা যখন এই রাজ্য দেখাশোনার ভার আপনাকে দিয়েছেন । আপনি নিজে প্রত্যক্ষ করে দেখুন । সোম ঘোষ জনে জনে, ঘরে ঘরে গিয়ে ছ'মাসের কর দশ দিনে আদায় করে আনলেন । গৌড়েশ্বরও খুব খুশি হলেন । গৌড়েশ্বর তখন সোম ঘোষকে পাকাপাকি ভাবে ত্রিষষ্ঠগড়ের দেওয়ান করে দিলেন । সোম ঘোষের জন্য ভাল ঘর বাড়ী তৈরী হল, নানা ধনে তার ঘর সংসার পরিপূর্ণ হল । পরম আনন্দে সোম ঘোষের দি" অতিবাহিত হতে থাকে । কিন্তু তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় মনে একটা অশান্তিও বয়ে চলে ।

(খ) পুত্রার্থে সোম ঘোষের দেবী ভগবতী জয়দুর্গার আরাধনা ও পুত্র লাভ ঃ

সোম ঘোষ ব্রাহ্মণ পন্ডিত ডেকে এনে বললেন - আপনারা বিচার করে বলে দিন, কোন দেবী বা দেবতার আরাধনা করলে পুত্র সন্তান লাভ করা যায় । পন্ডিত মশাই পুরাণ পাঠ করে সোম ঘোষকে শুনালেন যে - গোবিন্দের পূজা করলে মুক্তি লাভ করা যায়, সূর্যের পূজা করলে শরীর নিরোগ থাকে । মহেশ্বরের সেবাপূজা করলে জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, আর দুর্গতি নাশিনী, সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী, শ্রীশ্রী সর্বমঙ্গলা জয়দুর্গার পূজা করলে সর্বত্রজয় হয়, ধন পুত্র লক্ষ্মী তার ঘর ছেড়ে যান না । পন্ডিতের মুখে এই কথা শুনে যে মহাবিদ্যা জপ করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সিদ্ধলাভ করে ছিলেন, সোম ঘোষ সেই মহাবিদ্যা জপ করে আনন্দ সহকারে দেবী ভগবতী জয় দুর্গার মহাপূজা করতে লাগলেন ।

'মহাবিদ্যা জপে গোপ বর্ণ একাক্ষর । মহাপূজা আনন্দে করেন সোম ঘোষ ।
যে বিদ্যা জপিয়া সিদ্ধ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর ।। ভক্তি ভাব দেখে ভগবতীর সন্তোষ ।।'
(১৭১)

সোম ঘোষের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবতী কৈলাশ ত্যাগ করে মর্তে এলেন ।

'মন্ত্রের অধীন দেবী মন্ত্ররূপা হন ।
কৈলাশ ত্যজিয়া কৈল মহীতে গমন ।। (১৭৪)

দেবী সোম ঘোষকে বললেন তোমার পূজায় আমি সন্তুষ্ট, তুমি বর প্রার্থনা কর -

'ভবানী বলেন বাছা মেগে লহ বর ।।'

সোম ঘোম দেবীর চরণে লুটিয়ে পড়ে দু'হাত জোড় করে জানালেন - যদি কৃপা করে দেখা দিলে মা, জন্ম জন্ম ধরে তোমার দয়া থেকে যেন বঞ্চিত না হই । আমার ঘর ধনে পরিপূর্ণ, কিন্তু ঘরে পুত্র নাই । পুত্র ছাড়া ঘরবাড়ির কোন শোভা নাই, তাই মা, আমায় একটি পুত্রবর দাও। দেবী ভবানী বললেন তোর ভক্তিতে আমি তুষ্ট, তাই বর দিনু তোর সুবংশধর হবে, আর সে

এই গড়ের রাজা হবে, সেই পুত্রের নাম রাখবি আমার সাধের নাম 'ইছাই' । এই বলে ভবানী কৈলাশ গমন করলেন । মহানন্দে সোম ঘোষ অন্দর মহলে গিয়ে স্ত্রী রমাকে সব বললেন, স্ত্রীরও মনে খুব আনন্দ । যথা সময়ে সোম ঘোষের একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলো - তার কপালে রাজদন্ড, অঙ্গুলে দশচক্র । ভবানীর ইচ্ছা আনুসারে পুত্রের নাম রাখা হল 'ইছাই' ।

ছেলে বড় হলে সোম ঘোষ নানা অস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ করে তুললেন । ইছাই প্রথম থেকেই ছিল আত্মগম্ভীর, অহংকারী কিন্তু ভবানীর সাধক । তাই রাত দিন মনে চিন্তা করে ভবানীর পূজা করে নিজে স্বতন্তর রাজা হবো ।

'রাত্রে দিনে মনে চিন্তে গোয়ালা কুমার ।
ভবানীর পূজা করে নিব রাজ্য ভার ।।'

স্বতন্তর রাজা হব মনে অনুমান ।
ধর্মের মঙ্গল বসু নরসিংহ গান '।। ২১৮

(গ) ইছাই এর দেবী দশভুজা শ্যামারূপা দুর্গার পূজা আরাধনা ও ঢেকুর গড়ের স্বতন্তর রাজা হওয়ার বর লাভ ঃ ঢেকুরগড়ের স্বাধীন রাজা হবার মানসে ইছাই নানা উপকরণে ও ষোল উপচারে দেবী দশভুজা শ্যামারূপা দুর্গার পূজার ব্যবস্থা করলেন —

'শ্যামারূপা সিদ্ধ পাঠ ত্রিষষ্ঠের গড়ে ।
ইছাই পূজেন শ্যামা চমৎকার পড়ে ।।
ঢোল বাজে দামামা নিনাদ দুর দুর ।
শানি বাজে সুন্দর শুনিতে সুমধুর ।।'২২২

'পুষ্পপাত্রে নানা ফুলে কেশর কাঞ্চন।
জাতি যুথি জবা চাঁপা টগর রঙ্গন ।।
বকুল মাধবীলতা মল্লিকা কমল ।
করবী কেতকী কুন্দ শ্রীফলের দল।।'২৪০

'জগঝম্প গমকে ঠমকে পড়ে কাঠি ।
রণসিংহা তেঘাই বাজনা পরিপাটি ।।'২২৬
'ব্যালিশ বাজনা বাজে দেবীর সম্মুকে ।
পূজা আয়োজন সব করেন কৌতুকে।। ২৩০
কালিকাপুরাণ মত ষোল উপচারে ।
গোয়ালার মানস পূজিব অভয়ারে ।।
অগুরু চন্দন চুয়া নানা উপহার ।
ক্ষীর চিনি ছানা লাড়ু বিশাশায় ভার ।।'২৩৪

'ছয় রসে পরিপূর্ণ সুবর্ণের থালা ।
পরিপাটি নৈবেদ্য জ্বলিল দীপমালা ।।
ধুপ ধূনা অন্ধকার দিবসে রজনী ।
ভক্তি ভাবে ইছাই পূজেন ত্রিণয়ণী।।' ২৪৬
'মহাবিদ্যা জপ করে গোয়ালা নন্দন ।
যে মন্ত্র জপিয়া সিদ্ধ হরি পঞ্চানন ।।'
'অঙ্গ বলিদান দিল গোয়ালা তনয় ।
দেবগণ দেখিয়া অন্তরে পেলো ভয় ।।'২৬০

ইছাই-এর পূজা দেখে পার্বতী পরম আনন্দিত হলেন, কৈলাশে পদ্মাকে বললেন - বরপুত্র ইছাই আমার পূজা করছে, চল ইছাই-এর ঘরে পূজা নিতে যাই । এই বলে দেবী অভয়া সিংহযানে শ্যামারূপা হয়ে ইছাই এর কাছে অধিষ্ঠান হয়ে ইছাইকে বর চাইতে বললেন ।

'পূজা দেখে পার্বতীর পরম পিরিত ।
কৈলাশে করেন যুক্তি পদ্মার সহিত ।।
বরপুত্র ইছাই আমার পূজা করে ।

পূজা নিতে যাই চল গোয়ালার ঘরে ।।
সিংহযানে শ্যামারূপা হয়ে অধিষ্ঠান ।
বর মাগ ইছাই বলেন বিদ্যামান ।।' ২৭২

সাক্ষাৎ ভবানীকে সামনে দেখে ইছাই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে জোড় হাতে স্তব করতে লাগলেন —

'দুঃখহর জগন্মাতা সর্বভূতাধার । বুদ্ধি রূপা হৃদয় বাসিনী নমস্তুতে ।।'(২৮৬)
মহীজল রূপা তুমি ব্যাপিনী সংসার ।।'২৮২ 'সর্বার্থ সাধিকা শিবা মঙ্গল রূপিনী ।
'নানা শাস্ত্র রূপা বিদ্যা ত্রিরূপা জগতে ।। শরণ্যে এ্যম্বকে গৌরী নমো নারায়ণী ।।'২৯০

ইছাই -এর স্তবে তুষ্ট হয়ে ভবানী বললেন - তুমি বর চাও ইছাই । ইছাই জোড়হাত করে নিবেদন করলেন - মা, আমাকে এই গড়ের স্বতন্তর রাজা করে দাও । তখন -

'ভবানী বলেন আমি দিনু এই বর ।
এ গড়ের রাজা তুমি হইলে স্বতন্তর ।।' (৩০০)

এবং ভবানী আরও জানালেন -

'বাড়িবে অজয় নদী বিপক্ষ দেখিয়া ।
রাজত্ব করহ সুখে আনন্দে বসিয়া ।।' (৩০৪)

আর আজ হতে এই 'ত্রিষষ্ঠ' গড়ের নাম হল 'ঢেকুরগড়' । এই বলে দেবী ইছাই-এর মন্দিরে গিয়ে বসলেন -

"দেউলে বসিল দেবী আনন্দিত মনে" (৩১০)

ইছাই দেবীর শক্তি পরীক্ষা করার জন্য বলিদান স্থানের বীর মাটি নিয়ে একটা ইঁদুরের গায়ে ছড়িয়ে দেন, বীর মাটির প্রভাবে ঐ ইঁদুর এত শক্তিমান হয়ে উঠলো যে, তাকে দেখে বিড়াল প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল । এই দেখে ইছাই-এর মনের প্রত্যয় বেড়ে গেল ।

(ঘ) ইছাই-এর রাজ্যভার গ্রহণ ঃ

দশভুজা শ্যামারূপা ভগবতীর বর পেয়ে ইছাই সারা ঢেকুর অঞ্চলে ঢোল-কাঁড়া বাজিয়ে নিজেকে ঢেকুর গড়ের স্বতন্ত্র রাজা হিসাবে ঘোষণা করলেন । ইছাই -এর ভয়ে কেউ এর বিরোধিতা করলেন না, এমন কি কর্ণসেন যিনি এই ত্রিযষ্ঠ (ঢেকুর) গড়ের রাজা ছিলেন তিনিও প্রতিবাদ করার সাহস দেখালেন না ।

নির্বিঘ্নে ঢোল সহরত হয়ে যাবার পর শুভ দিন দেখে ইছাই ঢেকুরের সিংহাসনে বসলেন । কপালে রাজটীকা নিলেন, মাথাতে ছাতা ধরালেন ।

"দেখে অতি শুভক্ষণে বসিলেন সিংহাসনে
শিরে ছত্র ধরালো ইছাই ।
রাজটীকা নিল ভালে বার দেন যথা কালে
গোয়ালার দেশেতে দোহাই।।' (৩২৪)

সিংহাসনে বসার পর ইছাই নিজের প্রাসাদ তৈরীর দিকে মন দিলেন, সুন্দর রাজ প্রাসাদ তৈরী হল । প্রাসাদের ভেতরে ভাল ভাল ফুলের উদ্যান তৈরী হল । কিন্তু ইছাই শুধুমাত্র নিজের সুখ বিলাস নিয়েই মেতে রইল না । তার প্রজারাও যাতে সুখে বসবাস করতে পারে সেদিকেও

বিশেষ নজর ছিল ।

"দেশে নাই অবিচার　　　　　নিরন্তর সবাকার
ঘাট নাই মর্যদা আদরে ।
লোক সব সুখীময়　　　　　রাজপীড়া নাহি হয়
নাট গীত সবাকার ঘরে ।।' (৩৩৬)
'ভূম বিঘা আনা দর　　　　　বাড়া নাই রাজকর
প্রজা যেন রামের ভুবনে ।।' (৩৪২)

কিন্তু ইছাই এত প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠলো যে রাজা গৌড়েশ্বরকেও আর মানতে চাইলো না

'ইছাই প্রবল বড়　　　　　দেশেতে হুকুম দড়
নাহি মানে রাজা গৌড়েশ্বর ।' (৩৫৮)

ইছাই-এর এই বেপরোয়া ভাব দেখে ঢেকুরের রাজা কর্ণসেন তাঁর ঘরবাড়ী জমি জায়গা অপরকে বিলিয়ে দিয়ে প্রাণ ভয়ে সপরিবারে গৌড়ে চলে এলেন ।

'ইছাই বসিল পাটে　　　　　না জানি কখন কাটে
পরিবার সহিত আমাকে ।' (৩৬২)

'মনে যুক্তি কৈল সার ছেড়ে রাজ্য দেশভার ।　করি এই অনুমান ছেড়ে ঘর ধনধান।।
পালাব উচিত এ সময় ।।　　　　　রাজ্য পাট রতন মন্দির ।
যদিবা দেশেতে থাকি কার বাপে মোকে রাখি।　পরিজন সঙ্গে নিয়া দেশভূম পরে দিয়া।
গোয়ালাতে যদি প্রাণ লয় ।।　　　　　পালাইলা পরাণে অস্থির ।।' ৩৭২

(ঙ) গৌড় দরবারে কর্ণসেনের উপস্থিতি ঃ

রাজা গৌড়েশ্বর দরবারে বসেছেন, মন্ত্রী মহাপাত্র সামনে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে, বার ভূঞারা চারদিক বেষ্টন করে রয়েছেন, সিপাই সদ্দাররাও নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে । এক দিকে মন্দিরা মাদলের মৃদু শব্দের তালে তালে নর্ত্তকীরা নাচছে, আর অন্যদিকে ব্রাহ্মণ পন্ডিত মহাভারতের শকুনির চক্রান্তে পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ও পরিণামে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, বস্ত্র হরণ, আর দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁর লজ্জা নিবারণ, তারপর দ্রৌপদীসহ পঞ্চ পান্ডবের বনবাস গমনের বর্ণণা পাঠ করে সবে বই বন্ধ করেছেন এমন সময় ছয় পুত্র সহ ঢেকুরের রাজা কর্ণসেন দরবারে উপস্থিত হয়ে গৌড়েশ্বরকে সম্ভাষণ করে সকরুণে ইছাই ঘোষের অত্যাচার বর্ণনা করতে করতে বললেন - মহারাজ, আপনি সোম ঘোষকে ত্রিষষ্ঠ গড়ের (ঢেকুর) খাজনা আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন, সে ঠিকমত কাজ করছিল, আমারও অসম্মান করে নাই, কিন্তু পুত্র কামানায় ভগবতীর পূজা করে ইছাই নামে এক পুত্র লাভ করে,

সেই ছেলে বড় হয়ে ভবানীর পূজা করে স্বাধীন রাজা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেছে। কারও যোগ্যতা নাই তার সঙ্গে সংগ্রাম করে। সে আমার রাজ্যভুম কেড়ে নিয়েছে । আমি কোন রকমে প্রাণ নিয়ে আপনার কাছে পালিয়ে এসেছি ।

কর্ণসেনের কাছে ইছাই-এর অত্যাচারের কথা শুনে গৌড়েশ্বর রেগে গিয়ে বললেন - বেটা চাকর হয়ে এহেন কাজ করেছে । আমারই নুন খেয়ে আমাকেই না মানা, বর্বর গোয়ালাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে । এই বলে মহাপাত্রকে (মন্ত্রীকে) উপায় স্থির করতে বললেন ।

(চ) কর আদায়ের জন্য গঙ্গাধর ভাটকে ঢেকুর প্রেরণ ঃ

মহাপাত্র বললেন - মহারাজ এতে ভাবনা করার কিছু নাই, বর্বর গোয়ালা চিরকাল মাঠে গরুর রাখালি করেছে । এখন যদি সে হুকুম না মানে তাকে সাজা পেতে হবে । আপনি প্রথমে গঙ্গাধর ভাটকে দূত হিসাবে পাঠিয়ে সব কর মিটিয়ে দিতে বলুন, যদি দেয ভাল, নতুবা তাকে বলিদান দেবো । মন্ত্রীর যুক্তি রাজার বেশ পচ্ছন্দ হল, ভাট গঙ্গাধরকে ডেকে বললেন - অবিলম্বে তুমি ঢেকুরে গিয়ে সোম ঘোষের কাছে যত কর বাকি আছে আদায় করে নিয়ে এস। আর কতটাকা কর বাকি আছে সেরেস্তায় গিয়ে জেনে যাবে । রাজা গঙ্গাধরের হাতে সোম ঘোষকে একটা হুকুমনামা চিঠিও লিখে দিলেন ।

গঙ্গাধর রাজার হুকুম নামা নিয়ে অজয় নদীর তীরে ঢেকুরের দপ্তরে উপস্থিত হল, গঙ্গাধর ভাট এসেছে শুনে সোম ঘোষ প্রাসাদ থেকে দু'ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে দপ্তরে গঙ্গাধরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন । গঙ্গাধরের সঙ্গে সোম ঘোষের বহুদিনের সখ্যতা। দু'জনের কোলাকুলি হল । এরপর গঙ্গাধর সোম ঘোষের হাতে রাজার মোহর দেওয়া চিঠি দিয়ে বললো - রাজা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আপনার বকেয়া সব কর আদায় করে নিয়ে যাবার জন্য, আপনি বিলম্ব না করে সব কর মিটিয়ে দিন, নতুবা আপনার এই পদ আর থাকবে না । তাছাড়া এই দেশের রাজা কর্ণসেনকে লঙঘন করে আপনার ছেলে স্বঘোষিত স্বাধীন রাজ হয়ে তার ঘর বাড়ি ধন সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে - এই সব শুনে মহারাজ গৌড়েশ্বর রেগে আগুন হয়ে গেছেন, তার ওপর রাজকর না দিলে রাগ দ্বিগুণ হয়ে যাবে । তাই আপনার মঙ্গলের জন্য বলছি - বকেয়া কর তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিন ।

এই শুনে সোম ঘোষ বললেন - আমি রাজার নুন খাই, তাঁর কথার অমান্য করার সাধ্য আমার নাই । তবে একটা কথা শোন, সেন দেশটাকে লুটে পুটে খেয়েছিল, সে ছ'বছর রাজ কর দেয় নাই । এখন নিজের দোষ অন্যের মাথায় চাপিয়ে নিজেই ঘর বাড়ি ফেলে পালিয়ে গিয়ে আমার ছেলের অপযশ করছে । যাই হক এখানে ক'দিন তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আর খাওয়া দাওয়ার জন্য পঞ্চাশ মোহর দিচ্ছি । আমি খাজাঞ্জির কাছ থেকে কত কি বাকি আছে জেনে নিয়ে রাজকর মেটাবার ব্যবস্থা করছি - এই বলে সোম ঘোষ খাজাঞ্জিকে ডেকে বকেয়া রাজ করের হিসাব নিলেন এবং গঙ্গাধরকে বললেন - বছরে রাজার কর তিন লক্ষ টাকা, ছ'সনের বাকি হয় আঠারো লক্ষ টাকা, তার মধ্যে সাত লক্ষ উসুল দেওয়া আছে, তাই বাকি হয় এগার লক্ষ । এর মধ্যে হাজা শুকার জন্য বাদ ধরা হয়েছে ছয় লক্ষ। নীট বাকি দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষ। আর রাজা যদি ছ'মাসের কর বাকি রাখেন তাহলে প্রজাদের খুব সুবিধা হয়।

সে ক্ষেত্রে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিলেই সব শোধ হয়ে যায়। এই সব বুঝিয়ে সোম ঘোষ গঙ্গাধরকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা রাজকর আর সেলামি বাবদ তিনশ মোহর দিয়ে বিদায় দিলেন। গরুর গাড়ী করে গঙ্গাধর যেই গড়ের বাইরে গেছে প্রাসাদের ভেতর ইছাই-এর কাছে খবর পৌঁছে গেছে যে কর্ত্তা গঙ্গাধরকে কর মিটিয়ে বিদায় দিয়েছে। ইছাই তখন ঢাল খাড়া নিয়ে আর সেই সাথে প্রধান অনুচর লোহাটা বজ্জর ও গুহক চন্ডালসহ গঙ্গাধরকে ধাওয়া করলো। গড়ের বাইরেই ধরে ফেলে বললো - 'বেটাকে পিঠ মোরা দিয়ে বাঁধ, মাটিতে ফেলে পেটাও'। আর গঙ্গাধরকে বললো - শোন, কোন বেটা ঢেকুরের কর নিতে পারে। আমি এখানকার স্বতন্তর রাজা। ব্রহ্মার এ'দেশে কর নেবার অধিকার নাই। এই বলে গঙ্গাধরকে মাটিতে ফেলে লাথি জুতো মেরে সব টাকা কেড়ে নিল। গঙ্গাধর তখন দাঁতে কুটো দিয়ে বললো - আমাকে প্রাণে মেরো না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।

'ভাটকে বলেন কিছু ইছাই কুঙর।	লাথা লাথি মারিয়া নিলেক ধন কড়ি।
কোন বেটা নিতে পারে ঢেকুরের কর।	চড় মারে চাপড় গলায় দিয়া দড়ি।।
কেবা তোকে পাঠাইলা কেবা কর দেয়	জটে ধরে ভূমে পাড়ে ঘাড়ে দেয় কিল।
কার বা যোগ্যতা ঢেকুরের কর নেয়।।	মাথার উপরে কেহ তুলে মারে শিল।।৬১০
আমি স্বতন্তর রাজা কেবা আছে আর।	টানাটানি চারিদিক পড়িল বিপাক।
এদেশেতে ব্রহ্মার নাহিক অধিকার।।	দাঁতে কুটা করে বলে মোর প্রাণ রাখ'।।৬১৪

ইছাই গঙ্গাধরের কাছ থেকে ধন কড়ি কেড়ে নিয়ে তাকে খুব মারধোর করে বেঁধে রেখেছে শুনে ইছাই এর বাবা সোম ঘোষ সেখানে গিয়ে ইছাইকে জানাল - গৌড়ের মধ্যে গঙ্গাধর আমার একজন বিশেষ বন্ধু, তাছাড়া ও গৌড়রাজার দুত হয়ে এখানে এসেছে, তাই ভাটের তো কোন দোষ নাই, দূতকে বেঁধে রাখা হয় এমন কথা কোথাও শুনি নাই। ওকে শাস্তি দেওয়া কোন পৌরুষের কাজ নয়। তাই ওকে ছেড়ে দাও। বাবার কথায় ইছাই গঙ্গাধরকে ছেড়ে দিল। ছাড়া পেয়ে গঙ্গাধর গৌড় ফিরে গিয়ে রাজা গৌড়েশ্বরকে সব কথা জানিয়ে বললো - রাজার আজ্ঞায় সোম ঘোষ কর দিয়েছিল কিন্তু ওর ছেলে ইছাই পথে আমাকে মারধোর করে সব টাকা কড়ি কেড়ে নেয়। সে নিজে ঐ দেশের স্বাধীন রাজা হয়েছে। আমাকে খুব অপমান করেছে। আপনার কৃপায় আমি বেঁচে ফিরে এসেছি। এই শুনে গৌড় শিরোমণি রেগে আগুণ হয়ে কাঁপতে লাগলেন। যুদ্ধে যাবার জন্য দলবলকে সাজতে আজ্ঞা দিলেন।

'স্বতন্তর দেশে রাজা হয়েছে আপনি।
শুনে কোপে কম্পবান গৌড় শিরোমণি।।
দলবল সাজিতে বলেন নৃপবর।
ভনে নরসিংহ যার শাঁখারীতে ঘর।।' (৬৪৮)

(ছ) গৌড়েশ্বরের ঢেকুর-যুদ্ধ যাত্রা ঃ ইছাই প্রজা পালনে, একজন আদর্শ সামন্ত রাজা হলেও

রাজ আজ্ঞা পালনে ছিল স্বেচ্ছাচারী। নিজেকে স্বতন্তর রাজা হিসাবে ঘোষণা করে মূল রাজা গৌড়েশ্বরের দূতের কাছ থেকে তার বাবার দেওয়া করের টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে তাকে মারধোর করে নিজের ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়ে রাজা গৌড়েশ্বরের বিরাগ ভাজন হয়ে পড়লেন, রাজা নিজে ঢেকুর যুদ্ধ যাবার জন্য রণ সাজে সাজলেন।

'ঢেকুর মহিম হবে পড়ে গেল সাড়া। জয় ঢাক রগড় (চলিয়া) যার দূর ।।
রণ সিঙ্গা তেঘাই সঘন বাজে কাড়া।।' ৬৫০ আপনি সাজিল রণে গৌড়েশ্বর রায়।
'বরগো শানাই বাজে শুনিতে মধুর। মাহুতে সাজায়ে হাতি সম্মুখে যোগায়।।'৬৫৬

রাজা হাতির পিঠে চেপে ঢেকুর যুদ্ধের জন্য বের হলেন, সঙ্গে চললো ঢাল, তলোয়ার, তীর ধনুক, কাটারি, খঞ্জরসহ কয়েক হাজার সৈন্য, আর তার সাথে রাজার মামা, জ্যেঠা,খুড়ো, যুবরাজরা, গঙ্গাধর ভাট ও কয়েকশ চাকর খানসামা, আর ছয় পুত্রসহ রাজা কর্ণসেন ও মহাপাত্র। প্রথমে রাজার নিশান সহ হাতিদের দল, তারপর ঘোড়সোওরের দল, তারপর পদাতিক দল এইভাবে ন'লক্ষের দলবল নিয়ে রাজা গৌড়েশ্বর ঢেকুরের দিকে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। একে একে ভৈরবী-গঙ্গা, ব্রহ্মানী, ময়ুরাক্ষী, কোপাই পার হয়ে অজয়ের ধারে রাজার সৈন্য সামন্ত এসে পৌঁছালো। এ দিকে দেবী ভগবতীর বরে বিপক্ষ দল দেখে অজয় নদী সাত তাল হয়ে উঠলো।

'বিপক্ষ দেখিয়া নদী বাড়ে সাত তাল।
সবে বলে অকস্মাৎ এ'কোন জঞ্জাল ।।' (৭৭৪)

নদীর এই অবস্থা দেখে গৌড়েশ্বর মহাপাত্রকে বললেন - ঝড় বৃষ্টি নাই, এখন বর্ষা কাল নয়, যে নদীতে এক হাঁটু জল ছিল, সেই নদী সাত তাল কি করে হল। নদীর সাত তাল হবার আসল রহস্য কেউ জানতো না, তাই মহাপাত্র বললো জোয়ারে নদী বেড়ে গেছে। কালকেই নদী শুকিয়ে যাবে। আমরা নদী পার হয়ে ইছাইকে আক্রমণ করবো। আজকের মত এখানেই ছাউনী ফেলা হক্। এই বলে বিরাট জায়গা জুড়ে চক্রব্যূহের মত তাবু ফেলা হল। তাবুর মাঝখানে রাজার ঘর, তার সামনে মহাপাত্রের ঘর, পিছুতে খানসামোদের ঘর, ডানদিকে খুড়া, জ্যেঠা, বাঁদিকে মামা, সদর দুয়ারে হাসানের তাবু। আর তার চার দিকে সৈন্য সামন্তের বেড়া। এপাড় থেকে গৌড়েশ্বরের বিশাল বাহিনীর অবস্থান দেখে ঢেকুরের লোকজন সব পালাতে লাগলো। দেশ ভেঙ্গে যায় দেখে ইছাই সবাইকে বললো - তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা ঘরেই থাক। ভবানীর কৃপায় আমি যুদ্ধ জয় করবো। আর তার প্রধান অনুচর লোহাটাকে বললো - তুমি গড়ের দুয়ার আগলে থাকো, আমি শ্যামারূপা ভবানীর পূজা করে এসে শত্রুর ওপর হানা দেবো। এই বলে ইছাই শ্যামারূপার কাছে গেলেন পূজা করতে।

'এত বলি চলিলেন ইছাই কুঙর। গন্ধ, পুষ্প ধুপ দীপ নানা আয়োজন।
অবিলম্বে গেল শ্যামারূপার গোচর ।। একান্তে করেন পূজা অভয়া চরণ ।।'(৮১৮)

ইছাই পুষ্প গন্ধে ধুপদীপে শ্যামারূপা ভগবতীর আরাধনা করতে লাগলেন। মহাবিদ্যা জপ করার পর দেবী তাঁর সম্মুখে অধিষ্ঠান হয়ে বললেন - তোমার সঙ্গে বিবাদ করে কেউ

জয়লাভ করবে না। তুমি ঘরে বসে থাক তোমার অনুচর লোহাটাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যুদ্ধে যাবো। ভূপতির দলবলকে কেটে খন্ডবিখন্ড করবো।

'অধিষ্ঠান হয়ে দেবী বলেন বচন।
বিবাদ তোমার সঙ্গে করে কোন জন।।'(৮২২)
'চিন্তা নাহি ইছাই বসয়িা থাক ঘরে।
লোহাটার উপলক্ষে যাইব সমরে।।'
'ভূপতির দলবল কাটিব এখনি।
বহাব রকত নদী যাইব আপনি।।'(৮৩০)

ভবানীর এই কথা শুনে ইছাই লোহাটা বজ্জরে ডেকে দেবীর সব কথা বলে ও'কে যুদ্ধে পাঠালো - সঙ্গে গুহক চন্ডাল, বেয়াল্লিশ কোটাল, আরও অনেকে চললো যুদ্ধের সাজে, ঢাল, তলোয়ার, পিঠের উপর শরভরা তূণ নিয়ে। আর লোহাটাকে আশ্রয় করে চললেন দেবী ভবানী রণরঙ্কিনী রূপে। রাজার দলবলের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ বাঁধলো। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগলো।

"(অসুরের) রণ হৈতে হইল অধিক।
চারিদিকে হাতি ঘোড়া পলায় পাইক।।
আপনি ভূপতি ভয়ে ভঙ্গ দিল রণে।
অনাদ্যমঙ্গল বসু নরসিংহ ভনে।।" (৯৭০)

এদিকে গৌড়েশ্বরকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে কর্ণসেন হায় হায় করতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন আমার রাজ্য পাট কি ভাবে ইছাইকে ছেড়ে দেবো। তাই তিনি ছয় পুত্রকে নিয়ে যুদ্ধস্থলে উপনীত হলেন। লোহাটার সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ বাধলো। কর্ণসেনের তীরের আঘাতে লোহাটা মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। সেই সময় দেবী শ্যামারূপা নিজের হাতে তীর ধনুক তুলে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

'লোহাটা মুর্চ্ছিত শ্যামারূপার গোচরে।
যুঝিবারে অভয়া ধনুক নিল করে।।" (১০১০)

কর্ণসেনের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ হতে লাগলো, ইতি মধ্যে লোহাটার জ্ঞান ফিরে আসায় সেও লাফ দিয়ে উঠে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। একে একে কর্ণসেনের ছয় পুত্র লোহাটা বজ্জরের হাতে নিহত হল। সেই দেখে রাজা কর্ণসেন কাঁদতে কাঁদতে গাধার পিঠে চেপে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালালেন।

যুদ্ধে জয়লাভ করে লোহাটা কোটাল ইছাই -এর কাছে গেলে ইছাই তাকে আলিঙ্গন করে, শিরোপা দিয়ে পুরস্কৃত করলো। এদিকে কর্ণসেন গৌড়ে ফিরে গিয়ে ছয় পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিতেই ছয় পুত্রবধূ ও মহারাণী নিজে মুর্চ্ছিত হয়ে দেহত্যাগ করেন। সেই দেখে কর্ণসেন মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করে হরি ভজনার পরিকল্পনা করলেন। আর সেই জন্য পট্টবস্ত্র ফেলে বাঘছাল পরে, চুল দাড়ি রেখে, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, হাতে কমন্ডুল নিয়ে যোগী বেশে বৃন্দাবন, বারাণসী, হরিদ্বার এইসব তীর্থস্থান যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

তিন

রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা

কর্ণসেন যোগীবেশে তীর্থ ভ্রমণ আর তপস্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন, মনে বড় ইচ্ছা হয়েছে গোবিন্দের ভজনা করবেন, তার জন্য উপবাস করে কঠোর তপস্যা করবেন। আর মনে মনে ভাবলেন তার আগে গয়ায় গিয়ে বিষ্ণুপদে পিন্ডদান করবেন। এই ভাবে পথে যেতে যেতে রাজা গৌড়েশ্বরের কথা মনে পড়ল, ভাবলেন রাজার সঙ্গে খুবই সখ্যতা ছিল, তাই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই।

রাজা গৌড়েশ্বর দরবারে বসেছেন, বারভূঞারা হাতজোড় করে সামনে রয়েছেন, ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা পুরাণ পাঠ করছেন। গুণিগণ গান করছেন, পাত্র মিত্ররা ডাইনে বাঁয়ে বসে আছেন, আর সুন্দর সুন্দর দশজন নটী নৃত্য করছে। এমন সময় যোগীবেশে কর্ণসেন রাজ সভায় উপস্থিত হলেন। কর্ণসেনের যোগীরূপ দেখে সবাই হকচকিয়ে গেলেন। রাজা কর্ণসেনকে আলিঙ্গন করে জিজ্ঞাসা করলেন - তোমার এই বেশ কেন? তখন কর্ণসেন বললেন - ঢেকুরের যুদ্ধে আমার ছয় পুত্র নিহত হয়েছে, সেই শোকে পাটরাণী ও ছয় পুত্রবধূ আত্মহত্যা করেছেন। পুত্রশোক আমিও সহ্য করতে পারছি না, তাই সংসার ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছি তপস্যা করার জন্য। সংসারের সুখ দু'চার দিনের, গোবিন্দের ভজনা ছাড়া সবই মিছে।

'সংসারের সুখ রাজা দিন দুই চারি।
রসের পসরা যেন করয়ে পসারী।।'

'গোবিন্দ ভজন বিনা সব অকারণ।
ইহকালে পরকালে বন্ধু নারায়ণ।।'

কর্ণসেনের কথা শুনে রাজা মোহিত হয়ে গেলেন, বললেন, চলভাই আমরা দু'জনেই বনবাসে গিয়ে তপস্যা করবো। বারাণসীতে গিয়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে বিশ্বনাথের তপস্যা করবো। মহাদেব সাপক্ষ হলে আর কিছুই ভাবনা থাকবে না। এই বলে রাজা গৌড়েশ্বর রাজবেশ ত্যাগ করে যোগী বেশ ধারণ করলেন। সভার লোক জন রাজাকে যোগী বেশে দেখে চম্‌কে উঠলেন সবাই মুখ চাওয়া চায়ি করতে লাগলেন। মহাপাত্র ভাবলেন রাজা কি পাগল হয়ে গেলেন। রাজা রাজ্যপাট ছেড়ে যোগীবেশে বনবাসে যাচ্ছেন, এখন আমি কি উপায় করি! এই ভাবতে ভাবতে পাত্র বললেন - আমার একটি নিবেদন শুনুন, - রাজার ধর্ম প্রজা পালন করা, রাজা যদি দেশে না থাকে দেশে অরাজকতা দেখা দেবে। চোর ডাকাতের উপদ্রব বাড়বে। এতে প্রজাদের প্রতি অবিচার করা হবে, তাতে রাজার পাপ হবে। আর হরি সাধনা করতে হলে ঘরে বসেও করা যাবে। এই বলে গণেশ ও কার্ত্তিকের গল্পটা বললেন। পাত্রের কথা শুনে রাজা যোগী বেশ ত্যাগ করে কর্ণসেনকেও গৌড়ে থাকতে বললেন, তাঁকে ভাল ঘর বাড়ী দিলেন।

রাজসভা ভঙ্গ করে রাজা যখন ভিতর মহলে গেলেন, তখন রাণী ভানুমতি তাঁর ছোট বোনের সঙ্গে পাশা খেলছিলেন, রাজা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই রাজাকে দু'জনেই সম্ভাষণ করলেন। রাজা এর আগে রঞ্জাবতীকে দেখেন নাই, - তাই বললেন - এই মনমোহিনী অপরূপা উর্বশী কোথা থেকে এলেন, কার কন্যা ইনি, কোন দেশে ঘর, এঁর নামই বা কি ?

'এমন মোহিনী বালা রাণী কোথা পেলি।
নবীন কিশোর বর্ণ যৌবনের ডালি।।' ১৭৪

'ভানুমতি বলেন শুনহ মহাশয়।
ছোট ভগ্নী রঞ্জাকে এনেছি দিনকয়।।' ১৭৮

এই বালা তাঁর শালি হয় শুনে রাজা তখন পরিহাস করে বললেন- স্বামী ছেড়ে এখানে একা একা কেন, এই কথা শুনে রঞ্জাবতী লজ্জায় ঘরের কোণে গিয়ে লুকালো। রাণী ভানুমতি তখন বল্লেন - আমার বোনের এখনও বিবাহ হয় নাই। সেই শুনে রাজা আনন্দিত হয়ে রাণীকে বললেন - কর্ণসেন রঞ্জাবতীর যোগ্য পাত্র, কর্ণসেনের সাথে রঞ্জার বিয়ে দেবো। রাণী তখন বললেন - আমার ভাই দোজবরে কখনই বোনের বিয়ে দেবে না। এই কথা শুনে গৌড়েশ্বর রাণীকে জানালেন - যদি তোমার ভাই কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জার বিয়ে দিতে না চায় তাহলে তাকে কামরূপ পাঠাবো যুদ্ধ করতে। রাণী এই যুক্তিতে মত দিলেন।

পরের দিন দরবার বসল, রাজা কায়েস্থ খাজাঞ্চীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন দেশের কত কর বাকি আছে । খাজাঞ্চী খাতা পত্র দেখে রাজার হাতে কাগজ দিয়ে জানাল- কাঙুরের (কামরূপ-কামাখ্যা) রাজার কর বাকি আছে বিশ লাখ। এত বাকি দেখে রাজা রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তক্ষুনি মহাপাত্রকে ডেকে বললেন - কাঙুরেরের বিশ লক্ষ টাকা কর বাকি, তুমি কি টাকা খেয়ে কর আদায় করছ না। তোমার নিজের মঙ্গল যদি চাও, এখনি কাঙুরে গিয়ে কর আদায় করে নিয়ে এস। আর যদি কর না দেয় তাহলে তার মাথা কেটে নিয়ে আসবে। এই কথা শুনে মহাপাত্র সিপাই, সর্দ্দার, তীরন্দাজ, ঢালি, বন্দুকী, ঘোড়া, হাতি, পদাতি সব নিয়ে কাঙুর যাত্রা করলো। খানা খন্দর, নদী নালা, পাহাড় পর্বত, বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে, নানা বন্যজন্তু আসে পাশে দেখা গেল, তারপর গৌহাটীর কাছে গন্ডকী নদীর ধারে কাঙুরের রাজ বাড়ী দেখা গেল। কিন্তু শত্রুপক্ষ দেখে গন্ডকীর হাঁটু জল সাত তাল হয়ে উঠল, তার কারণ কাঙুরের রাজা কপূরধল কামাখ্যা দেবীর মহাসাধক ছিলেন। মহাপাত্রের দলবল নদীর এই অবস্থা দেখে ভাবল জোয়ারের জলে এই অবস্থা হয়েছে দিন তিনেকের মধ্যে জল কমে যাবে। তাঁই তারা নদীর ধারে তাবু ফেলে রইল।

এদিকে মহাপাত্র (রঞ্জাবতীর দাদা) কাঙুর যাত্রা করার পর রাজা গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে বিবাহের যুক্তি দিলেন। বললেন আমার সন্ধানে পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। তাকে বিবাহ কর, পুত্রের মুখ দেখে সব পাপ ক্ষয় কর। রাজার কথায় কর্ণসেন সম্মতি জানালে রাজা সঙ্গে সঙ্গে রাণীকে গিয়ে বললো যোগ্যকন্যা ঘরে রাখা উপযুক্ত নয়, কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জার বিবাহের ব্যবস্থা কর। রাণী এই বিবাহে সম্মতি জানাতেই রাজা গণক ডেকে বর কন্যার মিল গননা করে বিবাহের দিন স্থির করে ফেল্লেন।

কর্ণসেন রঞ্জার বিবাহের সংবাদে চারদিকে আনন্দের রোল পড়ে গেল, রঞ্জাবতীর বাবা বেণুরায় ও মা মন্থরা রাজ বাড়ীতে এলেন। সুন্দর ছন্দে নানাবিধ বাদ্যে গৌড়ের রাজ বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠল। মহাধুমধামে রঞ্জাবতী - কর্ণসেনের বিবাহ সুসম্পন্ন হল।

পরের দিন সকালে কর্ণসেন জোড় হাতে গৌড়েশ্বরের চরণ বন্দনা করে বিদায় চাইলেন । নৃপতি গৌড়েশ্বর জানালেন - তোমাকে বিদায় দিতে আমার মন একে বারেই সরছে না। কিন্তু বিদায় দিতেই হবে, তার কারণ শ্যালকের অজ্ঞাতে তোমার সাথে রঞ্জার বিয়ে

দিয়েছি। পাতর তার ছোট ভগ্নী রঞ্জাকে খুবই ভালবাসে। সে কাঙুর থেকে ফিরে এসে যদি শোনে বা দেখে আমি তোমার সঙ্গে রঞ্জার বিয়ে দিয়েছি তাহলে সে অনর্থ বাঁধাবে। তাই তোমাকে আমি ওড়িষ্যার ময়না (ময়না বর্তমানে মেদিনীপুরের অন্তর্গত) নগরে পাঠাব। আর তোমাকে সেই দেশের অধিকার দিচ্ছি। তুমি রামের সমান সেখানে প্রজা পালন করবে। বৎরান্তে একবার রাজ কর দেবে। এই বলে গৌড়েশ্বর কর্ণসেন ও রঞ্জাকে নানা বসন ভূষণ অলঙ্কারাদি দিয়ে বিদায় জানালেন। কর্ণসেন শ্বশুর, শাশুড়ী, রাণী ভানুমতী ও অন্যান্য সকলের কাছে বিদায় চাইলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী, রাণী ভানুমতী নানা ভূষণে ভরিয়ে দিলেন, বিদায় বেলায় মা-বাবা, মেয়ে, দিদি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু উপায় নাই চিরাচরিত নিয়ম এই বিষাদের মধ্যেই মেয়েকে স্বামীর ঘরে যেতে হয়, তাই নবদম্পতিকে গৌড় থেকে ময়নার উদ্দেশ্যে শুভক্ষণে যাত্রা করতে হল -

'শুভক্ষণে বরকন্যা চড়িল দোলায়।
ভৈরবী গঙ্গার জল পার হৈল নায়।।
ডানদিকে রাখিল গোপালপুর সুতি।
বালিঘাট পাল্য কর্ণসেন রঞ্জাবতী।।
তারাদীঘি পশ্চাৎ জলন্দা দরশন।
পাইয়া মোঙ্গলকোট হরষিত মন।।
পশ্চাৎ কালুরতক কর্জনা সন্মুখে।
বর্ধমান উপনীত পরম কৌতুকে।।
দিন দুই মোকাম করিয়া নৃপবর।
পারাল সত্বর গঙ্গা নদ দামোদর।। ৪৮০
পশ্চাৎ করিল সেন বারবকপুর।
অমিলা মোগলমারি রেখে যায় দূর।।
জাহানাবাদ[২] বিষ্ণুপুর দিলা দরশন।
ডানদিকে রেখে যায় গড়মন্দারন।।
রাঙ্গা মাটি পারায়ে জলার নিল পথ।
পদিমার বিল পেয়ে সিদ্ধ মনোরথ।।
কালিন্দি নদীর জল পারাল তুরিত।
শুভক্ষণে ময়নায় হইল উপনীত।।
কর্ণসেন হৈল রাজা পড়ে গেল সাড়া।
তিন সন্ধ্যা শহরে বাজিছে সিঙ্গাকাড়া।।'(৪৯০)

কবির বর্ণিত পথ দিয়ে কর্ণসেন রঞ্জাবতী ময়না নগরে পৌছাল, সেখানে তাঁর রাজ্যাভিষেক হল। আমশাখা বনমালা কলাগাছ পূর্ণঘট দিয়ে সব সাজানো হয়েছে। জয়পতি মন্ডল প্রভৃতি প্রজারা টাকা কড়ি সেলামী দিয়ে রাজাকে অভিবাদন জানালেন, রাজাও প্রিয় বাক্যে তাদের বশ করে রাখলেন। রাজা কর্ণসেন ময়নাতে সাত মহলের রাজ প্রাসাদ তৈরী করালেন। প্রাসাদের স্থানে স্থানে ফুলের বাগান তৈরী হল। মূল মহলের ভিতর রঞ্জাবতীর বাসঘর, ঘর সাজানো হয়েছে নানা মণি মাণিক্যে, বসানো হয়েছে বড় বড় দর্পণ। বাড়ীর ঈষাণ দিকে বিষ্ণুর মন্দির তৈরী হয়েছে। সংকীর্তনের নাট মন্দির নির্মান করা হয়েছে। নগরের মাঝে শিবের দেউল নির্মান হয়েছে। নগরের বিভিন্ন জায়গায় শ্রীফল, ধাত্রী, তুলসী, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষরোপনও করিয়েছেন। রাজা জয়পতি মন্ডলকে ডেকে তাকে রাজ কার্য পরিচালনার অনেক কিছু দায়িত্ব দিলেন। ময়না নগরে কর্ণসেনের প্রজাপালনের গুণে প্রজারা পরম সুখে বসবাস করতে লাগলেন।

এদিকে ছয় মাস হয়ে গেল গন্ডকী নদীর জল আর কমে না, মহাপাত্রের দলবল নদী পার হতে পারছে না। তখন ওরা বুঝতে পারল কাঙুর রাজ কর্পূরধল দেবী কামাখ্যার সাধক, তাই কাঙুর জয় সম্ভব নয়। এই ভেবে মহাপাত্র দলবল নিয়ে গৌড়ে ফিরে গেল। গৌড়ে এসে রাজাকে জানাল - কামাখ্যা দেবীর বরে গন্ডকী নদী শত্রূপক্ষ দেখে সাত তাল হয়ে বহে চলেছে।

ছ' মাস নদীর ধারে থেকেও নদী পার হতে পারলো না আমাদের লোকজন। পাত্রের কথা শুনে রাজা গৌড়েশ্বর চিন্তান্বিত হয়ে পাত্রকে বললেন - বর্ষার পর পুনরায় কাঙুর রণে যাবে, এই বলে পাত্রকে বিদায় দিলেন।

মহামদ নিজের বাড়ীতে এসে মা বাবাকে প্রণাম করে - রঞ্জাবতীকে ডাকা ডাকি করতে লাগলেন, কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না, তখন মা কে জিজ্ঞাসা করলেন রঞ্জাবতী কোথায় গেছে ? তখন মা (মন্থরা) কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লেন - গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিয়ে দিয়েছেন। এই কথা শুনে পাত্র রেগে আগুন ,মাকে বললেন -

'হেন ছার কর্ম কেন করিয়াছ মা।।
মনে ছিল বিভা দিব ভাল ঘর বরে ।
দোজবরে বুড়ো মোর ভগ্নী বিভা করে।।
স্থির করি তার আমি না রাখিব বংশ।
বাসুদেব সনে পণ করে ছিল কংশ।।' (৬১২)

দেখতে দেখতে এক বৎসর হয়ে গেল, ময়না নগরে সেন-রঞ্জা মহাসুখে বসবাস করছেন, একদিন দুজনায় পাশা খেলছিলেন, কিন্তু রঞ্জাবতীর বাবা মায়ের জন্য মন খারাপ হওয়ায় চুপচাপ বসে ছিলেন। সেই দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন - কি হয়েছে?

'রাণীকে বলেন রাজা অপরাধ কি ।
মুখ তুলে কথা কও বেণুরায়ের ঝি।। (৬২২)

রঞ্জাবতী বললেন - বহু দিন হল মা বাবার কোন খবর পাই নাই, তাই মন খুব খারাপ, ভাই বোনেরা কেমন আছে কিছুই সংবাদ পাচ্ছি না। মহারাজ গৌড়েশ্বর ভাবতে পারেন - আমরা নতুন রাজত্ব পেয়ে ঘরে নিশ্চিন্তে বসে আছি, রাজ কর দিচ্ছি না, তাই আপনি গৌড়ে গিয়ে মহারাজার সঙ্গে দেখা করুন মহারাজা খুব আনন্দিত হবেন,আর সব সংবাদও পাবো। রাণী রঞ্জাবতীর কথায় শুভক্ষণ দেখে কর্ণসেন গৌড় যাত্রা করলেন। আর সঙ্গে নিলেন নানা রত্নের ভেট, বৎরান্তের কর, কাঁদি কাঁদি গুয়া নারকেল, নানা প্রকার শঙ্খ, মুক্তা, শ্বশুর, শাশুড়ী ও ভানুমতীর জন্য নিলেন কটকী শাড়ী, হীরা মণি মাণিক্য ইত্যাদি, আর অতি যত্ন করে নিলেন জগন্নাথ দেবের প্রসাদ। রাজা কর্ণসেনের সঙ্গে এই সমস্ত জিনিস পত্র নিয়ে চললো বেশ কিছু নফর চাকর। রাজা গৌড়েশ্বর দরবারে বসেছেন এমন সময় কর্ণসেন সেখানে উপস্থিত হয়ে জোড়হাতে রাজার চরণ বন্দনা করলেন, উভয়ে আলিঙ্গন করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। কর্ণসেন রাজার চারদিকে ভেট সামগ্রী সাজিয়ে দিলেন। তারপর গৌড়েশ্বর ও কর্ণসেনের মধ্যে পরিহাস চলতে লাগল। রাজার কাছে সেনের এত সম্মান দেখে পাতর (গৌড়েশ্বর ও কর্ণসেনের শ্যালক তথা গৌড়েশ্বর মন্ত্রী) ভেতরে ভেতরে রেগে আগুন হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ঠিক করলো রাজা ও কর্ণসেনের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে। তাই রাজাকে বললো - মহারাজ আপনার কাছে একটি নিবেদন আছে - যে অপুত্রক সে সকল পাপীর পাপী , আটকুড়োর মুখদেখাও পাপ, তাকে স্পর্শ করলে অনেক পাপ হয়, আপনার পুণ্যের শরীর অপনি কি করে অনায়াসে অপুত্রক কর্ণসেনকে স্পর্শ করলেন। আপনাকে এখন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এজন্য আপনাকে দশদিন উপবাস

থেকে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের দান করতে হবে, সর্ব তীর্থের জলে স্নান করে আপনার ওজনের সমান রৌপ্যমুদ্রা খরচ করে এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করালে আপনি এই পাপ থেকে মুক্তি পাবেন। রাজার ব্যক্তিত্ব খুব কম ছিল, দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া মহাপাত্রের কথাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন । তাই কুচক্রী মহাপাত্রের এই সব কথায় যে কর্ণসেনকে একটু আগেই আলিঙ্গন করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন সেই কর্ণসেনকে দূরে সরিয়ে দিলেন। কর্ণসেন সভা মাঝে এই ভাবে অপমানিত হয়ে লজ্জায় দুঃখে পাগলের মত হয়ে ময়নাগড়ে ফিরে গেলেন।

'সজল নয়ন রাজা মলিন বসন।
রঞ্জার সম্মুখে যায়্যা দিল দবশন।। (৭১৭)

রাজার এই মলিন বদন দেখে রাণী ব্যাকুল হয়ে সব কথা জানতে চাইলেন, বারবার অনুরোধ করে বললেন - কে কি বলেছে, কে অনাদর করেছে সব আমাকে বল। তখন কর্ণসেন রাণীকে সব কথা বললেন - বললেন যে গৌড়েশ্বর আমাকে যথাযোগ্য সমাদর ও সন্মান করেছিলেন, কিন্তু রাজ সভা মাঝে তোমার ভাই মহামদ আঁটকুড়ো বলে ভীষণ অপমান করেছে, এই অপমান আমার প্রাণে সহ্য হচ্ছে না, এ জীবন রাখার চেয়ে না রাখাই শ্রেয়। কর্ণসেনের কাছ থেকে এই সব কথা শুনে রঞ্জাবতী মনে ভীষণ ব্যথা পেলেন, কিন্তু রাজাকে (কর্ণসেনকে) সান্তনা দেবার জন্যে বললেন - ও তোমার সম্বন্ধী হয়, ভগ্নীপতিকে উপহাস করেছে মাত্র, এতে দুঃখ পাবার কিছু নাই। তাছাড়া পুত্রের জন্য আমরা দেবতার আরাধনা করব, নানা ব্রত করব, তুমি কিছু ভেবো না, রাণীর কথা শুনে কর্ণসেন একটু শান্ত হলেও রাণীর খেতে শুতে স্বপনে একটাই চিন্তা কি পূজা করলে, কি ব্রত করলে তাঁদের একটি বংশধর হবে।

চার

রঞ্জাবতীর শালেভর ও লাউসেনের জন্ম কথা ঃ

বড় ভাইয়ের দেওয়া আঁট কুড়ি নাম ঘুচানোর জন্য রঞ্জাবতী পাগল হয়ে নানা দেবদেবীর পূজা উপসনা করতে লাগলেন, শয়ন ভোজনও প্রায় ত্যাগ করলেন।

'মাণিকী কল্যাণী দাসী সঙ্গেতে সদাই। শয়ন ভোজন রাণী ত্যাজিলা সকল।
জিজ্ঞাসিল কি করিলে পুত্র বর পাই ।। পান বিনে শুকাইল বদন কমল'।।
(৭৬৪)

(ক) পুরদত্তের ধর্মপূজায় গাজনের শোভা যাত্রা ঃ

এমন সময় একদিন উসরপুরের পুরদত্ত বারুই এর ধর্মপূজার গাজনের শোভা যাত্রা নিয়ে রামাই পন্ডিত ময়না নগরে কর্ণসেনের রাজবাড়ীতে উপস্থিত হলেন-

'পুরদত্ত বারুই উসত পুরে ঘর। সাঙ্গজাত সকলি চলিল তার ঘর।। ৭৯০
ধর্মপূজা আরম্ভ করিল মনোহর।। বাড়ির ভিতরে গেল ধর্মের গাজন।
গাজন করিতে যান ময়না ভূবন। কাড়া কাঁশি ঢাক ঢোল বাজিছে বাজন।।
বিধাতা সাপক্ষ হইলে পুরে সুলক্ষণ।।'৭৭৪ মহলের ভিতর শুনেন রঞ্জাবতী।
'রতনা মালিনী সঙ্গে রামাই পন্ডিত। মাণিকী কল্যাণীকে বলেন শীঘ্রগতি।।
ধর্মের গাজন দেখে লোকে হরষিত।।'৭৮৪ বাড়ির বাহিরে শুনি কিসের বাজনা।
'কর্ণসম দাতা কর্ণসেন নৃপবর। সংবাদ জানিয়া শীঘ্র আইস দুইজনা'।। ৭৯৬

রাণী রঞ্জাবতী গাজনের শোভা যাত্রার বাজনা শুনে মাণিকী ও কল্যাণীকে বললেন তাড়াতাড়ি গিয়ে কিসের বাজনা তার সংবাদ নিয়ে এস। কল্যাণী ও মাণিকী বাইরের দলিজে গিয়ে দেখলেন যে রামাই পন্ডিত মশাই ধর্মঠাকুরের গাজনের শোভাযাত্রা নিয়ে এসেছেন - দাসীরা ধর্মঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন - ঠাকুর ধর্মরাজের কিছু বার্তা বলুন রাণীমাকে আমরা সেই কথা বলব।

তখন রামাই পন্ডিত বললেন - এই পুরদত্ত বারুই ছোটবেলা থেকে ধর্মের সেবা করে আসছেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন ধর্মের কৃপায় তাঁর বংশধর হয়েছে। একমনে ধর্মঠাকুরের পূজা করলে অপুত্রের পুত্র হয়। দাসীরা রাণীর কাছে গিয়ে রামাই পন্ডিতের কথা বললেন। রাণী রঞ্জাবতী একটি থালায় ফুল পুষ্প ও কিছু রত্ন নিয়ে তাড়াতাড়ি গাজনের সামনে এসে জোড় হাতে ধর্মঠাকুরের চরণ বন্দনা করে রামাই পন্ডিত মশাই এর পায়ে দু' হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন - প্রভু আমার কোলে বংশধর নাই, আমার ভাই আঁটকুড়ি বলে গালাগালি দেয়, তাই মনে সুখ নাই, কোন দেবতার পূজা করলে আমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, আপনি দয়া করে আমাকে সেই কথা বলুন। রাণীর কথা শুনে -

'পন্ডিত বলেন শুন রাণী রঞ্জাবতী। 'আমার বচন শুন রাণী রঞ্জাবতী।
ধর্মের গাজনে এই বঠে বারমতি।। অনাদ্য সেবিলে হয় বংশের উৎপত্তি ।।

রঞ্জাবতীর শালেভর ও লাউসেনের জন্মকথা

এক মনে পূজে যে ঠাকুর নিরঞ্জন।
বংশ লাভ হয় তার পরিপূর্ণ ধন ।।'(৮৪০)
চাঁপায়ে যায়্যা তুমি পূজ ধর্মরাজ ।
পুত্রবর পাইবে সুসিদ্ধ হবে কাজ।।'(৮৫০)

পন্ডিতের মুখে ধর্মপূজার কথা শুনে তাঁর পায়ে ধরে মিনতি করে বললেন --- প্রভু কৃপা করে আমাকে ধর্মপূজার আরাধনা শিখিয়ে দিন, আর পূজার যা যা উপকরণ লাগবে বলে দিন। রঞ্জাবতীর কথা শুনে রামাই পন্ডিত তাকে ধর্মপূজার দীক্ষা দিলেন, সিদ্ধ বিদ্যা পেয়ে রাণী যথা বিহিত গুরু দক্ষিণা প্রদান করলেন।

খ. রাণী রঞ্জাবতীর ধর্মপূজার অয়োজন ঃ

রাণী রঞ্জাবতী জয়পতি মন্ডলকে ডেকে বললেন -- ময়না নগরের মধ্যে যত তাড়া তাড়ি সম্ভব ধর্মঠাকুরের মন্দির তৈরীর আয়োজন করুণ, যা টাকা লাগে ভান্ডার থেকে নেবেন। রাণীমায়ের কথা শুনে জয়পতি আনন্দিত মনে মন্দির নির্মানের কাজে লেগে পড়লেন।

'রঞ্জাবতী বলেন শুনহ জয়পতি।
গ্রাম মধ্যে ধর্মঘর তুল শিঘ্রগতি।।
ভান্ডার ভাঙিয়া লহ যত চাই ধন।
এত শুনি মন্ডলের আনন্দিত মন।।'(৮)
'জন প্রতি সের চাল কিছু দিল কড়ি ।
বেতন দিনান্তে দেন দুই পন কড়ি।। (১২)
নাটশালা চারিদিকে করিল নির্মান ।
রচনা করিল স্থান গোলক সমান।।' (৩৬)

জয়পালের ব্যবস্থাপনায় খুব সুন্দর করে চারচালের মন্দির নির্মিত হল। ধর্মের ঘর দেখে রাণী রঞ্জাবতী আনন্দিত মনে রামাই পন্ডিত ও সামূল্যা সুন্দরিকে সমাদর করে নিয়ে এলেন। শনিবার পূর্ণিমার তিথিতে মন্দিরের মধ্যস্থলের পিড়িতে ধর্মের পাদুকা স্থাপন করে ধর্মের গাজন আরম্ভ করলেন।

'সামূল্যাকে বিনয়ে বলেন রঞ্জাবতী।
কতদিনে হবে দিদির বংশের উৎপত্তি।।'
'আঁটকুড়ি বলে ভাই রাজ সভা মাঝে।
অপমান বচন শেলের মত বাজে।।' ৪৮

সামূল্যা দেবী তখন বললেন -- চিন্তার কিছু নাই, তুমি চাঁপায়ে গিয়ে ধর্মরাজ নিরঞ্জনের পূজা করে 'শালেভর ' দিয়ে জীবন ত্যাগ করবে, ধর্মরাজ তোমার জীবন ফিরিয়ে দিয়ে পুত্র বর দেবেন। চল আমরা চাঁপায়ে যাই।

'সামূল্যা বলেন দিদি এত চিন্তা কি।
ভবিষ্যত কথা সব আমি কয়ে দি ।।(৫০)
জাতিস্বরা আমি জানি ভূত ভবিষ্যৎ।
চাঁপায়ে পুজিতে ধর্মসিদ্ধ মনোরথ।।
শালেভর দিয়া তুমি ত্যাজিবে জীবন।
জিয়ইয়া পুত্র বর দিবে নিরঞ্জন ।।
চল ভগ্নী চাপায়ে পুজিতে জগন্নাথ।
সাজন করিয়া সঙ্গে লহ সাঙ্গজাত।।'(৫৬)

এই কথা শুনে রঞ্জাবতী সামূল্যার নির্দেশ মত পূজার সমস্ত উপকরণ, সুবর্ণ থালা, টাকা কড়ি, কাঞ্চনের মালা সঙ্গে নিলেন আর নিলেন মাণিকী কল্যাণী নামে দুই দাসীকে, এর পর চললেন ভুপতি কর্ণসেনের কাছে বিদায় নিতে।

'বিদায় হইতে গেল ভূপতির স্থানে।
চাঁদ রায়ে কৃপাকর প্রভু নিরঞ্জনে।।
শঙ্করী চরণে শিবে হবে কৃপান্বিত।
ভনে নরসিংহ বসু নূতন সঙ্গীত।'। (৭৮)

ভূপতি কর্ণসেনের কাছে গিয়ে রাণী রঞ্জাবতী বললেন —

'অবধান হয়ে কিছু শুন নৃপবর।
এসেছি বিদায় হতে তোমার গোচর।।
চাঁপায়ে পূজিব ধর্ম সাধ বর মনে ।
ফুল ফল জল দিব ধর্মের চরণে ।।'৮৬
'তুমি আজ্ঞা দিলে যাই চাঁপাই ভুবন।
বেদ হতে বাড়া মোকে তোমার বচন।।'৯২
'বিনা অঙ্গ জপ তপ না হয় সন্তান। ১২১
আজ্ঞা হইলে চাঁপায় পুজিব ভগবান।।
ধর্মরাজে পূজা করে লব পুত্র বর ।
আঁটকুড়ি নাম ঘুচে সংসার ভিতর ।।
কোলে পুত্র হইলে মুখে ঘুচে কালি ।
ভ্রাতার সহিতে নারি আঁটকুড়ি গালি।।' ১২৬

রঞ্জাবতীর এই কথা শুনে কর্ণসেন রঞ্জাবতীকে বললেন — ধর্মের পূজা খুব কঠিন কঠোর সাধনা, কঠোর উপবাস করে নিয়মে থেকে 'সন্ন্যাস' করতে হয়, এক মনে ধর্মের পূজা করতে না পারলে ঠাকুর আবার পাপ দেন। আর তা ছাড়া ধর্মঠাকুর ধ্যানের অগম্য, কলিযুগে ধর্মপূজা কোথাও শুনি নাই, যার আদি অন্ত নাই, যার দর্শন কেউ পায় নাই তাঁর দর্শন তুমি কি করে পাবে। আর ধর্মপূজা করে কোথায় কে পুত্র পেয়েছে? যাই হোক ধর্মপুজার জন্য তোমাকে দূর দেশে যেতে হবে না ঘরে বসে ভক্তিভরে ধর্মের পূজা কর। কপালে থাকলে পুত্র হবে।

' ঘরে বসি ধর্মপূজা কর ভক্তি ভাবে।।
কপালে থাকিলে পুত্র হবে অনায়াসে।
ধর্মের মঙ্গল বসু নরসিংহ ভাষে।।' (১৭০)

কর্ণসেনের কথা শুনে রঞ্জাবতী বললেন ---- ধর্মের কৃপা অনেকেই পেয়েছেন, ধর্মঠাকুরের কৃপায় কুন্তিদেবী যুধিষ্ঠিরের মত পুত্র পেয়েছেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাণী মদনা ধর্মের বরে পুত্র পেয়েছেন, ঠাকুর দুর্যোধনের রাজভোগ পরিত্যাগ করে ভক্ত বিদুরের খুদ খেয়ে মাটিতে শয়ন করেছেন, ভক্ত সুধামার কাছ থেকে খুদ কেড়ে খেয়েছেন। ভগবান যদি ভক্তের অধিন না হবেন তাহলে এই সব হয় কি করে? রাণীর যুক্তি শুনে কর্ণসেন রাণী রঞ্জাবতীকে চাঁপায়ে ধর্মপূজা করার অনুমতি দিলেন।

গ) চাঁপায়ে রঞ্জাবতীর ধর্মপূজা ও শালেভর দিয়ে প্রাণত্যাগ ঃ

চাঁপায়ে গিয়ে রঞ্জাবতী ভক্তিভরে ধর্মপূজা আরম্ভ করে ঠাকুর নিরঞ্জনকে বল্লেন -

'ওহে প্রভু মায়াধর রাজ রাজেশ্বর।
রঞ্জাবতী মাগে প্রভু এক পুত্র বর ।।' (২)
'অনাথের নাথ তুমি অধমের গতি।
নিজ গুণে দয়া মোরে করিবে মাধব।।
যদি কৃপা না করিবে ভগবান।
শালেভর দিয়া আমি ত্যাজিব পরাণ।।

৮, ১২, ৩৬, ৪৮, ৫৬, ৭৮, ৮৬, ৯২, ১২১, ১২৬, ১৭০, 'হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান' পালার চরণ সংখ্যা।

পান্ডবে করিলে রক্ষা হইয়া সারথি।।	স্ত্রী হত্যা দিব হে প্রভু তোমার উপর।
দয়ার সাগর তোমা বলে সর্ব জনে।	কৃপা করি প্রভু দেহ এক পুত্র বর।।
কৃপাকর কৃপানিধি আপনার গুণে।।' (২০)	তুমি ধর্মরাজ সুদীনের দীনপতি।
'পরম পাতকী আমি কিবা জানি স্তব। (২৩)	ভনে নরসিংহ বসু শাঁখারি বসতি।।'৩০

রঞ্জাবতী ঠাকুরের কাছে মিনতি ভরে পুত্রবর চেয়ে 'শালে ভর' দিয়ে প্রাণ ত্যাগের সংকল্প করে চাঁপায়ের ঘাটে ধর্মরাজের গাজনের আয়োজন করলেন । নিজে গাজনের কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করে, মাথায় ধুনা পোড়ান, প্রণাম খাটেন, অন্যান্য সঙ্গী সাথীরাও রঞ্জাবতীর সাথে প্রণাম খাটেন, ধুনা পোড়ান, পিঠে কাঁটা ভাঙ্গেন, এই ভাবে প্রায় দশদিন সন্ন্যাস ব্রত চলল, কিন্তু ঠাকুর নিরঞ্জনের কোন বর পাওয়া গেল না । তখন রঞ্জাবতী 'শালে ভর' দেবার সংকল্প করলেন । তার জন্য কামার দিয়ে গামার কাঠের পাটায় তীক্ষ্ণধার পেরেক বসালেন এবং সামূল্যাকে গিয়ে বললেন - দিদি, ধর্মরাজ আমাকে দয়া করলেন না । আমি শালে ভর দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করবো । তোমরা বাড়ী ফিরে গিয়ে মহারাজকে এই কথা বলবে! তখন সামূল্যা বললেন - দিদি তুমি শালেভর দেবে, আমরা সব বাড়ি ফিরে যাবো, সে হয় না। আমরা সকলেই তোমার জন্য জীবন পণ করে এসেছি । তাই মরতে হয় সকলেই মরব ।

রঞ্জাবতী চাঁপায়ের জলে স্নান করে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের বহু দ্রব্য সামগ্রী দান করে সামূল্যাকে আলিঙ্গন করে 'শালে ভর' দেবার জন্য এগিয়ে চললেন - সকল সঙ্গীদের কাছে বিদায় নিয়ে মঞ্চের চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে নিজের কাপড় কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে সূর্য অর্ঘ দিলেন । তারপর লোহার কাঁটা পেরেক বসানো 'শালের' ওপর ঝাঁপ দিলেন ।

"অনাদ্যের চরণ যুগল মনে করি ।	বড়ফুল বরণ হইল কলেবর ।।
পাটের উপরে ঝাঁপ দিলেন বিদ্যাধরী ।।	সর্বাঙ্গে রক্তধারা যোলধারে ছুটে ।
বুক বিধি পিঠে বোল বাহিরিয়া যায় ।	নাকে মুখে রঞ্জার ঝলকে রক্ত উঠে ।।
দেবাসুর দেখিয়ে করেন হায় হায় ।।'১৪২	ধর্ম ধর্ম বলে রাণী ত্যাজিল জীবন ।
'ধড় ফড় করে রাণী শালের উপর ।	ধন্য ধন্য বলে বাখানে সর্বজন ।।" ১৫০

রাণী রঞ্জবতী শালে ভর দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলে সবাই হায় হায় করতে লাগলেন, পুরোহিতগণ, রামাই পন্ডিত মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন । শোকে তাপে সামূল্যা মাণিকী কল্যাণী দিশা হারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ।

'মাণিকী কল্যাণী হৈল ধূলায় ধূসর ।'	'ধর্মের উপরে হত্যা দিল সর্বজন ।
'জিহ্বা কেটে দেন কেহ ধর্মের উপর ।।'	এমন নিষ্ঠুর তুমি কেন নিরঞ্জন ।।'

(১৬০)

এই ভাবে গাজনের সন্ন্যাসীরা কাতর ভাবে নিরঞ্জনের কাছে প্রার্থনা করে বলে -

'রঞ্জাকে জিয়াইয়া দেহ পুত্র বরদান । যদ্যপি ইহাতে কিছু হইবে অন্যথা
দয়াময় ঠাকুর ভক্তের ভগবান ।। লোক সব জানিবে ধর্মের পূজা বৃথা ।।'১৬৮

ঠাকুর নিরঞ্জনের কাছে এই ভাবে প্রার্থনা করে সকলে মিলে রঞ্জার মৃতদেহ, আগলে রইল। যাতে ডাঁশমাছি দেহের মধ্যে বসতে না পারে তারজন্য মাণিকী কল্যাণী চামর দিয়ে বাতাস করতে লাগলো । কাক কুকুর সাবধানে তাড়িয়ে দিতে লাগলো । কারও চোখে ঘুম নাই । শালে ভর দেবার আগে মঞ্চে উঠে রঞ্জবতী প্রথম সূর্য অর্ঘ দিয়েছিল, তাই স্ত্রীহত্যার দায়ে মহাপাপ স্বমূর্তিধারণ করে সূর্যের দিকে ছুটে গেল, বিপদ দেখে সূর্য গোবিন্দর কাছে যাবার জন্য গোলকের দিকে গেলেন ।

ঘ) মহাপাপের তাড়নায় সূর্যদেবের বৈকুণ্ঠে গমন, প্রভূ নিরঞ্জন কর্তৃক রঞ্জার প্রাণদান ও পুত্রবর প্রদান ঃ

একে সূর্যতেজস্বী, তার উপর স্ত্রী হত্যার দায়ে প্রথমেই মহাপাপ তাঁর দিকে ছুটে আসায় তিনি রেগে আগুন, অগ্নিমূর্তি সূর্যদেবকে দেখে দেবতারা বলাবলি করতে লাগলেন গোলক বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন বিধাতা সুরগুরু বৃহস্পতিকে নিয়ে যুক্তি করতে বসলেন । সুরগুরু বললেন - সূর্যকে শান্ত করতে কুঁদুল শিরোমণি নারদকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন । নারদ সূর্য্যকে শান্ত করতে পারবে । বিধাতা তখন নারদকে ডেকে বললেন - সূর্যের কোপানলে সুরপুরী পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে আপনি গিয়ে সূর্যকে শান্ত করুন । বিধাতার কথা শুনে নারদ হাতে বীণা আর কোন্দল ধুকড়ি নিয়ে ঢেঁকি চড়ে সূর্যের দিকে চললেন । নারদ যে দিকেই যান কোন্দলের ভয়ে সবাই ঘরের কোণে লুকিয়ে পড়ে । এই ভাবে যেতে যেতে নারদ সূর্যের পথ আগুলে দাঁড়ালেন, নাদরকে বিদ্ধস্ত অবস্থায় দেখে দিবাকর জিজ্ঞাসা করলেন - আপনার এই অবস্থা কেন ? নারদ প্রভাকরকে দুহাত জোড় করে প্রণাম করে বললেন - আমি বিনা কোঁদলে একদন্ড থাকতে পারি না, কিন্তু পথে কোন লোক দেখতে পাই নাই । তাই দুঃখে বেনায় চুল বেঁধেছি । নারদের কোন্দলের কথা শুনে বেনায় চুল বাঁধার দৃশ্য দেখে দিবাকর কোপ ভুলে হাসতে লাগলেন । শান্ত হয়ে গোলকে গোবিন্দের কাছে গিয়ে তাঁর পদযুগল বন্দনা করে সবিনয়ে বললেন - সুরলোকে দেবতারা মহা আনন্দে আছেন, কিন্তু জন্মাবধি আমার কোন সুখ নাই । পৃথিবীতে নিত্য নিত্য নানা পাপ ঘটছে । আর সব পাপ সর্বপ্রথম আমাকে যেন গিলতে আসে । পুত্রের জন্য 'শালে ভর' দিয়ে রঞ্জাবতী আজ তিনদিন হল চাঁপাইয়ে মৃত

শালেভর ঃ 'শালেভর' কথার অর্থ একটি মানুষ সমান লম্বা কাঠের পাটায় অসংখ্য লোহার পেরেক বসিয়ে মাচা থেকে তার উপর ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করা । ধর্মরাজ ও মহাদেবের গাজনে এখনও 'সালে ভর' প্রথা দেখা যায় । তবে এখন ঐ শালের ওপর ঝাঁপ দেয় না । এখন ঝাঁপ দেবার পরিবর্তে পেরেক বসানো পাটার মধ্যে শুয়ে গাজন স্থল প্রদক্ষিণ করে প্রতিকী 'শালে ভর' দেওয়া হয়।

অবস্থায় রয়েছে। আপনি নিশ্চিন্তে দেবলোকে বসে আছেন, আর এই স্ত্রী হত্যার পাপ এসে আমার ঘাড়ে পড়ছে। আপনি যদি আমাকে অধিকারে রাখতে চান, তাহলে চাঁপাই-এ গিয়ে রঞ্জাদেবীর জীবন ফিরিয়ে দিন। এই শুনে ভগবান চঞ্চল হয়ে উঠলেন, হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্পক রথে চেপে চাঁপায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

চারি দন্ডের মধ্যে প্রভু নিরঞ্জন চাঁপাই ভূবনে পৌঁছে গেলেন, কিন্তু রঞ্জাবতীর মৃতদেহের চারপাশে সন্ন্যাসীরা ঘিরে থাকায় হনুমান বলল - এত লোকের সামনে আপনার দর্শন দেওয়া ঠিক হবে না। তাই পবনদেবকে ঝড় বৃষ্টির ব্যবস্থা করতে বলুন - তাহলে সকলে ওখান থেকে চলে যাবেন। সেইমত ভগবান পবনকে ঝড়-বৃষ্টির ব্যবস্থা করতে বললেন, ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। সামূল্যা, মাণিকী, কল্যাণী ছাড়া অন্যান্য সন্ন্যাসীরা একটা ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। সামূল্যা মাণিকী কল্যাণী এই তিনজনে রঞ্জাবতীর মৃতদেহ কোলে করে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বসে রইলেন। কিন্তু প্রভু নিরঞ্জন তাঁদের চোখে মায়া নিদ্রা ছড়িয়ে দিলেন, তাঁরা ঘুমে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিছুটা দূরে পুষ্পরথ রেখে প্রভু নিরঞ্জন রঞ্জার মৃতদেহের কাছে এলেন এবং মনে মনে বললেন - এমন ভক্ত আর দেখি নাই।

'রঞ্জার সম্মুখে যায়্যা দিল দরশন। বিস্তর ভকত আছে সংসার ভিতর।।
বিস্ময় হইলা দেখে দেব নিরঞ্জন।। এমন দুরন্ত কর্ম কেহ নাহি করে।
মনে মনে করেন ঠাকুর মায়াধর। ধন্য ধন্য রঞ্জাকে বলেন মায়াধরে।।'৩৫২

এই বলে প্রভু নিরঞ্জন রঞ্জার মৃতদেহ কোলে তুলে নিয়ে কুশ জল গায়ে দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে রঞ্জার দেহে প্রাণ সঞ্চার করলেন। রঞ্জা চোখ চেয়ে ঠাকুরকে দেখে বলেন - আমি পুত্র কামনায় শালেভর দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছিলাম, যদি কৃপা করে আমার জীবন দান করলেন তাহলে আমাকে পুত্রবর দিন তা না হলে আমি এ জীবন আর রাখবো না, এই বলে জাতি দিয়ে নিজের গলা কাটতে গেলেন। প্রভু নিরঞ্জন হাত ধরে ফেলে বলেন।

'শুন বেটী রঞ্জাবতী হলেম সদয়। জন্মিবে তোমার গর্ভে কশ্যপ কুমার।
অকপটে দিনু বর হইবে তনয়।। দেবকীর গর্ভে যেন কৃষ্ণ অবতার।।
(৩৮০)

রঞ্জাবতী প্রভু নিরঞ্জনকে প্রণাম করে বললেন যদি আমাকে এত কৃপা করলেন তাহলে আমাকে আপনার চতুর্ভূজরূপে একবার দেখা দিন, নয়ন সার্থক করি। রঞ্জার অনুরোধে ঠাকুর চতুর্ভূজ রূপ ধারন করলেন।

'রঞ্জার বচনে কাম পানের অনুজ। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম কৌস্তব ভূষণ।
দয়াময় ঠাকুর হইলা চতুর্ভূজ।। বনমালা গলে শোভে গরুর বাহন।।' ৩৮৮

রঞ্জা গদ গদ হয়ে নয়নভরে প্রভুর চতুর্ভুজরূপ দেখে তাঁর চরণযুগল জড়িয়ে ধরলেন। প্রভূ পুনরায় তাঁকে পুত্রবর দিলেন। রঞ্জাবতী তখন বললেন আমার একটি নিবেদন - সামনের এই মরা নিম গাছে যদি মঞ্জরী দেখতে পাই তাহলে জানবো আমারও পুত্র হবে। ঠাকুর ঐ মরা

গাছের দিকে দৃষ্টি দিতেই - ঐ গাছের উত্তর ডালে আমের বকুল, পূর্ব ডালে ফুটে উঠল চাঁপা নাগেশ্বর, পশ্চিমে কদম ফুল, আর দক্ষিণ ডালে জোড়া নারকেল দেখা গেল । হনুমান ঐ নারকেল পেড়ে রঞ্জার হাতে তুলে দিল । ঠাকুর বললেন - রঞ্জা তোমার মানস সফল হবে । তোমার গর্ভে লাম্বাদিত্য জন্মগ্রহণ করবেন । তুমি লাউ কাটবে না আর লাউ খাবে না । পুত্রের নাম রাখবে লাউসেন। আরও কয়েকটা কথা মনে রাখবে - বাসর রচনার পর কালিন্দীর জলে স্নান করতে যাবে, সেখানে জোড়া নারকেল ভেসে আসবে, খুব যত্ন করে বড় ফলটি দিয়ে সূর্যঅর্ঘ্য দেবে, আর ছোট নারকেলটি তুমি ভক্ষণ করবে । তাহলেই তোমার গর্ভে কশ্যপ নন্দন জন্মগ্রহণ করবেন ।

রাণীর ধর্মপূজা পরিপূর্ণ হল । রামাই পন্ডিত চাঁপায়ের ঘাটে ঘট বিসর্জ্জন করে এলেন । রাণী আনন্দে সামুল্যাকে আলিঙ্গন করে পন্ডিত মশাইকে দুহাতে প্রণাম করে সকলকে নিয়ে নৌকা যোগে ময়নার দিকে যাত্রা করলেন ।

রঞ্জাবতী ময়নার রাজবাড়ীতে পৌঁছাতেই রাজা (কর্ণসেন) খুব আনন্দিত হলেন। সারা রাজবাড়ীতে আনন্দ উৎসবের রোল পড়ে গেল । রাজা-রাণী সকলের পরিপূর্ণ ভোজনের আয়োজন করলেন । রাণী সামুল্যাকে গলার কন্ঠ হার, রামাই পন্ডিত মশাইকে দিলেন অমূল্য রত্ন । হরিহর ঢাকীকে দিলেন অনেক কাপড়জামা, মাণিকী কল্যাণীকে দিলেন নানা দ্রব্য, কাপড় জামা, অলঙ্কার ইত্যাদি । সকলে আনন্দ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করলেন। এরপর রাণী বিরলে বসে কর্ণসেনকে তাঁর শালেভর দিয়ে প্রাণত্যাগের কথা, তারপর সাক্ষাত ধর্মরাজের দর্শন ও আর্শীবাদে আবার নব জীবন লাভের কথা, এবং সর্বোপরি পুত্রলাভের বর প্রাপ্তির কথা নিবেদন করলেন । ধর্মরাজের নির্দেশ অনুসারে ঐ দিনেই মাণিকী কল্যাণী বাসঘরে বাসরশয্যা তৈরী করে দিলেন । পরের দিন সকালে রাণী তাঁর দুই দাসীকে নিয়ে কালিন্দী নদীতে স্নান করতে গেলেন ।

(ঙ) ধর্মরাজের বরে রঞ্জার গর্ভে লাউসেন নামে লম্বোদিত্যের জন্ম ঃ

এদিকে বৈকুণ্ঠে ধর্মরাজ সব দেবতাদের নিয়ে বৈঠক করলেন, সকলকেই জিজ্ঞাসা করলেন কে ময়নাভুবনে যাবেন । ওখানে গিয়ে রঞ্জার গর্ভে জন্মলাভ করলে কলিতে ধর্মপূজা পদ্ধতি প্রচার হবে । এই কথা শুনে ধর্মরাজের বাহন উলুক বললেন - হে প্রভু মায়াধর, আপনি লম্বোদিত্যকে পাঠান রঞ্জার গর্ভে জন্ম নিতে । উলুকের কথা শুনে ঠাকুর নিরঞ্জন কশ্যপ নন্দন লম্বোদিত্যকে বললেন - তুমি দিন কতকের জন্য পৃথিবীতে গিয়ে রঞ্জার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলে পৃথিবীতে ধর্মের পূজা প্রচার হবে । দেবকীর গর্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তুমিও রঞ্জার গর্ভে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করবে । ঠাকুর নিরঞ্জনের এই কথা শুনে আদিত্য ঠাকুর নিরঞ্জনের পায়ে ধরে বললেন - আমি দেবতা হয়ে কি করে মানব হব । তখন -

'ঠাকুর বলেন শুন কশ্যপ নন্দন । তত দিনে জেনো আমি তোমার অধীন ।।
মোর কার্যে কদাচ না করো অন্যমন।। বিপদে সম্পদে যবে করিবে স্মরণ ।
পৃথিবীতে বিহার তোমার যতদিন । সেই ক্ষণে আমার পাইবে দরশন ।।' (৬১৬)

রঞ্জাবতীর শালেভর ও লাউসেনের জন্মকথা

এরপর প্রভু ভগবান রবির রথের ঘোড়াকে এনে তাকেও পৃথিবীতে জন্ম নিতে বললেন, আরও বললেন - যতদিন কশ্যপ কুমার পৃথিবীতে থাকবেন তুমিও তার বাহন হয়ে তত দিন থাকবে। আর তুমি গৌড়ে জন্মাবে, নাম হবে অন্ডীর পাখর। এরপর প্রভু ধর্মরাজ চার বিদ্যাধরীকে ডেকে বললেন - তোমারাও পৃথিবীতে গিয়ে জন্মগ্রহণের জন্য গমন কর। সেখানে গিয়ে আদিত্যের (পৃথিবীতে নাম লাউসেন) নারী হয়ে বিহার করবে।

এই বলে প্রভু নিরঞ্জন ওঁদের সকলকে পাঠালেন পৃথিবীতে জন্ম নেবার জন্য। এর মধ্যে আদিত্যের জীবাত্মা নিয়ে একটি নারকেলের মধ্যে সাবধানে স্থাপন করে হনুমানকে দুটি নারকেল দিয়ে বললেন - তুমি শীঘ্র ময়না ভুবনে যাও। রঞ্জাবতী কালিন্দী নদীতে স্নান করছে। তুমি সাবধানে তার কাছে এই দুটি নারকেল ভাসিয়ে দিয়ে এস। এই কথা শুনে হনুমান সত্বর ময়না নগরের দিকে চলল। সেখানে গিয়ে কালিন্দী নদীতে রঞ্জা যেখানে স্নান করছিলেন তার কাছাকাছি নারকেল দুটি ভাসিয়ে আবার বৈকুণ্ঠ ভুবনের দিকে উঠে গিয়ে ধর্মরাজকে সকল সংবাদ দিলেন।

কালিন্দী নদীতে রঞ্জা তার দুই দাসী মাণিকী ও কল্যাণীকে নিয়ে স্নান করছেন আর মনে মনে ভাবছেন এখনও তো কোন নারকেল ভেসে এল না, তাহলে কি প্রভু নিরঞ্জন আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করলেন, এইরকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে দেখেন তাঁর সামনে দুটো নারকেল ভেসে আসছে, রঞ্জাবতী তাড়াতাড়ি জল থেকে নারকেল দুটি নিয়ে বড়টি দিয়ে সূর্য অর্ঘ্য দিলেন, আর ছোটটি নিজে খেলেন। শুভক্ষণে লম্বোদিত্য তাঁর গর্ভে প্রবেশ করলেন। দশমাস পর রঞ্জাবতীর একটি চাঁদপারা পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। রাজা রাণী পুত্রের মুখ দেখে আনন্দিত মনে দুহাতে সকলকে নানা দ্রব্য উপহার দিলেন। পুত্রের নাম রাখলেন লাউসেন।

একদিকে লাউসেন রূপে রঞ্জাবতীর গর্ভে লম্বোদিত্যের জন্মের পর, অন্যদিকে চার বিদ্যাধরী যথাক্রমে কাঙুর কামরূপের রাজা কর্পূরধলের কন্যারূপে কলিঙ্গা নামে, মঙ্গলকোটের রাজা গজপতি রায়ের কন্যারূপে আঙ্গলা নামে, বর্দ্ধমানের রাজা কালিদাসের কন্যারূপে বিমলা নামে, এবং সিমুল্যার(হরিপাল) রাজা হরিপাল শিখরের কন্যারূপে কানড়া নামে জন্মালেন. আর গৌড়ে জন্মাল আদিত্যের ঘোড়া অন্ডির পাখর।

৭৬৪, ৭৯০, ৭৯৬, ৮৪০, ৮৫০, 'রঞ্জাবতীর বিবাহ পালার লাইন সংখ্যা।' ৩৬, ৪৮, ৫০, ৫৬, ৭৮, ১২৬, ১৭০, কাব্যে র অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রের উপন্যাস পালার লাইন সংখ্যা। ২০, ৩০, ১৪০, ১৫০, ১৬০, ১৬৮, ৩৫২, ৩৮০, ৩৮৮, ৬১৬, লাউসেন জন্মপালার লাইন সংখ্যা।

পাঁচ

লাউসেন চুরি পালা

১) লাউসেন চুরি ঃ

ময়না নগরে রাণী রঞ্জাবতীর পুত্র সন্তান হয়েছে শুনে লোকের ঘরে ঘরে আনন্দের সীমা নাই, ব্রাহ্মণ সজ্জন লোকজন সব রাজার ঘরে গিয়ে ছেলেকে আশির্ব্বাদ করে এলেন, আর রাজাও সকলকে নানা বসন ভূষণ ধন রত্ন দান করলেন ছেলের কল্যাণের জন্য। রাণী রঞ্জাবতী রাজাকে বললেন - আপনি কোন উপযুক্ত রজক আর নাপিতকে গৌড়েশ্বরের কাছে আর আমার মা-বাবা, দাদা ও দিদির(রাণী ভানুমতি) কাছে এই শুভ সংবাদ দিয়ে পাঠিয়ে দিন, এই শুভ সংবাদ পেলে তারা খুব আনন্দিত হবেন।

রাণীর কথা অনুসারে কর্ণসেন রাজা গৌড়েশ্বর, রাণী ভানুমতি, শ্বশুর বেণু রায়, শাশুড়ী মন্থরা প্রভৃতি সকলকে প্রণাম জানিয়ে রঞ্জাবতীর পুত্রসন্তান লাভের কথা লিখে রাম দাস রজক ও শ্রীনিবাস নাপিতের হাতে চিঠি দিয়ে গৌড়দেশ পাঠিয়ে দিলেন।

রামদাস ও শ্রীনিবাস মহানন্দে গৌড় যাত্রা করল। গৌড়ে পৌছে রাজাকে কর্ণসেনের চিঠি দিয়ে দুজনে প্রণাম করে রাজার সামনে দাড়াল। রঞ্জার পুত্র হয়েছে শুনে রাজা গৌড়েশ্বর রাণী ভানুমতি, সকল সভাসদ, আর রঞ্জার পিতামাতা মহানন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

পরম আনন্দে রাজা গৌড়েশ্বর রজক নাপিতকে নিজের গায়ের চাদর খুলে দিলেন, দুজনার দু'কানে সোনার বালা দিলেন, এছাড়া অনেক টাকাকড়িও দিলেন। রাণীভানুমতি দুজনকে পাটের শাড়ী দিলেন, বেণু রায় ও মন্থরা (রঞ্জাবতীর বাবা ও মা) অনেক টাকাকড়ি ও জামা কাপড় দিলেন। অন্যান্য মিত্রজনেরাও নাপিত রজককে নানারকম জিনিসপত্র দিলেন। এইসব জিনিসপত্র নিয়ে শ্রীনিবাস ও রামদাস রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ময়না যাত্রা করল।

রঞ্জার পুত্রসন্তান লাভে গৌড় রাজ্যের সকলেই খুব খুশী, খুব আনন্দিত, কিন্তু ওরই মধ্যে এক জনের মাথায় যেন বাজ পড়েছে। অন্তরে জ্বলেপুড়ে মরছে - সে আর কেউ নয় রঞ্জাবতীর দাদা গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী মহামদ। রাজার প্রিয় পাত্র কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জার বিয়ের কথা শোনার পর থেকে তার মাথায় আগুন জ্বলছে, তাই সে মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগল কি করে রঞ্জার পুত্রের বড়াই ঘোচান যায়। কোন চক্রে কর্ণসেনকে আটকুড়ো করা যাবে। এইসব ভাবতে ভাবতে রাজা গৌড়েশ্বরকে বললো - আপনাকে আমি কিছু উচিৎ কথা বলতে চাই, একটু নিরিবিলি জায়গায় আপনাকে সেই সব কথা বলবো। এই বলে রাজাকে বলতে লাগলেন - ধর্মের বরে রঞ্জার পুত্র সন্তান হয়েছে, ঐ ছেলে দেবতা না অসুর কিছুই জানা নাই, আপনি ত্রিষষ্ঠের দায়িত্ব দিলেন সোম ঘোষকে, টাকাকড়ি উপার্জন করে দেবী পূজা করে পুত্র বর পেল। সেই ছেলে ইছাই ঘোষ আপনাকে অমান্য করে রাজকর না দিয়ে স্বতন্ত্র রাজা হয়ে বসল। তা ছাড়া কৃষ্ণ যেমন কংসকে বধের জন্য জন্মেছিল তেমনি রঞ্জার ছেলেও যে আপনাকে নিধন করে আপনার রাজ্যভার নেবে না সে কথা কে বলতে পারে। তাই এখন থেকে ব্যবস্থা না

নিলে আপনি বিপাকে পড়বেন। এই ভাবে সাত পাঁচ বলে মহামদ রাজার মন ভাঙ্গাতে লাগলেন। রাজা গৌড়েশ্বরের অনেক গুণ থাকলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের খুব অভাব ছিল। মহামদের যুক্তিকে অনেক সময়ই ঠিক বলে মনে করতেন, আর সেই যুক্তি অনুসারেই চলতেন - এক্ষেত্রেও মহামদ ভূপতিকে ভুল বোঝাতে পারল। তখন মহামদ ইন্দা মেটেকে ডেকে বলল - ঐ নাপিত আর ধোপা বেটাকে গিয়ে ধর মহারাজ যে সব ধন কড়ি দিয়েছে সব কেড়ে নিয়ে আয়, তুই অনেক ইনাম পাবি। ইন্দা মেটে দু'চারজন লোক নিয়ে গিয়ে মাঝ পথে ওদের চড় চাপড় লাথি গুতো মেরে সব কেড়ে নিয়ে এল।

এদিকে মহাপাত্রের কথা শুনে রাজার ভাবনা বেড়ে গেছে। কি করে রঞ্জার পুত্রকে বিনষ্ট করা যায় সেই চিন্তাই রাজার মনে ঘুরছে। অথচ এই রাজা গৌড়েশ্বরই মহাপাত্রকে লুকিয়ে রঞ্জার বিয়ে দিয়েছিলেন। রঞ্জার পুত্র সন্তান লাভের সংবাদে একদিন আগেও দু'হাতে ধনরত্ন বিলি করেছেন। কিন্তু কুমন্ত্রনার প্রভাব কি মারাত্মক। তাই কবি বলেছেনে 'কুমন্ত্রী থাকিলে তুয়া দেশের কন্টক।' (৬৯২) আজ সেই মহারাজই রঞ্জার পুত্রের ধ্বংস চায়। মহাপাত্রকে ডেকে যুক্তি করতে বসলেন, কি করে রঞ্জার পুত্রকে নষ্ট করা যায়। মহাপাত্র রাজাকে বলল - ইন্দা মেটেকে ময়না পাঠিয়ে ঐ ছেলেকে চুরি করে নিয়ে আসতে বলুন। রাজা ইন্দা মেটেকে বললেন - তুমি ময়না গিয়ে রঞ্জার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে এস। একাজ করতে পারলে অনেক বস্ত্র, অলঙ্কার টাকা পয়সা পাবে। এই বলে পথ খরচের জন্য বিস্তর টাকা কড়ি দিয়ে দিলেন।

ইন্দা আরও জনা দশ সঙ্গী নিয়ে ময়না যাত্রা করল, নিজে সন্ন্যাসীর বেশ ধরল, - মাথায় জটা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ছাই, হাতে ত্রিশুল নিয়ে চলল - সঙ্গে চলল তার দশ চেলা। ময়না লোকজনের কোন সন্দেহই হল না, সবাই ভাবলো এঁরা সাধু সন্ন্যাসী, দিনের বেলায় কালিন্দীর ঘাটে বটগাছের তলায় সন্ন্যাসীরূপী চোর ইন্দা মেটে আসন পেতে বসল, তার চারদিকে চেলারা ধুনি জ্বালিয়ে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইল, সন্ন্যাসী একে বারে মৌন। গ্রামের লোকজন দন্ডধারী সাধু দেখে প্রণাম করে চলে যায়। এরপর মা ভবানীর পূজা করে রাত্রিতে ইন্দা সাধু বেশেই তার চেলাদের সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে গেল, সকালে যখন ঘুমে অচৈতন্য রঞ্জাও কোলের কাছে ছেলে নিয়ে ঘুমিয়ে গেছে, তখন ইন্দা তার সিঁদ কাটি দিয়ে ঘর খুলে রঞ্জার ঘরে প্রবেশ করে দেখল -

'নিদ্রা যায় রঞ্জাবতী বরণ বিমলা।
কোলে বেটা লাউসেন চাঁদ ষোলকলা।।
রূপ দেখা মোহিত হইল চোরগণ।
কি করে এমন শিশু করিব নিধন।।'

(৪৮০)

শিশু লাউসেনের রূপ দেখে চোররা মোহিত হয়ে গিয়ে আর চুরি করে নিয়ে যেতে পারছিল না, কিন্তু মহাপাত্রের কথা মনে পড়তেই ভাবল লাউসেনকে নিয়ে না গেলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। তাই সাবধানে শিশু লাউসেনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর কালিন্দী, পদ্মিমার বিল, রাঙ্গামেটে, উচালন, আমলে, বর্ধমান, কালুরতাক, বালিঘাট, গোপালপুর

সুতি পেরিয়ে ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হল, মনে মনে ঠিক করল এখানে স্নান খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে যাবো। এই পরামর্শ করে নদীর ধারে বেনাবন পরিষ্কার করে শিশু লাউসেনকে সেখানে শুয়িয়ে রেখে স্নান খাওয়া করতে গেল। চোরেরা নদীতে স্নান করে ভাঙ্গ সিদ্ধি খেয়ে পথশ্রান্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

'লাউসেন বেনাবনে কাঁদে শিশু একমনে
বৈকুণ্ঠে জানিল নিরঞ্জন।।
নিবাস শাঁখারি গ্রাম বসু বংশে অনুপাম
মথুরা বসুজা মহাশয়।
তিন পুত্র ছিল তার সকল গুণের সার
ঘনশ্যাম প্রথম তনয়।।
নরসিংহ তদাত্মজ সেবি ধর্ম পদরজ
মনে আশা রচিতে সঙ্গীত ।
ঠাকুর দেখায় পথ সিদ্ধ হৌক মনোরথ
চাঁদ রায়ে হও কৃপান্বিত।। ৫৯২

বৈকুণ্ঠে ঠাকুর নিরঞ্জন দেখলেন বেনা বনে লাউসেন কাঁদছে, সেই দেখে ঠাকুর হনুমানকে ডেকে বললেন - আমার রাম অবতারে তুমি অনেক কাজ করেছো, তোমার যত্নে সাগর বন্ধন হয়েছে, তোমার জন্য লক্ষ্মণ প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, তোমার সাহায্যেই আমি রাবণকে ধ্বংস করে সীতা উদ্ধার করেছিলাম। এখন চোরেরা লাউসেনের প্রাণ নাশ করবে - সে কিছুতেই হতে পারে না। আমার পূজা প্রকাশেই লাউসেন রূপে আদিত্যের জন্ম। তুমি অবিলম্বে লাউসেনকে উদ্ধার করে নিয়ে এস। এই কথা শুনে হনুমান শঙ্খচিল রূপে বেনা বনে গিয়ে লাউসেনকে নিয়ে এসে ধর্মরাজের কাছে দিলেন।

'ভকতের তুলে নিল ভকত বৎসল।
কোলে করে মুখে দিল মন্দাকিনীর জল'।। (৬২৬)

এদিকে চোরেরা ঘুম থেকে উঠে বেনা বনে গিয়ে দেখে শিশু নাই, চারদিক খোঁজাখুঁজি করে যখন কিছুতেই শিশুকে পাওয়া গেল না তখন ইন্দা মেটে বলল - এক কাজ করা যাক্ একটা কুকুরকে কেটে সরায় করে তার রক্ত নিয়ে গিয়ে রাজাকে দেখিয়ে বলব লাউসেনকে হত্যা করে তার রক্ত এনেছি। সেই যুক্তি মত একটা কুকুরকে কেটে সরা করে সেই রক্ত নিয়ে রাজা গৌড়েশ্বরের সামনে রাখলো।

রাজা গৌড়েশ্বর তখন দরবারে বসেছিলেন। সামনে জবাফুলের মত তাজা রক্ত দেখে বললেন -এ কিসের রক্ত? ইন্দা মেটে রাজাকে বলল - মহারাজ আমরা শিশুকে চুরি করে

নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু একুশ দিনের শিশু পথেই মারা গেল, তাই আমরা তাকে কেটে তার রক্ত নিয়ে এসেছি। রিপুরক্ত দেখে রাজা আনন্দিত ইন্দাকে যথোচিত পুরস্কার দিল। ভাগ্না নিধন হয়েছে শুনে মহাপাত্রের আনন্দের সীমা রইল না।

২) গৌড়েশ্বরের কুকুরের দশা প্রাপ্তি ঃ

মহাপাত্র বলল মহারাজ - শত্রুর শেষ রাখতে নাই, আপনি শত্রুর রক্তে স্নান করুন, আপনার সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। পাত্রের কথায় রাজা রক্তের সরা তুলে মাথায় ঢাললেন। কুকুরের রক্তে স্নান করে রাজার মতিগতি কুকুরের মত হয়ে গেল। পাপ রক্তে রাজার সোনার বরণ কালি হয়ে গেল, রাজা কুকুরের মত ডাকতে লাগলেন, রাজার মুখের আকার কুৎসিত হয়ে গেল, সভার লোকজন সব চমকে উঠলো। সবাই কানাকানি করতে লাগলো - রাজার এরকম দশা হল কেন, সবাই মিলে রাজাকে হরি হরি বলাতে গেল, রাজা হরির বদলে হাউ হাউ ঘাউ ঘাউ করে উঠলো। রাজসভার লোকজন ভবতে লাগলেন -

'না জানি কি করিলেক গৌড়ের পাতর।	হরি বলাইতে বলে হাউ হাউ রব।
কোন পাপে কুক্কুর হইল নৃপবর।।	রাজাকে দেখিয়া চমকিত লোক সব'।।

(৭৩০)

এদিকে অন্তরীক্ষে প্রভু নিরঞ্জন হয়ত বলছেন - পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়। যাইহোক রাজার কাকা জ্যাঠা সভাসদরা মন্ত্রণা করতে বসলেন - কি করলে রাজার এই পাপ মুক্তি হয়। ঠিক হল শিব পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভাগবত পাঠ, ব্রাহ্মণ ভোজন, গো তিল কাঞ্চন দান করে রাজাকে নানা তীর্থের জলে স্নান করাতে হবে। এই সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার পর রাজা ধীরে ধীরে পাপ মুক্ত হল।

এদিকে ময়নায় রাণী রঞ্জাবতী ঘুম থেকে উঠে দেখে তার কোলের পাশে কুমার নাই, রাণী মাণিকী কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করল, রাজাকে ওঠানো হল, সব জায়গা পাতি পাতি করে খোঁজ হল, কিন্তু শিশু লাউসেনকে কোথাও পাওয়া গেল না। রঞ্জাবতী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

'রঞ্জাবতী কাঁদেন ভূমিতে গড়াগড়ি।	বুক বিদারিয়া যায় তোমা না দেখিয়া।
কে নিল মানিক চাঁদ আঁধালার নড়ী।।	কালি দুগ্ধ দিনু বাছা এখানে বসিয়া।।'

(৭৭০)

রাজার লোক জন পাড়ায় পাড়ায় চোর খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। পুত্রকে না পেয়ে রঞ্জাবতী জলে ঝাঁপ দিতে যায়।

'পুত্র হেতু রঞ্জা জলে ঝাঁপ দিতে যায়।
দেখেন বৈকুণ্ঠ হতে প্রভু ধর্মরায় ।।' (৭৭৬)

(৩) কর্পূর সেনের জন্ম ঃ

এই সময় ঠাকুর ধর্মরায় কর্পূর দেওয়া পান খাচ্ছিলেন হঠাৎ তাঁর শ্রীমুখ থেকে এক খন্ড কর্পূর মাটিতে পড়ে গেল আর তার থেকে জন্মাল একটি ফুটফুটে শিশু। কর্পূর থেকে ঐ শিশুর জন্ম বলে ঠাকুর নাম রাখলেন 'কর্পূর'। আর বললেন এই শিশু লাউসেন অপেক্ষা বেশী চালাক হবে। সর্বদা লাউসেনের সঙ্গে থেকে তাকে বুদ্ধি বল যোগাবে। তারপর হনুমানকে ডেকে বললেন - তুমি এই দুটি শিশুকে তাড়াতাড়ি ময়নাগড়ে নিয়ে গিয়ে রঞ্জাকে দিয়ে এস। রঞ্জা পুত্র শোকে ব্যাকুল। এমনকি জলে ঝাঁপ দিতে যায়। তুমি তুরিতে সেখানে যাও।

(৪) হনুমানের ময়না যাত্রা ও লাউসেনকে ফেরত ঃ

হনুমান দু'কোলে দু'শিশুকে নিয়ে ময়না যাত্রা করলেন, ময়নার দক্ষিণ দিকে একটা পুষ্প উদ্যান ছিল, বার বৎসর সেই বাগানে কোন ফুল ফোটে নাই, সেই বাগানে দুই শিশুবে রেখে দৈবজ্ঞের বেশে হনুমান রঞ্জাবতীর কাছে গেলেন।

মায়ারূপী হনুমান রঞ্জাবতীর কাছে গিয়ে পঞ্জিকা পড়ে খড়ি পেতে গনণার ভান করে বললেন - তোমার সন্তান বেঁচে আছে। কাল রাতে চোর এসে তোমার ছেলে চুরি করে নিয়ে গেছে। এই শুনে রঞ্জাবতী দৈবজ্ঞবেশী হনুমানের পায়ে ধরে বললেন - ঠাকুর আপনি পুনরায় গণনা করে বলুন কে আমার ছেলে চুরি করেছে, কোথায় গেলে আমি আমার ছেলেকে পাব। হনুমান আবর পাঁজি দেখে খড়ি পেতে গণনার ভান করে বললেন - তোমার ছেলে খুব আনন্দে আছে, কোন বিঘ্ন হয় নাই, তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমার ছেলেকে দেখিয়ে দেব। এই বলে গণকরূপী হনুমান রঞ্জাবতীকে নিয়ে ঐ মালঞ্চের কাছে গেলেন। লাউসেনের আগমনে বাগানের সমস্ত গাছে ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে। হনুমান ঐ বাগানে গিয়ে প্রথমে কর্পূরকে নিয়ে এসে রঞ্জার হাতে তুলে দিলেন। পুত্র পেয়ে রঞ্জাবতী পরম আনন্দিত, তার মুখে চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন। কিন্তু মনে একটা সংশয় দেখা দেয়, যেদিন লাউসেন জন্ম গ্রহণ করেছিল সে দিন যেন অন্ধকারে মানিক জ্বলেছিল। তাই তিনি এই শিশুকে ঘরে নিয়ে গেলেন, কিন্তু সেই রকম কোন দীপ্তি বের হল না, তাই রঞ্জাবতী ঘর থেকে বেরিয়ে গণকের কাছে গিয়ে বললেন - আপনি কার ছেলেকে এনে দিয়েছেন, তখন গণকরূপী হনুমান বল্লেন এ'তোমার ছেলে লাউসেন নয় ঠিকই, তবে আসল ঘটনা তুমি শোন -

ইন্দা মেটেকে ময়না পাঠিয়ে তোমার ভাই ও গৌড়েশ্বর তোমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। চোররা লাউসেনকে গঙ্গার ধারে বেনা বনে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঠাকুর নিরঞ্জনের নির্দেশে আমি শঙ্খচিল হয়ে লাউসেনকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসি। সেই সময় ঠাকুরের মুখের কর্পূর তাম্বুল থেকে আর একটি শিশু জন্মায়, ঠাকুর সেই শিশুর নাম রাখলেন কর্পূর, ঠাকুর নিরঞ্জন দু'টি শিশুকেই তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, এইটিই হল কর্পূর, কর্পূর সব সময় লাউসেনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। তার বিপদে আপদে যুক্তি পরামর্শ দিয়ে সহায্য করবে। এই বলে হনুমান লাউসেনকেও এনে রঞ্জাবতীর হাতে দিলেন। রঞ্জাবতী দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মহানন্দে রাজবাড়ি ফিরে গেলেন। লাউসেনকে ফিরে পাওয়ায় ময়না নগরে আনন্দের সীমা রইল না।

ছয়
আখড়া নিশাপালা
(১) লাউসেন ও কর্পূরের বিদ্যারম্ভ ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ঃ

(ক) বিদ্যারম্ভ ঃ

দিনে দিনে দু'ভাই বড় হতে লাগল, কিন্তু তাদের লেখা পড়ার বদলে খেলার দিকেই মন বেশি, তারা দু'জনে সর্বদাই কানাই-বলাই সেজে কৃষ্ণের সব কিছু লীলা খেলার অভিনয় করতে থাকে। পুতনা বধ থেকে শুরু করে গোপিনীদের সঙ্গে খেলা - কালিয়া দমন শঙ্খচূড় বধ, সব শেষে কংশকে বধ, বন্দীশালা থেকে পিতামাতাকে উদ্ধার। এসবই তারা দু'জন খেলার ছলে দেখাতো। কিন্তু লেখাপড়া না করায় রাজারাণীর মন খুব খারাপ।
রাজারাণী তখন জয়পতি মন্ডলকে ডেকে একজন ভাল পাঠগুরু ঠিক করে দিতে বললেন - ময়নার মধ্যে বিখ্যাত পাঠগুরু মনোহর বিপ্রকে জয়পতি ডেকে আনলেন। রঞ্জাবতী তাঁকে মিনতি করে বললেন - আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই দুই পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহন করুণ। আপনার গুরু দক্ষিণার কোন অভাব হবে না। শুভদিন দেখে দুজনার বিদ্যারম্ভ হল। দু'জনায় গুরুগৃহে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলো। অবিরাম গুরুগৃহে পড়াশোনা করে তারা সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হয়ে উঠল। রাজারাণী বিপ্রকে নানা ধনরত্ন গুরু দক্ষিণা দিলেন।

(খ) মল্লযুদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা ঃ

এরপর দুভাই অস্ত্রশাস্ত্রেও নিপুন হয়ে উঠল। দু'ভাই'কে মল্লযুদ্ধ শেখাবারও ইচ্ছা হল রাজা রাণীর, তাই জয়পতি মন্ডলকে একজন মল্লগুরুর সন্ধান করতে বললেন। জয়পতি বললেন - এদেশে লাউসেনের যোগ্য কোন মল্লগুরু নাই, তবে রমতীর(রাণীমায়ের বাপের বাড়ীর) সারেঙ্গ ধল এক জন বিখ্যাত মল্ল, একাই বাইস হাতির বল ধরে, তাকে নিয়ে এলে আপনার পুত্ররা ভাল মল্লযুদ্ধ শিখতে পারবে। রঞ্জাবতী বললেন - এ খুব ভল কথা, রমতীর মল্লরা তো আমাদের প্রজা, খুব যত্ন করে ছেলেদের মল্লযুদ্ধ শেখাবে। এই বলে রমতীর সারেঙ্গ মালকে ময়নাতে আনার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

এ'দিকে বৈকুণ্ঠতে বসে হনুমান এই সব যুক্তি শুনছিলেন, হনুমান ঠাকুর নিরঞ্জনকে বললেন - প্রভু রমতীর মালেরা সব মহাপাত্রের অধীনে থাকে, মহাপাত্রের কথায় সারেঙ্গধল মল্লযুদ্ধ শেখাবার ছলে লাউসেনকে বিনাশ করে ফেলবে। তাই এই কাজ ঠিক হবেনা। তখন প্রভু মায়াধর উলুককে জিজ্ঞাসা করলেন - উলুক কি উপায় করা যায়? উলুক হাত জোড় করে বলল - প্রভু আমার মনে হয় হনুমান ছাড়া লাউসেনকে মল্লবিদ্যা শেখার আর উপযুক্ত কেউ নাই, প্রভু আপনি হনুমানকে ময়না পাঠিয়ে দিন, উলুকের কথায় হনুমানকে ডেকে প্রভু ময়াধর বললেন - তুমি অবিলম্বে ময়না গিয়ে লাউসেন, কর্পূরকে মল্ল যুদ্ধ শেখাবে। তুমি ছাড়া আর কোন ভাল যোদ্ধা এ সংসারে নাই। তাই বিলম্ব না করে শিঘ্র ময়না যাও, আর দুভাইকে মল্ল যুদ্ধ শিখাও। প্রভু নিরঞ্জনের এই কথা শুনে হনুমান আনন্দিত মনে ময়নার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ময়নায় প্রবেশ করার আগে হনুমান ভাবল, এই বেশে রাজবাড়ীর ভেতর যাওয়া ঠিক নয়। তাই বৃদ্ধ মল্লর বেশে রাজবাড়ীর ভেতর গিয়ে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন - আমি একজন মল্ল শিক্ষাবিদ, আমার নাম মল্ল মনু, আমার বয়সের কোন লেখাজোখা নাই, পূর্বাপর আমার অযোধ্যায় যাতায়াত ছিল, রাম রাবণের যুদ্ধ দেখেছি, যুবক বয়সে ছ'মাসের পথ একদিনে যেতাম, মাথায় করে গন্ধমাদন পর্ব্বত এনেছি। এখন বৃদ্ধ হয়েছি, তবে শিক্ষাদানে অসুবিধা নাই. মল্লযোদ্ধারূপী হনুমানের কথায় রাজারাণী তাঁকেই লাউসেন কর্পূরের উপযুক্ত মল্লশিক্ষক বলে গণ্য করে মল্ল শিক্ষাদানের জন্য অনুরোধ করেন। হনুমান এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে লাউসেন ও কর্পূরকে মল্লযুদ্ধ শেখাতে আরম্ভ করলেন। এই শিক্ষাদানের জন্য একটি উপযুক্ত আখড়া ঘর তৈরী হল। লাউসেন ও কর্পূর অল্প সময়ের মধ্যেই মল্লযুদ্ধ বিশারদ হয়ে উঠল, তার মধ্যে লাউসেনকে ধর্মরাজ ক্ষীর খাইয়েছিলেন বলে কর্পূর অপেক্ষা লাউসেন মল্লযুদ্ধে অধিক পারদর্শি হয়ে উঠল। লাউসেন কর্পূরের মল্লযুদ্ধ শিক্ষা সম্পন্ন হয়ে গেলে হনুমান বাড়ী যেতে চাইলেন, তখন লাউসেন, কর্পূর, মা সকলে মিলে মল্লযুদ্ধ শিক্ষাবিদরূপী হনুমানকে আরও কিছুদিন ময়নাতে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু হনুমান বললেন - আমার শিষ্যদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, আর অনেক দিন বাড়ী থেকে এসেছি, তাই বাড়ির জন্য খুব মন খারাপ, সে কারণে এখনই যেতে চাই। এই শুনে রাণী রঞ্জাবতী বড় থালায় করে নানাবিধ দ্রব্য কাঞ্চনরত্ন ইত্যাদি গুরুদক্ষিণা হিসাবে হনুমানের সামনে রেখে প্রণাম করলেন। হনুমান হেসে বললেন আমার কোন দ্রব্যের অভাব নাই। আমি সব ছেড়ে শ্রীরামের নাম সার করেছি। আমার এসব কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। আমার শিষ্যরা উপযুক্তভাবে শিক্ষা লাভ করে মল্লযুদ্ধ বিশারদ হয়েছে এটাই আমার উপযুক্ত গুরু দক্ষিণা। এই বলে হনুমান বিদায় নিলেন। লাউসেন, কর্পূর গুরুর পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। গুরু চলে যাবার পরও দু'ভাই সব সময় আখড়া শালে মল্লযুদ্ধ অভ্যাস করতে থাকেন।

(২) দশভুজা মা দুর্গা কর্তৃক লাউসেনের ধর্মরাজ ভক্তির পরীক্ষা ঃ

এদিকে শরৎকাল উপস্থিত, মা দশভুজা দুর্গার পূজার আয়োজন চলছে সর্বত্র। কোথাও দশভূজা, কোথাও অষ্টাভূজা, কোথাও চতুর্ভুজা দুর্গাপ্রতিমার পূজার ব্যবস্থা হয়েছে। দেবী পার্বতী কৈলাশ থেকে পূজার আয়োজন দেখে মহাদেবকে বললেন -

'ত্রিভুবনে পূজে মোকে দেবাসুর নরে।	তিন দিবসের তরে যদি আজ্ঞা হয়।
মনে সাধ যেতে চাই সবাকার ঘরে।।	পূজা দেখিবারে যাই নায়ক নিলয়।।'

(২৯৪)

একথা শুনে মহাদেব বললেন আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আর কোথাও যেতে পারবো না। তাছাড়া কার বউ, কার মেয়ে লোকের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়, কোন দেব কন্যা এত ডাকাবুকো, ঢাল তলোয়ার নিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তোমার জন্য সর্বত্র আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। এই কথা শুনে ভবানী বললেন - তোমার নিজের দোষ ঢাকার জন্য আমাকে এসব কথা বলছো, তুমি ভিক্ষার ছলে ঘুরে ঘুরে কোচ বধুদের সঙ্গে বিহার করে বেড়াও। এই বৃদ্ধ বয়সে কুলে কালি দিচ্ছ, আর আমি না খাঁড়া ধরলে সৃষ্টি নাশ হয়ে যেত। এই বলে দেবী দশভুজা,

কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সহচরী পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে সিংহ যানে পূজা দেখতে বেরিয়ে পড়লেন।

মা মহামায়া ত্রিজগতের ঘরে ঘরে পূজা দেখতে গেলেন, - অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, কর্ণাট, দ্বারকা, গোকুল, ভেলঙ্গ, গুজরাট, অযোধ্যা, মথুরা, গয়া, কুরুক্ষেত্র, হস্তিনা নগর, মল্ল, মথুরা, মগধ, বৃন্দাবন, বারানসী কামিক্ষা, কান্যকুব্জ, কালিঘাট, গৌড়, ক্ষীরগ্রাম, হিজলী, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জায়গার পূজা দেখে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে ময়না নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানকার বাড়ি ঘর রাজপ্রাসাদ আর তাল তমাল খেজুর নারকেল আম জাম কলা কদম্ব বকুল প্রভৃতি গাছের শোভ দেখে দেবী মোহিত হয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে কোন ঘরে দুর্গাপূজা হয় নাই।

'পুরী দেখে পার্বতীর পরম কৌতুক। বারষিক পূজা মোর ত্রিলোক বিদিত।।
জিজ্ঞাসিলা পদ্মাকে এদেশে কেবা ভূপ।। মহা পূজা ত্রিজগতে দেখি সর্ব ঠাঁই।
সকল সুন্দর দেখি এক অনুচিত। এ কেমন দেশ যে আমার পূজা নাই।।'

(৪১৮)

ময়নাতে দুর্গাপূজা দেখতে না পেয়ে দেবী পার্বতী রেগে গেলেন। তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠল, ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। দেবীর এই ক্রোধ দেখে পদ্মাবতী বলেন - আপনি ত্রিভূবন মাতা, আপনি অনুগ্রহ করে পূর্ব কথা কিছু অনুধাবন করুন, আমি সেই পূর্ব কথা আপনাকে সবিশেষ নিবেদন করছি -

একদিন প্রভু নিরঞ্জন ইন্দ্রপুরে অম্বুবতীর নৃত্য দেখার জন্য গিয়েছিলেন, আপনিও সেই নৃত্যসভায় যাচ্ছিলেন, পথে অম্বুবতীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়, সে আপনাকে চিনতে না পারায় অশ্রদ্ধা করেছিল, তাই আপনার শাপে অম্বুবতীর নৃত্যে বিঘ্ন ঘটে, তখন প্রভু নিরঞ্জন আপনার কাছে পাঠান ক্ষমা চাইতে, আপনি তখন পৃথিবীতে ধর্মপূজা প্রচারের জন্য অম্বুবতীকে রমতীর রাণী মন্থরা গর্ভে জন্ম নিতে পাঠান, আর বলেছিলেন মানবরূপী অম্বুবতীর গর্ভে লম্বোদিত্য জন্মগ্রহণ করবে পৃথিবীতে ধর্মপূজা প্রচারের জন্য। ময়নার যুবরাজ লাউসেনই হচ্ছেন মানবরূপী সেই লম্বোদিত্য, আর তাঁর মা ময়নার রাণী রঞ্জাবতী হচ্ছেন মানবরূপী অম্বুবতী, এই লাউসেনই আপনার মধ্য দিয়ে ধর্মপূজা পদ্ধতি প্রকাশের জন্য একমনে ধর্মপূজা করেন। আর সেই কারনেই ময়না নগরে আপনার পূজা হয় না। এই কথা শুনে ভগবতী দুর্গা হেসে বললেন - পদ্মাবতী তুমি ভাল কথা শুনালে। না হলে আমি হয়ত অজান্তে কোন শাপ দিয়ে লাউসেনের ক্ষতি করে দিতাম। কিন্তু মনে মনে বল্লেন -

কিন্তু বুঝে নিতে চাই তপস্বী কেমন। তবে কার্ত্তিক গণেশ হতে লাউসেন বড়।।
কোন ভক্তি ভাবে পূজে ধর্মের চরণ।। বর দিব যথোচিত কি বলিব বাড়া।
ধর্মের চরণ যদি ভক্তি থাকে দড়। দান দিয়া যাব জয়মঙ্গল এ খাঁড়া'।।

(৪৫৬)

মা ভবানী লাউসেনকে পরীক্ষা করার জন্য ভুবনমোহিনী রূপ ধরলেন -

'ভুবন মোহিনী হৈল ভবানীর বেশ।
নরসিংহ গীত রচে ধর্মের আদেশ।।' (৫৩২)

মহামায়া মনোমোহিনীরূপ ধরে লাউসেনের পালঙ্কের উপর গিয়ে বসলেন, লাউসেন তখন ঘুমে অচেতন, লাউসেনকে জাগিয়ে তোলার জন্য মোহিনীরূপী মহামায়া হাতের কঙ্কণ, পায়ের নূপুর বাজাতে লাগলেন, গায়ে আস্তে আস্তে হাত দিতে উঠাতে লাগলেন। লাউসেন জেগে উঠে পরমাসুন্দরী এক মহিলাকে নিজের পালঙ্কে বসে থাকতে দেখে হতচকিত হয়ে মনে মনে বললেন - এখানে এতদিন রয়েছি, এত সুন্দরী মেয়ে তো কখনও দেখি নাই, এ'কার কুলবধু, কেমন কুলবধু, এখানেই এসেছেন কেন? এর কি কোন লাজ লজ্জার ভয় নাই -

"রূপ দেখে অনুমান অন্তরে বিস্তর।
উর্বশী আপনি প্রায় এসেছে এ ঘর।। (৬৮০)
রম্ভা তিলোত্তমা কিম্বা ইন্দ্রের নাচনি।
নয়নে না দেখি হেন নবীন যৌবনী।।" (৬৮২)

এই রকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে লাউসেন মোহিনীরূপী মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করলেন - তুমি কোথা থেকে এসেছে, তুমি কার কন্যা? এখানে আমার কাছে কি প্রয়োজনে এসেছো? এই সব প্রশ্ন শুনে প্রথমে ছলনাময়ী ভবানী অধোমুখে চুপ করে রইলেন কিন্তু কিঞ্চিৎ মাথায় বস্ত্র সরিয়ে কটাক্ষ করে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন - আমার নাম ত্রিপুরা সুন্দরী, আমার বাবা আমাকে এক বৃদ্ধ বরে বিয়ে দেন, সে ভাঙ্গ খেয়ে আমাকে সর্বদাই গালাগালি দেয়, আমার আর সহ্য হয়না, তাই আমি অনুতাপে ঘর ছেড়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই, কিছুদিন মহাযোগ বলে কৈলাশে ছিলাম, এখন কিছু দিন গেলাহাটে আছি। সেখানে আমার বড় বোন সুরক্ষা ঔষধে ছ'কুড়ি নাগরকে ভুলিয়ে রেখেছে। আমি লোক মুখে আপনার কথা শুনে এখানে চলে এলাম। চলুন আমরা কোন দূর দেশে গিয়ে ঘর বাঁধি। আমি আপনার জন্য জাত কুল ত্যাগ করে কুলে কালি দিয়ে মাথায় কলঙ্কের ডালি নিয়ে নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করলুম। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। এই বলে —

'লাউসেন ভুলাতে লাবণ্য নানা রঙ্গ।
খসায়ে বুকের বাস দেখাইল অঙ্গ।।' (৭৩৪)

ছলনাময়ী ভবানীর ঐসব কথা ও হাব ভাব দেখে কানে হাত দিয়ে লাউসেন রাম নাম করতে লাগলেন। আর ঐ লাস্যময়ী নারীকে বললেন - তুমি আমার সঙ্গে এত ছলাকলা করছো কেন? আমি ধর্মের সেবক ধর্মপূজা কবি, আমার কাছে তোমার কোন কার্য সিদ্ধ হবে না, তুমি কোন লম্পট রাজকুমারের কাছে যাও। যার পরদারে মন থাকে। লাউসেনের এই কথা শুনে দেবী হেসে বললেন - আপনি বলছেন পরদারে মন দিলে পাপ কার্য হয়, তাহলে সীতাকে রাবণ চুরি করেছিল কেন? পুরন্দর গুরুর স্ত্রী হরণ করেছিলেন কেন? লাউসেন জানালেন

এগুলো সবই অন্যায় কাজ। আমি পরস্ত্রীকে মায়ের সমান দেখি। তাই তোমার চরণে দেবী নমস্কার করি। তুমি আমার মা রঞ্জাবতী অপেক্ষা অধিক।

'আমি মায়ের সমান দেখি পরের যুবতী।।
তোমার চরণে দেবী করি নমস্কার।
তুমি রঞ্জাবতী মাতা হৈতে অধিক আমার।।' (৭৭৮)

এত ছলনা করার পরও যখন লাউসেনকে দেবী ভোলাতে পারলেন না তখন নিজে নিজেই বললেন 'বুঝিলাম লাউসেন ধর্মপরায়ণ'। দেবী লাউসেনকে নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন - আমি অনন্তরূপিনী আদ্যাশক্তি, তোমার ধর্মভক্তি পরীক্ষা করতে এসেছিলাম, দেখলাম তোমার পাপে কোন মন নাই। ধর্মের প্রতি তোমার অগাধ ভক্তি। তুমি আমার কাছে বর চাও, তোমাকে বর দিয়ে আমি কৈলাশ ভবনে যাবো। তখন লাউসেন বললেন - আপনার কথায় আমার খুব একটা বিশ্বাস হচ্ছে না। ব্রহ্মা আদি দেবতা ধ্যানেতে যাঁর অন্ত পান না, সেই জন শুধু শুধু আমার কাছে আসবেন কেন? তবে যদি আপনি আপনার দশভূজা রূপ দেখান তাহলে আমার বিশ্বাস হবে।

'ব্রহ্মা আদি দেব যারে ধ্যানেতে না পান।
পঞ্চমুখে মহেশ সদাই গুণ গান।।
কি কারণে এখানে আসিবে সেই জন।
একথায় প্রত্যয় না হয় মোর মন।।
তবে হয় প্রবোধ দেখিলে দশভুজা।
যে রূপে আশ্বিন মাসে লোক দেয় পূজা।।'
(৭৯০)

এই কথা শুনে ভগবতী একটু হেসে দশভূজা মূর্তি ধারণ করলেন। লাউসেন মা দুর্গার সিংহারূঢ়া দশভূজা মহিষমর্দ্দিনী রূপ দেখে মোহিত হয়ে দু' হাত জোড় করে স্তব করতে লাগলেন।

'আদ্যাশক্তি মহামায়া মহিমা অপার।
অসুর নাশিতে হৈল নানা অবতার।।'(৮১৬)
' নিক্ষেপন কৌসম্ব করেন করদ্রতে।
ব্রাহ্মাণী রূপিনী নারায়ণি নমস্তুতে।।'(৮২০)
' ময়ুর কর্ব্বটারূপা শক্তি চর্ম হাতে।
কুমারী রূপিনী নারায়ণকন্দ মাথে।।
শঙ্খ চক্র গদাহাতে সারঙ্গ ধারিণী।
গৃহীতা পরম উর্দ্ধে বৈষ্টবি রূপিণী।।
গলে বনমালা শোভে গরুড় বাহনা।
নারায়ণি নমস্তুতে পুরহ কামনা।।' (৮৩০)
শ্মশানে বাসিনী রক্তমাংস ভোগী সদা।
প্রসিদমে নমস্তুতে শিবানী মোক্ষদা।।
বিকট দশনা কালী করাল বদনা।
ললিত বসনা শিরমালা বিভূষণা।।
চামুন্ডা ধারণে নাম বধে চন্ড মুন্ড।
নমস্তুতে উগ্রচন্ডা সমর প্রচন্ড।।' (৮৪৮)
'সর্ব্বেসা তামসীরূপা সর্বভূতাধার।
আগমের অগোচর মহিমা তোমার।।
সর্বশক্তি সমন্নিতা তুমি সর্বভূতে।
প্রসিদমে মাতা নারায়ণি নমস্তুতে।। '
(৮৫৬)

লাউসেনের স্তব শুনে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বর চাইতে বললেন -

'স্তব শুনে সন্তুষ্টা হইলা ভগবতী। (৮৫৭) বুঝিলাম ধর্ম্মপদে ভক্তিভাব দড়।
ভনে নরসিংহ বসু মধুর ভারথি।। বর মেগে লহ যে তোমার সাধ মনে।।
ভবানী বলেন বাছা তুমি ভক্ত বড়। শুনে নিবেদয় সেন অভয়ার চরণে।।'(৮৬২)

ভবানীর এই কথা শুনে লাউসেন হাত জোড় করে দেবী ভবানীকে বললেন - না জেনে আপনার চরণে কত অপরাধ করেছি, কত কথা বলেছি। আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন, আর কৃপা করে যদি বর দিতে চাইলেন তাহলে আপনার হাতের খড়্গখানি আমাকে দিন। এটি পেলে আমার আশা পরিপূর্ণ হয়। ভবানী তখন বললেন -

ইন্দ্র যখন মহিষাসুরের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হলেন, মহিষাসুরের ভয়ে দেবতাগণ কম্পিত, তখন বিধাতা ব্রহ্মা বিষ্ণু বরুণের পরামর্শে দেবতাগণ নিজ নিজ তেজ উদ্‌গার করে আমার এই মহিষমর্দ্দিনী সাকার রূপ দিলেন, আর প্রত্যেকে নিজ নিজ অস্ত্র আমাকে সমর্পণ করলেন।

'নিজ নিজ অস্ত্র হতে যত দেবগণ। যমদন্ড নাগপাশ দিলা জলেশ্বর।
একে একে আমাকে করিল সমর্পণ।। প্রজাপতি অক্ষমালা রশ্মি দিবাকর।। (৮৯০)
বিষ্ণু চক্র দিলেন শঙ্কর দিল শূল। বসন বিমল হার দিল ক্ষীর সিন্ধু।
বরুণ দিলেন শঙ্খ ব্রহ্মা কমন্ডুল।। বিশ্বকর্মা চূড়ামণি ভুষা অর্থ ইন্দু।।
বহ্নি শক্তি পবন দিলেন ধনুশর। কাল এনে খড়্গচর্ম দিল অবশেষে।
ঐরাবত হতে ঘন্টা, বজ্র পুরন্দর।। সেই খড়্গ এই ইথে কেটেছি মহিষে।। (৮৯৪)
চন্ডমুন্ড রক্তবীজ ইহাতে নিধন।
এ খড়্গ কেটেছে শম্ভু নিশম্ভু দুজন।।' (৮৯৬)

এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে খড়্গ দিয়ে মহিষকে কেটে মহিষাসুর বধ করেছি, চন্ডমুন্ড, শম্ভু নিশম্ভু কেটেছি। এই খড়্গের জন্য দেবলোক নির্ভয়ে থাকে। তাই খড়্গ দিতে মন চাইছে না, তুমি অন্য কিছু বর নাও। এই কথা শুনে লাউসেন জোড় হাত করে বললেন - এই খড়্গ পেলে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হত, অন্য কোন বরে আর কি কাজ, এই বলে অধোমুখে বসে রইলেন। ভবানী লাউসেনের মনের ভাব বুঝতে পেরে মনে মনে চিন্তা করলেন - কলিকালে ধর্মপূজারপ্রচার নাই, লাউসেনের দ্বারাই ধর্মপূজার প্রচার হবে, একে এই খড়্গ দান করলে ধর্ম তুষ্ট হবেন। - এই সব মনে মনে যুক্তি করে লাউসেনকে ডেকে দেবী তাঁর হাতে খড়্গ দিয়ে বললেন - এই অস্ত্র খুব সাবধানে রাখবে। এই অস্ত্রের দ্বারা তুমি সর্বত্র বিজয় লাভ করবে।

'যতনে এ অস্ত্র বাছা রেখো সাবধানে।
এ অস্ত্রে বিজয় তুমি হবে সর্বস্থানে।।' (৯২০)

এই বলে দেবী দুর্গা কৈলাশে মহাদেবের কাছে ফিরে গেলেন।

আখড়া নিশা পালা

এদিকে কর্পূর শুয়ে শুয়ে সব দেখছিলেন, ভবানী চলে যাবার পর দাদা লাউসেনকে কপট রাগ দেখিয়ে বললো - দাদা তুমি কোথা হতে কার নারী এই রাতের বেলায় এখানে এনেছিলে. লোকে জানে তুমি তপস্বী, এখন দেখা গেল তুমি ভন্ড বিড়াল তপস্বী। তখন লাউসেন কর্পূরের হাত ধরে বললেন - ভাই কর্পূর তুমি মন দিয়ে শুন এ অন্য কোন নারী নয়, দেবী দুর্গা, নানা ছলা কলা করে আমাকে পরীক্ষা করতে এনেছিলেন, শেষে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে তাঁর হাতের এই খড়্গ দান করে গেছেন। এই বলে কর্পূরকে দেবীর দেওয়া খড়্গটি দেখালেন, খড়্গ দেখে কর্পূরের খুব আনন্দ হল, বললেন দাদা তোমার জীবন সার্থক। এখন আর মাতুলকে কোন ভয় নাই। এই বলে দু-ভাই মাতা পিতার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলে সুন্দর খড়্গটি তাদের দেখালেন এবং জোড়হাত করে মাকে জানালেন - দেবী ভবানী প্রসন্ন হয়ে এই খড়্গ দিয়েছেন, এখন এই খড়্গের উপযুক্ত একটি ঢালের (ফলা) প্রয়োজন। ঢাল ছাড়া তলোয়ার ঠিক শোভা পায় না। এই কথা শুনে রাজা কর্ণসেন বললেন -অস্ত্রাগারে অনেক ফলা(ঢাল) আছে। তোমাদের যা ইচ্ছা তাই নিও। ওই শুনে দুভাই অস্ত্রাগারে গিয়ে বিচিত্র সব ফলা দেখলো, কিন্তু ঐ গুলো সব জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ফিরে এসে রাজা রাণীর কাছে জোড় হাতে নতুন ফলা (ঢাল) নির্মাণের জন্য আবেদন জানালেন। তখন রাজা জয়পতি মন্ডলকে ডেকে নতুন ফলা (ঢাল) তৈরীর ব্যবস্থা করতে বললেন। জয়পতি মন্ডল নন্দ কামারকে ডেকে আনলো। রাজা তাকে ঢাল তৈরীর নির্দেশ দিলেন।

সাত

মাল বধপালা

১) ঢাল নির্মাণ :

ঢাল নির্মাণের আদেশ পেয়ে নন্দকামার কুড়ুল নিয়ে বনের মধ্যে চলে গেল ফলার কাঠ কাটার জন্য। বনের ভেতর গিয়ে শিমূল, শাল, বেল, অশ্বত্থ এই সব গাছ দেখে কাটতে যায়, কিন্তু গাছেরা যেন বলতে থাকে আমরা কি অন্যায় করেছি যে আমাদের কাটছো, গাছেদের কথা বলতে দেখে কামার তো ভয় পেয়ে এ বন থেকে সে বনে যায়। সর্বত্রই ফলে ফুলে সব গাছই একই কথা বলে, কামার ক্লান্ত হয়ে গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় ধর্মরাজ এসে বললেন - তোমার সামনে যে মান্দার গাছ দেখছো ঐ গাছ কেটে নিয়ে ফলা তৈরী কর। কামার তখন ঐ গাছ কেটে নিয়ে আনন্দে বাড়ি গেল ফলা (ঢাল) তৈরীর জন্য।

এদিকে বৈকুণ্ঠে ধর্মরাজ হনুমানকে জানালেন - লাউসেনের ফলা (ঢাল) তৈরী করার ভাল লোক কই, হনুমান তখন বললো - আপনি বিশ্বকর্মাকে ময়না পাঠিয়ে দিন, বিশ্বকর্মা কারিগর, উনি উত্তম ফলা নির্মাণ করে দেবেন, হনুমানের কথায় ধর্মরাজ বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন - অবিলম্বে তুমি ময়না নগরে গিয়ে লাউসেনের জন্য উত্তম রূপে ফলা নির্মাণ করে দাও। এই বলে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে দিলেন।

বিশ্বকর্মা নররূপ ধরে মনের আনন্দে নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে ময়নার কর্মকারের ঘরে রাত্রিতে উপস্থিত হলেন। প্রথমে কাঠ কেটে চৌরস করে ফলা (ঢাল) নির্মাণ করলেন, তারপর তুলি নিয়ে ফলার মধ্যে নানা চিত্র অঙ্কন করলেন - সীতা হরণ, রাম রাবণের যুদ্ধ, কংসের কারাগারে নারায়ণের জন্ম, পুতনা বধ, কংস বধ, তারপর মহাভারতের কথা, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, তারপর আঁকলেন পুরির স্বর্গদ্বার জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা, তারপর গোলক ধাম, লক্ষ্মী নারায়ণ, আর একদিকে দশভূজা দুর্গা মহিষমর্দ্দিনীরূপে মহিষাসুরবধ, লিখলেন অনন্ত নাগের ওপর পৃথিবী তাতে সুমেরু কুমেরু পাহাড়, পর্বত সাগর উপসাগর বনজঙ্গল, বন্যজন্তু, জলচর ইত্যাদি। এরপর আঁকলেন বর্তমানের রাজা গৌড়েশ্বর, রাণী ভানুমতি, বেণুরায়, মন্থরা, কর্ণসেন, রঞ্জাবতী, ময়না নগর, লাউসেন কর্পূর, কলিঙ্গ, কানড়া, অমলা বিমলা (লাউসেনের ভাবি চার স্ত্রী), কালুবীর, অভির পাখর, আর আঁকলেন পাতর মহামদের ভবিষ্যতের একটা রূপ, যেখানে দেখা যাচ্ছে পাতর লখ্যা ডুমনির পায়ে পড়ে আছে, মাথায় শেয়ালে পেচ্ছাব করছে। এই সব চিত্র আঁকার পর মাঝখানে ধর্মের পাদুকা এঁকে শাল ঘরে ঢাল রেখে বিশ্বকর্মা সূর্যোদয়ের পূর্বে নিজ স্থানে প্রস্থান করলেন।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কামার ঢাল তৈরীর জন্য শাল ঘরে গিয়ে দেখলো অপূর্ব এক ঢাল নির্মাণ করা রয়েছে আর তাতে আঁকা রয়েছে নানা অবতার, নানা চিত্র, এই দেখে কামারের আনন্দ ধরে না, মনে মনে ভাবল এই সুন্দর ফলা কে নির্মাণ করলেন, তাঁকে না দেখার জন্য মনে অনুতাপও হল। যাই হোক ফলা (ঢাল) নিয়ে কর্ণসেনের কাছে গিয়ে তাঁকে

নমস্কার করে তাঁর হাতে ফলা দিলেন। ফলা দেখে রাজা কর্ণসেনতো অবাক, ফলার ওপর রবি শশী যেন একত্রে উদয় হয়েছে, ভাগবত মহাভারত রামায়ণে যত লীলা আছে, যত অবতার আছেন সব ওই ফলার ওপর আঁকা হয়েছে দেখে রাজা আনন্দিত হয়ে কামারকে নিজের গায়ের উত্তরিও খুলে পরিয়ে দিলেন, চড়ার ঘোড়া ও নগদ অনেক টাকা পয়সা পুরস্কার দিলেন।

রাজা কর্ণসেন সেই ফলা নিয়ে রাণী রঞ্জাবতীকে দেখাবার জন্য অন্দরমহলে গেলেন। রাজা রাণীকে বললেন এই ফলা বিশ্বকর্মা গড়েছেন। এত সুন্দর ফলা কোথাও দেখা যায়না, রাণী ফলার মধ্যে দেখলেন মাতা পিতা ভগ্নী ভানুমাতী, রাজা গৌড়েশ্বরকে দেখে তার বেশ অভিমান হল। তারপর দেখলেন ভাই মহামদের মুখে চুনকালি, আর তার মাথায় শিয়ালে পেচ্ছাব করছে। তাঁরা ফলার বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করলেন - এমন সময় দু'ভাই লাউসেন আর কর্পূর এলেন, তাঁরা ফলা (ঢাল) দেখে খুব আনন্দিত হলেন। বিশেষ করে ফলার মাঝে ধর্মের রথঘর ও পাদুকা দেখে। তারপর তারা ঐ ঢাল আর তলোয়ার নিয়ে প্রতিদিন অনুশীলন করতে লাগলেন। ফলা বিদ্যায় লাউসেন খুব নিপুণ হয়ে উঠল, কর্পূর তখন লাউসেনকে বললো - তুমি ধর্মের কৃপায় অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ হয়ে উঠেছো, তোমার এই প্রতিভা ঘরে বসে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। বাইরে না গেলে এই প্রতিভা প্রকাশ পাবে না। সুতরাং সব থেকে ভাল জায়গা হচ্ছে মেসোমশাই রাজা গৌড়েশ্বর দরবারে যাওয়া, ওখানে রাজা তোমার যশ গুণ বুঝতে পারলে তুমি অনেক কিছু পাবে। কর্পূরের ওই কথা শুনে লাউসেন রাজি হয়ে গেল। তখন কর্পূর বললো - চলো প্রথমে বাবা মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি, পিতামাতা অপেক্ষা বড় গুরু পৃথিবীতে আর কেউ নাই।

'বিদায় হইয়া চল মা বাপের ঠাঁই। পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতা কল্পতরু।।
জনক জননী হতে বাড়া গুরু নাই।। পিতার পিরিতে সব দেবতার প্রীত।
বেদের বচন দাদা পিতামাতা গুরু। পিতা অপেক্ষা মাতা গুরু শাস্ত্রের লিখিত।।'
(৫৮৪)

তাই চল আমরা মা বাবার আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসি, তাঁদের আশীর্ব্বাদে সর্বত্র জয় হবে। -

'মা বাপের আশীর্ব্বাদ সব ঠাঁই জয়।
বিদায় হইয়া যেতে উপযুক্ত হয়।।' (৫৮৮)

এই বলে লাউসেন কর্পূর প্রথমে পিতা কর্ণসেনের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললেন - আমরা গৌড় যেতে চাই, আপনি দয়া করে অনুমতি করুন। ওই কথা শুনে কর্ণসেন তো ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, বললেন - অত দূরদেশে তোমাদের যেতে দিতে আমার মন সায় দিচ্ছে না, আমি কিছু বলতে পারছিনা, তোমাদের মায়ের কাছে যাও। বাবার কথা শুনে দু'জনে এবার মা রঞ্জাবতীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললো - মা, আমরা দু'জনায় গৌড়দেশ যেতে চাই। মা শুনে তো একেবারে পাগলের মত অবস্থা। লাউসেনকে বললেন - তোমার মামা মহামদকে জান, সে তোমাকে শিশু কালেই চুরি করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। ঠাকুর নিরঞ্জন তোমাকে

রক্ষা করেছেন, তাই ওখানে এখন যেতে দেব না, তোমার মামা কংসের চেয়ে নিষ্ঠুর। যদি যেতে চাও আরও বড় হয়ে যাবে। সঙ্গে নফর নস্কর ঘোড়া হাতি দেব। আরও ভাল মল্ল বিদ্যা শিখতে চাও ঘরেই ভাল বিশারদ এনে দেবো। মায়ের কথায় দু'ভাই যাত্রাভঙ্গ করলেন।

'যাত্রা ভাঙ্গিলেন দোঁহে মায়ের বচনে। শিবদাসে মায়াধর করিবে কল্যাণ।
কৃপা কর ধর্মচাঁদ শঙ্করী চরণে।। অনাদ্যমঙ্গল বসু নরসিংহ গান।।' (৬৮৪)

২) সারঙ্গধল মাল বধ :

ছেলেদের মল্ল শিক্ষার আরও আগ্রহ দেখে, এবং যাতে মল্ল শিক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে না যায়, তার জন্য রাণী রঞ্জাবতী রাজা কর্ণসেনের কাছে গিয়ে বললেন - ছেলেরা যাতে বাইরে না যেতে পারে তার জন্য রমতী থেকে সারঙ্গ ধলকে নিয়ে এসে ঘরেতে আরও ভাল করে মল্লবিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা কর, তুমি দাদাকে পত্রলিখে সারঙ্গধলকে পাঠিয়ে দিতে বল। রাণীর কথায় কর্ণসেন মহামদের কাছে চিঠি লিখে দিলেন - সারঙ্গধল মালকে শিঘ্র করে ময়না পাঠিয়ে দিতে। সারঙ্গধল লাউসেন ও কর্পূরকে মল্ল বিদ্যা শেখাবে। পত্রবাহক সিঙ্গাদার গৌড়ে গিয়ে মহাপাত্রের হাতে রাজার পত্রটি দিলেন। মহাপাত্র ঐ পত্র পেয়ে মহাখুসী, সারঙ্গধলকে পাঠাবো, এবার ভাগ্না ঠিক নিধন হবে। ওই ভেবে সারঙ্গধলকে ডাকিয়ে বললেন - তুমি সাতজন মাল নিয়ে ময়না যাও, ওখানে আমার ভাগ্নাকে মল্লযুদ্ধ শেখাবে এবং কানে কানে বললেন - মল্লযুদ্ধ শেখাবার সময় তার দু'পা ধরে পাথরে আছাড় দিয়ে ভাগ্নাকে ও কর্পূরকে হত্যা করবে, ওই কাজ করতে পারলে অনেক ইনাম বসনভূষণ পাবে।

'এ কার্য্য তোমাকে দিলাম আমি ভার। মল্লযুদ্ধ শিখাইতে ধরিয়া দু'পায়।
ভাগিনকে নিধন করিবে এই বার।। পাথরে কাছাড়্যা তাকে যেন প্রাণ যায়।।'
(৮১২)

সারঙ্গধল ইনাম পাবার লোভে আনন্দ করতে করতে সাতজন মাল নিয়ে ময়না যাত্রা করলো। ময়না পৌঁছাতেই নগরের লোকেরা মাল দেখতে ছুটে এলো, তার কারণ এই মালেদের চেহারা সব দৈত্যের মতন। সারঙ্গধল এসেছে শুনে রাণী রঞ্জাবতী তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন - দিদি ভানুমতি, রাজা গৌড়েশ্বর, দাদা মহামদ, মা বাঁবা আর খেলার সাথিরা সকলে কে কেমন আছেন। সারঙ্গ জোড়হাতে রঞ্জাদেবীকে জানাল - আপনার কৃপায় সকলেই কুশলে আছেন। এরপর রঞ্জাবতী ছেলেদের মল্লযুদ্ধ শেখাবার কথা বললেন - মালেদের থাকার ঘর, বসবাসের খরচ দিয়ে থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

'মালগণে রঞ্জাবতী দিল বাসাঘর। রন্ধন ভোজন করে করিল শয়ন।
বাসার খরচ দিল পঞ্চাশ মোহর।। ভনে নরসিংহ যার শাঁখারি ভবন।।'
(৯১৬)

পরের দিন সকালে সারঙ্গ মালরা যখন আখড়ায় এল তখন লাউসেন আর কর্পূর

দু'জনায় মল্লযুদ্ধ অনুশীলন করছিল। সাত মালকে দেখে লাউসেন জিজ্ঞাসা করল - তোমরা কারা, কোথা থেকে এখানে এসেছো। লাউসেনের প্রশ্ন শুনে সারঙ্গ বললো - তোমাদের বীরত্বের কথা শুনে তোমার মামা রমাতি নগর থেকে আমাদের পাঠিয়েছেন - তোমাদের ভাল করে মল্লযুদ্ধ শেখাতে। তোমরা নিশ্চয় শুনেছো সারঙ্গধলের কথা। আমিই সেই সারঙ্গধল, শুধু বাঁ হাতেই বাইশটা হাতির বল ধরি, এক নিমিশে পর্বতের চূড়া গুড়ো করতে পারি। হনুমান আমাকে তার ভাই মনে করে। সারঙ্গের ওই সব কথা শুনে লাউসেন একটু হেসে বললো - তুমি নিজের গুণগান নিজেই গাইছ। হনুমান স্বয়ং আমার মল্ল গুরু, আমার কাছে তোমরা কিছু বড়াই করো না। তোমরা শুধু শুধু ওই বিদেশে এসেছো নিজেদের প্রাণ নাশ করতে। লাউসেনের কথায় সারঙ্গ রেগে আগুণ। বললো - আমার চেয়ে বীর এখানে কে আছে এগিয়ে আসুক দেখি, আর তোকে তো আমি এক চড়ে বধ করতে পারি। এই রকম কথা কাটাকাটি হতে হতে দু'জনার মধ্যে ভীষণ মারামারি আর যুদ্ধ বেধে গেল। এই দেখে তো কর্পূর আখড়াঘরের এক কোণে লুকিয়ে পড়ল। লাউসেন সারঙ্গের মল্লযুদ্ধে কখনও সারঙ্গ হারে, কখনও লাউসেন হারে। এক সময় সারঙ্গ লাউসেনকে মাটিতে ফেলে বুকে পাথর চালিয়ে জীবন সংশয় করে তুলল। তখন লাউসেন মনে মনে প্রভু নিরঞ্জন ধর্মরাজের স্তব করতে লাগলেন। লাউসেনের স্তবে বৈকুণ্ঠে ঠাকুর নিরঞ্জন অস্থির হয়ে হনুমানকে বললেন - তুমি তাড়াতাড়ি ময়নার মল্লস্থানে গিয়ে লাউসেনকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর। প্রভুর নির্দেশে হনুমান হাওয়ার গতিতে ময়নার আখড়ার শাল ঘরে পৌছে সকলের অন্তরীক্ষ লাউসেনের বুকের পাথর ঠেলে ফেলে আহত স্থানে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, গুরু হনুমান তাকে আশীর্ব্বাদ করে উপদেশ দিয়ে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

এইবার লাউসেন উঠে দাঁড়িয়ে সিংহনাদে হুঙ্কার ছেড়ে মালদের যুদ্ধের জন্য আবার ডাক দিলেন। মালরাও তার দিকে তেড়ে এল। আবার প্রবল যুদ্ধ বাধল। এবার লাউসেন একসঙ্গে দুজন মালকে আছাড়ে আছাড়ে যমালয়ে পাঠালেন, সব শেষে সারঙ্গকেও পা ধরে আছাড়ে যমালয়ে পাঠালেন তখন ঘরের কোণ থেকে কর্পূর বেরিয়ে এসে বললো - দাদা, আমার খুবই ভয় করছিল, পাছে কিছু হয়। তবে সত্যই তুমি খুব বীর - একে একে সাত মালকে যমালয়ে পাঠালে। একেই বলে যথা ধর্ম তথা জয়।

'সাত মাল নিধন আনন্দের সীমা নাই ওর। মোর মনে ছিল জয় হয় কি না হয়।
কর্পূর বলেন দাদা বড় বল তোর।। ধর্ম যার সখা তার সর্ব ঠাঁই জয়।।'

(১২৩৪)

আট

বাঘ জন্ম ও বাঘ বধ পালা

মাল বধ করার পর লাউসেন আর কর্পূর পুনরায় গৌড় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল তার বাবা ও মায়ের কাছে। কিন্তু মা-বাবার ও'দের গৌড় যেতে দেবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, বিশেষ করে মা রঞ্জাবতী বললেন - তোমার মাতুল বিশেষ অভাজন ধর্মের কৃপায় তুমি প্রাণে রক্ষা পাচ্ছ। তখন লাউসেন বললো - মা কিছু ভয় করো না, তোমার আশীর্ব্বাদে সব সময়েই আমার জয় হবে। ঠাকুর নিরঞ্জন আমার সহায় আছেন -

'শিশু বলে মনে মা না কর কিছু ভয়।
তোমার আশিসে হবে সব ঠাঁই জয়।।
সদা মোর সাপক্ষ আপনি নিরঞ্জন।
অর্জুন সারথি পূর্বে আছিল যেমন।।' ১১৪

যাই হোক্ মা বাবাকে কোনমতে রাজি করিয়ে দু'ভাই গৌড়ের উদ্দেশ্য যাত্রা করল - যাত্রাকালে কতক মঙ্গল নিদর্শন দেখে ওরা মনে মনে খুব খুশি হল।

'যাত্রাকালে লাউসেন দেখেন মঙ্গল। দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ দেখে আনন্দিত।
বামে সব শিবা কুম্ভ পরিপূর্ণ জল।। বারনারী ব্যবস্যা মঙ্গল গায় গীত।।' (১৩৪)

এরপর দুভাই পদিমার বিল, মন্দারনের পীর ইস্‌মালেরগড়, বিষ্ণুপুর, জাহানাবাদ, উচালন, মোঘলমারি, আমিলা, বাবরকপুর, দামোদর নদ, বর্ধমান, কর্জ্জনা, কালুরতাক, মঙ্গলকোট, কেদারের দীঘি পার হয়ে সাঁজ পুরের কাছে একটা জঙ্গলের সামনে উপস্থিত হল। তখন লাউসেন দেখে এখানে দু'দিকে দুটো পথ গিয়েছে। একটা পথে লোকের যাতায়াত বেশি, আর একটা পথে লোকজনের যাতায়াত খুবই কম। কর্পূর বললো - দাদা ঐ পথে (যেদিকে লোকের যাতায়াত কম) বনের মধ্যে একটা বাঘ আছে, কিন্তু সে প্রকৃত বাঘ নয়, শাপভ্রষ্ট ইন্দ্র-নন্দন কালাধর।

বাঘরূপে মহীতলে জন্মেছে। এই বলে কর্পূর বাঘের জন্ম বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করল - একদিন ইন্দ্রের রাজসভায় নৃত্যের আসর বসেছে, ইন্দ্র তার ছেলে কলাধরকে ঐ আসরে নাচার জন্য বললেন - কালাধর তার অপূর্ব নৃত্যশৈলিতে সকলকে মুগ্ধ করলেন - সেই সময় কৈলাশ হতে দেবী ভগবতী বাঘের পিঠে চেপে ইন্দ্রের নৃত্যসভায় উপস্থিত হলেন। সকল দেবতা তাঁকে যথোচিত সমাদার করলেন। কালাধর কিন্তু দেবীকে বাঘের পিঠে দেখে মুচকি হাসতে থাকে, সেই দেখে দেবী ক্রোধে কালাধরকে অভিশাপ দিয়ে বললেন বাঘ দেখে হেসেছিস্, তুই নিজেই বাঘ হয়ে জন্মাবি। এই বাঘই শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রনন্দন কালাধর। এখন নাম হয়েছে কামদল। সাজপুরের জঙ্গলে থেকে এই দেশকে শ্মশান করে দিয়েছে। কেউই ও'কে মারতে পারে নাই।

কর্পূরের কাছে বাঘের সব কথা শুনে লাউসেন বললো - যে পথে বাঘ আছে আমরা

সেই পথেই যাবো। ধর্মের চরণ শরণ করে বাঘের খোঁজে লাউসেন ও কর্পূর মহাবনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো - মহাবন দেখে কর্পূর তো ভয়ে অস্থির, একটা নেউল বা একটা শেয়ালকে দেখেও কর্পূর বাঘ ভেবে ভুল করে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। কর্পূরের এই রকম অবস্থা দেখে দুজনা মিলে ঠিক করল কর্পূরকে গাছের উপর রেখে লাউসেন বাঘের সন্ধানে যাবে।

'যদি দাদা সার্দুল শিকারে যাত্যে চায়। কহিতে লাগিল কর্পূরের বরাবর।।
বৃক্ষের উপরে মোকে তুল্যা রাখা যায়।। শিকারে যাইবো তোমা রখ্যা তরুবরে।
কর্পূরের বচন শুনিয়া বীরবর। ভনে নরসিংহ ঘর শাঁখারি নগরে।।'

(২৫৬)

এই বলে সামনের একটা বড় সিমুল গাছের উপর কর্পূরকে তুলে, তার গায়ের চাদর দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে দিলেন যাতে পড়ে না যায়। এর পর নিজে বাঘের খোঁজে বনের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে বনের মধ্যেই দেখলেন একটা বড় পুকুরের বাঁধানো ঘাটের উপর এক দেউলে রয়েছেন দেবী দশভূজা, কিন্তু প্রায় বার বৎসর তাঁর পূজা হয় নাই। বনের মধ্যে নানা ফুল দেখে দেবী দুর্গা এবং নিরঞ্জনকে পূজা করার ইচ্ছা হল লাউসেনের। ফুল তুলে ভক্তিভাবে ঠাকুরের পূজা করে বললেন আমাকে বাঘের সন্ধান দাও। তাকে হত্যা করে যেন গৌড় যেতে পারি। ঐ বাঘ এদেশের খুব ক্ষতি করছে। ঠাকুর নিরঞ্জন বৈকুণ্ঠে বসে বাঘকে মায়া তৃষ্ণায় আকুল করে দিলেন, বাঘ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সরবরের ঘাটে জল খেতে এল। পুকুর ঘাটে বাঘ দেখে লাউসেন ধনুকে টঙ্কার দিতেই কামদল বাঘ ভয় পেয়ে ছুটতে লাগলো, লাউসেনও তার পিছু পিছু ছুটলো - তারপর তাকে (বাঘকে) ভবানীর দেওয়া খাড়া দিয়ে হত্যা করলো। বাঘের সঙ্গে যুদ্ধে লাউসেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো তাই কর্পূরকে জল আনতে বললেন, কর্পূর জল আনতে গিয়ে পুকুরে একটা কুমির দেখতে পেয়ে ভয়ে পালিয়ে এসে দাদাকে কুমিরের কথা বলে । লাউসেন কুমিরের কথা শুনে কুমির হত্যার জন্য দীঘির দিকে গেলেন এবং ভবানীর অস্ত্র দিয়ে সেখানে কুমির বধ করেন । এরপর কুমিরের দাঁত আর বাঘের নখ বেঁধে নিয়ে দু'ভাইএ গৌড়ের দিকে যাত্রা করলেন ।

এদিকে কামদলের বাঘ জীবন শেষ হতে কামদেব (কালাধর) ইন্দ্রের ভবনে ফিরে গেলেন। পুত্র কালাধরকে ফিরে পেয়ে ইন্দ্রের ভবনে আনন্দের সীমা নাই । দেবতারা সব কালাধরকে দেখতে এলেন ।

নয়

জামতির নিশা পালা

দ্বিচারিণী নয়নীর ছলাকলা ঃ এদিকে বাঘ বধের পর দু'ভাই লাউসেন ও কর্পূর চপল চরণে গৌড়ের দিকে যাত্রা করলেন। তারাদীঘি পার হয়ে তাঁরা রমতি নগরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। দূর থেকে রমতি নগরের ঘরবাড়ি দেখতে পেয়ে ওঁদের মনে আনন্দ ধরে না। কারণ রমতি হচ্ছে লাউসেনের মামার বাড়ি, রঞ্জাবতীর বাপের বাড়ি। কিন্তু রমতি নগরের আগে রয়েছে জামতি নগর আর গোলাহাট।

পথ চলতে চলতে দু'ভাই একটা পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়ালো - পুকুরের নাম কৃষ্ণ সরোবর। দু'ভাই পথশ্রান্ত হয়ে একটা কদমগাছের তলায় বিশ্রাম নেবার জন্য কিছুক্ষণ বসলেন। এমন সময় ঐ গ্রামের বধূরা কৃষ্ণ সরোবরে জল নিতে এসে কদমতলায় লাউসেন আর কর্পূরকে দেখে মোহিত হয়ে নানা কথা বলাবলি করতে লাগলো। কেউ বলে আমার বাবা কানা ছিল, দেশে এমন বর থাকতে একটা বুড়ো বরে বিয়ে দিল। কেউ বলে আমার বর কালা, কানে শুনতে পায় না, কেউ বলে আমার বর রাতে ভাল দেখতে পায় না হাত ধরে শোয়াতে হয় - এই রকম নানা কথা। এর মধ্যে নয়নী নামে একজন বধূও ঐ দলে ছিল। তার মনে মনে ইচ্ছা হল লাউসেনকে নানা ভাবে ভুলিয়ে নিজের করে নেবে। কিন্তু এই কাজ সকলের সামনে হবে না, তাই নয়নী ঠিক করল বাড়ি গিয়ে অন্যসময় আবার আসবে। সবাই জল নিয়ে বাড়ি গেল - নয়নীও চলে গেল। বাড়ি গিয়ে নয়নী ভাল করে সাজ পোষাক করে পুনরায় কৃষ্ণ সরোবরের দিকে যাত্রা করলো।

ঘর থেকে নয়নী যেই বেরিয়েছে ওর কোলের ছেলে মাকে বললো - মা কোথায় যাচ্ছো ? ছেলে পিছু ডাকার জন্য তার গালে ঠাস্ করে একটা চড় মেরে ছেলেকে নিয়েই পুকুর পাড়ে কদমতলায় গিয়ে লাউসেনের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো - আমি এ দেশের হরিহর বারুই -এর বৌ। বাড়ির সকলে আমাকে খুব ভালবাসে কিন্তু তোমাকে দেখে আমি ঘরে আর থাকতে পারলাম না তাই ছুটে চলে এলাম। ঘর দ্বার সব ত্যাগ করে। সঙ্গে এনেছি প্রচুর ধন অলঙ্কার - এ সবই তোমার জন্য। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে অনেক সুখ শান্তি পাবে। তোমার সহোদরও অনেক যত্নে থাকবে। এই ভাবে লাউসেনকে ভুলাবার জন্য নানা ছলাকলা করতে লাগল। তাই কবি লাউসেনের হয়ে ঠাকুরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করেছেন।

'লাউসেনে ভুলাতে করিছে কত তান। শঙ্করীচরণে শিবে হইও কৃপান্বিত।
চাঁদরায়ে কৃপা কর প্রভু ভগবান।। ধর্মের কৃপায় নরসিংহ গায় গীত।।'

(৩৫০)

নয়নীর কথা শুনে লাউসেন বললো - তুমি নির্লজ্জ মহিলা, তোমার জাতি কুলের

কোন ভয় নাই, তুমি স্বামী পরিত্যাগ করে অন্যজনে অনুরক্ত হয়েছো, এতে তোমার ক্ষতি হবে, তুমি বাড়ি গিয়ে স্বামী সেবা কর । পতিই বণিতার পরম গতি ।

'নয়নীর কথা শুনি   হেসে কন গুণমণি
শুনলো নির্লজ্জ নিতম্বিনী।
জাতি কুলে নাহি ডর   কুলবধূ স্বতন্তর
এখানে কি কাজে একাকিনী ।।' ৩৫৪
'নিজ স্বামী পরিত্যাগ   অন্যজনে অনুরাগ
ইথে কিবা পুরিবা কামনা ।
বনিতা জনার গতি   আপন আপন পতি
ইথে কিছু নাহি অন্যথা ।।' ৩৬০

লাউসেনের কথা শুনে নয়নী বললো - আমি তোমার জন্য সব কলঙ্ক মাথায় নিয়ে চলে এসেছি, আমি আর ফিরে যাবো না । তখন লাউসেন বললো - তোমার মনে যদি এই মতলব থাকে তুমি অন্যজনে ভজনা কর । আমায় নয় । আরও জানাল -

'আমি হবিষ্যাণী যোগী   ফলমূল সদা ভোগী
হেথা থেকে পাবে কিবা সুখ ।
ইথে নাহি অনুরাগী   দূর ব্বিচারিণী মাগি
শুনে নয়নীর মনে দুখ ।।   (৩৯৮)

শাঁখারি নগরে ধাম   বসু বংশে ঘনশ্যাম
সদাগর সরল হৃদয় ।
শিব সেবে এক মনে   অনাদ্য মঙ্গল ভনে
নরসিংহ তাহার তনয় ।।' (৪০২)

নয়নীকে তাড়িয়ে দেবার পর নয়নী মনে মনে ঠিক করলো লাউসেনকে জব্দ করতে হবে, অপমা[illegible] হবে । তাই কোলের শিশুর গলায় পা দিয়ে মেরে একটা কুঁয়ায় ফেলে দিল, তারপর [illegible] কাঁদতে বাড়িতে গিয়ে সকলকে ডেকে বললো - পুকুর পাড়ে দু'টো ডাকাতের মত লোক আমাকে অসৎ অভিলাষের প্রস্তাব দেয় আমি সম্মত না হওয়ায় - আমার ছেলেকে মেরে কুঁয়ায় ফেলে দেয় । তখন পাড়ার লোকজন লাঠি ঠেঙ্গা নিয়ে পুকুর পাড়ে কদমতলায় লাউসেনকে মারধোর করে হাতপা বেঁধে জামতি নগরের রাজা গদাধরের কাছে নিয়ে এল । রাজা সব শুনে লাউসেনের হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্দীশালে রাখার নির্দেশ দিয়ে বললেন - আগামী কাল সকালে বিচার হবে । বন্দীশালার কোটালরা লাউসেনকে ভাল করে বেঁধে বুকে পাথর চাপিয়ে বন্দীশালে রেখে গেল ।

লাউসেন বিনা দোষে এভাবে বন্দী হয়ে থাকায় ঠাকুর মায়াধরকে মনে মনে স্তব করতে লাগলেন তাঁকে বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করার জন্য ।

''বিপাক পড়িল লাউসেনের উপর ।   মনে মনে ধ্যানপূজা নানাবিধ স্তব।
অন্য কেবা রক্ষা করে বিনা মায়াধর ।।   এবার বিপদে রক্ষা করহ কেশব।। ৪৭৮

লাউসেনের স্তব শুনে বৈকুণ্ঠে ঠাকুর নিরঞ্জনের মন অস্থির হয়ে উঠল । হনুমানকে ডেকে প্রভু মায়াধর বললেন - বাছা পবনকুমার, জামতিনগরে লাউসেন বিনা দোষে, মিছে অপবাদে বন্দী হয়ে আছে । তার প্রাণনাশের উপক্রম হয়েছে । তুমি শীঘ্র গিয়ে তাকে উদ্ধার কর । ঠাকুর নিরঞ্জনের কথা শুনে হনুমান ঝড়ের গতিতে জামতি নগরে চলে এল । বন্দীশালায় লাউসেনকে ঐ অবস্থায় দেখে রেগে কাঁপতে লাগল । যাইহক তার সব বাঁধন খুলে, বুকের পাথর ছুঁড়ে ফেলে তার গায়ে পদ্মহাত বুলিয়ে দিতেই লাউসেন উঠে বসে সামনে তার মন্ত্রগুরুকে দেখে কেঁদে ফেলে তার দুপা জড়িয়ে ধরল । হনুমান লাউসেনের হাত ধরে উঠিয়ে বললো - তুমি কিছু চিন্তা করো না, ত্রিভুবনের নাথ তোমার সহায়, এই গদাধর অতি তুচ্ছ । তুমি সসম্মানে মুক্তি পাবে । এই বলে হনুমান চলে গেল রাজা গদাধরের শয়ন কক্ষে। নিশা অবসান, গদাধরের শয্যার পাশে বসে তাকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলে স্বপ্নের মধ্যে বলতে লাগলো -

'ধনমদে মাতিয়া নাহিক পরিজ্ঞান ।	লাউসেনে ছেড়ে দেহ করিয়া আদর।।' ৫২৪
ধর্মের সেবককে বিনা দোষে অপমান ।।	'শাস্তি পাবে উচিত করিলে অন্যমত ।' ৫২৫
আপন কল্যাণ যদি চাহিস গদাধর ।	সাগরে ফেলাব লয়ে জামতি নগর।' ৫২৭

এই বলে হনুমান অদৃশ্য হয়ে গেল । রাজা গদাধর স্বপ্ন দেখে ধড়ফর করে উঠে কাঁপতে কাঁপতে স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলেন । সকাল হতেই দরবারে বসে স্বপ্নের কথা সকলকে বললেন। স্বপ্নের কথা শুনে সভাসদরাও বিদেশী কুমারকে ছেড়ে দিতে বললেন। রাজা তখন সভাসদদের নিয়ে বন্দীশালে গেলেন । গিয়ে দেখেন বন্দীর সব বন্ধন মুক্ত, বন্দী নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে । তখন রাজা এবং সভাসদরা ভাবলেন ইনি কোন দেবতার অংশ, এঁর মধ্যে কোন দৈবশক্তি আছে ।এই ভেবে রাজা গদাধর লাউসেনের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাঁকে মুক্ত করার আদেশ দিলেন । লাউসেন বললেন - মহারাজ আপনি আমাকে মুক্তি দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু অপবাদ আর কলঙ্ক মাথায় নিয়ে আমি এখান থেকে যেতে চাই না, আপনি পন্ডিত সুবিবেচক ও সুবিচারক, বারুই বনিতা আমার নামে যে অপবাদ দিয়েছে আপনি তার বিচার করে যদি আমার কোন দোষ থাকে তাহলে আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন আমি সেটাই চাই, আর আমার কোন দোষ না থাকলে আমাকে কলঙ্ক মুক্ত করবেন ।এই শুনে রাজা গদাধর বল্লেন - কোন সাক্ষী নাই আমি কি করে বিচার করব ।তখন লাউসেন বললেন - মৃত শিশুই একমাত্র সাক্ষী, তাকে কুয়া থেকে তুলে আনা হোক ।এই কথা শুনে রাজার আদেশে রাজার লোকেরা ঐ মরা শিশুকে কুয়া থেকে তুলে এনে লাউসেনের সামনে রাখল ।

লাউসেন ঠাকুর নিরঞ্জনের স্তব করে ঐ মরা শিশুর গায়ে পুষ্পজল ছিটিয়ে দিলেন। তার ফলে মরা শিশু প্রাণ ফিরে পেল ।এই দৃশ্য দেখে সকলেই তো অবাক, তাঁরা বললেন কলিযুগে এমন ঘটনা কখনও দেখি নাই। রাজা তখন ঐ শিশুকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

বালক সভার মাঝে বললো -

'বিদেশী না মারে মোরে মেরে ছিল মা।
কোলে ছিনু আমার গলায় দিল পা ।।' (৫৯৮)

সাক্ষীর কথা শুনে রাজার আদেশে নয়নীর নাক কান কেটে দেওয়া হল। অন্যদিকে লাউসেনের চরিত্র দেখে সকলে চমৎকৃত। আর তারই প্রভাবে জামতি নগরে ধর্মপূজার প্রচার হল।

'সেনের চরিত্র দেখে লাগে চমৎকার।
জামতিতে ধর্মপূজা হইল প্রচার ।।' (৬০৪)

রাজা গদাধর সসম্মানে লাউসেনকে বিদায় জানালেন। এদিকে কর্পূর রাজার লোকজনের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে উলুবনে লুকিয়ে ছিল। লাউসেন কর্পূরকে খুঁজে নিয়ে গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

৫৯৮, ৬০৪, ৭৮২, ৭৭৮, ৭৮৮ 'জামতির নিশাপালা'র চরণ সংখ্যা।

দশ

গোলাহাট দিবা পালা

বারবণিতা সুরক্ষার নাক কান কাটা ঃ দু'ভাই জামতি নগর থেকে বেরিয়ে রসপুর পার হয়ে কিছু দূরে তারা মন্দিরা, মাদল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সুর শুনতে পেল, তখন লাউসেন কর্পূরকে জিজ্ঞাসা করল - সামনে কোন দেশ আছে তাই এত কলরব ও বাজনা বাদ্যি শুনা যাচ্ছে। তখন কর্পূর বললো- সামনে আসছে ভুবন বিখ্যাত গ্রাম, গোলাহাট । এ গ্রামে কোন পুরুষ থাকে না । এদেশে শুধু মেয়েদের বাস । এখানকার অধিকারী হচ্ছে সুরক্ষা নামে এক রমণী । সে দেবীর কাছে বর চেয়ে নিয়েছে যে তার ছ'কুড়ি পতি হবে । এই ছ'কুড়ি পূর্ণ হতে আর দুজন বাকি আছে । কোন পুরুষ এখানে এলে তার আর ঘর ফিরে যাবার উপায় থাকে না । গোলাহাটের ভেতর দিয়ে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে । আমরা অন্যপথে যাই চল । কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন বললেন - যে মহিলা একা ছ'কুড়ি নাগর ভজে সে কেমন মহিলা তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করছে, কেমন সেই সুন্দরী সুরক্ষা, (অর্থাৎ লাউসেনর মধ্যে একটা দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে যে সুরক্ষা কি করে তাকে ভোলাতে পারে দেখা যাবে) । লাউসেনের এই কথা শুনে কর্পূর তো রেগে আগুণ - তবুও কর্পূরের কথা না শুনে লাউসেন গোলাহাট দিয়েই গৌড় যাওয়া ঠিক করলেন । সন্ধ্যার সময় তাঁরা গোলাহাটে পৌঁছালেন এবং দেখলেন -

'সরণি সুন্দর অতি পরিসর বাট । বেশ্যাদের ভবন সকল অট্টালিকা
সন্ধ্যার সময় সেন পাল্য গোলাহাট ।। লাশ বেশ করে সব বসেছে গণিকা।। ৭৪২

পথ দিয়ে চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলেন এক মালিনী সুন্দর সুন্দর ফুলমালা বিক্রি করছে । মালা দেখে লাউসেনের ইচ্ছা হল ধর্মঠাকুরের পূজা করবেন মালা দিয়ে -

'মালা দেখে মনোবাঞ্ছা ময়নার রায় । মালিনীকে বলিতে লাগিল তপোধন ।
দুইমালা লয়ে দিব অনাদ্যের পায় ।। দুই মালা দেহ মোরে পূজি নিরঞ্জন।।' ৭৭৮

মালিনী দুই ভাইকে দেখে মোহিত হয়ে বললো- পূজার জন্য দুইমালা আমি বিনা মূল্যেই দেবো ।

'এত বলি দুই মালা দিলেক মালিনী । ধ্যান করে নিরঞ্জন কৈল নিবেদন ।
মালা হাতে সেন ধর্ম ভাবেন অমনি ।। নির্মাল্য গলায় লয়ে পরিল দু'জন ।।' ৭৮৮

মালা দিয়ে মালিনী লাউসেনদের বললো - আপনারা গোলাহাটে এসে খুব ভুল করেছেন । এখানে যারা আসে তারা আর বাড়ি ফিরে যেতে পারে না । বারাঙ্গনা সুরক্ষা সকল পুরুষকে মজিয়ে রেখে দেয় । সুতরাং আপনারা আজ রাত্রিটা আমার বাড়িতে থেকে কাল

গেলাহাট দিবা পালা

সকালে সকলের অগোচরে গোলাহাট ছেড়ে চলে যাবেন।

মালিনীর কথায় সেই রাত্রে ওর বাড়িতেই উঠলেন লাউসেনরা। সকালে উঠে গুরু আর ধর্মরাজের চরণ বন্দনা করে স্নান পূজা সেরে মালিনীর ঘর থেকে বিদায় নিলেন। গোলাহাটের বাজারের পথে যেতে যেতে দেখলেন দুপাশে রমনীরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা লাউসেন আর কর্পূরকে দেখে তাদের রূপে মোহিত হয়ে ছুটে এসে নানা রকম টিপন্নী কাটতে থাকে। অনেকে লাউসেনদের পিছু ধেয়ে আসে। ইতিমধ্যে সুরক্ষা খবর পেয়ে গেছে নগরে দু'জন বিদেশী নাগর এসেছে। সুরক্ষা সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচরী গোরক্ষাকে বললো - তুই তাড়াতাড়ি গিয়ে যে কোন ভাবে ভুলিয়ে, পানের মধ্যে ওষুধ খাইয়ে দুই নাগরকে বশ করে এখানে নিয়ে আয়। আর একাজ করতে পারলে তুই অনেক পুরস্কার পাবি। সুরক্ষার কথা শুনে পরিপাটী করে লাস বেশ করে পানের পসরা সাজিয়ে যে পথ দিয়ে লাউসেন কর্পূর যাবে সেখানে একটা বটগাছের তলায় পথ আগুলে দাঁড়িয়ে রইল। লাউসেন কর্পূর সেখানে আসতেই খল খল করে হেসে উঠে মৃদু ভাবে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করার ফাঁকে নানা অঙ্গ ভঙ্গি করে পান খেতে অনুরোধ করল।

'লাউসেনে দেখে দাসী হাসে খল খল।	'মলিন হয়েছে রৌদ্রে সোনার বরণ।
বদনে ঈষৎ দিল বসন বিমল ।।	হের এসো কাছে বসো ভাই দুইজন।।
ঘন ঘন কটাক্ষ না পান কত তান।	শীতল বটের ছায়া বসন্তের বা।
প্রিয় ভাষে বলে কোথা করেছ পয়ান।।'	পান খেয়ে খানিক বিশ্রাম করে যা।।'
(১২৬)	(১৩২)

গোরক্ষার এইসব কথায় কর্পূর এগিয়ে এসে বললো - শুন বারাঙ্গনা - আমরা ধর্মের সেবক, আমরা কোন অন্যায় কাজ করি না, হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করি, আমরা বিভিন্ন তীর্থ ঘুরতে বেরিয়েছি, গৌড়ের রাণী আমাদের মাসি, তাই এই পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমাদের পথ ছেড়ে দাও। কিন্তু লাউসেনের মনটা খুব সরল, তার একটা পান খাবার ইচ্ছা হল, সেই জন্য পানের দাম জিজ্ঞাসা করল - কর্পূর খুব বুদ্ধিমান, সে বুঝতে পারছে এই সব বারাঙ্গনা নানা ভাবে মানুষকে বশ করে, পানের মধ্যে ওষুধ মেশায়। তাই দাদাকে বললো - দাদা তুমি ঐ পান খেও না, বিপদ হবে, তখন লাউসেন বললো - ঠাকুর আমাদের সহায় কোন বিপদ হবে না। এই বলে গোরক্ষার কাছে পান কিনতে গেল, কর্পূর যখন দেখল দাদা পান কিনতে যাচ্ছে এবং পান খাবেই, তখন আর কোন উপায় না দেখে লাথি মেরে পানের ডালা পথের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। এতে গোরক্ষা তো রেগে আগুন, তাই লাউসেন গোরক্ষাকে সব পানের দাম দিতে রাজি হল। এবং ভাই কর্পূরকে টাকার থলি আনতে বলেন, কর্পূর থলি এনে দেখে তাতে মাত্র দু'টি কানা কড়ি পড়ে রয়েছে। সেই কড়ি দুটি হাতে নিয়ে লাউসেন কাতর ভাবে ঠাকুর নিরঞ্জনকে ডাকতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর হাতের মুঠো খুলতেই দেখলেন কানা কড়ি দুটি রূপান্তর হয়ে গেছে দুটি অমূল্য মাণিকে। যার এক একটির মূল্য সাত হাজার ধন অপেক্ষা বেশি।

'কড়ি হাতে কুমার ভাবেন মায়াধর ।	কানাকড়ি হইল দুই অমূল্য মাণিক ।
ঈশ্বর যাহার সখা তার কিবা ডর ।।	সাত নৃপ ধনাপেক্ষা একেক্ অধিক ।।'

(২২৪)

লাউসেন ঐ মাণিক দুটি গোরক্ষার হাতে দিয়ে বললো - তোরা তো সব সময় টাকা পয়সার অনুরাগী, সারা জীবন পরের পায়ে তেল দিয়ে মরলি । এই মাণিক নিয়ে বাড়ি যা । গোরক্ষা দুটো মাণিক পেয়ে খুশী হয়ে সুরক্ষার কাছে ছুটে গিয়ে তার হাতে ঐ মুদ্রা দিয়ে সব কথা জানাল। কিন্তু সুরক্ষার হাতে ঐ দুই মাণিক পুনরায় কানা কড়িতে পরিণত হয়ে গেল । তখন সুরক্ষা বললো - আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চল, দেখি ওরা কি রকম নাগর ।

'যুগল মাণিক দিল সুরক্ষার হাতে ।	চাঁদ রায়ে নিরঞ্জন হবে পক্ষা বল ।।
কানা কড়ি হৈল পুন সবার সাক্ষাতে ।।	কৃপা কর ধর্ম শিব শঙ্করী চরণে ।
অপরূপ দেখে দাসী ভাবিয়া চঞ্চল ।	অনাদ্য মঙ্গল বসু নরসিংহ ভনে ।।'

(২৪০)

এই বলে সুরক্ষা বারাঙ্গনা তার সব নাগরদের নিয়ে লাউসেনের কাছে চললো - তার ছকুড়ি নাগর ভৃত্যের মত তার পিছু পিছু চামর দোলাতে দোলাতে নৃত্য করতে করতে তাম্বুল যোগাতে যোগাতে যেতে লাগলো । আর এসবই হচ্ছে ওযুধের ফলে । এইভাবে সুরক্ষা বটগাছের তলায় বসে থাকা লাউসেনের কাছে উপস্থিত হল । এই দেখে কর্পূর লাউসেনকে বললো - দাদা এখান থেকে পালিয়ে চল । এই সুরক্ষা আসছে । ও নানা ওষুধ জানে, এই ওযুধের গুণে শতাধিক লোককে বশ করেছে । এঁরা সকলেই নবীন যুবক, এঁদের মধ্যে ব্রাম্মণ পন্ডিত, রাজার কুমারও আছেন । এত ভাল ভাল লোককে একা সুরক্ষা আটকে রেখেছে । তাই এখান থেকে শিঘ্র পালিয়ে চল ।

'ভুলায়ে রেখেছে যত জিতেন্দ্রীয়গণ ।
ব্রাম্মণ-পণ্ডিত কত রাজার নন্দন ।।
সংসার মাঝে কারে না দেখি এমন ।
একেলা সুরক্ষা ভজে শতাধিক জন ।।' (৩৩৬)

কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন জানাল - ভাই ধর্মরাজ আমাদের সহায় । এই সুরক্ষা আমাদের কি করবে । তুমি কিছু চিন্তা করো না । এই কথা বলতে না বলতে সুরক্ষা সামনে এসে হাজির । লাউসেনকে দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেল, মনে মনে বললো-

'সেনকে দেখিয়া মোহ পাল্য বাণেশ্বর ।	মনে করে এরে যদি ভুলাইতে পারি ।
কি দিয়ে গড়েছো বিধি এমন নাগর ।।	সবাকার উপর করিব অধিকারী ।।'

(৩৫৪)

এই কথা মনে মনে বলে সুরক্ষা লাউসেনকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো । সুরক্ষাকে

লাউসেন তাঁর সব কিছু পরিচয় দিয়ে বললেন-লোকমুখে গোলাহাটের কথা শুনে একবার গোলাহাট দেখতে এলাম। এই শুনে সুরক্ষা বললো-আমার খুবই সৌভাগ্য আপনার মত গুণীজন এখানে এসেছেন, দক্ষিণ থেকে যারা এপথে গৌড় যায় দিন কতক এখানে থেকে যান ।

'মোর ভাগ্যে আপনি করেছ আগুসার ।
দিন কতক থাক হেথা রাজার কুমার ।।
দেখাব স্বর্গের নাট শুনাইব গীত ।
গুণ বুঝে নিলে মোর হইবে মোহিত ।।'
(৩৮৬)

'মনে সাধ তোমাকে কথক দিন রাখি । ৩৯৫
ভোগ রাগ বিলাসে একত্রে দোঁহে থাকি ।।
এহা শুনে লাউসেন কানে দিল হাত ।
নরসিংহ বলে দয়া কর জগন্নাথ ।।'
(৩৯৮)

লাউসেন কানে হাত দিয়ে সুরক্ষা বাণেশ্বরকে বললো - আমি তোমার মনোমত নাগর হতে পারি না । আমি ধর্মপরায়ণ ধর্মের সেবা করি ।

'ধর্মসেবা করি আমি ধর্মপরায়ণ।
নাহি মাখি তৈল নাহি তাম্বুল ভক্ষণ।।
আতপান্ন দিনেতে ভক্ষণ একবার।
ধর্মের সেবক নাহি সহে অনাচার।
রাজা আর বেশ্যা সে পরশে হয় পাপ।
জেনে শুনে কেবা গিয়ে ধরে কাল সাপ।।'
(৪০৬)

তাই আমি কোন অনাচার করতে পারি না । তুমি যেন আমাকে স্পর্শ করো না । এই শুনে সুরক্ষা বললো - তুমি পাপ পুণ্যের কথা না বলে আমার সঙ্গে চল । আর দেখ আমার সঙ্গে কত নাগর । তোমাকে এদের মধ্যে রাজা করে রাখব ।

'হের দেখ মোর সঙ্গে এতেক নাগর ।
তোমাকে করিব রাজা সবার উপর।।' (৪৪২)

এছাড়া আরও নানা প্রলোভন দেখাতে লাগল। সব শুনে লাউসেন বললেন - আমার একাজ নয়, আমি শুধু ধর্মের সাধক ,

'(শুন্যা) লাউসেন তবে বলেন বচন।
আমি নহি সুন্দরী এ কর্মের ভাজন।।
সব ছাড়া করেছি ধর্মের পদ সার।
এসব বিভবে ইচ্ছা নাহিক আমার।।'
(৪৫৪)

আমি বিলম্ব না করে গৌড়ে যেতে চাই । কিন্তু সুরক্ষা ছাড়বার পাত্রী নয়, মনে মনে বললো - এ ছলা কলায় ভুলবে না, একে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে হবে । তাই লাউসেনকে বললো -

'ধরে লয়ে গেলে তোকে রাখে তোর কে।
সনদ দিয়েছে রাজা এই দেখে লে ।।
গোলাহাট দিয়া গৌড়ে যায় যেই নর ।
এক রাত্রি মোর সনে সে বঞ্চে বাসর ।।'
(৫০২)

সুরক্ষা আরও বললো - অবশ্য আর একটা উপায় আছে, যদি একন্তাই যেতে না চাও, তাহলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হবে । যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তাহলে আমার নাক কান কেটে নিয়ে যাবে । আর যদি উত্তর না দিতে পার তাহলে আমার রন্ধনে আহার করবে, আর আমার কাছে থাকবে । এই বলে লাউসেনের হাতে তামা, তুলসী, গঙ্গাজল

দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল। তারপর প্রশ্ন করলো, 'অঙ্গ মধ্যে কোথা ধাতু বৈসে বনিতার'। প্রশ্ন শুনে লাউসেন চমকে উঠলেন, মনে মনে নানা শাস্ত্র পুরাণ কাব্য বিচরণ করলেন। কিন্তু সুরক্ষার প্রশ্নের কোন উত্তর পেলেন না। তখন পরাজয় বুঝে অধোমুখে বসে রইলেন। লাউসেনের পরাজয় বুঝে সুরক্ষারও খুব আনন্দ হল, আর বললো -

'কি ভাব রাজার পো　　দূর কর মায়া মো
মোর ঘরে করহ পয়ান।
পিরিতে পরম সুখ　　নতুবা পাইবে দুখ
পরিণামে পাবে অপমান।। ৫৮৩
রেঁধে দি ব্যঞ্জন ভাত　　ভোজন করহ নাথ
আজি হইতে তুমি মোর পতি।
সত্য করে মতিমান　　ইহাতে করিলে আন
এ পাপে পাবে না অব্যাহতি।।' (৫৮৪)

সুরক্ষার কথা শুনে লাউসেন একবার শেষ চেষ্টা করে বিনয়ের সাথে বললেন হে সুন্দরী, আমাদের ছেড়ে দাও। অধর্ম কাজে আমাদের যুক্ত করো না। আমাদের জাত নষ্ট করো না। কিন্তু লাউসেনের কথা শুনে সুরক্ষা রেগে গিয়ে গোরক্ষাকে বললো - এদের দুজনাকে বাঁধ। এই সব দেখে শুনে কর্পূরতো রেগে আগুন। দাদা লাউসেনকে বললেন - দাদা তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, আমার কথা শুনলে না, এখন আমি দেখব, তোমার দৈববল কি করে।

'শুনিয়া কহেন সুর　　ভাই কর চিন্তা দূর।
উদ্ধার করিবে নিরঞ্জন।'　　(৬২৮)

আর নিজে মনে মনে ভাবছেন এখন কি উপায় করি, এই নারীতো তার রান্না খাওয়াতে চায়। যাই হক লাউসেন সুরক্ষাকে বললেন- তুমি বাড়ি গিয়ে রান্না কর, আমরা খাব। তবে রান্নার ব্যাপারে আমার একটা শর্ত আছে-আমারা যে ভাবে খাই সেই মত ব্যবস্থা করতে হবে। এরণ্ডের ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল করতে হবে, আঙা হাঁড়িতে ভাত রাঁধতে হবে, আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধতে হবে, রান্না করতে হবে সেওলার জ্বাল দিয়ে, এই সব কিছু কাজ রাত্রির মধ্যে করতে হবে। যদি পাখিদের ডাক শুনি আর সূর্যের উদয় হয় তা হলে আমরা ভোজন করতে পারবো না। এটাই আমাদের সর্বকালের আহারের নিয়ম। লাউসেনের আহারের নিয়ম শুনে সুরক্ষা প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর ঠিক করল পার্বতীর পূজা করে তাঁর কাছ থেকে বর চেয়ে নিয়ে রান্নার সব ব্যবস্থা করে ফেলব। এই বলে পার্বতীর পূজা আরম্ভ করে দিল। পার্বতী পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে সুরক্ষাকে বললেন - কি বর চাস সত্য করে বল। সুরক্ষা বললো - তুমি বর দিয়েছিলে আমার ছ'কুড়ি পতি হবে, এখন ছ'কুড়ি থেকে দু'জন কম হয়েছে। ঈশ্বর দু'জনাকে এনে দিয়েছে। কিন্তু এরা আমার কোন কথা শুনে না। শেষে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে

পরাজিত হয়ে এখানে এসেছে। কথা ছিল আমার রন্ধন এরা ভোজন করবে। এরা বলছে আমরা সন্ন্যাসী, রান্নার নানা রকম ফিরিস্তি দিয়েছে। আর সব কিছু রাত্রির মধ্যে শেষ করতে হবে। তুমি আমার একমাত্র সহায়। তুমি কৃপা করলে অন্ন রেঁধে এদের ভোজন করাবো। 'রন্ধনের ব্যবস্থা কর।' এই বলে ভবানী কৈলাসে চলে গেলেন।

ভবানীর কাছ থেকে বর পেয়ে আনন্দিত মনে লাউসেনের নির্দেশমত সব রান্না সময়মত সেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে লাগল। অবশ্য রান্নার দিকেই সুরক্ষার যে মন ছিল তা নয়, মন ছিল লাউসেনের দিকেই।

'মাগীর নাহিক মন রন্ধনেতে বাড়া।
কান এড়ে কপাটে বঁধুর শুনে সাড়া।।' (৭৬০)

এদিকে রান্নার সময় কর্পূর দেখল - দাদার নির্দেশমত জলের সেওলা দিয়ে উনুন জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। আর তা দুর দুর করে জ্বলছে। এই দেখে কর্পূর কিছুটা বিস্ময় বোধ করল। যাই হক যথা সময়ে রান্না শেষ হতেই সুরক্ষা খাবার জায়গা পরিষ্কার করে পিঁড়ি পেতে জল দিয়ে পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে দিয়ে লাউসেন ও কর্পূরকে খেতে বসতে অনুরোধ করল। এই সব দেখে লাউসেন মনে মনে ভাবছেন - যা যা বলছি এরা তো সবই করে ফেলছে - এখন উপায় কি ?

'উপায় না দেখি কিছু বিপাক সাগর।
মনে মনে করেন রক্ষহ মায়াধর।।
ঘন ঘন সুৰক্ষা বলিছে খাও ভাত।
কর্পূর বলেন দাদা(রক্ষা) জগন্নাথ।।
ত্রিদশের নাথ বিনা না দেখি উপায়।
গো (লাহাটে) এসে বেশ্যা বাসে জাতি যায়।।
লাউসেন শুনিয়া ভাবেন (মায়া) ধর।
ভনে নরসিংহ যার শাঁখারিতে ঘর।।' ৮০৬

যাই হক্ ঠাকুরকে স্মরণ করে সত্য রক্ষার জন্য লাউসেন ও কর্পূর আসন গ্রহণ করলেন। এবং বললেন সব খাবার এক সাথে সাজিয়ে দিতে যাতে সব কিছু ঠাকুরকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ মুখে দিতে পারি। এই কথা শুনে সুরক্ষারা সব খাবার একে একে সাজিয়ে দিল। লাউসেন হাতে গন্ডুষ নিয়ে একভাবে ঠাকুর জগন্নাথকে ডাকতে লাগলেন।

'লাউসেন চিন্তিত গন্ডুষ লয়ে হাতে।
একভাবে ভাবেন ঠাকুর জগন্নাথে।।' (৮১৮)

এদিকে বৈকুণ্ঠ হতে ঠাকুর নিরঞ্জন নটী সুরক্ষার সব কান্ড দেখে পবন পুত্র হনুমানকে বললেন - গোলাহাটে নটী সুরক্ষা আমার ভক্ত লাউসেনকে প্রশ্নে পরাজিত করে তাকে তাদের রন্ধন খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছে। ঐ অন্ন খেলে আমার পূজার বারমতি সব নষ্ঠ হয়ে যাবে। অবশ্য সূর্যের উদয় হলে ওরা আর অন্ন গ্রহণ করবে না।

'বেশ্যার রন্ধনেতে সেবক অন্ন খায়।
মোর পূজা মহীতলে বৃথা বয়ে যায়।।
লাউসেন অঙ্গীকৃত সবার সাক্ষাত।
সূর্য্যের উদয় হৈল না খাইব ভাত।।' ৮২৮

তাই ঠাকুর নিরঞ্জন হনুমানকে বললেন তুমি শিঘ্র সূর্য দেবের কাছে গিয়ে আজ তাড়াতাড়ি উদয় হতে বল। হনুমান সূর্যের মন্দিরের দিকে হাওয়ার গতিতে চলে গেল। আর

ঠাকুর ধর্মরাজ নিজে ইন্দ্র ও যমরাজকে নিয়ে গোলাহাটের দিকে পবন বেগে ধেয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন - ইন্দ্র তুমি কোকিল হবে আর যমরাজ তুমি কাক হবে। কোকিল ও কাক হয়ে সুরক্ষার ঘরের চালে বসে খুব করে ডাকবে। সেই ডাক শুনে লাউসেনরা ভাববে প্রভাত হয়ে এসেছে ওরা আর অন্ন গ্রহণ করবে না। কিন্তু তিলেক বিলম্ব হলে সব সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঠাকুর ধর্মরাজ গোলাহাটে গিয়ে লাউসেন আর কর্পূরের মাঝে বসে দুজনার হাত প্রায় অবস করে দিলেন যাতে ওদের হাত উপরে উঠতে না পারে। এরই মধ্যে সুরক্ষার ঘরের চাল থেকে ছদ্মবেশী কোকিল ও কাক ডাকতে লাগলো। সেই শুনে লাউসেন আনন্দিত হয়ে উঠল। আর এদিকে হনুমান সূর্যের রথকে লেজে করে বেঁধে উদয় পর্বতে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে দুদন্ড আগেই সূর্যের উদয় ঘটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল। কাক কোকিলের ডাক আর একদিকে সূর্যের উদয় দেখে লাউসেন কর্পূর গণ্ডুষ ফেলে উঠে পড়লেন। সেই দেখে সুরক্ষা বলে উঠল তোমরা গণ্ডুষ ফেলে না খেয়ে উঠে পড়লে কেন ? তখন লাউসেন বললেন - দেখতে পাচ্ছ না, আকাশে রবির উদয়। কাক কোকিল ডাকছে, সেই শুনে সুরক্ষা বললো - তাতে কি হয়েছে, তোমরা ভাত না খেতে পার, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, না পারলে তোমরা ছাড়া পাবে না। এই কথা শুনে লাউসেন মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন, সুরক্ষার প্রশ্নের উত্তর তাঁর জানা নাই, তাঁর পঠিত শাস্ত্রে সুরক্ষার প্রশ্নের উত্তর নাই। তাই আবার ঠাকুরকে ডাকতে লাগলেন তাঁকে রক্ষা করার জন্য। ঠাকুর ভগবান হনুমানকে বললেন - তুমি বিষ্ণুর ভবনে গিয়ে সুরক্ষার প্রশ্নের উত্তর জেনে লাউসেনকে বলে আসবে। এই শুনে হনুমান তরিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের কাছে গিয়ে সমস্ত কিছু নিবেদন করলেন। নারায়ণ বললেন ধাতুর উত্তর পাবে ব্রহ্মার কাছে, তুমি সেখানে যাও। হনুমান তখন ব্রহ্মার কাছে ছুটল এবং ব্রহ্মাকে গিয়ে সব কথা নিবেদন করল।

ব্রহ্মা বললেন - ধাতু কথার নির্ণয় আমার জানা নাই, তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে যাও, তিনি সব জানেন। এই কথা শুনে হনুমান কৈলাশ শিখরে গিয়ে শিবের কাছে সব কথা নিবেদন করল -

'সবিনয়ে নিবেদন করে জোড় হাত। পুরিতে না পেরে সেন হয়েছে (তার)অধীন।।
পাঠাইল মোরে ধর্ম ত্রিদশের নাথ।। ধাতের নির্ণয় তাহা হতে হলো নাই।
লাউসেন তাহার সেবক সদাচার। পরাজয়ে জাতি নাশ সে বেশ্যার ঠাঁই।।
বিবাদ বেশ্যার সনে হইল তাহার ।। কৃপা করে কহিবে ধাতের অন্যায়ণ।
সমস্যা দিয়েছে তারে সুরক্ষা নটীন। তবে রক্ষা পাইবেন রঞ্জার নন্দন।।' (৯৬৮)

মহাদেব সব শুনে বললেন - আমি ধাতু কথার সন্ধান ঠিক জানি না, তবে গণেশের মা পার্বতী একথার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন, এই বলে মহাদেব ভবানীর কাছে গেলেন - হনুমানও শ্বেত মাছির রূপ নিয়ে মহাদেবের সঙ্গে গেল।

'গৌরীর সাক্ষাতে শিব হৈল উপনীত। এক কথা মোর কাছে বলহ এখনি।।
সমাদর শিবকে করিল যথোচিত।। সত্যকরে কহিবে আমার বিদ্যমানে।
ঠাকুর বলেন শুন গণেশ জননী। বাম লোচনের ধাতু বৈসে কোন খানে।।'৯৮৮

মহাদেবের কথা শুনে পার্বতী হেসে হেসে বললেন - তুমি তো সবই জান। শুধু শুধু আমায় জিজ্ঞাসা করছ কেন, তাছাড়া কোঁচ বণিতারা এ প্রশ্নের উত্তর জানে তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা কর (পার্বতীর ধারনা মহাদেব কোঁচ বধূদের ঘরে যাতায়াত করে। তাই পরিহাস করে এই কথা বলে ছিলেন)। মহাদেব তখন গৌরীকে বললেন - আমার দিব্য করে বল যে তুমি ধাতুর উত্তর জান না। তখন পার্বতী মহাদেবের ভাব বুঝে বললেন -

ভাব বুঝে ভবের ভবানী কন সার ।
লোচন যুগলে ধাতু বৈসে বণিতার।।(১০০০)

ধাতু কথায় উত্তর পেয়ে হনুমান আনন্দিত মনে হর-পার্বতীকে প্রণাম করে প্রবল বেগে লাউসেনের কাছে গিয়ে ধাতু কথার সন্ধান জানিয়ে দিল । লাউসেন ধাতু কথার উত্তর পেয়ে আনন্দিত মনে সুরক্ষাকে বললেন -

'নটীকে বলেন কর্ণসেনের কুঙর । জিজ্ঞাসিলে কোথা ধাতু বৈসে বণিতার।
শুনে লেরে বেশ্যা মাগী প্রশ্নের উত্তর ।। এবা কোন তুচ্ছ কথা সম্মুখে আমার ।।
নিবসে নারীর ধাতু লোচন যুগলে ।' (১০১০)

সুরক্ষা তার প্রশ্নের উত্তর শুনে ভয়ে চারদিক চাইছে, ভাবছে এখন উপায় কি ? তখন কর্পূর বললো - দাদা নটিনীর নাক কান কেটে নাও, এটাই শর্ত ছিল । কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন সুরক্ষার নাক-কান কেটে ফলার উপর বেঁধে নিলেন। নটী সুরক্ষার অবস্থা সূর্পনখার মত হল । সুরক্ষার নাগররা নিস্তার পেয়ে চারিদিকে ছুটে পালাল । কিন্তু যাবার আগে ঐ নাগররা লাউসেনকে প্রণাম করে গেল । গোলাহাটের বারবণিতারা নানা স্থানে পালিয়ে গেল, গোলাহাট নটী মুক্ত হল । সেখানে ধর্মরাজের পূজা প্রচার হল ।

এগার

হস্তীবধ পালা

গোলাহাটকে নটী মুক্ত করে লাউসেন কর্পূর গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ক্রমে ক্রমে শীতলপুর, বালিঘাট, গোপালপুর সুতি পার হয়ে ভৈরবী গঙ্গার তীরে এসে পৌঁছালেন, ওখান থেকে গৌড়ের ঘর বাড়ি দেখে তাদের আনন্দ ধরে না। দু'ভাই গঙ্গা স্নান সেরে প্রভু নিরঞ্জনের পূজার পর কিছু ফলমূল ভক্ষণ করে গঙ্গার ঘাটে এলেন, নৌকা করে গঙ্গা পার হয়ে গৌড়েতে পৌঁছালেন। দুর থেকে রাজপ্রাসাদ দেখে দুইভাই এর মনে হল এ প্রাসাদ যেন ইন্দ্রের অমরাপুরীর থেকেও ভাল। হঠাৎ পথের মধ্যে লাউদত্ত নামে গৌড়ের এক কর্মকারের ছেলের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। লাউদত্তের বয়স লাউসেনের মতই হবে। লাউদত্ত দুজন বিদেশী দেখে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। লাউসেন তার পরিচয় দিয়ে নিজের নাম বললো -

'নাম শুন্যা হাস্যা কিছু বলে কর্মকার।
নামের কারণে মিতা হইলে আমার।।
মোর নাম লাউদত্ত গৌড়ে নিবাস।' (৮০)

লাউদত্ত লাউসেন দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করল। লাউদত্ত লাউসেন ও কর্পূরকে একবার তাদের বাড়ি যেতে অনুরোধ করে বললো -

'পরিবার সহিত করিব আমি সেবা। এত বলি তিনজন করিল গমন।
তোমা হৈতে অতিত দুর্লভ আছে কেবা।। ভনে নরসিংহ বসু শাঁখারি ভবন।।' ৮৮

লাউসেন - কর্পূর ঐ রাত্রে কর্মকারের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করে সকালে উঠে বৈঠক খানায় এসে বসলেন। পাশে রাখলেন তাঁদের সেই বিখ্যাত ফলা। সুপুরুষ দুজন বিদেশীকে দেখবার জন্য কর্মকারের ঘরে লোকজনের খুব ভিড় হতে লাগলো। তাঁদের দেখে নানা লোক নানা রকম প্রশংসা করলেন।

'অনুমান অন্তরে করেন লোকজন।
বলেন আস্যাছেন শ্রীরামলক্ষ্মণ।।' (১০৪)

আবার ফলা দেখে লোকজনের চমক লেগে যাচ্ছে। বলা বলি করছে এত সুন্দর ফলা যে নির্মাণ করলেন, তিনিই বা কেমন। এই ফলায় সকল দেবদেবীর মুর্ত্তি অঙ্কন করা আছে। এই সব দেখার জন্য কামারের ঘরে যেন যাত বসে গেল। এমন সময় ঐ পথ দিয়ে মহামদ (রাজার মন্ত্রী, লাউসেনের মামা) পাল্কি চড়ে যাচ্ছিল সঙ্গে যাচ্ছিল নফর, চাকর, কোটাল, ঝাড়খন্ডি বাদ্য ইত্যাদি। হঠাৎ কামারের ঘরে অনেক লোকের ভিড় দেখে জিজ্ঞাসা করল - এখানে আজ কি আছে ? লোকেরা বলে দুজন বিদেশী এসেছে এখানে, তাই সবাই দেখতে এসেছে। তখন

মহামদ পাল্কি থেকে নেমে হেঁটেই কামারের ঘরে গেল । বিদেশীকে দেখে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল । লাউসেন তাঁর সব পরিচয় দিলেন - নিজ নাম, কর্পূরের নাম, মা, বাবা, দাদু, মাতামহ, মাতামহী, মাসি, মেসো (গৌড়েশ্বর) আর মাতুল মহামদ (কিন্তু মাতুল মহামদকে লাউসেন চেনে না) প্রভৃতি সকলের পরিচয় দিলেন । লাউসেন ও কর্পূরের পরিচয় পেয়ে মহামদের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত অবস্থা ।

'পরিচয় বিশেষ পাইল পাত্রবর । কৃষ্ণ দেখ্যা যেমন কাঁপিল কংশাসুর ।
বিনা মেঘে বজ্রপাত মাথার উপর ।। তরাসে পাত্রের প্রাণ কাঁপে দুর দুর ।।

(১৬০)

কিন্তু মনে মনে বললো যাকে বধ করার ইচ্ছা ছিল বিধাতা তাকে আমার সামনে এনে দিয়েছেন। এই বার রঞ্জাকে আটকুড়ি করব । এই কথা ভাবতে ভাবতে লাউসেনের ফলার দিকে তার চোখ গেল । পরম কৌতুকে ফলার নির্মাণ, দেবতাদের চিত্র, কংসের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের সংগ্রাম দেখতে লাগলেন - ফলার মধ্যে আরও দেখলেন যে মহামদ নিজে লখ্যা ডুমনির পায়ের তলায় পড়ে আছে । তার মুখে চুনকালি আর মাথার উপরে শৃগাল প্রস্রাব করছে । নিজের চুনকালি মাখা দৃশ্য দেখে আগুনে ঘি ঢালার মত অবস্থা মহামদের। সে বাড়িনা গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় ফিরে গেল। মহারাজকে মিছে করে বললো - আজ ভোর বেলায় একটা স্বপ্ন দেখেছি। সেটা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম তাই বাড়ি না গিয়ে ফিরে এলাম। স্বপ্নে দেখেছিলাম গৌড়দেশে দুজন বিদেশী এসে আপনার রাজ্যপাট দখল করে নিচ্ছে, আপনার রাজ্যপাট আর বুঝি থাকবে না । মহামদের মুখে তার স্বপ্নের কথা শুনে সভার সকলেই খুব শঙ্কিত হয়ে পড়লেন । রাজা মহামদকে জিজ্ঞাসা করল - এ ব্যাপারে কি করা যায় , মহামদ যুক্তি দিল - আপনি কোটালকে ডেকে গোটা রাজধানীতে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিন যদি কারও বাড়িতে বিদেশী এসে থাকে তাকে যেন অবিলম্বে গৌড় থেকে বিতাড়িত করা হয় । অন্যথায় তার চরম শাস্তি হবে । মহাপাত্রের কথায় রাজা ইন্দ্রজাল কোটালকে ডেকে ঢোল দেবার ব্যবস্থা করলেন - যাতে কোন বিদেশী গৌড়ে না থাকে । কর্মকারের বৈঠকখানায় বসে লাউসেন কর্পূর রাজার এই আদেশ শুনে কর্মকারের বাড়ি থেকে বিদায় নেবার ব্যবস্থা করলে কর্মকার প্রথমে রাজি হচ্ছিল না । কিন্তু লাউসেন বললেন রাজ আজ্ঞা অমান্য করা উচিত নয় । এই বলে দুভাই কর্মকারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভৈরবী গঙ্গার ধারে একটা বকুল তলায় গিয়ে বসলো। এদিকে মহাপাত্রের চরেরা ওদের পিছু পিছু গিয়ে সব দেখে মহাপাত্রকে সংবাদ দিল ।

মহাপাত্র মনে মনে ঠিক করল ভাগ্নেকে বধ করতে হাতি পাঠিয়ে দেবো । এই ভেবে গদা নামে মাহুতকে ডেকে বললো - ভৈরবী-গঙ্গার ধারে দুজন বিদেশী ঘুমুচ্ছে । তাদের ওপর দিয়ে হাতি চালিয়ে দিয়ে ওদের নিধন করতে হবে, এই কাজে সফল হলে প্রচুর বস্ত্র-অলঙ্কার পুরস্কার পাবে । গদা মাহুত বললো - এটা এমন কি কাজ, আমি রাজার নুন খাই । তোমাদের জন্য সব কিছু করতে পারবো । এই বলে গদা মাণিকরাজ নামে ভাল হাতিকে হাতিশাল থেকে নিয়ে এসে পায়ের সব ঘন্টা খুলে দিয়ে ভৈরবী-গঙ্গার ধারে গিয়ে বিদেশীদের খুঁজতে লাগল । খুঁজতে খুঁজতে দূর থেকে দেখল বকুল তলায় দুজন বিদেশী কুমার নিদ্রা যাচ্ছে । অরুণ কান্তি

যোগী সন্ন্যাসীর মত রূপ দেখে মাহুত ভাবে এদের কি করে হত্যা করবো । আবার ভাবল - বিফল হয়ে ফিরে গেলে পাত্র তাকে প্রাণে রাখবে না, এই রকম মনেতে সাতপাঁচ ভেবে হাতিকে ওদের দিকে চালনা করতে গেল, কিন্তু হাতি কর পেতে বসে পড়ে শুড় দিয়ে মাহুতের পায়ে ধরতে লাগলো । একটুও এগুলো না ।

'হরি যার সাপেক্ষ তাহার কারে ডর ।
কোলে কর‍্যা সেনকে রাখিল মায়াধর ।।
প্রহ্লাদে রখিল যেন গজবৃন্দ মাঝে ।
সেইরূপ সেনকে রাখিল ধর্ম্মরাজে ।। ' (৩৪৮)

হাতির এইরকম আচরণ দেখে গদা মাহুত বিস্ময়ে ভাবতে লাগল - এই বিদেশী কুমারদের সাথে কোন দৈব বল আছে । তাই ভয়েতে হাতির পিঠ থেকে নেমে হাতিকে বকুল গাছে বেঁধে রেখে প্রাণ ভয়ে ছুটতে ছুটতে পাত্রের কাছে এসে সব সমাচার নিবেদন করল। পাত্র এই কথা শুনে প্রথমে একটু চিন্তায় পড়ে গেল ।কিন্তু কুচক্রীর ছলের অভাব হয় না। তখনই মনে মনে ঠিক করল ঐ দুই ভাগ্নেকে হাতি চোর বলে রাজার কাছে ধরে এনে শাস্তি দিতে হবে।

পরেরদিন সকালে রাজা গৌড়েশ্বর যখন দরবারে বসেছেন, সেই সময় পাত্র মহামদ বিরস বদনে দরবারে ঢুকে জানাল - মহারাজ, খুব বিপদ হয়ে গেছে ।শুনলাম আপনার পাট হাতি চুরি হয়ে গেছে। আর পাট হাতি, পাট রাণী এঁরা হচ্ছে রাজলক্ষ্মী এর মধ্যে একটাও চলে গেলে রাজ্য থাকা ভার । তাই মনে হয় আপনার রাজত্বকাল বুঝি শেষ । এই কথা শুনে রাজাতো খুব শঙ্কিত হয়ে পড়লেন । ইন্দা কোটালকে ডেকে খুব তিরস্কার করতে লাগলেন, বললেন - ব্যাটা মদ খেয়ে ঘুমাস, চৌকি দিস্ না । চোরে হাতি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে । তোর চোখে পড়ছে না, ভাল চাস তো হাতিসহ চোরকে হাজির কর, নতুবা তোরই মাথা কাটা যাবে। ইন্দ্র কোটাল জোড়হাতে করে জানাল — হুজুব, আমার অন্যায়ের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, আর চোরকে আমি খুঁজে আনবই কিন্তু একটা কথা হুজুর - কাল পূর্ণিমার রাত ছিল, চারদিকে জ্যোৎস্নায় কিংফুটে ছিল, এই অবস্থায় চৌকির মধ্যে চোর কি করে হাতি চুরি করে নিয়ে গেল । আপনি বিচারে পন্ডিত, ঘর শত্রু না থাকলে এ চুরি হয় না। রাজা বললেন - এখন আর কোন কথা নয়। হাতি সহ চোর ধরে নিয়ে আয় যত তাড়াতাড়ি পারিস্ ।

এই কথা শুনে ইন্দা ঘোড়ায় চড়ে চোর খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল । সঙ্গে চললো আরও লোকজন, ইন্দা গলি, ঘুচি, ছোট বড় রাস্তা, হাট বাজার ঝোপ-ঝাড় খুঁজতে খুঁজতে ভৈরবী-গঙ্গার ধারে এল । এদিকে লাউসেন কর্পূর ঘুম থেকে উঠে দেখল বকুল তলায় একটা হাতি বাঁধা রয়েছে। তাঁরা ভাবতে থাকেন এই হাতি যদি একবার আমাদের উপর দিয়ে যেত তাহলে আমাদের হাড় গোড় সব চুরমার হয়ে যেত ।

'নিরঞ্জন বাঁচাল্য হইয়া পক্ষাবল ।
এদেশে সজ্জন নাই লোকজন খল ।। (৪৫৬)

হস্তীবধ পালা

ইন্দা কোটাল দূর থেকে দুজন বিদেশী আর রাজার হাতিকে বকুলতলায় দেখে সেই দিকে তেড়ে এল। তাদের চেহারা সব যমদূতের মত, কর্পূর খুব ভীতু, ওদের ভয়ে সে তো লুকিয়ে লুকিয়ে ছুটে গিয়ে একটা মোদকের দোকানে ঢুকে পড়ল। এদিকে লাউসেন একা, ইন্দা আর তার লোকেদের মধ্যে কেউ বললো - মেরে ঠ্যাঙ ভেঙ্গে দাও কেউ বললো হাত পা বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে চল। যাইহোক্ শেষ পর্যন্ত লাউসেনের হাতে পায়ে গলায় শেকল দিয়ে বেঁধে টেনে টেনে রাজপথ দিয়ে চললো। নগরের লোকজনরা হাতি চোর দেখতে রাস্তার দিকে ছুটে এসে ভীড় করতে লাগল। কিন্তু যে দেখে সেই বলে - এ ছেলে হাতি চোর হতে পারে না, কিন্তু একথা মুখ ফুটে বলার সাহস কারও ছিলনা, যাই হোক্ ইন্দা কোটাল লাউসেনকে মহামদের কাছে নিয়ে এল। মহামদ লাউসেনকে দেখেইতো জ্বলে উঠল। বললো - এই চোরকে এখন বন্দীশালে ভালকরে বন্দী করে রাখবি, বুকে পাথর চাপিয়ে দিবি, একে আমি বলিদান দেব। এদিকে লাউসেনের ফলার লেখা দেখেও মহামদের বুকে যেন শেল বিঁধেছে। তাই হুকুম দিল ফলাটা পুড়িয়ে ফেলতে। অনুচররা আগুন দিয়ে ফলা পোড়াতে গেল, কিন্তু পারলো না। কুড়ুল দিয়েও ভাঙ্গতে পারল না, অগত্যা মহামদ নিজের কাছে রেখে দিল।

বন্দীশালে লাউসেন অশেষ কষ্টের মধ্যে পড়ে একভাবে ঠাকুর নিরঞ্জনকে ডাকতে লাগলেন - আবার কর্পূরের কথাও ভবতে লাগলেন -

‘ বিপদ সাগরে পড়্যা রঞ্জন নন্দনে।	বিপদে উদ্ধার কর প্রভু জগন্নাথ।।
একভাবে ভাবেন ঠাকুর নিরঞ্জনে।।’ ৫৮০	কাতর হইয়া সেন ধর্মকে ধেয়ান।
‘ অতি অকিঞ্চন আমি অধম অনাথ।	বৈকুণ্ঠতে আপনি শুনিল ভগবান।।’

(৫৮৬)

লাউসেনের কাতর ডাক শুনে ঠাকুর নিরঞ্জন হনুমানকে বললেন - আমার ভক্ত লাউসেন খুব বিপদে পড়েছে। হাতি চোর অপবাদ দিয়ে তার মামা তাকে বন্দীশালে বেঁধে রেখেছে। তার প্রাণ যাবার উপক্রম, তুমি শীঘ্রকরে গৌড়ের বন্দীশালে গিয়ে লাউসেনের বন্দীদশা মুক্ত করবে, তারপর স্বপনে গৌড়েশ্বরকে সব কথা বলে সসম্মানে লাউসেনকে মুক্তি দিতে বলবে। হনুমান ধর্মরাজের চরণে প্রণাম করে এক এক লাফে দ্বাদশ যোজন পথ অতিক্রম করে গৌড়ের বন্দীশালের কাছে পৌছালো। সেখানে গিয়ে দ্বার রক্ষকদের লাথি, চড় মেরে লেজে বেঁধে প্রাসাদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর বন্দীশালার দরজা লাথি মেরে ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখল দারুন ভাবে বেঁধে রেখেছে লাউসেনকে। হনুমান রাগে কাঁপতে কাঁপতে লাউসেনের বুকের পাথর নামিয়ে রেখে সব বাঁধন খুলে দিল। বাঁধন মুক্ত হয়ে উঠে বসে সামনেই মল্লগুরু হনুমানকে দেখে লাউসেন কেঁদে ফেললেন। তাঁকে প্রণাম করে বললেন আপনি আমাকে মুক্ত করলেন, এখন আমি পালিয়ে যাব, নতুবা মাতুল আমাকে বধ করবে। লাউসেনের কথা শুনে হনুমান বললো - তোমার কোন ভয় নাই।

‘পক্ষাবল তোমার আপনি ধর্মরাজ।
সর্বত্র বিজয় হবে সিদ্ধ হবে কাজ।।’ (৬৪২)

কাল সকালেই গৌড়েশ্বর তোমাকে সসম্মানে মুক্তি দেবে, আর নানা পুরস্কার দেবে। এমনকি ময়নার জায়গীর ও পেতে পার। রাজাকে স্বপনে সব কথা জানাবো। এই বলে হনুমান রাজার শয্যার কাছে চলে গেল। হনুমান রাজার মাথার কাছে বসে স্বপনে বললো - রাজা, তুমি রাজা হয়েও সঠিক ভাবে প্রজার বিচার করতে জানো না, এই পাপে তোমার নরক বাস হবে। একটা দুষ্ট দুর্জন অবিচারী লোককে মন্ত্রী করেছো, তার জন্যে তোমাকেও ঠকতে হবে। রঞ্জার কুমার ধর্মের সেবক সে তোমাকে দেখবার জন্য গৌড়দেশে আসছিল। তাকে হাতি চোর অপবাদ দিয়ে তোমার মন্ত্রী পাতর বন্দীশালে দারুণ ভাবে বেঁধে রেখেছে। তার জীবন সংশয়। তুমি অবিলম্বে তাকে মুক্ত করে ঘোড়া জোড়া দিয়ে সসম্মানে বিদায় দেবে। এই বলে হনুমান বৈকুণ্ঠে ফিরে গেল।

রাজা স্বপ্ন দেখে সচকিত হয়ে শয্যা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি দরবারে গিয়ে বসলেন। বারভূঞা, ঘটক, পাঠক, কবি, পন্ডিত, সদাগর , সবাই উপস্থিত, পাত্রমহামদ সেখানে প্রবেশ করল। রাজা তখন ভোর রাতের স্বপ্নের কথা উত্থাপন করলেন। রাজা বললেন আপনারা সকলে শুনুন - আজ নিশা অবসানে দেখি আমার মাথার কাছে ভীষণাকার একজন বসে স্বপনে বলছে - রাজন, তুমি দেশের ভাল মন্দ সমাচার ঠিকমত রাখ না, বিনা অপরাধে একজন বিদেশী কুমারকে পাত্র বন্দীশালে বেঁধে রেখে দিয়েছে, গুরুতর বন্ধনে তার প্রাণ শেষ হবার উপক্রম, তাকে শিঘ্র মুক্ত করবে। স্বপ্নের কথা শুনে সভাসদরা শঙ্কিত হয়ে পড়ল। রাজা গৌড়েশ্বর মহামদকে বললেন - বন্দীকে শিঘ্র আমার কাছে নিয়ে এস। আমি সভামাঝে বিচার করব। প্রকৃত চোর হলে সাজা দেবো, নতুবা ছেড়ে দেবো। তখন পাত্র মহামদ বলে - মহারাজ হাতেনাতে ঐ চোরকে ধরেছি, ওকে ক্ষমা না করে শূলে দিতে চাই। সাধারণভাবে রাজা একটু দুর্বল প্রকৃতির, মহামদের যুক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেনে নেয়, কিন্তু এক্ষেত্রে স্বপ্ন দেখার পর রাজা মহামদের ওপর বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাই মহারাজা খুব রেগে পাত্রকে বললেন - তুমি রাজার হুকুম না মেনে নিজেই তাকে শূলে দিতে চাও, নিজের ভাল যদি চাও, সত্ত্বর বন্দীকে এখানে নিয়ে এস, আমি ভালমন্দ বিচার করবো। অগত্যা মহামদ বন্দীশালে গেল বন্দীকে আনতে। গিয়ে দেখে বন্দী বন্ধন মুক্ত, তখন রক্ষীদের খুব বকাবকি করে পুনরায় হাতে পায়ে শিকল দিয়ে, গলায় জিঞ্জির পরিয়ে, কোমরে রসা বেঁধে দরবারের দিকে নিয়ে চললো, কিন্তু যে দেখে সেই বলে এ কখনও হাতি চোর হতে পারেনা।

> 'যেবা দেখে রূপ সেই করে হায় হায়।।
> সভে বলে এইজন হাতি চোর নয়।
> মিছা দোষ দিয়েছেন পাত্র মাহাশয়।।' (৭৪০)

গৌড়ের পাতর তখন মনে ভাবল, এতরূপ দেখে রাজাও একে চোর বলে ভাববে না, তাই তার গায়ে পাঁশ মাটি লেপে দিল। কিন্তু ধর্মের কৃপায় ঐ পাঁশ মাটি কস্তুরী চন্দন হয়ে গেল, গলার জিঞ্জির মালা হয়ে গেল, এই সব দেখে মহামদ ভাবলো এ বেটা ভোজবাজি জানে,

যাইহোক তখন এই ভাবেই লাউসেনকে রাজসভায় হাজির করল। রূপ দেখে গৌড়েশ্বর এবং সকলে মোহিত হয়ে গেলেন। সকলেই বললেন এই সুপুরুষ কুমার কখনই চোর হতে পারে না। রাজা রেগে পাত্রকে বললেন - তোমার পাপে আমার রাজ্য চলে যাবার উপক্রম হয়েছে। মিছে অপবাদ দিয়ে নিরীহ লোককে ধরে এনে আমাকে দায়ি করছ। তোমাকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে। রাজার ভর্ৎসনা দেখে পাত্র অধোমুখে বসে রইল। রাজা লাউসেনকে আদর করে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। লাউসেন অভিমানে কেঁদে ফেললেন। তারপর নিজের সব পরিচয় দিলেন। মা, বাবা, ঠাকুরদা, দাদু, দিদিমা, মাসি, মামা এবং সর্বশেষ গৌড়চূড়ামণি মেশোমশাই এর পরিচয় দিয়ে জানালেন -

'তুমি নৃপ চূড়ামণি তোমার মহিমা শুনি
যাত্রা কৈল্য দেখিতে চরণ।' (৮০৬)

এরপর পথে যা যা ঘটেছিল তাও বললেন, - জানালেন কামদল বাঘ হত্যার কথা, দেখালেন তার নখ, কান, লেজ, তারাদীঘির কুমির বধের কথা, কুমিরের দাঁতও দেখলেন। তারপর জামতি নগরের দ্বিচারিণী নয়নীর কথা, তার নিজের শিশু হত্যার কথা, ঠাকুর নিরঞ্জনের কৃপায় সেখান থেকে উদ্ধার, গোলাহাটকে নটী মুক্ত করা, সেই সঙ্গে নয়নী আর সুরক্ষার নাক-কান কাটার কথা। তারপর গৌড়ে পৌছে কর্মকারের বাড়িতে থাকা, সেখানে মহাপাত্রের দর্শন ও তাকে পরিচয় দান। পরিচয় পাবার পর বিদেশীদের এখানে না থাকার নির্দেশ দান। আরও বললেন বকুলতলায় আমাদের বুকে হাতি চাপিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করা, তারপর চোর বলে ধরে এনে বন্দীশালে বেঁধে বুকে পাথর চাপিয়ে রেখে প্রাণনাশের চেষ্টা, অবশেষে ঠাকুর নিরঞ্জনের কৃপায় প্রাণে বেঁচে গেছি। এই বলে লাউসেন কেঁদে উঠলেন।

লাউসেনের কাছে এই সব কথা শুনে গৌড়েশ্বর মহামদকে খুবই তিরস্কার করতে লাগলেন। বললেন - মহামদ, তুমি খুব নিষ্ঠুর, নির্দয়, তোমার মত নিষ্ঠুরের মুখ দেখাও অন্যায়, তুমি এর মামা, তুমি জেনে শুনে যে অন্যায় কাজ করেছ, তার ক্ষমা নাই। এই বলে মহারাজা লাউসেনকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন - তুমি মনে কিছু দুঃখ করোনা, আমি তোমার মেসোমশাই, তোমার সাপেক্ষে আছি, তুমি আমার কুলের প্রদীপ, ঘোড়া জোড়া যা দরকার তুমি সব নেবে। এই শুনে পাত্রের মাথায় যেন আবার বাজ পড়ে গেল, কিন্তু সে দমে না গিয়ে রাজাকে বললো - এ আমার ভাগনে নয়, এ চোর, ভোজবাজি জানে। আপনি একজন চোরকে কোলে করেছেন। এ মুখে অনেক বড় বড় কথা বলেছে - বলেছে, সারেঙ্গধলকে মেরেছে, কামদল বাঘ মেরেছে, তারাদীঘির কুমির মেরেছে, নয়নী সুরক্ষার নাক কান কেটেছে। যে বাইশ হাতির বল ধরে, সে যদি আপনার পাট হাতি মাণিক রাজকে বধ করতে পারে তাহলে বুঝব এই কুমার আমারই ভাগনা। এই শুনে লাউসেন বললেন - আমি হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু মামা আমার ঢাল খাঁড়া সব কেড়ে নিয়েছে, সেই সব অস্ত্র ফেরত পেলে আমি হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। এই শুনে রাজা পাত্রের দিকে চেয়ে বললেন- লাউসেনের ফলা অস্ত্র সব নিয়ে এস। মহাপাত্র

লাউসেনের খাঁড়া, ফলা নিয়ে এল। ফলা আর খাঁড়া ফিরে পেয়ে লাউসেন আনন্দে গন্ডা পাঁচ ছয় উল্টো পাল্টা লাফ দিয়ে দিল। লাউসেনের বীরপনা দেখে পাত্রের মনে ভয় হয়ে গেল। তখন মনে মনে যুক্তি করতে লাগলো - কি করে লাউসেনকে হত্যা করা যায়। আর গদা মাহুতকে ডেকে চুপি চুপি বললো - মানিক রাজ হাতির সঙ্গে ভাগনার যুদ্ধ হবে। তুই হাতিকে মদ খাইয়ে মাতাল করে নিয়ে আসবি। মহামদের কথায় গদা মাহুত হাতিকে খুব করে মদ খাইয়ে দরবারে নিয়ে এল। হাতি মাতাল হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। সভার লোকজন বলা বলি করতে লাগল - এই মত্ত হাতির সঙ্গে বালকের যুদ্ধ হবে। কার যুক্তিতে এত অবিচার। এমন সময় মহাপাত্র হাজির হয়ে বললো - কোথায় গেল ভাগনা । এবার হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করুক, দেখি কত বীর। এবার তার কপট চাতুরি ধরা পড়ে যাবে। এই বলে মহামদ লাউসেনকে নানা রকম গঞ্জনা দিতে লাগল। মহামদের এই সব কুটিল গঞ্জনা বাক্যে লাউসেনের রাগ দশগুণ বেড়ে গেল। সভামাঝে লাফিয়ে উঠে রাজাকে দু'হাত জোড় করে বললেন - আপনার আশীর্ব্বাদে আমি হাতি বধ করব। মামার এই গঞ্জনা বাক্য আর সহ্য হচ্ছে না। এই বলে গুরুর দেওয়া পাটের পাছড়া কোমরে বেঁধে, গায়ে রাঙ্গামাটি মেখে ধর্মরাজের চরণ বন্দনা করে হাতির সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সভামধ্যে ছোট বড় সকলে পাত্রের ধ্বংস আর শিশু লাউসেনের জয় কামনা করতে লাগলেন। কবিও ভগবানের কাছে লাউসেনের জন্য কৃপা প্রার্থনা করলেন।

'হাথির সহিত বীর বুঝিবারে যান। শঙ্করী চরণে শিবে করিবে কল্যাণ।
চান্দরায়ে কৃপা কর প্রভু ভগবান। ভনে নরসিংহ সাপক্ষ ভগবান।।' ১০৬৬

ধর্মরাজের আশীর্ব্বাদে মত্ত হাতিকে দেখেও লাউসেনের মধ্যে কোন সংকোচ বা ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। মাহুত অঙ্কুশ দিয়ে হাতিকে লাউসেনের দিকে ঠেলে দিল, লাউসেনও হাতির উপর দিয়ে বার পাঁচ ছয় লাফিয়ে হাতির দু'টো দাঁত দুহাতে ধরে হাতিকে মাটিতে ফেলে দিল, মাহুত আবার হাতিকে অঙ্কুশ দিয়ে উঠিয়ে দিয়ে লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। সভার লোকজন এই দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হায় হায় করতে লাগলো। আর পাত্র মহানন্দে মনে মনে বলছে - ভাগনে এবার যমঘরে গেল, আর নিস্তার নাই। কিন্তু 'ঈশ্বর রাখেন যারে অশেষ উপায়ে' কিম্বা 'রাখে হরি তোমারে কে'। লাউসেন হাতির পেটতলায় গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে উঠে এক লাফে হাতির উপর ওঠে গিয়ে হাতের মুঠো দিয়ে মেরে মাহুতের মাথা চৌচির করে দিল। মাহুত মারা গেল, হাতি একা হয়ে গিয়ে ছুটতে লাগল। পাত্রের মনে ভয় ঢুকে গেল, সভার অন্যান্যরা ছোটাছুটি করতে লাগলো। লাউসেন লাফ দিয়ে আবার মাণিকরাজ হাতিকে ধরে এনে পাথরে কাছাড় দিয়ে হাতির হাড় গোড় চূর্ণ করে দিল। পাট হাতির নিধন দেখে সবাই লাউসেনকে ধন্য ধন্য বলতে লাগল । লাউসেনের বীরত্ব দেখে গৌড়েশ্বরেরও খুব আনন্দ হল।

'বীরপনা বীরের দেখিয়া গৌড়েশ্বর।
পরম পুলক হৈল রাজার অন্তর।।' (১১৪৮)

রাজা তখন মহামদকে বললেন - লাউসেন মহাবীর, কিন্তু তোমার মত খল সংসারে

আর কেউ নাই। ঘোড়াশাল থেকে বেছে ভাল ঘোড়া নিয়ে এস, লাউসেনকে দেব, আর দেব আমার গায়ের এই জোড়। বিলম্ব করো না, শিঘ্র যাও। কিন্তু গৌড়ের পাতরের লাজ লজ্জা নাই, মনে মনে আবার কুমতলব ভেজে রাজাকে বললো - মহারাজ, আমি উচিৎ কথা বলি বলে খল হই। এই লোক পাট হাতি মেরে আপনাদের কাছে খুব বীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু পূর্বেই আপনাকে বলেছে - জামতিতে মরা শিশুর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। যদি দেবতা এর পক্ষে থাকে তাহলে এই মরা হাতির জীবন ফিরিয়ে দিক্। মহাপাত্রের কথায় রাজা লাউসেনকে অনুরোধ করলেন হাতিকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য। লাউসেন জোড় হাত করে নৃপতিকে বললেন - 'আমি কি জীয়াব হাথি জীয়াবে ঈশ্বর'। এই বলে লাউসেন হাতি আর মাহুতের গায়ে পুষ্পজল ছিটিয়ে দিল। সেই সঙ্গে হাতি আর মাহুত উঠে বসল। সবাই বলে ধন্য ধন্য। কলিযুগে এমন দৃশ্য আমরা দেখি নাই। রাজা লাউসেনকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন - তুমি নিজে ঘোড়াশালে গিয়ে তোমার পছন্দ মত ঘোড়া বেছে নাও। লাউসেন ঘোড়াশালে গিয়ে নানা বর্ণের, নানা আকারের ঘোড়া দেখলেন। আর ভাবতে লাগলেন কোন ঘোড়া নেবেন। অবশেষে ছোট্টখাঁট্টো এক ঘোড়ার কাছে এলেন। লাউসেনকে দেখে ঘোড়াটি ঘন ঘন মাটি আঁচড়াতে লাগল। আর লাউসেনকে বললো - আমি অস্তির পাখর, সূর্য্যের সাত ঘোড়ার মধ্যে একজন, তোমার মনে আছে কিনা জানিনা, ধর্মরাজ ধর্মপূজা প্রকাশের জন্য তোমাকে মহিতলে পাঠিয়েছেন, আর আমাকে পাঠিয়েছেন, তোমার ঘোড়া হিসাবে, আমি বার বৎসর তোমার অপেক্ষায় এখানে আছি, এছাড়া চার বিদ্যাধরিকে পাঠিয়েছেন তোমার জীবন সঙ্গী হবার জন্য। অস্তির পাখরের কথা শুনে লাউসেন খুব আনন্দিত মনে ওকেই রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা ঘোড়াকে সাজিয়ে দিতে বললেন, সেই সঙ্গে সেনকে দিলেন শিরোপা, নানা অলঙ্কার, ময়নার জায়গীর। এই সব দেখে মহাপাত্রের মাথায় ফের যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ল, আবার চাতুরী করে বললো - ও আগে ঘোড়ায় চড়ে দেখাক কেমন সিফাই, তারপর ওকে জায়গীর লিখে দেবো। মামার এই কথা শুনে লাউসেন লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে পড়ল। আর সূর্য্যের ঘোড়া অস্তির পাখর নিমেষের মধ্যে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে বৈকুণ্ঠ, গোলকধাম, কৈলাশ, সুমেরু, কুমেরু সব দেখাতে লাগল। এদিকে মহাপাত্র ভাবল ঘোড়া ভাগ্নাকে আকাশ থেকে নিশ্চয় ফেলে দিয়েছে। যাই হক আপদ গেল। এই কথা বলতে না বলতেই লাউসেনকে নিয়ে ঘোড়া ফিরে এল। লাউসেন ঘোড়া থেকে নামতেই রাজা উঠে গিয়ে লাউসেনকে আলিঙ্গন করে বললেন - আজ থেকেই তুমি ময়নার অধিপতি, তোমাকে ময়নার জায়গীর লিখে দিলাম। সেই সঙ্গে দিলেন নানা ধন সম্পতি। ওদিকে কর্পূর ময়রার ঘরে বসেই সব সংবাদ পেল যে রাজদরবারে দাদার জয় হয়েছে। সেই শুনে কর্পূর রাজসভায় উপস্থিত হল। লাউসেন রাজার কাছে কর্পূরের পরিচয় করিয়ে দিতেই রাজা কর্পূরকে কোলে তুলে নিলেন।

গৌড়দেশে লাউসেন ও কর্পূরের বীরত্বের জন্য খুব নাম যশ হল। সবাই বলতে লাগল - লাউসেন ধর্মের অবতার, আর তখন থেকেই গৌড়দেশে ধর্মপূজার প্রচার আরম্ভ হল।

বার

কাঙুর মহিম যাত্রা পালা

১) গৌড় থেকে লাউসেনের ময়না যাত্রা ঃ গৌড়দেশে লাউসেন কর্পূরের জয় জয়কার হতে লাগলো, দু'ভাই গৌড়দেশের নানা জায়গা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এর পর কর্পূর একদিন বললো - আমাদের এবার বাড়ি যেতে হবে। সেখানে বৃদ্ধ মা-বাবা আছেন, -

'জন্মভূম জান্য রায় গোলক সমান।
জনকেরে জানিবে সাক্ষাৎ ভগবান।।
জননী সমান গুরু নাহি ত্রিভূবন।' (১৫)

কর্পূর আরও জানালো - আর বিলম্ব ক'র না দাদা তোমার আমার জন্য মা ব্যাকুল হয়ে আছেন। কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন ঘোড়া সাজাতে বলে গৌড়েশ্বরের কাছে বিদায় নিতে গেলেন। রাজাকে জোড়হাতে বললেন - আপনার আজ্ঞা হলে আমরা বাড়ি ফিরে যাই। নৃপতি বললেন তোমাদের বিদায় দিতে মন কিছুতেই চাইছে না। কিন্তু মা-বাবার কথা যখন বলছ তখন যেতেই হবে। এই বলে রাজা লাউসেন ও কর্পূরকে অনেক বসন, ভূষণ, ধনরত্ন দিয়ে আর কপালে চুম্বন দিয়ে বিদায় জানালেন। এরপর দুভাই মাসির কাছে বিদায় নিতে গেলেন, মাসি, দুজনকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বললেন - ধন্য রঞ্জা, তোমাদের মত সন্তানের জননী হয়েছে, ধর্ম তার সহায়। কথা বলতে বলতে ভানুমতী কেঁদে ফেললেন। বললেন - রঞ্জাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। আর একবার আসতে বলবে, অনেক দিন দেখি নাই। এই বলে লাউসেন কর্পূরকে নানা ধনরত্ন আর বসন ভূষণ দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। মাসিকে নত হয়ে প্রণাম করে পুনরায় রাজার কাছে শেষ বিদায় নিতে গেলেন।

'পুনরায় দুহে ভূপতির স্থানে যান।।
বিদায় হইল বীর রাজ্যর গোচর।
ভনে নরসিংহ যার শাঁখারিতে ঘর।।' (৯২)

২) কালুডোমের সঙ্গে লাউসেনের পরিচয় ও তাকে ময়নার দায়িত্ব অর্পণ ঃ ভূপতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রবির ঘোড়া অম্ভীর পাখর ঘোড়ায় দুভাই চেপে বসল। অমনি অম্ভীর পাখর আকাশ পানে ছুটে চললো - এক নিমেষের মধ্যে রমতি নগরের কাছে চলে এল। কর্পূর বললো - একবার মামার বাড়ি যাওয়া উচিৎ। কিন্তু লাউসেন বললেন তুমি জান না - মামা দুরন্ত নির্দয়, তার দয়া মায়া কিছু নাই, সুতরাং এই দুর্জনের কাছে কখনই যাওয়া ঠিক নয়। যে কোন ছল চাতুরী করে আমাদের নিধন করবে। তাই ওখানে না গিয়ে সোজা ঘর চল। তবে এই গাছ তলায় একটু বিশ্রাম নেবে চল। এই বলে একটা পুকুর পাড়ের গাছ তলায় বিশ্রাম নিতে

গেলেন। হঠাৎ ডাল শুদ্ধ একটা পাখি মাটিতে এসে পড়ল। লাউসেন ঐ বাটুলাহত পাখিকে দেখে বুঝল যে একে মেরেছে সে মহাবীর। সেই সময় কালুবীর পাখিকে নিতে এল। লাউসেন কালু ডোমকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে কালু জানাল - আমি জাতিতে ডোম। কুলো, চালুনি, চাঙ্গারি, ঝুড়ি এই সব বুনে বিক্রি করি আর শুয়ার চড়াই, কোন রকমে এক বেলা খাই, আমার দুছেলে শাকা, শুকা, রণে ধর্নুদ্ধর। আমরা এই রমতি নগরেই থাকি। লাউসেন কালুর কথা শুনে নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে বললেন - তুমি যদি ইচ্ছা কর আমার সঙ্গে যেতে পার, অনেক সুখে থাকবে, এখানে থেকে এত দুঃখ কষ্ট করার দরকার কি। এই শুনে কালুর মনে খুব আনন্দ হল, জোড় হাতে বললো - তার ঘরে ডুমনি আছে। দুজনে যুক্তি করে আপনাকে নিবেদন করবো।

কালু সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ডুমনি লখ্যাকে সব জানাল। লখ্যাও এই প্রস্তাবে খুব আনন্দিত হল, আর বললো - এক কাজ কর এখানে যে ক'ঘর ভাই, বন্ধু কুটম্ব আছে সবাইকে এই কথা বল। আমরা এক সঙ্গে যদি সবাই যাই তাহলে যম ইন্দ্র কাকেও আর ভয় থাকে না। কালু তেরঘর ডোম আত্মীয় কুটুম্বকে ডেকে লাউসেনের প্রস্তাবের কথা জানাল - সকলেই এক বাক্যে ময়না যেতে রাজি হয়ে গেল। বললো - এখানে এত দুঃখ কষ্ট করে থাকার দরকার কি। তখন সব ডোম আর ডুমনিরা লাউসেনের কাছে গিয়ে প্রণাম করে তাদের কথা নিবেদন করলো। কালুডোম বললো - আমরা সবাই আপনার সঙ্গে ময়না যেতে চাই, তবে একটা নিবেদন - আমরা সাত পিড়ি রাজার চাকর, রাজার নুন খেয়ে আসছি, তাই তাঁর বিনা অনুমতিতে আমাদের এ দেশ ছেড়ে যাওয়া উচিৎ হবেনা। আমরা একবার রাজার অনুমতি নিয়ে এসেই আপনার সঙ্গে যাবো। এই যুক্তি শুনে লাউসেন আনন্দিত হয়ে বললেন আমিও তোমাদের সঙ্গে গিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে অনুমতি চেয়ে নেব। এই বলে লাউসেন কর্পূর ঘোড়ার পিঠে আর কালু তাদের আগে আগে চললো

গৌড়েশ্বর দরবারে বসেছেন, এমন সময় লাউসেন দরবারে এসে পৌছাতেই সকলেই একটু বিস্মিত হয়ে গেলেন। লাউসেন জোড়হাতে রাজাকে নিবেদন করলেন - মহারাজ আপনার কাছে একটি ভিক্ষা চাইতে এসেছি - আপনি কৃপা করে রমতির তের ঘর ডোমকে যদি আমাকে ভিক্ষাদেন তাহলে ময়না দ্রাবিড় দেশের লোকেদের হানা থেকে রেহাই পায়। রাজা গৌড়েশ্বের লাউসেনের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে জানালেন - কালু ডোমের বীরত্ব এ অঞ্চলে বিখ্যাত, এছাড়া তের ঘর ডোমও খুব বীর, আর একটা বিষয় এরা নীচ জাতি হলেও চোর ডাকাত নয়। তুমি এদের ভাল করে পালন করবে। তোমার হাতে কালু ডোমদের সঁপে দিলাম। লাউসেন পুনরায় রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কালু বীর ও তের ঘর ডোম নিয়ে ময়না চললেন। তবে যাবার আগে সেন নিজে একবার ডোমদের ঘর দেখতে গেলেন।

'দয়ার সাগর সেন সরল হৃদয়।
আপনি দেখিতে গেলা ডোমের আলয়।।'(২৫৮)

তারপর ডোমেরা শুভক্ষণে লাউসেনের সঙ্গে ময়না যাত্রা করলো। যাবার সময়

সবাই তাদের ভিটে মাটিকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল।

লাউসেন-কর্পূর ঘোড়ার পিঠে চললো, কালুবীর বাঁশের রনপায়ে চললো, বাকি সব পিছু পিছু লাইন দিল। লাউসেন ঘর যাচ্ছে বলে মনের আনন্দে যেতে লাগলেন। ডোম-ডুমনিরা ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে আসছিল, লাউসেন সেই দেখে ভাল বসন ভূষণ দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে তাদের ময়না নিয়ে গেল।

ময়না পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে দু'ভাই মা- বাবার কাছে ছুটলো, দুহাত দিয়ে মা বাবাকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই রাণী তাঁদের চুমু খেয়ে কোলে টেনে নিলেন। বললেন - আজ আমার সব দুঃখ দূর হল। আমি চিন্তায় অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন গৌড়দেশের কথা, কিভাবে সেখানে পৌঁছালো। গৌড়েশ্বর মেসো, তোমার মাসি, আমার মা, বাবা, তোমার মাতুল তোমাদের কেমন আদর যত্ন করল, সব বল। মায়ের কথায় লাউসেন একে একে সব বর্ণনা দিলেন - জলন্দায় কামদল নামে বাঘ হত্যা, তারাদীঘিতে কুমির নিধন, জামাতি নগরে দ্বিচারিণী নয়নার আচরণ, ধর্মের কৃপায় সেখানে জয়, গোলাহাটে সুরক্ষা নটীদের কথা, গোলাহাটকে নটীমুক্ত করা, তারপর গৌড়ে কর্মকারের ঘরে একরাত্রি অবস্থান, মামার কুচক্রে হাতি চোর অপবাদে বন্দীশালে অবস্থান, অনাদ্যের ভরসায় সেখান থেকে মুক্ত, আবার মামার কুচক্র। পাটহাতির সাথে যুদ্ধ। ধর্মের কৃপায় হাতিকে নিধন, আবার তার জীবনদান। এই সবের জন্য রাজা গৌড়েশ্বরের কাছে সমাদর লাভ, ঘোড়া, জোড়া, ময়নার জায়গীর, সবশেষে কালুবীরকে প্রদান, সব কিছুই লাউসেন মা বাবাকে জানালেন। এরপর মা রঞ্জাবতী দু'ভাইকে নাড়ু, মিঠাই, ক্ষীর কলা সব খেতে দিলেন। দু'ভাই মনের আনন্দে খাওয়া দাওয়া করে বাইরের দলিজে গিয়ে বসলেন। কালু ডোমদের থাকার সব ব্যবস্থা করে দিলেন, এবং প্রত্যেককে পঞ্চাশ করে মোহর দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে তের ঘর ডোম পরিবারের জন্য সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরী করে দিলেন। সকলের সামনে কালুকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে লাউসেন বললেন - তোমার হাতে ময়না নগর সঁপে দিলাম, আজ থেকে তুমি হলে এই দেশের ধাতা, রিপু এলে তাদের মাথা কেটে নেবে। এক কথায় লাউসেন কালুবীরকে তার প্রধান সেনাপতি করলেন। আর ময়নার জয়পতি মন্ডলকে বিশেষ সহচর করলেন।

লাউসেন প্রজাদের সুখের জন্য এবং তাঁর রাজ্যে প্রজাবৃদ্ধির জন্য খাজনার হার কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। বাস্তু ভিটার খাজনা মুকুব করে দিলেন এবং বাৎসরিক খাজনা কিস্তি বন্দী করে আদায়ের ব্যবস্থা করলেন। খাজনার আসানের কথা শুনে জয়পতি মন্ডল খুব খুশি হলেন এবং লাউসেনের এই প্রস্তাব চারদিকে প্রচার করে দিলেন। তার ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রাহ্মণ, পন্ডিত, ব্যবসায়ি, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, বুদ্ধিজীবি কায়স্থ, মালাকার, কৈবর্ত, কর্মকার, মোদক, তেলি, বারুই, সূত্রধর, তাঁতি, গন্ধ বণিক, বৈদ্য চিকিৎসক, এই রকম বহুলোক, বহু পরিবার ময়নাতে বসবাসের জন্য চলে এলেন। ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য রাজা চৌপাঠী, টোল স্থাপন করলেন, নগরের লোকজনদের সুবিধার জন্য দোকান পাট, হাট বাজার বসালেন। লাউসেন প্রজাদের জন্য নানা রকম সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করলেন। লাউসেনের প্রজাপালন যেন

রামের সমান। যার ফলে নানা দেশ থেকে সব চলে আসতে লাগল, এমনকি রমতি নগর থেকেও।

'প্রজার পালন যেন রামের সমান। রমতি ভাঙ্গিয়া বৈসে ময়না নগর।
নানা দেশ হৈতে হৈল প্রজার পয়ান।। ভনে নরসিংহ যাকে ধর্ম দিল বর।।'
(৪৯০)

এদিকে রমতি নগর ছিল গৌড়ের অধীন। তাই রমতির লোকজন ময়না চলে যাচ্ছে শুনে গৌড়েশ্বর রেগে আগুন।

' ক্রোধ কর্য্যা চাহেন পাত্রের পানে রায়। রাজ্যের দিলাম ভার ভাঙ্গিল মুলুক।
বলেন তোর অবিচারে মোর দেশ ভাঙ্গ্যা যায়।। উপযুক্ত না হয় দেখিতে তোর মুখ।।
(৪৯৬)

আজি হৈতে যদ্যপি আসিবি দরবার।
সমুচিত শাস্তি পাবি দিবি গুণাগার।।' (৪৯৮)

৩) মহাপাত্রকে সভা থেকে বহিষ্কার, ফলে নকল যুদ্ধের মহড়া ঃ- রাজা দুর্বল চরিত্রের হলেও এখানে কিছুটা দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে পাত্রকে সভা থেকে বের করে দিলেন। পাত্র মনের দুঃখে বাড়ি গিয়ে ভাবতে লাগলো কিভাবে রাজাকে জব্দ করা যায়। এরপর মনে একটা ফন্দী এঁটে গদাধর ভাটকে চুপি চুপি ডেকে বললো - রাজা আমাকে সভা মাঝে খুব অপমান করেছে। তুমি এক কাজ কর, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে রাত্রে নৌকার ওপর বাজনা বাদ্য তুলে নিয়ে খুব জোরে বাজাবে, আর কামানে আগুন দিয়ে খুব শব্দ করবে। মহারাজ ভাববে কেউ গৌড় রাজ্য আক্রমণ করতে এসেছে, মহামদের কথা শুনে গদাধর ভাট গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠে বাজনা বাদ্য বাজাতে লাগল। আর কামানের গোলা ছুড়তে লাগল। অন্ধকার রাত্রি জলের ওপর থেকে বাজনা বাদ্যের গম্ গম্ শব্দ আর কামানের আওয়াজে রাজা ভয়ে কম্পবান। চারিদিকে লোক ছোটাছুটি করছে। রাজা তখন ইন্দ্রজাল কোটালকে দিয়ে মহামদকে ডাকতে পাঠালেন। মহাপাত্র এটাই চেয়েছিল। মহাপাত্র অবিলম্বে রাজার কছে এসে তাঁর চরণ বন্দনা করে দাঁড়াল। রাজা তার হাত ধরে বললেন - শীঘ্র দেখ, কারা গৌড় রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। মহামদ হাতজোড় করে বললো - এমন কি কাজ, যদি আজ্ঞা দেন আমি নিজে গিয়ে এদের তাড়িয়ে দিয়ে আসি। লোক মুখে শুনলাম কাঙুর রাজ কর্পুরধল আসছে। এই বলে মহামদ ঘোড়ার পিঠে চেপে বেশ কিছু লোকজন নিয়ে ছুটল। যাবার আগে নিজের লোকদের গোপনে বললো - তোমরা তাড়াতাড়ি গদাধরকে গিয়ে বল - বাজনা বন্ধ করতে, রাজা আমাকে আদর করে ডেকে এনেছে। আমার জয় হয়েছে। এই শুনে মহামদের চরেরা গদাধর ভাটের কাছে গিয়ে সব কথা বললো - গদাধর বাজনা বন্ধ করে চলে গেল। এদিকে মহামদ গঙ্গার ঘাটের দিকে যাবার সময় খুব জোরে বাজনা বাদ্যি বাজিয়ে, কামান দাগতে দাগতে চললো - এমন ভান করতে লাগল যেন এই শব্দ শুনে বিপক্ষ দল ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, পরে সবাই বলতে লাগলো মহপাত্রের জন্য এই যুদ্ধে জয় হল।

মহাপাত্র নকল যুদ্ধ জয় করে রাজার কাছে ফিরে এল। রাজা খুশি হয়ে তাঁর গায়ের খাসা জোড়া খুলে দিলেন, নানা ধন, আর ভালো ঘোড়া কেনার জন্য দুলক্ষ টাকা দিলেন। মহামদের মর্যাদা আরও বেড়ে গেল। এরপর রাজা আর মন্ত্রী দুজনে বসে যুক্তি করতে লাগল- কি করে কাঙুর রাজ কর্পূর ধলকে পরাস্ত করা যায়। মহামদ মনে মনে বললো - এই সুযোগে রঞ্জার ছেলেকে কাঙুর পাঠিয়ে দেওয়া হোক। যুদ্ধে জয় হয় ভাল, নচেৎ গন্ডকীতে ডুবে মরলে আপদ যায়। এই ভেবে রাজাকে বললো - লাউসেন ধর্মবর পুত্র। তাকে কাঙুর যুদ্ধে পাঠান। নিশ্চয় যুদ্ধে জয় হবে। পাত্রের যুক্তি সঠিক বিবেচনা করে রাজা গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ময়না থেকে আনবার জন্য পত্র লিখে পাঠালেন। চিঠির প্রথমে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে তারপর লিখলেন কাঙুরের রাজা কর্পূরধল রাজকর দিচ্ছেন না। তুমি কাঙুর যুদ্ধে গিয়ে কর্পূরধলের কাছ থেকে কর আদায় করে নিয়ে এস। কাঙুর জয় করে এলে প্রচুর পুরস্কার পাবে। চিঠির শেষে লিখলেন - 'তারিখ তেরঞি তুলা সোম সুত বার।' এই চিঠি লিখে ইন্দ্রজাল কোটালকে ময়না পাঠালেন। ইন্দ্রজাল ময়না এসে লাউসেনের কাছে গৌড়েশ্বরের চিঠি দিলেন, লাউসেন দরবারে বসেছেন এমন সময় মহারাজের চিঠি পেয়ে এবং কাঙুর যুদ্ধ যাত্রার আমন্ত্রন পেয়ে খুব খুশি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালুবীরকে ডেকে সব জানালেন, কালুবীরও কাঙুর যুদ্ধে যাবার জন্য লাউসেনকে উৎসাহিত করলো। তাই কবিও ঠাকুরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করে জনালেন —

'চান্দরায়ে কৃপা কর প্রভু দয়াময়।।
শঙ্করী চরণে শিবে হবে বরদায়।
ধর্মের মঙ্গল বসু নরসিংহ গায়।। ' (৬৯৬)

কালু বীরের কাছ থেকে কাঙুর যুদ্ধে যাবার উৎসাহ পেয়ে লাউসেন অভির পাখর ঘোড়ার কাছে গেলেন - ঘোড়া রাহুতকে দেখে আনন্দে হেস্বর করতে লাগল। প্রভুর মুখে কাঙুর যুদ্ধের কথা শুনে তারও যেন খুব আনন্দ হল। সেও যেন বললো -

'ভয় কিছু নাহি রাজা সাজ্যা চল রণে।
নিমিষে লইয়া যা'ব কাঙুর ভুবনে।।' (৭১০)

এরপর লাউসেন পিতার কাছে বিদায় নিতে গেলেন। পিতা কর্ণসেনের কাছে গিয়ে প্রণাম করে লাউসেন বললেন - গৌড়েশ্বর আমাকে কাঙুর যুদ্ধে যেতে লিখেছেন। আপনি আজ্ঞা দিলে কাঙুর যুদ্ধে যাই। যুদ্ধের কথা শুনে কর্ণসেন ভয়ে অস্থির, বললেন - তোমার ছ'দাদা যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তুমি যুদ্ধে গেলে আমি আর বাঁচবো না। পিতার কথা শুনে লাউসেন বললেন - আপনার কোন ভয় নাই, আপনার আশীর্ব্বাদে যুদ্ধ জয় করে আসব। ঠাকুর নিরঞ্জন সদাই আমার সাপক্ষে আছেন। আমি গৌড় রাজার অধিনে, রাজার নুন খাই। রাজ আজ্ঞা সব সময়

পালন করা আমার উচিৎ। এই কথা শুনে কর্ণসেন বললেন - ঠিক আছে মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবে যুদ্ধে যেও। এই শুনে লাউসেন ছুটে মায়ের কাছে গেলেন, মাকে প্রণাম করে বললেন - মা, আমাকে কাঙুর যুদ্ধে যাবার জন্য গৌড়েশ্বর আজ্ঞা করেছেন, এই কথা শুনে রাণী রঞ্জাবতী পাগলের মত অবস্থা, বললেন - অনেক কষ্টে তোমাকে পেয়েছি, তোমাকে কাঙুরের গড়ের কঠিন যুদ্ধে যেতে দেব না। গৌড়েশ্বর নিজে আর তোমার মামা দুজনাই কাঙুর যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে নাই, তুমি কোন সাহসে সেই যুদ্ধে যাবে। আমাদের ধন সম্পত্তির প্রয়োজন নাই, ভিক্ষে করে খাব, সেও ভাল। মায়ের কথা শুনে সেন জোড় হাত করে বললেন - কোন চিন্তা কর না, ঠাকুর মায়াধর আমার সাপক্ষে আছেন, এর ওপর তোমার আশীর্ব্বাদে আমি সর্বত্র জয়ী হব। রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিৎ নয়। মা তুমি মনে কোন দ্বিধা না করে আমাকে অনুমতি দাও। তোমার আশীর্ব্বাদে আমি যুদ্ধ জয় করে ফিরব।

'এত বলি বিদায়, বাপস্থানে রায়।
পদরজ দু'জনার বন্দিল মাথায়
রাজ রাণী দুজনায় করিল আশিস।।
সমরে সারথি বাছা হবে জগদীশ।' (৭৭২)

মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুভক্ষণে যাত্রা করে বাইরের দলিজে গিয়ে সহিস কে ঘোড়া সাজাতে বললেন - রবির ঘোড়া অস্তির পাখর প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধে যাবার আনন্দে নাচতে লাগল -লাউসেন যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হলেন। কোমরের ডান দিকে কাটারি, বাঁ দিকে তলোয়ার, পিঠে ঢাল ফলা, আর তীর ভর্ত্তি তূণ বাঁধলেন। কালুবীর, শাকা শুক ও অন্যান্য ডোমেরা কোমর বেঁধে তাদের তীর ধনুক নিয়ে জোড় হাত করে সেনের সামনে এসে দাড়াল।

'দেখ্যা লাউসেন রাজা আনন্দিত মন।
ভনে নরসিংহ যার শাঁখারি ভবন।।' (৮১৮)

৪) লাউসেনের কাঙুর যুদ্ধ যাত্রার ব্যবস্থা ঃ শুভক্ষণে ব্রাম্মণ পন্ডিত লাউসেনকে আশীর্ব্বাদ দিলেন। রাজা লাউসেন হাত পেতে আশীর্ব্বাদি ফুল নিয়ে ঘোড়ায় উঠলেন। আগে আগে যায় কালুবীর, তার পিছু পিছু শাকা, শুক ও অন্যান্য ডোম সৈনিকরা চললো.- তার পিছু পিছু সিঙ্গা, কাড়া ঘন ঘন বাজিয়ে চললো আরও অনেকে । দেখতে দেখতে কালিন্দী, পাদুমার বিল, উচলন মোঘলমারি, বাবরকপুর পেরিয়ে নৌকায় দামোদর পার হয়ে বর্ধমানে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে স্নান পূজা সেরে আবার যাত্রা শুরু করলেন। লাউসেনের ঘোড়া নক্ষত্রের গতিতে ছুটে নিমেষে কর্জনা, মঙ্গলকোট, তারাদীঘি, গোলাহাট, বালিঘাট, গোপালপুর পার হয়ে দুপুরের মধ্যেই গঙ্গার ঘাটে এসে পৌছাল।

'সম্মুখে গঙ্গার তীর দেখ্যা হর্ষ কালুবীর' (৮৬৭)

তারপর সকলে গঙ্গায় স্নান করে রন্ধন ভোজনের ব্যবস্থা করতে লাগল। লাউসেন একমনে নিরঞ্জনের পূজা করলেন।

'হৈয়া এক ভাব মন   পূজা কর‍্যা নিরঞ্জন
করিলেন রন্ধন ভোজন।।' (৮৭৬)

সবাই মিলে পরিপাটি করে খেয়েদেয়ে গৌড় যাত্রা করলেন। গঙ্গা পার হয়ে লাউসেনের দলবল গৌড়ে পৌঁছাল। বাজনা বাদ্যি, অস্তির পাখর ঘোড়ার নাচনে আর খুরের শব্দে গৌড়ের মাটি তোলপাড় হতে লাগল। এরপর রাজবাড়ি পৌঁছে লাউসেন ঘোড়া থেকে নেমে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। রাজা তার হাত ধরে সব সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন, এবং খুব সমাদর করলেন।

'দেখিয়া পাত্রের মুন্ডে পড়িল বজ্জর।'   (৯০৮)

পাত্র সেনকে অযথা বকাবকি করতে লাগল রাজার কাছে বসেছে বলে। রাজা গৌড়েশ্বর কিন্তু সেনকে আদর করে জানালেন - তোমাকে কিছু কথা বলছি। কামরূপ কামিক্ষার (কাঙুর দেশের) রাজা কর্পূরধল বহুদিন রাজকর দেয় নাই, তুমি কামরূপে গিয়ে রাজাকে কর দিতে বলবে, যদি কর দেয় তাহলে তাকে ঘোড়া-জোড়া দেবে, আর অন্যথা করলে তার মাথা কেটে আনবে। এখানে তোমার চেয়ে বীর আর কেউ নাই। তুমি গেলে নিশ্চয় কাঙুর জয় হবে। রাজার কথায় লাউসেন জোড়হাত করে বললেন - আপনার চরণে একটি নিবেদন আছে, শুনেছি পূর্বে মামা দলবল নিয়ে কাঙুর যুদ্ধে গিয়েছিলেন কিন্তু ছ'মাসেও গন্ডকী পার হতে পারেন নাই, আর সেই ভয়েই মাতুল আর কাঙুর মুখো হতে চাইছেন না। আর আমি অতি তুচ্ছ। আমি কিকরে অসাধ্য সাধন করবো। লাউসেনের কথা শুনে পাত্র তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বললো-' ভাল চাস তো শীঘ্র কাঙুর যুদ্ধে যা, নচেৎ তোর সব কেড়ে নেবো।' মামার কথা শুনে সেন জোড় হাত করে রাজার চরণ বন্দনা করে বললেন -

'সংগ্রাম করিব জয় তোমার আশিসে।
গন্ডকী নদীর জল পারায় নিমিষে।।' (৯৫৬)

৫) লাউসেনের কাঙুর যুদ্ধ যাত্রা ঃ লাউসেনের বিক্রম দেখে রাজা আনন্দিত হয়ে নিজের পাগড়ি সেনের মাথায় পরিয়ে দিলেন, গায়ের উত্তরিও খুলে সেনের গায়ে দিয়ে দিলেন। শুভক্ষণে লাউসেন কাঙুর যুদ্ধ যাত্রা করলেন-

কাঙুরের পথ খুব দুর্গম, নদী, নালা, বনজঙ্গল পার হতে হতে গোহাটি দেখা গেল, বাঁদিকে পাহাড় পর্বত, ডানদিকে বড় নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে গন্ডকী নদীর ঘাটে এসে পৌঁছাল। গন্ডকী নদীর জল ছিল মাত্র এক হাঁটু, কিন্তু শত্রুপক্ষ দেখে নদী প্রবল আকার ধারণ করল। পর্বত প্রমাণ ঢেউ, প্রবল স্রোত দেখে লাউসেন কালুবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন - গণ্ডকীর

জল এক হাঁটু ছিল, সেই জল হঠাৎ সাত তাল হয়ে প্রবল আকার ধারণ করল কি করে। ঝড় বৃষ্টি নাই, বর্ষাকালও নয়, ব্যাপার কি? লাউসেনের কথা শুনে কালুবীর জানাল - দেবী ভগবতী কাম্খিক্ষা কর্পূর ধলের সাপেক্ষে, তার বরেই শত্রু পক্ষ দেখলেই গন্ডকীর জল সাত তাল হয়ে ওঠে, কারো সাধ্য নাই গন্ডকী পার হতে পারে। এই কথা শুনে লাউসেন মনে মনে ঠাকুর মায়াধরকে ডাকতে লাগলেন।

'লাউসেন শুনিঞা ভাবেন মায়াধর। দীনের দয়াল প্রভু দয়ার সাগর।।' (১০১২)	'কৃপা কর ঠাকুর সমরে হকু জয়। দলবল কি কর‍্যা গন্ডকী পার হয়।।' (১০২০)

বৈকুণ্ঠে ঠাকুর নিরঞ্জন হনুমানকে বললেন তুমি অনেক অসাধ্য সাধন ক'রেছ, রঞ্জার পুত্র গন্ডকী নদীর ধারে আট্‌কে গেছে, পারাপার হতে পারছে না। ভবানীর বরে নদীর জল বেড়ে গেছে, তুমি সেনকে গিয়ে বলো - গৌড়েশ্বরের মাতা ধর্মপাল মহিষী বল্লভাকে রত্নাকর যে মালা আর কাটারি দিয়েছেন সেই মালা আর কাটারি নদীর জলে ছুঁয়ালে নদী শুখিয়ে যাবে। তাই লাউসেন যেন মহারাণী বল্লভার কাছে গিয়ে সেই মালা আর কাটারি নিয়ে আসে তাহলেই তার যুদ্ধে জয় হবে। ঠাকুর নিরঞ্জনের এই কথা শুনে হনুমান নিমেষে গন্ডকী ধারে এসে লাউসেনকে ঠাকুর ধর্মরাজ নিরঞ্জনের কথা বলে রাজমাতা বল্লভার কাছ থেকে মালা আর কাটারি নিয়ে আসতে বললেন, - আর বললেন গন্ডকীর জলে ঐ কাটারি ছোঁয়ালে জল শুকিয়ে যাবে। আর ব্রহ্মার মালা দেখে ভবানী কাঙুর ছেড়ে কৈলাশ চলে যাবেন। হনুমানের কাছে এই কথা শুনে লাউসেন আনন্দ চিত্তে গৌড়ে রাজমাতা বল্লভার কাছে সব নিবেদন করলেন। বল্লভা মালা আর কাটারি লাউসেনকে অর্পণ করলেন। লাউসেন মালা আর কাটারি নিয়ে গন্ডকীর ধারে ফিরে এলেন। ফিরে এসে গন্ডকীর জলে কাটারি ছুঁয়াতেই গন্ডকীর জল কমে গিয়ে এক হাঁটু হয়ে গেল। সেন তার দলবল নিয়ে গন্ডকী পার হয়ে কাঙুরের পশ্চিম গড়ে উপস্থিত হলেন।

তের

কাঙুর যুদ্ধ ও কলিঙ্গার বিবাহ পালা :

১) কাঙুর যুদ্ধ ও লাউসেনের জয়লাভ ঃ লাউসেন আর কালুবীর দলবল নিয়ে কাঙুরের পশ্চিম গড়ে পৌছে দেখলেন নানা বর্ণের পাথর দিয়ে তৈরী সাত গড় কাঙুর, গিরি, গুহা, গহন অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত। এই দেখে লাউসেন ভাবতে লাগলেন কি করে এই অলঙ্ঘ কাঙুর গড় জয় করা যায়। কালুবীর তখন বললো - আপনি শাকা শুকা আর দলবল নিয়ে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি একা গিয়ে কর্পূর ধলের দল বল কেমন সব দেখে আসি, আর যদি সুযোগ পাই একাই যুদ্ধ করে আসব। আপনি অনুগ্রহ করে ব্রহ্মার কর যপের মালাটি আমার হাতে দিন। আমি দেবী ভগবতীকে ঐ মালা দেখাবো। উনি কাঙুর ছেড়ে কৈলাশে চলে যাবেন। এই বলে কালুবীর সন্ন্যাসীর বেশ ধরে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করল। কাঙুর নগরের শোভা দেখে কালুর মনে হল ঐ যেন দ্বিতীয় অমরাবতী, নগরের শোভা দেখতে দেখতে কালুবীর রাজার দলিজ দ্বারে পৌঁছাল। বাড়িঘর দেখে তার মনে হল যেন ইন্দ্রের ভবন। কালুবীর দেবী কামিক্ষার মন্দিরের কাছে উপস্থিত হল -

'মহাসিদ্ধ পীঠস্থানে বীর উপনীত।
ধর্মের কৃপায় নরসিংহ গায় গীত।।' (৮২)

'দন্ডাইয়া দেবীর দ্বারে কালুসিংহ ধল।
জোড় হাথে বন্দিলেন চরণ যুগল।।
পাদপদ্ম দর্শনে সকল পাপ ক্ষয়।
দ্বিতীয় কৈলাশ প্রায় দেবীর আলয়।।' (৮৬)

কালু দেখল দেবীর মন্দিরে নানা ভক্ত নানা ভাবে পূজা করছেন, পূজা দিচ্ছেন, ছাগ, মেষ বলিদান হচ্ছে। যজ্ঞ কুন্ডে হোম হচ্ছে।

'চারিদিগে চন্ডীর পূজায় পরিপাটি।
চন্দন অগুরু চুয়া পরিপূর্ণ বাটি।।' (১০২)

কালুবীর ভবানী কামিক্ষার পূজা দেখে মনে মনে বললো -

'জীবন জনম মোর হইল সফল।
দেখিনু নয়ন ভরে চরণ কমল।।' (১০৮)

এই বলে কালুবীর জোড় হাতে দেবীর স্তব করতে লাগল -

'বিশ্বরূপা ব্রহ্মার জননী বেদমাতা।
বিষ্ণু ভক্তি প্রদায়িনী হরিভক্তি দাতা।।
'রক্ত বীজ বিনাশিলে ঘোর রূপা কালী।।
শম্ভুবীর বধিলে নিশম্ভু তার ভাই।

দান দয়ামই দেবী দুঃখ বিনাশিনী।	দৈত্য দল্যা দূর কৈলে দেবের বালাই।।'১৩৮
ভক্তে অনুগতা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী।।"১১৪	'যেই জনা পূজে তব চরণ কমল।
চন্ডমুন্ড বধিয়া হইলে মুন্ডমালী।'	তার পারা সংসারে কাহার ভাগ্য বল।।'
	(১৪৪)

কালুসিংহ বীরের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভবানী বললেন - তোর স্তবে আমি খুব তুষ্ঠ হয়েছি, তুই কি বর চাস, কালু তখন জোড় হাত করে বললো - কপূর্রধল রাজ গৌড়েশ্বরের কোন কর দিচ্ছেন না, লাউসেন কর আদায় করতে কাঙুর এসেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে যদি কৈলাশ গমন করেন, তাহলে এখানে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার হয়। কালুবীরের প্রার্থনা শুনে ভবানী বললেন - কর্পূরধল আমার একনিষ্ঠ ভক্ত। বারমাস ষোল উপচারে আমার পূজা করে। আমার পক্ষে কাঙুর ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই শুনে কালুবীর অতি সঙ্গোপনে দেবীকে ব্রহ্মার কর যপের মালা দেখালো। মালা দেখে দেবী সচঞ্চল হয়ে দেউল ভেঙ্গে কৈলাশ যাত্রা করলেন। দেউলের ধ্বজা খসে পড়ল। কামিক্ষার লোকেরা প্রমাদ গুণতে লাগল। কিন্তু কালুবীরের খুব আনন্দ হল। মনে ভাবল একাই যুদ্ধ করতে যাই। এই বলে রাজার ভবনের দিকে এগুতে লাগলো। কিন্তু তার হাতে কোন অস্ত্র নাই। তাই কৌশলে চৌকিদার, পাইক এদের কাছ থেকে তীর ধনুক, তলোয়ার নিয়ে নিল। তাদেরই অস্ত্র নিয়ে অনেক চৌকিদার পাইককে মেরে এগিয়ে যেতে লাগল। নগর কোটাল এই সংবাদ পেয়ে লোকজন নিয়ে সাধুবেশী কালুবীরের দিকে ধাওয়া করতে গেলে - কবি তখন কালুবীরের জন্য ঠাকুরের কাছে কৃপা প্রর্থনা করে বললেন—

'চান্দ রায়ে কৃপা কর প্রভু নিরাকার।।
শঙ্করী চরণে শিবে হও কৃপান্বিত।
ধর্মের আজ্ঞায় নরসিংহ রচে গীত।।' (২৩৬)

যত সাধু সন্ন্যাসী কামাক্ষা দেবীর মন্দিরে আশেপাশে ছিলেন, সবাই ভয়ে পালাতে লাগলেন। অবশেষে কোটালের লোকজন ভেক্‌ধারী কালুবীরের কাছে এল। কালুবীর চড় চাপড়েই কোটালের অনেক লোকজন বা সৈন্যকে মেরে ফেলল - অন্যান্যরা ভয়ে ছোটাছুটি করে পালাতে লাগল। তখন কোটাল কালুবীরের সামনে এল যুদ্ধ করতে। কালুবীর বীরবিক্রমে তাদের প্রতিহত করতে লাগল। তারপর কালুবীর এক এক তীরে দশ বিশ জন করে সৈন্য নিধন করতে লাগল, কালুবীরের বিক্রম দেখে কোটাল রণে ভঙ্গ দিল, কালুর জয় হল।

কোটাল রণে ভঙ্গ দিয়ে রাজা কর্পূর ধলের কাছে গিয়ে সব সমাচার নিবেদন করল। রাজা কোটালের মুখে সব শুনে রেগে কাঁপতে লাগলেন - যুদ্ধে যাবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন - সৈন্য সামন্তের সঙ্গে রাজার কাকা খুড়া, মামা, শালক, ভাই এরকম অনেকে রণসাজে উপস্থিত হলেন - পয়দল, হাতির দল, ঘোড়ার দল, ধনুকী, বন্দুকী, তীরন্দাজ সব রণবাদ্য নিয়ে কালুবীরের দিকে এগিয়ে গেল। কৌরবের দল যেমন অভিমুন্যকে ঘিরে ধরেছিল, তেমনি

কর্পূরধলের সৈন্য সামন্তরা কালুবীরকে ঘিরে ধরল। ধর্মের কৃপায় কালুবীর ধনুকে গুণ দিতেই বড় বড় রক্ষীরা ভয়ে কম্পবান, জয়সিংহ কোটাল কালুবীরকে আঘাত হানতেই সেই আঘাত সামলে নিয়ে কোটালকে সম্মুখ সমরে নিহত করল কালুবীর, কোটাল নিহত হয়েছে দেখে দল বল রণে ভঙ্গ দিল। সেই দেখে রাজার খানসামা, জ্যাঠা, মামারা তাদের হাতি, ঘোড়া, তীরন্দাজ দল নিয়ে এগিয়ে এলেন, কিন্তু কালুবীর ধর্মের আশীর্ব্বাদে কলাগাছ কাটারমত সবাইকে ধরাশায়ি করতে লাগল।

'একা বীর কালু হৈল সহস্র অর্জ্জুন।
কাটিতে কাটিতে বল বাড়ে দশ গুণ।।' (৫৭৪)

ঘোড়া, হাতি, রাউত অনেক মারা গেল, সেনারা রণে ভঙ্গদিল, সেই দেখে রাজা কর্পূর ধল নিজে হাতির পিঠে চেপে কালুবীরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু কালুবীরের বীরপনায় রাজা ভয়ে হাতি থেকে নেমে হেঁটে মহলের ভিতর ঢুকে পড়লেন, কালুবীরও তাঁর পিছু ধেয়ে রাজার কাছে উপনীত হল। সেই দেখে কবি প্রার্থনা করলেন -

'রাজার নিকটে যায়্যা হইল উপনীত। শঙ্করী চরণে শিবে হও বরদায়।
চান্দ রায়ে নিরঞ্জন হও কৃপান্বিত।। ধর্মের মঙ্গল বসু নরসিংহ গায়।।'(৬৮৮)

কালুবীরকে সামনে দেখে রাজা প্রাণ ভয়ে বললেন - আমাকে প্রাণে বধ কোর না, আমি তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করছি। রাজা কর্পূরধলের মিনতিতে কালুবীর ঈষৎ হেসে তাঁকে কাঁধে করে লাউসেনের কাছে নিয়ে এসে ভেট্ দিল। নৃপতি কর্পূরধল লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে রইলেন। যুদ্ধ জয় করে কালুবীর জগন্নাথের শরণ নিল এবং লাউসেনের চরণ বন্দনা করল। লাউসেন কালুবীরকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করে তাকে মাথার পাগড়ি, গায়ের কাবাই উপহার দিলেন। শাকা, শুকা ও অন্যান্য ডোম সৈনিকরা এসে কালুবীরকে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

২) কলিঙ্গার বিবাহ ঃ রাজা লাউসেন কর্পূরধলের দিকে ফিরে তাঁকে বললেন - আপনি কার যুক্তিতে গৌড়েশ্বরের রাজকর না দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাদ বাধালেন? যাই হোক আপনি যদি এখন সমস্ত রাজকর মিটিয়ে দিয়ে আসেন তাহলে আপনার অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিতে পারি। লাউসেনের কথা শুনে আনন্দিত মনে কর্পূর ধল জোড় হাত করে বললেন - আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিলেন, আমি সমস্ত রাজকর মিটিয়ে দেবো। তখন কালুবীর কর্পূরধলকে বললো - আপনি রাজাকে রাজকর দেবেন, কিন্তু আমার ঠাকুর লাউসেন কি পাবেন, তাঁর সঙ্গে আপনার কন্যার বিয়ে দিতে হবে। এই কথা এখানে দিন। কালুবীরের এই কথা শুনে রাজা কর্পূরধল আনন্দ চিত্তে বলেন - লাউসেনের মত পাত্র পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, আমি অবশ্যই লাউসেনের হাতে কন্যা দান করব। আপনারা সকলে আমার রাজভবনে চলুন। এই বলে নৃপতি কর্পূরধল লাউসেন, কালুবীর এবং তাদের দলবল নিয়ে কাণ্ডুরের সাত

গড় মহল্লা পেরিয়ে নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

দরবার ঘরে লাউসেনদের বসবার ব্যবস্থা করে অন্দর মহলে গিয়ে কন্যা কলিঙ্গাকে সব কথা বললেন - যুদ্ধের কথা, তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শনের কথা এবং কালুবীরের প্রস্তাব অনুসারে লাউসেনের সঙ্গে কলিঙ্গার বিবাহ দেবার কথা। পিতার এই কথা শুনে কলিঙ্গা লজ্জিত হয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন, পাটরাণী বিমলা কলিঙ্গার বিবাহ প্রস্তাবে খুব আনন্দিত হলেন, কিন্তু তিনি রাজাকে বললেন - এই যুদ্ধে ভাই, বন্ধু, খুড়ো, জেঠা, মামা, মেশো বহু আত্মীয় স্বজন নিহত হয়েছেন। এক বছর অশৌচ, এই সময় কন্যা দান করতে নাই। অশৌচান্তে এই শুভ কাজ করা হবে। রাণীর কথা যুক্তি সংগত মনে করে রাজা লাউসেনের কাছে গিয়ে বললেন - এই যুদ্ধে খুড়ো, জেঠা প্রভৃতি অনেকে মারা গেছেন, তাই এক বসৎর অশৌচ, এই সময় কন্যা দান শাস্ত্র সম্মত নয়। আপনি যদি এক বৎসর এখানে থাকেন, তারপর কন্যা দান করে আপনার সঙ্গে পাঠাব। রাজার এই কথা শুনে লাউসেন ঈষৎ হেসে একভাবে ঠাকুর নিরঞ্জনকে ডাকতে লাগলেন।

'এতশুনি ঈষৎ হাসিল তপোধন।
একভাবে নিরঞ্জন করিল স্মরণ।।' (৭৮৪)

নিরঞ্জনের কৃপায় অমৃত বৃষ্টি হতে লাগল আর সেই অমৃত বৃষ্টির স্পর্শে রাউত, মাহুত, জেঠা, খুড়ো, ভাই, বন্ধু, হাতি, ঘোড়াসহ দলবল জীবিত হয়ে উঠল। এই দেখে সবাই বলে - এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার, রাজা কর্পূরধল আনন্দিত মনে গণক ডেকে বর কনের মিলন গণনা করতে বললেন। গণক গণনা করে বল্লেন - বর কনের রাজজোটক মিলন, আর বিলম্ব কবা উচিৎ নয়। পাটরাণী সব ত্রয়োদের ডেকে শুভ সংবাদ দিলেন। বিয়ের দিন নানা বাদ্য বাজতে লাগল, রাজবাড়ি আনন্দে মুখরিত, রাজা কন্যার অধিবাস ও নান্দীমুখ করালেন, ঘৃতের বসুধারা দিয়ে সব দেবদেবীর পূজা করলেন। এদিকে লাউসেনের অধিবাস ইত্যাদি সারা হল। চৌদলে করে বর লাউসেন বিবাহ করতে বেরুলেন - সঙ্গে বরযাত্রী কালুবীর, শাকা, শুকা প্রভৃতি। ঢোল, সানি জগঝম্প বাদ্য বাজিয়ে বর এল রাজ বাড়িতে। রাজা আদর করে বরকে বসালেন এবং বসন অলংকার দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। মা, পাটরাণী ও অন্যান্য যুবতী আত্মিয়রা করলেন স্ত্রী আচার, তারপর সাতপাকে ঘোরা, শুভদৃষ্টি, মাল্যদান, সিন্দুরদান, গাঁটছড়া বাঁধা, অগ্নি সাক্ষীসহ বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হলে বরবধুকে বাসর ঘরে উলুধ্বনি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। না গানেই রাত্রির অবসান। শালাজ শালিকা প্রভৃতি পরিহাস জনেরা শয্যা তোলার টাকা চাইতে সেন তাদের হাতে পঞ্চাশ মোহর দিলেন। এরপর লাউসেন স্নান পূজা সেরে শ্বশুরের কাছে গিয়ে বিনীত ভাবে বললেন - আর বিলম্ব করে লাভ নাই, আপনিও রাজকর নিয়ে গৌড়ে চলুন, আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কর্পূরধল আনন্দিত মনে বাকি সব রাজকর আর রাজার সেলামী হিসাবে আরও পঞ্চাশ মোহর নিয়ে শুভক্ষণে গৌড়যাত্রা করলেন। বর কনেকে দিলেন নানা দ্রব্য, গৌড়েশ্বরের জন্য নিলেন নানা দ্রব্যের ভেট্। কলিঙ্গা মায়ের চরণ বন্দনা করে বিদায় নিলেন, তখন মা, মেয়ে আর সখীদের কান্নায় পরিবেশ বিষণ্ণ হয়ে

উঠল। কাঙুর রাজকন্যা কলিঙ্গা হচ্ছেন দেব সভার চার বিদ্যাধরীর একজন। লাউসেন ঘোড়ার পিঠে আর বিদ্যাধরী কলিঙ্গা দোলায়। কালুবীর তার আগে অন্যান্যরা পিছনে যেতে লাগলেন।

রাজা গৌড়েশ্বর খবর পেলেন কাঙুর জয় করে লাউসেন কর্পূরধলসহ রাজকর আদায় করে নিয়ে আসছে। এমন সময় লাউসেন রাজ সভায় এসে উপস্থিত হয়ে জোড়হাত করে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন, কর্পূরধলও জোড়হাত করে মাথা হেঁট করে চারদিকে রাখলেন নানা ভেট ও রাজস্ব। রাজা গৌড়েশ্বর সহাস্য বদনে লাউসেনকে আলিঙ্গন করে বললেন - তুমি গৌড়ের চূড়ামণি, তুমি যা চাইবে, তাই দেব। লাউসেন তখন বললেন - আপনার কাছে একটি ভিক্ষা চাই, আপনি অনুগ্রহ করে রাজা কর্পূরধলকে ক্ষমা করে ঘোড়া জোড়া দিয়ে বিদায় করুন। লাউসেনের অনুরোধে নৃপতি কর্পূরধলকে ক্ষমা প্রদর্শন করে ঘোড়া জোড়া দিয়ে বিদায় জানালেন। কর্পূরধল নিজ রাজ্য কাঙুরে ফিরে গেলেন। এদিকে গৌড়েশ্বর সসম্মানে লাউসেনকে ময়না পাঠালেন। সেই দেখে পাষণ্ড মহামদের মাথায় যেন আবার বজ্রপাত হল।

চৌদ্দ

অমলা ও বিমলার বিবাহ এবং কানড়ার অধিবাস পালা

১) নববধূসহ লাউসেনের ময়না যাত্রা, অমলা ও বিমলার সাথে বিবাহঃ কাঙুর যুদ্ধ জয় করে লাউসেন নববধূ কলিঙ্গা সুন্দরীকে নিয়ে ময়না যাত্রা করলেন। পিছু পিছু লোকজনদের সঙ্গে চলল - নানা বজনা বাদ্যি। মঙ্গলকোট পৌছাতে ঐ দেশের রাজা গজপতি লাউসেনের আগমন বার্তা পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজের রাজভবনে নিয়ে এলেন, এবং সহাস্যে লাউসেনের সঙ্গে তাঁর ভুবন মোহিনী কন্যা অমলার বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। গজপতি রাজ কন্যাও স্বর্গের চার বিদ্যাধরীর দ্বিতীয় জন। লাউসেন ভেবে চিন্তে ঈষৎ হেসে এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গজপতিরাজ কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। অধিবাস, নান্দীমুখ, বরানুগম, স্ত্রী আচার, সাতপাক প্রদক্ষিণ, বিবাহের মন্ত্রপাঠ, মালা বদল, সিন্দুরদান, অগ্নিসাক্ষি, সবকিছু অনুষ্ঠান নিঁখুত ভাবে পালন করা হয়। ভোরবেলায় বাসরঘর থেকে উঠে লাউসেন স্নান পূজা সেরে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিযে ঘোড়ার পিঠে চড়লেন। আর কলিঙ্গা ও অমলা দুজনে বিচিত্র দোলায় চেপে চললেন - কালুবীর, শাকা, শুকা, এরা সব ঘোড়ার আগু আগু চলল। যেতে যেতে কালুরতক, কর্জনা পেরিয়ে বর্ধমানে পৌছালেন লাউসেন। সেই সময় বর্ধমানের রাজা ছিলেন কালিদাস, লাউসেনের আগমন বার্তা পেয়ে রাজা কালিদাস লাউসেনের সাথে সাক্ষাত ক'রে নিজ কন্যা বিমলার সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ দিলেন, এবং বহু মূল্যবান যৌতুক সহ বিদায় জানালেন। এই বিমলা ছিলেন স্বর্গের চার বিদ্যাধরীর তৃতীয়জন। লাউসেন তিন নববধূকে নিয়ে ময়না যাত্রা করেন। দামোদর পার হয়ে বাবরকপুর, আমিলা, মোগলমারি, উচালন, রাঙ্গামাটি পার হয়ে ময়না নগরে পৌছালেন। পুত্রবধুদের দেখে আনন্দের সীমা নাই রঞ্জাবতীর, বরণ করে ঘরে তোলেন নববধূদের। রাজা কর্ণসেন পুত্রবধূদের মুখদেখে আশীর্ব্বাদ করেন। প্রজারাও নানা রকম যৌতুক দিলেন নববধূদের।

২) সিমুল্যা কন্যা কানড়ার অধিবাসঃ রাজা গৌড় নাথ দরবারে বসেছেন, বারভুঞারা জোড়হাত করে সামনে রয়েছেন, খানসামারা কেউ চামর দোলাচ্ছে, কেউ ঢাল খাঁড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মধুর সুরে সানাই বাজছে, খাজাঞ্চীরা হিসাবপত্র করছেন। গুণীরা গীত গাইছেন, পন্ডিতরা রামায়ণ মহাভারত পাঠ করছেন। আর একদিকে নটীরা নাচ্ছে। এদের মধ্যে সনকা নামে নটীর নাচে আর রূপলাবণ্যে রাজা একেবারে মোহিত। পাত্রকে বললেন - সনকাই হবে আমার পাটরাণী আর ভানুমতী হবে তার চেড়ি। রাজার এই কথা শুনে পাত্র হায় হায় করতে লাগল, ভাবল দিদি ভানুমতীর কি দশা হবে। তখন এক বুদ্ধি বার করে বললো - মহারাজ, আপনি রাজচক্রবর্ত্তী, দেশে দেশে আপনার কত নাম যশ, আপনি কত পুণ্যবান, এখন আপনি যদি এই বেউশ্যাকে বিবাহ করেন বা তাকে স্পর্শ করেন, তাহলে আপনি মহাপাপের ভাগী হবেন। লোকে আপনাকে উপহাস করবে। যদি আপনার বিবাহ করার ইচ্ছাই হয় তাহলে সিমুল্যার রাজা হরিপালের এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, নাম তার কানড়া, আপনি তাকে

বিবাহ করার জন্যে হাতে সুতো বেঁধে সিমুল্যা চলুন, আমি যেকোন উপায়ে - ছলে বলে ঐ রাজকন্যার সাথে আপনার বিবাহ দেবো। পাত্রের কথায় রাজা সহাস্য বদনে বললেন - তোমার কথায় আমি কানাড়াকে বিবাহ করতে প্রস্তুত, কিন্তু আগে তুমি হরিপাল রাজার কাছে ভাট পাঠিয়ে মতামত জানার চেষ্টা কর। তারপর হাতে সুতো বাঁধবো। রাজার কথায় পাত্র গঙ্গাধর ভাটকে ডেকে আনালো, এবং গঙ্গাধরকে বললো - তুমি সিমুল্যা গিয়ে হরিপাল শিখরকে বলবে, মহারাজ গৌড়েশ্বরের সঙ্গে যদি তাঁর কন্যা কানাড়ার বিবাহ দেন তাহলে সিমূল্যারাজ জায়গির পাবেন, পরম সুখে থাকবেন, নতুবা ছলে বলে বিবাহের ব্যবস্থা করা হবে। পাত্রের কথা শুনে গঙ্গাধর সিমূল্যা যাত্রা করল। গঙ্গাধরের সঙ্গে রাজা অনেক লোকজন পাঠালেন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও নানা রকম অধিবাস দ্রব্যও দিলেন।

সিমূল্যা রাজ হরিপাল দরবারে বসেছেন, চারদিকে দন্ডায়মান পাত্র, মিত্র, কোটাল, বিদ্যাধর পন্ডিত পুরাণ থেকে রুক্মিনী হরণ কথা শুনাচ্ছেন, এমন সময় গঙ্গাধর ভাট সেখানে উপস্থিত হয়ে চারদিকে অধিবাস দ্রব্য সাজিয়ে রেখে সবিনয়ে জানাল - মহারাজ গৌড়েশ্বর আপনার কন্যা কানড়াকে বিবাহ করতে চান, আপনি রাজি হলে সিমুল্যা রাজ্য ইনাম পাবেন, মহানন্দে থাকবেন, আর রাজার কথার অন্যথা করলে অনর্থ বাধবে। এই কথা শুনে রাজার খুব আনন্দ হল, তাড়াতাড়ি অন্দর মহলে গিয়ে রাণীকে সব বললেন, রাণীও এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে কানড়ার কাছে গেলেন।

রাণী কানড়াকে সব কথা জানালেন, গৌড়েশ্বরের মত বর পাওয়া ভাগ্যের কথা, তুমি রাজি হলে আমাদের অনেক সম্মান বাড়বে। মায়ের কথা শুনে কানড়া বললো - আমি দ্বাদশ বৎসর অভয়ার পূজা করছি, তাঁর বরে আমার স্বামী হবেন রঞ্জার নন্দন। তবে তোমরা যখন গৌড়েশ্বরকে পছন্দ করেছ, তখন আমার আর কি বলার আছে। কিন্তু গৌড় থেকে যে সব চাকর বাকর এসেছে তাদের সঙ্গে আমি একবার কথা বলব। এখানে উল্লেখ করা যায় কানড়া হচ্ছে স্বর্গের চার বিদ্যাধরীর চতুর্থ জন। কানড়া তার সহচরী ধুমশীকে ডেকে বললো - গৌড়ের লোকজনদের আমার কাছে একবার ডেকে আনবে। কানড়ার কথা শুনে ধুমশী তাড়াতাড়ি গিয়ে গৌড়ের লোকজনদের ডেকে আনলো। ঐ লোকজনরা দূর থেকে কানড়াকে দেখে মনে মনে বলতে লাগলো - এ যেন মা জয়দূর্গা। তারপর কাছে এসে কানড়াকে নতজানু হয়ে প্রণাম করে জোড়হাতে দাঁড়াল। কানড়া ধুমশীকে বললো - এরা অনেক দূর থেকে এসেছে, এদের পেটভরে মিষ্টি খেতে দাও। তারপর ওদের বললো - তোমাদের রাজা কেমন, তাঁর বয়সই বা কত? কানড়ার কথা শুনে গৌড়ের লোকেরা জোড় হাত করে জানাল - মা, আমাদের রাজার বয়স আশি নব্বই হবে। চলার ভাল শক্তি নাই, কানে সেরকম শুনতে পান না, চোখে ভাল দেখতে পান না, চুল পাকা সোনমুড়ি, দাঁত নাই। গৌড়ের লোকজনদের মুখে এই সব কথা শুনে কানড়া আর ধুমশী হেসে অস্থির। যাইহোক কানড়া এদের কথায় খুশি হয়ে প্রত্যেকে নানা পুরস্কার দিল। এরপর কানড়া গঙ্গাধর ঘটককে ডাকালো। গঙ্গাধরের হাতে তামা, তুলসী, গঙ্গাজল দিয়ে

সিমুল্যা—হুগলি জেলার হরিপাল ধর্মমঙ্গল বর্ণিত সিমুল্যা। সিমুল্যার রাজা হরিপালের নাম অনুসারে সম্ভবত এই স্থানের নাম হরিপাল হয়েছে।

বললো - ঘটক ঠাকুর আপনি সব সত্যকথা বলবেন, আর মিথ্যা বললে আপনার নরক বাস হবে। এই বলে কানড়া জিজ্ঞাসা করল বর কেমন, তার বয়স কেমন হবে? এই শুনে ভাট মহা বিপদে পড়ে গেল। যাইহোক্ রাজা আর পাত্রের ভয়ে মিছে করে বললো - রাজার বয়স কুড়ি-বাইশ, রূপেগুণে কার্ত্তিক । অস্ত্রশাস্ত্রে নিপুন, দেব দ্বিজে অগাধ ভক্তি। ভাটের কথা শুনে কানড়া বললো ধুমশী এঁকে পিছু মোড়া করে বাঁধ, এ'সব মিছে কথা বলছে। তারপর ধুমশী নাপিত ডেকে মাথা নেড়া করে, গালে চুন কালি মাখিয়ে, গলায় জুতোর মালা দিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে, নাকে ঘোড়ার পেচ্ছাব মাখিয়ে ভাটকে নিজের দেশে পাঠিয়ে দিল। দুর থেকে গঙ্গাধরকে আসতে দেখে পাত্র রাজাকে বললো - মহারাজ ঐ দেখুন কার্যসিদ্ধ করে গঙ্গাধর ফিরে আসছে। কিন্তু গঙ্গাধরের কাছে সব কথা শুনে পাত্র রেগে আগুন। রাজাকে বললো - মহারাজ আপনি হাতে সূতো বাঁধুন, আমরা ছলে বলে কানড়ার সঙ্গে আপনার বিয়ে দেবো। নাহলে সিমুল্যাগড় কামান দিয়ে উড়িয়ে দেবো। পাত্রের কথায় রাজা গৌড়েশ্বর হতে সূতো বেঁধে হাতির পিঠে চেপে কানড়াকে বিয়ে করতে সিমুল্যা চললেন। সঙ্গে মহাপাত্রও চললো হাতির পিঠে, আর চললো নফর, চাকর, খানসামা, ধানুকী, বন্দুকী, গোলন্দাজ কামান, গোলা, বারুদ, ঢাক, ঢোল, কাড়া। সবার আগে পাটহাতি নিশান উড়িয়ে চললো -। বাজনার শব্দে রাস্তাঘাট গম গম, দামামা যেন মেঘের গর্জন।

'বিভাহ্ করিতে যান গৌড়ের ভূপ।
লোকজন দেখ্যা বলে একি অপরূপ।।'

সিমুল্যা পৌছাবার আগে দলবল নদীর ঘাটে এসে পৌছালো, সেখান থেকে সিমুল্যা সওয়া ক্রোশ দূরে। মহাপাত্র রাজাকে বললো - মহারাজ, আমরা আজ এখানে অবস্থান করি, বাজনদাররা জোরে জোরে বাজনা বাজাক, গোলন্দাজরা কামানে আগুন দিয়ে আওয়াজ করুক। সিমুল্যা রাজ্য তোলপাড় হক। হরিপাল শিখর ভয়পেয়ে যদি কন্যার বিবাহ্ দেয় তাহলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। মহাপাত্রের যুক্তি মহারাজার মনে লাগলো, তৎক্ষণাৎ রাজার আজ্ঞায় যত বাজনদার ছিল নিজ নিজ বাদ্য বজাতে আরম্ভ করল। জগঝম্প, ঢাক, ঢোল, সিঙ্গা, কাড়া নানা বাদ্য বাজাতে লাগল, বন্দুকীরা বন্দুকের আওয়াজ তুলল, গোলন্দাজরা কামানে আগুন দিয়ে বিকট শব্দ করতে লাগল। সিমুল্যা গড়ের লোকজন প্রাণ ভয়ে পালাতে লাগল। রাজা হরিপাল রাজকন্যা কানড়ার কাছে গিয়ে বললেন -

মা, তুমি গৌড়েশ্বরকে বিবাহ্ করতে রাজি হও তাহলে আমরা রক্ষা পাই। মাসী, পিসি, খুড়ি, জ্যাঠাই সবাই বোঝাতে লাগলেন - এমন ভূপতি বর পাওয়া ভাগ্যের কথা, তুমি সায় দিলে সব দিক বজায় থাকে।

'শুনিয়া কানড়া কন্যা বলেন বচন। আমার প্রাণের নাথ রঞ্জার নন্দন।।'
দ্বাদশ বৎসর পূজা করি অভয়ার। অন্যকে করিতে বল একি অবিচার।।' ৭৮৪

কানড়া আরও জানাল - তোমাদের যদি ভয় লাগে তোমরা গড় ছেড়ে যে কোন

জায়গায় চলে যেতে পার। আমি একাই থাকব, 'গড়ে একা থাকিব যা করেন অভয়া।' কানড়ার কথা শুনে হরিপালশেখর গড় ছেড়ে পালালেন। নৌকা করে বাঁশডিহার ভেতর গেলেন। এদিকে কানড়া সুন্দরী শুধুমাত্র ধুমশীকে নিয়ে সিমুল্যা গড়ে একা থেকে গেলেন।

কানড়া ধুমশীর সঙ্গে যুক্তি করতে বসল - এই বিপদে এখন কি করা যায়। এই ঘোর বিপদে আমাকে কে রক্ষা করবে।

'ধুমশী বলেন দিদি মনে ভয় কি। দুর্গতি নাশিনী দুর্গা ভক্তজন ত্রাতা।
একভাবে পূজ তুমি হেমন্তের ঝি।। যারে পূজে ত্রাণ পাইল হর বিষ্ণু ধাতা।।'
(৮০৪)

ধুমশীর কথা শুনে কানড়া স্নান করে ভবানীর পূজায় বসলেন, ধুমশী পূজার সব আয়োজন ঠিক করে দিল। কানড়া চামুন্ডা চতুর্ভুজার ধ্যান করে বিশেষ অর্ঘ্য দিলেন।

'কানড়া করেন পূজা অতি কতুহলে। 'তারপর পূজিল দেবতা আবরণ।
অশেষ কুসুম দেন চরণ কমলে।।'৮৩৪ মহাবিদ্যা জপেন হইয়া সাবধান।।'

কানড়ার পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে মা অভয়া পূজার স্থলের পদ্মাসনে এসে বসলেন। কানড়া ধ্যানে অভয়াকে দেখে কাঁদতে লাগলো। দেবী অভয়া কানড়ার হাত ধরে বললেন - আমি সব সময় তোমার বশ। তোমার কি হয়েছে বল। দেবীর কথা শুনে কানড়া বললো - হাতে সূতো বেঁধে দলবল নিয়ে গৌড়েশ্বর আমাকে বিবাহ করতে এসেছেন। মা-বাবা ও কাকা, খুড়ি জ্যেঠি সবাই ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। আমার এখন তাই মহাবিপদ —

'তোমা বিনে ত্রাণ কার্তা মোর আছে কে।'
'চিরকাল হৈত্যে সেবি তোমার চরণ।
হবেন আমার স্বামী রঞ্জার নন্দন।।' ৯০০

কানড়ার এই কথা শুনে ভবানী হেসে বললেন -

'ভয় নাই বাছা আমি আছি পক্ষাবল।' ৯০২

রাজা গৌড়েশ্বর তোর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। ভবানী আরও বললেন -

চিন্তা নাই কানড়া না বাস্য মনে ভয়। লাউসেন ভূপতি তোমার হবে পতি।
তোর আশা পূর্ণ কর‍্যা যাইব নিশ্চয়।। কোন যুগে ব্যর্থ নহে আমার ভারথি।।
(৯১০)

এই বলে ভবানী বিশ্বকর্মাকে একটি লোহার গন্ডার তৈরী করতে বললেন, বিশ্বকর্মা একটি লোহার গন্ডার তৈরী করে দিলেন দেবী গন্ডার দেখে খুশি হয়ে বিশ্বকর্মাকে আশীর্ব্বাদ করলেন আর অনেক পুরস্কার দিলেন। এরপর দেবী গৌরী গন্ডারের গায়ে হাত বুলিয়ে নিজের শক্তি লৌহ গন্ডারে সঞ্চার করিয়ে দিয়ে কানড়ার সামনে গন্ডারকে রেখে বললেন - গৌড়েশ্বর কিম্বা অন্য কেউ কাটতে এলে বজ্রের সমান কঠিন কায়া হবে এই গন্ডারের, আর লাউসেন যখন এই গন্ডার কাটতে আসবে তখন পাকা কলার মত হয়ে যাবে। তারপর ধুমশীকে ডেকে বললেন - তুমি ভূপতি গৌড়েশ্বরকে গিয়ে বলবে - রাজা হরিপাল একটি লোহার গন্ডার রেখে পণ করেছেন যে নর ঐ গন্ডার এক কোপে কাটতে পারবে সেই হবে কানড়ার বর। এই বলে ভবানী ধুমশীকে গৌড়েশ্বরের কছে পাঠালেন। আর কবি প্রর্থনা করলেন —

'আসর সহিত ধর্ম করিবে কল্যাণ।
ভনে নরসিংহ বসু সাপক্ষ ভগবান।।' (৯৬০)

পনের

কানড়ার বিবাহ পালা

ধুমশী ভবানীকে প্রণাম করে গৌড়েশ্বর ভূপতির কাছে গেল - যাবার সময় সে দ্বিতীয় রঙ্কিনীর মত সাজলো - বাঁ হতে বন্দুক, ডান হাতে খাঁড়া, গলায় মালা আর ঘন্টা, তারপর বলদ টানা গাড়িতে গন্ডারকে নিয়ে রাজার সামনে উপস্থিত হল। রাজা, পাত্র ও তার লোকজন ধুমশীকে দেখে হতভম্ব। পাত্র তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বললো - আমি সিমুল্যা রাজরাণীর দাসী, কানড়া কুমারী আমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন। তিনি -

চিরকাল আরাধনে পার্বতী শঙ্কর	একচোঁটে এই গন্ডা হানে যেইজন।
শিবদুর্গা দয়া কর্য়া দিয়াছেন বর।।	সেই বীর হইবেন কানড়া রমন।। (৫২)

ধুমশীর কথা শুনে পাত্র রেগে বললো - তোমাদের এইসব চাতুরী শুনতে চাই না, অবিলম্বে কানড়া এখানে এসে রাজাকে বিবাহ করুক, অন্যথায় উচিৎ শাস্তি পাবে। সিমুল্যা গড় ছারখার করে দেব। পাত্রের কথায় ধুমশী বলতে লাগলো - তোমার বীরপনা আর বলতে হবেনা। তুমি জলন্দর জঙ্গলের বাঘ মারতে গিয়ে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছ, কাঙুর জয় করতে গিয়ে ছ'মাসের মধ্যে গন্ডকী পার হতে পার নাই। আর কত কি বলব। যাই হোক তোমার সঙ্গে রয়েছে নবলক্ষ দলবল, আমি একা অবলা নারী, কোন সঙ্গি নাই, আছেন শুধু প্রভু জগন্নাথ, শঙ্কর ভবানীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোমার দলবলকে কেটে খান খান করব। ধুমশীর কথা শুনে ভূপতি পাত্রের কানে কানে বলেন -

'কাজ নাঞি বিভাহে চল যাই ঘর।	'দিয়েছে বিষম দায় গন্ডা কাট্যা দে।
ধুমসীর বচন শুনিঞা লাগে ডর।।	কার শক্তি লোহার গন্ডাকে কাটে কে।।
শিব পূজা বিস্তর কর্য়াছে হরিপাল।	শুনিঞা রাজার কথা বলে পাত্রবর।
সর্ব্বজয়া সদয়া তাহাকে সর্বকাল।।'	ভনে নরসিংহ যার শাঁখারিতে ঘর।।'
(১৩৮)	(১৫৮)

পাত্র রাজাকে বললো - মহারাজ আপনি পাগল হয়েছেন, হাতে সূতো বেঁধে বিয়ে না করে যদি ফিরে যান তাহলে আপনি গৌড়ে মুখ দেখাতে পারবেন না, আপনাকে সকলে দুর্বল ভাববে। রাজা আর পাত্রের এই কানাকানি দেখে ধুমসী বিরক্ত হয়ে রাজাকে বললো - মহারাজ গন্ডার কেটে কানড়া সুন্দরীকে বিয়ে করুন অথবা প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। ধুমশীর কথা শুনে গৌড়ের রাজন গন্ডার কাটতে উদ্যত হলেন - জনা দশ নফর হাত ধরে উঠিয়ে দিল, ভাল করে কোমর বেঁধে দিল। রাজা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, থর থর করে কাঁপছেন - ধুমশীকে বললেন - কোনখানে চোট হানবো দেখাও। ধুমসী খাড়ি দিয়ে গন্ডারের গলায় দাগ

দিয়ে বললো - এইখানে চোট হানুন। পাত্র বললো - মহারাজ, আপনার গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে চোট দেবেন যাতে গন্ডার খান্ খান্ হয়ে যায়। ভূপতি গন্ডারের গলায় কোপ মারতেই ঠন্ ঠন্ করে বিকট শব্দ হল, আর রাজার খড়্গ দু'খানা হয়ে গেল। রাজা মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। দলবল ভাবল - রাজা বোধ হয় মারা পড়লেন। সবাই ছুটে গিয়ে মাথায় জল ঢালতে লাগল। মহাপাত্র রাজার দিকে চেয়ে গন্ডারের দিকে ছুটে গেল, ভাবল গন্ডারটা দু'টুকরো হয়েছে। যাইহোক পুণ্যবলে রাজার জ্ঞান ফিরে এল।

রাজার এই অবস্থা দেখে ধুমসী হেসে বললো - রাজা আপনি কেমন বলবান বোঝা গেল বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গিয়েছিলেন। এখন মান মানে বাড়ি ফিরে যান। মহাপাত্র এই কথায় রেগে উঠে নিজেই গন্ডার কাটতে এগিয়ে গেল, গন্ডারটা পাত্রের চেয়ে উঁচু, তাই একটা মাচা বেঁধে তার উপর দাড়িয়ে গন্ডারের গলায় গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে চোট হানলো - আর খড়্গটা দু'খানা হয়ে ঠিকরে এসে তার মাথায় লাগল। মাথা কেটে রক্ত ঝরতে লাগল, আর ধুমশী টিট্‌কারী দিয়ে হাততালি দিতে লাগল। অনেক্ষণ অচেতন থাকার পর পাত্রের জ্ঞান ফিরলে রাজা বললেন - আর বিবাহে কাজ নাই, ফিরে চল। কিন্তু মহামদ ছাড়বার পাত্র নয়, রাজাকে বললেন- আমাদের এত লোকজন রয়েছে, কেউ না কেউ গন্ডার কেটে দেবে, না হলে ছলে বলে আপনার সঙ্গে কানড়ার বিয়ে দেবই। পাত্রের এই কথা শুনে ধুমশী হেসে বললো - রাজা, পাত্র, তোমরা দুজনাতেই পরাজিত হলে, এখন অন্যকে গন্ডার কাটার জন্য বলছ, তবে অন্য কেউ গন্ডার কাটলে তার সঙ্গেই কানাড়ার বিয়ে হবে, গৌড়েশ্বরের সঙ্গে নয় আর যদি ছলে বলে বিবাহ করতে চাও, তাহলে আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, আমার সাপক্ষে আছেন ঠাকুর জগন্নাথ, তাই আমি সবার আগে তোমার মাথা কাটবো। ধুমসীর কথায় মহামদ জ্বলে পুড়ে গিয়ে সব লোকজনদের বললো - তোমরা যে কেউ এক চোটে গন্ডার কাটলে সিমুল্যে রাজ্য জায়গির পাবে। এছাড়া হাতি, ঘোড়া, ও নানা ধনরত্ন পাবে। রাজসভায় সব থেকে বেশী সম্মান পাবে। পাত্রের কথায় সবাই চুপ করে রইল। কেউই গন্ডার কাটতে রাজি হল না। তখন পাত্র তার লোকজনদের খুব তিরস্কার করতে লাগল, -ধিক তোদের বীরপনা, মিছেই কোমরে ঢাল তলোয়ার বেঁধেছিস্, ঐ দিয়ে সব ঘাস কাটতে যা, তোদের জন্যে ভান্ডার থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ হচ্ছে, এসব বন্ধ করতে হবে। এইভাবে হা হুতাশ করতে করতে পাত্রের মনে পড়ে গেল লাউসেনের কথা। মনে মনে ভাবল লাউসেন যদি গন্ডার কাটতে পারে তাহলে রাজার সম্মান রক্ষা পায়, আর যদি যুদ্ধে লাউসেনের মৃত্যু হয় তাহলে ল্যাঠা চুকে যায়। এই সব ভেবে পাত্র রাজাকে বললো - মহারাজ এই সব অপদার্থ দলবল দিয়ে কোন কাজ হবেনা। আপনি লাউসেনকে অনান্, লাউসেন নিশ্চয় গন্ডার কেটে দেবে। এই শুনে নৃপতি গৌড়েশ্বর আনন্দিত মনে লাউসেনকে চিঠি লিখে দিলেন, লিখলেন -

পরম কল্যাণ বর দেশে যশ গায়। আশীর্ব্বাদ লিখয়া লেখেন প্রয়োজন।
শ্রীযুক্ত ময়নার পতি লাউসেন রায়।। করিতে দ্বিতীয় বিভা হয়্যা গেছে মন।।
(৩৭৪)

তাঁরও লিখলেন - সিমুল্যার হরিপাল শিখরের এক কন্যা আছে নাম কানড়া, তাকে বিবাহ করতে হাতে সুতো বেঁধে এখানে এসেছি, কিন্তু কুমারী কানড়া দৈবের বরে এক দারুন পণ করেছে - যে এক চোটে লোহার গন্ডার কাটতে পারবে তাকেই বিবাহ করবে। আমি আর পাত্র দুজনাতেই চোট হানলাম কিন্তু বজ্র কঠিন গন্ডার কাটা গেল না, এখন তুমি এই গন্ডার কেটে আমার সম্মান রক্ষা কর। চিঠির একপাশে পাত্র নিজে আবার লিখে দিল - পাত্র পাঠ চলে আসবে, ময়নার এনাম খাচ্ছো তাড়াতাড়ি না এলে হিসাব করে ময়নার কর আদায় করে নেব। আর অস্তির পাখর ঘোড়াও কেড়ে নেবো ইত্যাদি। এই সব লিখে ইন্দ্র কোটালকে ময়না পাঠিয়ে দিল। ময়নাধিপতি লাউসেন দরবারে বসেছেন, এমন সময় ইন্দ্র কোটাল সেখানে উপস্থিত হয়ে জোড় হাতে নমস্কার করে পাগড়ি থেকে চিঠি বার করে সেনকে দিলেন, এবং মুখে সব ঘটনা বলে শীঘ্রকরে সিমুল্যা যেতে অনুরোধ করল। লাউসেন চিঠি পড়ে সিমুল্যা যাবার জন্য ঘোড়া সাজাতে বলে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কালুবীরকে ডেকে সব বিবরণ বললেন এবং তার সঙ্গে সিমুল্যা যেতে আদেশ দিলেন। কালুবীর শাকা, শুকা, আর অস্তিরপাখর ঘোড়া খুব দ্রুত গতিতে সবাইকে নিয়ে সিমুল্যায় উপস্থিত হলেন। লাউসেন ঘোড়া থেকে নেমে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন, মামাকেও প্রণাম করলেন। রাজা লাউসেনকে আলিঙ্গন করে সহাস্য বদনে বলেন - তোমার মামাই আমাকে হাতে সুতো বেঁধে এখানে এনেছেন, গন্ডার না কাটার জন্য আমার বিবাহ হচ্ছে না। তুমি যদি গন্ডার কেটে দাও তাহলে আমার বিবাহ হয়, আমার কলঙ্ক ঘোচে। লাউসেনকে রাজা খোশামদি করায় পাত্র রেগে গিয়ে বললো - ও'ঘরে বসে বসে খাচ্ছে, কোন কাজে লাগে না, একটা গন্ডার কাটবে তার জন্যে এত বলার কি আছে, মামার কথায় লাউসেনের গা জ্বলে উঠল, বললেন - গন্ডার কেটে এখনি রাজার বিয়ে দেবো। এই বলে —

হানিবারে গন্ডাকে উঠিলা তপোধন।	শঙ্করী চরণে শিবে করিবে কল্যাণ।
চান্দ রায়ে কৃপা কর প্রভু নিরঞ্জন।।	নরসিংহ বলে কৃপা কর ভগবান।।

(৫৫২)

লাউসেন গন্ডার কাটতে উঠলে ধুমসী বললো - একচোটে গন্ডার যেন দু'খানা হয়ে যায়। লাউসেন দু'হাতে খড়্গা তুলে নিলেন—

'আপনি কালিকা দেবী বসিলা আতরে।	'চোট হান্যা রাউত হাকেন হান হান। (৮৬৯)
বিজুলি চমকে খড়্গা লক লক করে'	এক চোটে গন্ডাটা হইল দুইখান।।'

(৫৭৪)

গন্ডারটা দু'খান হয়ে মুন্ড গড়াগড়ি করতেই ধুমসী ভূপতিকে বললো - মহারাজ, আপনি তো জানেন কানড়ার পণ, যে জন গন্ডার হানবে সেই তার পতি হবে। সভামাঝে লাউসেন গন্ডার কেটেছেন, তাই লাউসেনই কানড়ার পতি। এই বলে ধুমসী লাউসেনকে বরণ অঙ্গুরী, কপালে চন্দের টিপ আর পুষ্পপাত্রে বরমাল্যা দিয়ে বরণ করলো। এই দেখে মহাপাত্রের

মাথায় যেন বাজ বড়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে বললো - তুই চাকর হয়ে গন্ডার কেটেছিস্ বলে বরমালা গলায় দিবি, রাজা তোর মেসো, তার ওপর তোর অন্নদাতা, ভাল চাস তো বস্ত্র, মালা, আংটী খুলে ফেল। রাজা আর আমি অর্ধেক গন্ডার কেটেছিলুম, বাকিটা কেটে তোর এত বড়াই। যদি প্রকৃত বীর তুই হস্ তাহলে গন্ডারের ওপর গন্ডার রেখে চার খানা কর দেখি। এই বলে পাত্র মাহামদ গন্ডারের ওপর গন্ডার রাখতে গেল কিন্তু একটুকুও সরাতে পারলনা, তখন কালুবীর বললো - আমাকে আজ্ঞা দিলে আমি গন্ডারের ওপর গন্ডার তুলে দিই। আজ্ঞা পেয়ে কালুবীর গন্ডারের ওপর গন্ডার চাপিয়ে দিল। তারপর লাউসেন গন্ডারের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেবীর দেওয়া খড়্গ দিয়ে গন্ডারের ওপর চোট হানতেই পাকা কলা কাটার মত গন্ডার চার টুকরো হয়ে গেল, তখন সবাই সেনকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। ধুমসী আনন্দিত মনে কাটা গন্ডার গাড়িতে চাপিয়ে রাজাকে বললো - এই কাটা গন্ডার নিয়ে গিয়ে কানড়া সুন্দরীকে দেখাই। এই বলে ধুমসী দ্রুত চললো রাজভবনের দিকে।

ধুমসী কানড়ার কাছে গিয়ে কাটা গন্ডার দেখিয়ে পরিহাস করে বলে - এই দেখ সব উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে, গৌড়েশ্বর গন্ডার কেটে ফেলেছে, তোমার কপালে বুড়ো বরই ছিল। এই শুনে কানড়া কপালে ঘা মেরে কাঁদতে কাঁদতে ভবানীর পায়ে ধরে বলতে লাগলো - এতকাল বৃথাই ভবানীর পদসেবা করলাম, আমার এ জীবনে আর কাজ নাই। আমার ডুবে মরাই ভাল। এমন সময় মহামায়া অভয়া কানড়ার সামনে এসে তাকে হাত ধরে মাটি থেকে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন - কি হয়েছে? তুমি মাটিতে পড়ে কাঁদছ কেন? কানড়া কাঁদতে কাঁদতে ভবানীকে বললেন — মাগো, চিরকাল তোমার চরণ সেবা করে এসেছি, তুমি বর দিলে লাউসেন আমার পতি হবেন। তার জন্য লোহার গন্ডার নির্মান করিয়ে দিয়ে বললেন - লাউসেন ছাড়া এই গন্ডার কেউ কাটতে পারবে না। কিন্তু গৌড়েশ্বর গন্ডার কেটে দিয়েছে। মার চরণ সেবা করে আমার হল বুড় বর। আমি বৃথাই তোমার চরণে ফুল বেলপাতা দিলাম। কানড়ার এই কথা শুনে ভবানী খল খল করে হেসে বললেন -

'সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী আমি সর্বাধার।
অগমে না পায় অন্ত মহিমা আমার।।
প্রকৃতি পুরুষ আমি সর্বভূতে থাকি।
শরণাপন্নে আমি ছায়া দিয়া রাখি।।' (৬৮৪)

'ভক্তি ভাবে পূজে যেই আমার চরণ।
তার ইষ্ট সিদ্ধি দুঃখ না পায় কখন।।'
'চারি যুগে আমার বচন নাহি নড়ে।
চিন্তা নাহি কানড়া বসিয়া থাক ঘরে।।'

'তোর বিভা করিতে নারিবে গৌড়েশ্বর।
লোউসেনে তোরে বিভা দিয়া যাব ঘর।।' (৭০৪)

তখন ধুমসী হেসে বললো - লাউসেনই গন্ডার কেটেছে। সেই কথা শুনে কানড়ার খুব আনন্দ হল। এদিকে পাত্র গৌড়েশ্বরের সঙ্গে যুক্তি করতে বসল, পাত্র বললো - মহারাজ, কানড়াতো লাউসেনকেই বিবাহ করতে চায়, লাউসেনই গন্ডার কেটেছে, তাই লাউসেনকে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে সিমুল্যা গড় আক্রমণ করে কানড়াকে বিবাহ করুন। কানড়ার পিতা হরিপাল

শিখর বাঁশডিঞা পালিয়ে গেছেন। তাকে আনতে লাউসেনকে সেখানে পাঠিয়ে দিন, বলবেন পিতা মাতা ছাড়া কন্যার বিবাহ হয়না, তাই তাঁদের আসতে হবে। রাজার কথায় লাউসেন বাঁশ ডিঞা চলে গেলেন কালুবীরকে নিয়ে।

এদিকে মহাপাত্র রাজাকে বললো - মহারাজ, কানড়া এখন গড়ে একা আছে। এই সুযোগে কানড়াকে নিয়ে এসে বিবাহ করে গৌড় ফিরে চলুন। রাজা তখন দলবল হাতিঘোড়া বন্দুকী, গোলন্দাজ নিয়ে সিমুল্যা তোলপাড় করতে লাগল। গড়ের ভেতর কানড়া দামামা শুনে ভয়ে কম্পবান, মনে মনে মহামায়া অভয়াকে আকুল ভাবে ডাকতে লাগলেন। ভক্তের ডাকে মহামায়া ভবানী পদ্মাবতীকে নিয়ে কানড়ার সামনে উপস্থিত হলেন। কানড়া ভগবতীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন -

'ভাই বন্ধু পালাইল জননী জনক।
আমি অনাথিনী নাঞি আমার রক্ষক।।
এত শুনি ভবানী বলেন বাছা শুন।
যম ইন্দ্র যদি আইসে সহস্র অর্জুন।।
একে একে কাটিয়া করিব খান্ খান্।'
'রুধির সাগরে মহী করাইব স্নান।।'
'ভালবাসি কানড়া তোমাকে সর্বকাল।
তোর লাগ্যা আপনি ধরিব খাড়া ঢাল।।
মস্তক কাটিব রাজা পাত্র দুজনার।
সাধ কর্যা পরিব গলায় মুন্ড হার।।'

(৮৭২)

দেবী অবশ্য বললেন - তবে একটা কথা শোন, আমি এখানে অবলম্বন ছাড়া যুদ্ধ করতে যেতে পারিনা, তাই ধুমশী অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে চলুক, আমি ধুমসীকে অবলম্বন করে যুদ্ধ করবো। দেবীর কথায় ধুমসী রণসাজে সজ্জিতা হয়ে দেবীর সামনে দাঁড়াল, দেবী বললেন -

'দিলাম অভয় বর শুনগো ধুমসী।
তোর গায় না লাগিবে গোলাগুলি অসি।
মোর বরে তোমার হইল বজ্রকায়।।'
এত বলি ধুমসীকে করিল বিদায়।।'

(৯৩০)

দেবীর চরণ বন্দনা করে ধুমসী যুদ্ধ যাত্রা করলো। পবন বেগে সাত গড় পার হয়ে রাজার সৈন্যদের সামনে হান হান মার মার বলে উপস্থিত হল। সামনে হাতি ঘোড়া মাহুত যাকে পেল কেটে খন্ড খ ন্ড করতে লাগল।

'ধুমসী আশ্রয় কর্যা উড়িলা ভবানী।
খড়্গা হাতে আপনি করেন হানা হানি।।'
'শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারেঙ্গ ধারিনী।
বারাহি বন্দনা ঘাতে বিপক্ষ নাশিনী।।'

(১০২২)

'ঐরাবতে ইন্দ্রনীর সহস্র লোচন।
বজ্র হাতে হান হান বদনে বচন।।'
'মুখে অট্টহাস গলেশোভে মুন্ডমালা।
দিগম্বরী ঘোররূপা বদন করালা।।'

(১০৩০)

এই যুদ্ধে রাজার বহুলোক মারা গেল, বাকিরা প্রাণ ভয়ে পালাল। সেই দেখে ভয়ে ভূপতি আর পাত্রও পালাতে লাগল, ধুমসীও ওদের পিছু পিছু ছুটল। ধুমসীকে দেখে গৌড়েশ্বর দাঁতে খড় দিয়ে আর পাত্র পায়ে ধরে বললেন - আর বিবাহে প্রয়োজন নাই, আমাদের ঘরে

যেতে দাও। এই কথায় ধুমসী বললো - মহারাজ তুমি কানড়াকে কখনও বিয়ে করার দাবি করবে না, এই ছাড়পত্র লিখে দিয়ে নিজের ঘর চলে যাও। ধুমসীর কথায় -

"স্ব অক্ষরে ছাড়িপত্র লেখ্যা দিল রায়।
কনড়া করুক বিভা যাকে মনে ভায়।।
মোর সনে দায় নাঞি জীবন যাবৎ।
আজি হৈতে কানড়া আমার মাতৃবৎ।।" (১০৬৮)

এই লেখার ওপরে সাক্ষী হিসাবে পাত্র সাক্ষর করে দেবার পর ধুমসী তাদের ছেড়ে দেয়। ধুমসী ছাড়পত্র নিয়ে কানড়ার কাছে ফিরে বললো রাজার বহুলোক এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে, আর ছাড়পত্র লিখে দিয়ে রাজা-পাত্র কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

ধুমসীর এই কথা শুনে কানড়া হায় হায় করে মাথা চাপড়াতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে ধুমসীকে বলতে লাগল - ঐ লোকজনের মধ্যে তো আমার প্রাণনাথ রঞ্জা-নন্দনও ছিলেন। তিনিও তাহলে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, এই বলে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে দিতে গায়ের অলঙ্কার খুলে ফেললেন, মাথার করবীও খুলে দিলেন। ধূলায় বসন মলিন, কাঁদতে কাঁদতে কানড়া বললো - একবার রণস্থল চল, সেখানে গিয়ে প্রাণনাথের অসার দেহটি একবার দেখে আসি। কানড়া ও ধুমসী রণক্ষেত্রে গিয়ে মৃতদেহ খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলো কোথাও লাউসেনের মৃত দেহ পাওয়া যায় কিনা। আর মনে মনে বলল - এত দিন ভবানীর সেবা করে আমার এই দশা হল। আমি আর এ জীবন রাখবো না। এই বলে সহচরী ধুমসীকে বললো -তুমি চিতা সাজাও, আমি সহমরণে যাব। কানড়াকে শোকাকুলা দেখে স্বয়ং ভগবতী সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে একটু পরিহাস করলেন, তারপর বললেন - বেটি, কান্নাকাটি করিস্ না, রঞ্জার কুমারের কোন ক্ষতিই হয় নাই, যুদ্ধের সময় রঞ্জার কুমার এখানে ছিলেন না। হরিপাল শিখরকে (তোমার পিতা) আনবার জন্য বাঁশডিঞা গিয়েছিলেন।

এদিকে লাউসেন তোপের আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি সিমুল্যা গড়ে ফিরে এলেন। দূর থেকে ধুমসী লাউসেনকে আসতে দেখে কানড়াকে বললো - তুমি তাড়াতাড়ি রণভূমি ছেড়ে অন্দর মহলে চলে যাও। লাউসেন আসছেন। লাউসেনকে দূর থেকে দেখে কানড়া আনন্দে জিভ কেটে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। লাউসেন রণভূমে এসে ঘোড়া থেকে নেমে চারদিকে হাতি, ঘোড়া ও গৌড় সেনাদের মৃতদেহ দেখে খুব ভেঙ্গে পড়লেন, ভাবলেন যুদ্ধে মেসো ও মামা মারা গেছেন। তাই তিনি রেগে কানড়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলেন। তখন কালুবীর জোড় হাত করে বললো - আমি থাকতে আপনি আগে যাবেন কেন? এই বলে কালুবীর মার মার করে ধুমসীর দিকে তীর ধনুক নিয়ে ছুটে এল, সেই দেখে ধুমসী ছুটে মহলের ভেতর যে ঘরে ভবানী আর কানড়া বসে ছিলেন, সেখানে ঢুকে ঘরে খিল দিয়ে দিল। এবং ভবানী আর

কানড়াকে কালুবীর আসার কথা জানালো। এই শুনে ভবানী বললেন — ভালই হল, কালুবীরের টানে লাউসেন আসবেন, তখন কানড়ার সাথে লাউসেনের বিয়ে দিয়ে দেব। এই বলে ভবানী ধুমসীকে বললেন --- দুয়ারে ঘড়া দুই ভাঙ্গ সিদ্ধি রাখ। ধামায় করে আট ভাজা রাখ, আর কিছু ধন রত্ন চার পাশে রেখে দাও। আর দরজার খিলটাও খুলে রেখে দাও, কালুবীর খুব ভাঙ্গ ভাল বাসে, ভাঙ্গ দেখেই খাবে তারপর নেশার ঘোরে ধনরত্ন নিয়ে পালাতে যাবে, তখন চোর বলে তাকে ধরে রাখবে। ভবানীর কথা মত ধুমসী সব ঠিক ঠাক করে রাখল। কালুবীর এসে দেখে কপাট খোলা, তাই সে নির্ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই দেখে ভাঙ্গ ভাজা সব সাজানো রয়েছে। মনের আনন্দে ভাঙ্গ ভাজা খেয়ে দেখে চার দিকে ছড়ানো রয়েছে অমূল্য রত্ন, সেগুলো নেবার লোভ সামলাতে না পেরে বোঝা বেঁধে মাথায় তুলে নেশার ঘোরে টলতে টলতে বাইরের দিকে যেতেই — ধুমসী চোর চোর বলে চিৎকার করে তাকে কানড়ার কাছে ধনরত্ন সহ ধরে নিয়ে এল এবং তাকে রত্ন ঘরে বন্দী করে রাখল।

এদিকে কালুবীরের বিলম্ব দেখে লাউসেন ঘরে প্রবেশ করে দুয়ারে ডাক দিয়ে বলতে থাকেন - কে আছ পরিচয় দাও। আমার মেসো, মামার সঙ্গে যে সংগ্রাম করছে তাকে বধ করব। ঘরের ভিতর থেকে এই কথা শুনে ভবানী কানড়াকে বললেন - দুয়ারে তোর স্বামী এসে ডাকছে, তুইও ঘোড়ায় চেপে (ঘুড়ি) তাঁর সামনে যা, ভবানীর কথা শুনে ঘুড়িতে চেপে কানড়া ময়নার রাজার সামনে উপনীত হলেন। দুজনা দুজনার মুখ দেখে মোহিত। কানড়া ঘুড়ির পিঠে বসেই সেনকে নমস্কার করল। সেন রাজকন্যার পরিচয় জানতে চাইলে কানড়া লজ্জায় -

'বদনাচ্ছাদন কর‍্যা কহে মৃদু ভাষে। চিরকাল হৈতে সেবি শঙ্কর পার্বতী।
কানড়া আমার নাম বল্যা মনে হাসে।। মনের মানস মোর হবে তুমি পতি।।

(১২৫২)

এই কথা শুনে লাউসেন আতঙ্কে কানে হাত দিয়ে তিনবার জগন্নাথকে স্মরণ করে বললেন- একথা শোনাও আমার পাপ, কারণ আমার মেসো গৌড়েশ্বর আপনাকে বিবাহ করতে এসেছিলেন, সেই হিসাবে আপনি আমার মাসি। তাই আমাকে এমন কথা বলা আপনার উচিত হয় নাই। সেই শুনে কানড়া বিনয়ের সঙ্গে জানালো - দেবী ভবানীর বরে আপনি আমার পতি, আপনি যদি দেবীর আজ্ঞা বা ইচ্ছা পালন না করবেন তা হলে গন্ডার কেটেছিলেন কেন? কারণ দেবীর বরে যিনি এক চোটে লোহার গন্ডা কাটবেন তিনিই আমার পতি হবেন। তাই আপনি রাজী না হলে যুদ্ধই এক মাত্র পথ। এই বলে কানড়া লাউসেনের দিকে তীর নিক্ষেপ করল, সেই তীর লাউসেনকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে তার পায়ে প্রণাম জানালো। এই দেখে কানড়া ঈষৎ হেসে আবার এক তীর ছুড়লে সেই তীর লাউসেনের মাথার উপর গিয়ে ছামনি পাড়ল। এবার লাউসেনও কানড়ার দিকে এক তীর নিক্ষেপ করলেন - সেই তীর কানড়ার গলা ধরে মুখ চুম্বন করে ঘুরতে লাগল। এই দেখে দুজনার মনে খুব বিস্ময় জাগল।

এমন সময় লাউসেন ও কানড়ার যুদ্ধের কথা শুনে ভবানী নিজে সেখানে উপস্থিত হলেন। এবং কানড়াকে খুব বকাবকি করলেন -

'স্বামী সনে সমর না শুনি কোন কালে।
না জানি কি আছে তোর কলঙ্ক কপালে।।' (১২৯২)

কানড়ার বিবাহ পালা

লাউসেন তখন ভবনীকে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। ভবানী লাউসেনকে বললেন - বাছা কানড়া আমার কাছে বর চেয়ে নিয়েছে - তুমিই তার পতি হবে। তাই তুমি কানড়াকে বিবাহ কর। লাউসেন জোড় হাতে ভবানীকে বললেন - গৌড়েশ্বর মেসো হাতে সুতো বেঁধে কানড়াকে বিবাহ করতে এসেছিলেন, তাই কানড়াকে বিবাহ করা আমার উচিৎ কাজ নয়। লাউসেনের কথা শুনে ভবানী বললেন - গৌড়েশ্বর ছলে বলে বিবাহ করতে এসেছিলেন, কিন্তু কানড়ার পণ অনুযায়ী তুমি গন্ডার কেটেছ, তাই তুমিই তার পতি, তাছাড়া এই দেখ গৌড়েশ্বর নিজের হাতে লিখে দিয়ে গেছেন - কানড়া যাকে মন চায় বিবাহ করুক, আমি তাকে মাতৃবৎ দেখি। দেবী ভবানীর কথায় লাউসেন মনে মনে ভাবতে লাগলেন এখন কি করা যায়। দেবীর কথা অলঙঘ্য, কখনই অন্যথা হবে না। লাউসেন তখন ভেবে চিন্তে বললেন - কানড়া যেমন গন্ডার কাটার পণ করেছিল, আমারও তেমনি একটা পণ আছে -- কানড়া যদি আমাকে ঘোড়া থেকে উঠিয়ে দিতে পারে তাহলে আমি কানড়াকে বিবাহ করব। আর যদি না পারে পরিবর্তে আমি যদি কানড়াকে উঠিয়ে দিতে পারি তাহলে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কানড়ার বিবাহ হবে। লাউসেনের এই পণের কথা শুনে ভবানী ভাবলেন বেশ ফের হল। তাই তিনি নারদকে দিয়ে ভোলা মহেশ্বরকে ডেকে পাঠালেন। ভবানীর ডাকে প্রভু পঞ্চানন শিমুল্যায় এসে উপস্থিত হলেন। অভয়া তাঁকে কানড়ার বিবাহের ব্যাপারে সব কথা বললেন।

'এত শুনি হাসিয়া বলেন মৃত্যুঞ্জয়।
ধর্মের সেবক কভু নহে পরাজয়।।' (১৩৫০)

তবে একদিনের জন্য ধর্মরাজ সেনকে ছেড়ে দিলে বিবাহ সম্পূর্ণ করা যাবে। দেবী ভগবতী নারদকে পাঠালেন ঠাকুর নিরঞ্জনের কাছে। নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়ে ঠাকুর নিরঞ্জন ধর্মরাজকে কানড়া লাউসেনের বিবাহের ব্যাপারে সব কথা বললেন, এবং এক দন্ডের জন্য লাউসেনকে ছেড়ে দিতে বললেন, ঠাকুর নিরঞ্জন হেসে বললেন - শুভ কাজের জন্য লাউসেনকে এক দিনের জন্য ছেড়ে থাকবো। নারদ বৈকুণ্ঠ থেকে ফিরে মহাদেবকে নিরঞ্জনের সম্মতির কথা জানালেন। মহাদেব তখন ভবানীকে জানালেন - এক কাজ কর অলক্ষে তুমি কানড়াকে কোলে নিয়ে বসবে, আর আমি সেনকে কোলে নিয়ে বসব। লাউসেন কানড়াকে যখন টেনে তুলতে যাবে তখন তুমি সাবধানে ধরে রাখবে, আর কানড়া যখন লাউসেনকে টেনে তুলবে, আমি তখন পিছু দিয়ে ঠেলে দেব। হর গৌরীতে এই পরামর্শ করে সবার অলক্ষে দুজন দুজনার পিছুতে গিয়ে বসলেন। লাউসেন কানড়ার দুই হাত ধরে টানাটানি করলেন কিন্তু তুলতে পারলেন না, লাউসেন পরাজিত হলেন। এবার কানড়া লাউসেনকে টান দিলেন আর সেই সময় মহাদেব পিছু থেকে ঈষৎ ঠেলে দিতেই সেন কানড়ার কোলের উপর পড়ল। কানড়ার জয় হল। এর পর ভবানী আর মহেশ্বর কানড়ার বিবাহ দিতে বসলেন। 'বরকন্যা সাজিল সাক্ষাৎ অরুন্ধতি।'

নারদ পুঁথি ধরে বিয়ের মন্ত্র পাঠ করলেন। কুশ হাতে মহাদেব বিয়ে দিতে বসেছেন, দেবী দুর্গা তাঁর হাতের আংটী যৌতুক দিয়ে লাউসেনের হাতে কানড়াকে সম্প্রদান করলেন। বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ার পর হর-গৌরী কৈলাশে গমন করলেন, নারদ পঞ্চাশ মোহর দক্ষিণা

নিয়ে নিজস্থানে গমন করলেন, এমন সময় হরিপাল শিখর নিজ ঘরে ফিরে এসে কন্যার বিবাহ দেখে খুব আনন্দিত হলেন। এরপর বরকন্যা ময়না যাত্রা করলেন। যাবার সময় রণক্ষেত্রের চেহারা দেখে লাউসেন ঠাকুর নিরঞ্জনের কাছে গৌড় রাজার মৃত সৈন্য সামন্তদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। ধর্মের কৃপায় উপর থেকে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগল - গৌড়ের রাজার সব লোক লস্কর প্রাণ ফিরে পেয়ে গৌড়ে ফিরে গেল। লাউসেন নব বধূকে নিয়ে ময়না নগরে পৌছালে রাণী রঞ্জাবতী এবং রাজা কর্ণসেন পুত্রবধূ কানড়াকে দেখে খুব আনন্দিত হয়ে বরণ করে ঘরে তুললেন।

ষোল

ঢেকুর যুদ্ধের সূচনা ও মায়ামুন্ড পালা

১.গৌড়েশ্বরের দরবার ঃ রাজা গৌড়েশ্বর আজ বিশেষ দরবারের আয়োজন করেছেন। ধনুকী, সিপাই, মন্ত্রী মহাপাত্র, কুলীন কবি, বারভূঞা, আর পঞ্চম গৌড়ের সব রাজা ও সামন্ত রাজ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেছেন , এসেছেন মঙ্গলকোটের গজপতি রাজ, বর্ধমান রাজ কালীদাস, বীরভূমের ভূপাল, সিমুল্যার হরিপাল শিখর, মিথিলা মগধের নৃপতিগণ, কাঙুর রাজ কপূরধল, এছাড়া মোল্লা , মোহম্মদ, হাসান হুসেন , পীরজাদা যাঁর মর্যাদা রাজার কাছে অনেক বেশী, এই রকম অনেকে এসেছেন ও বসেছেন। দামামা দুন্দুভি রণসিঙ্গা বেজে উঠছে বারে বারে। পঞ্চ গৌড়ের অধিপতি গৌড়েশ্বর রাজ সিংহাসনে বসে রাজন্যবর্গের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন কোন কোন রাজারা এসেছেন, আর কে কে আসেন নাই। দেখেন সব রাজাই এসেছেনে, এক মাত্র ঢেকুরের সোম ঘোষ বাদে। এরপর রাজার কায়স্থনায়েব খাতা পত্র নিয়ে কার কত রাজকর বাকী আছে বা নাই পড়ে শোনাতে লাগলেন। দেখা গেল সকল রাজাই রাজ কর দিয়েছেন, একমাত্র ঢেকুড়ের সোম ঘোষের ছেলে ইছাই কুড়ি বৎসরের রাজকর দেয় নাই। এই শুনে রাজা রেগে আগুন ।

পাত্রকে বললেন - ঢেকুরের গোয়ালা বেটা দেশ লুটে খাচ্ছে, অদ্যাবধি কর দেয় নাই, তার জন্য তুমি কোন প্রতিবাদ কর নাই , মনে হয় তুমি ওর কাছে টাকা খেয়ে বসে আছ। তোমার দোষেই এই রকম কান্ড ঘটেছে । রাজার কথা শুনে পাত্র বললো - গোয়ালা দেবীর বরে স্বতন্ত্র অধিকার পেয়েছে , কি করা যায় ভাল করে বুঝে সুঝে দেখতে হবে । এই ভেবে মহাপাত্র মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো। ভেবে চিন্তে ঠিক করল - রঞ্জার ছেলেকে ঢেকুর পাঠানোর ব্যবস্থা করলে ভাল হয়, অজেয় ঢেকুর , সেখানে গেলে ভাগ্না নিশ্চয় মরবে ।

‘ বিষম ঢেকুর গড় কেবা করে জয়।
এবার ভাগিনা তথা মরিবে নিশ্চয় ।।’ (১১৪)

চার রাউতি বিধবা হবে , রঞ্জা আটকুড়ি হবে, আর পুত্রশোকে বুড়ো কর্ণসেন যাবে মরে, তখন আমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। এই সব ভেবে পাত্র তর্জন গর্জন করতে করতে রাজাকে জানাল - যদি ঢেকুর জয় করতে চান তাহলে লাউসেনকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, একমাত্র লাউসেনই ঢেকুর জয় করতে পারবে। পাত্রের যুক্তি মেনে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে চিঠি লিখে দিলেন -- তোমাকে ঢেকুর যুদ্ধে যেতে হবে, ঢেকুরের গোয়ালা বেটা আমার আজ্ঞা মানছে না, অনেক কাল কর দেয় নাই, তুমি ঢেকুর জয় করলে অনেক বকসিস্ পাবে। শীঘ্র চলে আসবে। এই চিঠি দিয়ে ইন্দা মেটেকে ময়না পাঠিয়ে দিলেন।

২. লাউসেনের দরবার ঃ লাউসেন ময়নার রাজভবনে দরবারে বসেছেন। জয়পতি মন্ডল,

পন্ডিত, গায়েন, গুণিন, কবি, শাকা, শুকা, কালুবীর সবাই দরবারে রয়েছেন, এমন সময় ইন্দ্রজাল কোটাল এসে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে রাজার পত্রটি তাঁর হাতে দিলে, লাউসেন পত্র খুলে দেখলেন - রাজা ঢেকুর যুদ্ধে যাবার জন্য আজ্ঞা করেছেন। ঢেকুর যুদ্ধের কথা শুনে লাউসেনের মনে একটু ভয় হল, কারণ —

' শ্যামা রূপা ইছায়ে স্যাপক্ষ সর্বকাল।
যার রণে আপনি হারিল মহীপাল।।" (২২০)

তাই কালুবীরকে সব কথা বললেন। কালুবীর সেনের সব কথা শুনে জানাল — আপনার কোন চিন্তা নাই, ঢেকুরের যুদ্ধে আমাদের জয় হবেই।

' কোন গড় ঢেকুর ইছাই কোন বীর।
তীরে তীরে ছায়্যা লব অজএর নীর।। ' (২২৮)

কালুবীরের কাছ থেকে অভয় বাণী শুনে লাউসেন ঘোড়া শালে গিয়ে অন্ডির পাখরের কাছে গেলেন । সিপাইকে দেখে অন্ডির পাখরের খুব আনন্দ হল। লাউসেন অন্ডিরকে ঢেকুর যুদ্ধের কথা , অজয় নদীর কথা সব জানালেন —

"এত শুনি বাজীবর বলেন বচন ।
অন্ডির পাখর আমি রবির বাহন ।।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আমার আগে কি ।
পিঠে নিলে রত্নাকর পার কর‍্যা দি ।।"

"ভয় নাঞি ভূপতি সাজিয়া চল রণে।
নিমিযেকে লয়্যা যাব ঢেকুর ভুবনে।।
অবলীলা অজয় হইব আমি পারি ।
ইছায়ের উপরে আপুনি দেহ মারি।।"

'রণ জিন্যা এখানে আসিয়া খাব দানা।
বিলম্ব বিফল রায় দিতে বল হানা।।" (২৫৮)

ঘোড়ার এই কথা শুনে আনন্দিত মনে পিতা কর্ণসেনের কাছে বিদায় নিতে গেলেন লাউসেন। পিতাকে বললেন — গৌড়েশ্বর আমাকে ঢেকুর যুদ্ধে যেতে বলেছেন। এই তাঁর চিঠি।

ঢেকুরের কথা শুনেই কর্ণসেন চমকে উঠলেন — এক দিন কর্ণসেনই ছিলেন ত্রিষষ্ঠ গড় (ঢেকুর) এর অধিপতি। সোম ঘোষ ও তার পুত্র ইছাই ঘোষের জন্যই তাকে ঢেকুর ত্যাগ করতে হয়েছে। শুধু ঢেকুর ত্যাগই নয় গৌড়েশ্বরের হয়ে ইছাই এর সঙ্গে যুদ্ধে তার ছয় পুত্র নিহত হয়েছে। তাদের শোকে রাণী ও পুত্রবধূরা প্রাণত্যাগ করেছেন। এই সব কথা মনে হতেই ভয় পেয়ে লাউসেনকে বললেন —

'শুনিলে ঢেকুর নাম মনে হয় ত্রাস।
রণ কর‍্যা সেখানে আমার সর্বনাশ।।" (২৭২)

তাই ঢেকুর যুদ্ধে যেতে দিতে আমার কোন ইচ্ছা নাই, তোমার মায়ের কাছে গিয়ে অনুমতি নাও। এই কথা শুনে লাউসেন তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়ে মায়ের দু'পা জড়িয়ে ধরে বললেন - মা এই দেখ রাজা গৌড়েশ্বর নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েছেন ঢেকুর যুদ্ধে যাবার জন্য। তাই তোমার চরণে বিদায় নিতে এসেছি। পুত্রের কথা শুনে রঞ্জাবতী সচকিত হয়ে বল্লেন - শুনেছি ঢেকুর গড় বিষম বড় গড়, রাজা পাত্র, সেন সবাই হেরে ফিরে এসেছেন, তুমি কোন যুক্তিতে সেখানে যাবে। অনেক কষ্টে তোমাকে পেয়েছি। তোমাকে ঢেকুর যেতে দিতে মন একেবারেই চাইছে না। তখন লাউসেন বললেন -

'চিন্তা নাঞি জননী না ভাব্য অন্য মনে।
তের গন্ডা ইছাই বধিতে পারি রণে।।' (৩২৬)
'তব আশীর্ব্বাদে হব ঢেকুরে বিজয় ।
ঘরে বস্যা থাক মা না করা মনে ভয়।।' (৩৩৪)

এই বলে আবার মায়ের দু'পা ধরে আর্শীবাদ চাইলেন, মা আর্শীবাদ করে বললেন -

'সমরে সারথি বাছা হবে নিরঞ্জন।
পর হৈয়া অজয় জিনিবে গিয়া রণ।। (৩৩৮)

মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তিনি গেলেন চার রাণী কলিঙ্গা, অমলা, বিমলা ও কানড়া যেখানে পাশা খেলছিলেন সেখানে। রাণীদেরও বললেন ঢেকুর যুদ্ধে যাবার কথা, রাণীরা বিশেষ করে কানড়া আপত্তি করাতে লাউসেন বল্লেন -

'কোন বীর ইছাই অজয় কোন নদী।
রণ জয় হবেক স্বধর্ম্মে থাকি যদি।।' (৩৬৬)

আর বললেন -- আমি রাজার অধীন, তার নুন খাই, তাই রাজার আজ্ঞা পালন করা আমার কর্ত্তব্য। এই বলে কলিঙ্গাকে বললেন - তুমি পাটরাণী সকলকে সমান ভাবে দেখবে। এই বলে রাণীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্পূরের কাছে বিদায় নিলেন।

৩. লাউসেনের ঢেকুর যুদ্ধযাত্রা : কালুবীর শাকা শুকা আর তের দোলাই (ডোম) রণ সাজে সজ্জিত হয়ে এল। সহিস্ অন্ডির পাখর ঘোড়াকে সাজিয়ে লাউসেনের সামনে এনে দিল। মহেন্দ্রক্ষণ বুঝে লাউসেন ঘোড়ায় উঠে ঢেকুর যুদ্ধে যাত্রা করলেন। কালুবীর শাকা, শুকারা সঙ্গে সঙ্গে চললো --- লাউসেনের ঘোড়া অন্ডির পাখর দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ভৈরবী পারায়্যা গৌড়ে দিল দরশন।
ভনে নরসিংহ যার শাঁখারি ভবন।।" (৪৭২)

পঞ্চম গৌড়েশ্বর দরবারে বসেছেন এমন সময়ে লাউসেন সেখানে উপস্থিত হয়ে

ঘোড়া থেকে নেমে রাজাকে এবং মামাকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন এবং একে একে সকলকে সম্ভাষণ করলেন, রাজা লাউসেনকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন -- ঢেকুরের গোয়ালা বেটা ইছাই রাজকর দিচ্ছে না, তুমি তাঁকে সাজা দিয়ে কর আদায় করে নিয়ে এস। তুমি ছাড়া কেউ ঢেকুর জয় করতে পারবে না। তুমি সর্বত্র আমার বিজয় ঘোষণা করে এসেছ। এই কথায় লাউসেন বললেন --- আপনার আশিষেই আমার সর্বত্র বিজয় হয়েছে। ইছাইকেও পরাজিত করব। রাজা তখন লাউসেনকে মাথার পাগড়ি গায়ের অম্বর দিয়ে ঢেকুর যুদ্ধে পাঠালেন। কালুবীর, শাকা শুকাসহ লাউসেন ঢেকুর যুদ্ধে যাত্রা করলেন। অস্থির পাখর ঘোড়া ছুটল, তার আগে আগে কালুবীররা মার মার করে ছুটল। - গৌড় থেকে ঢেকুর ৮০ ক্রোশ পথ, সন্ধ্যার আগে ওঁরা পৌছাল সিঙ্গার নামে একটি স্থানে, সেখানে রাত কাটিয়ে আবার সকাল হতেই চললেন ঢেকুরের দিকে, কিছু পরে অজয় নদীর ধারে এসে পৌছাল।

লাউসেন অজয়ের উত্তর পাড়ে ঘোড়ার পিঠ থেকেই দক্ষিণে ঢেকুর অবলোকন করতে লাগলেন। দেখলেন ঢেকুর গড় ভীষণ গহন ঘোর, সূর্য, চন্দ্রও তার ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। ঐ গড়ের মধ্যে দেখলেন - অতি মনোহর দেবীর দেউল। ঢাক ঢোল বাজে নিরন্তর। রাজা মনে মনে ভাবতে লাগলেন -

কি কর্‌য়া এখানে হব জয়।
অনাদ্যের পদতলে।। বসু নরসিংহ বলে
নিরঞ্জন আছেন সদয়।। (৫৫৮)

লাউসেন ও কালুবীর দেখল নদীতে বিশেষ জল নাই সহজে পার হওয়া যাবে, কিন্তু যেই মাত্র ওরা নদী পার হতে গেল, ভবানীর বরে নদী সাত তাল হয়ে উঠল, সমুদ্রের মত ঢেউ, সবাই ঠাকুরকে ডেকে পাড়ে উঠে এল। কালুবীরের পরামর্শে অজয়ের তীরে তাবু ফেলা হল। কালুবীর নদীর তীরে ঘোরাফেরা করতে করতে দেখলো - নদীর দহতে বড় বড় মাছ, কালুবীরের মাছ ধরার খুব লোভ হল। লাউসেনের অনুমতি নিয়ে কালুবীর মাছ ধরার জন্য নদীতে মঞ্চ বেঁধে মঞ্চের চারি দিকে নিশানা উড়িয়ে দিল যাতে ঢেকুরের লোক জন এই নিশান দেখতে পায়। তার পর কালুবীর চিতল, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছ ধরতে লাগল। তাই দেখে শাকা শুকা আনন্দে সিঙ্গা কাড়া বাজনা বাজাতে লাগল। দূর থেকে ঢেকুরের ইছাই এই শব্দ শুনে রেগে আগুন হয়ে অজয় নদীর দিকে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যান, সেই সময় কিছু অমঙ্গল দেখে দেবী শ্যামারূপা ইছাইকে বললেন - আজ কিছু অমঙ্গল দেখি, তুমি যুদ্ধে যেও না। ভবানীর কথা শুনে ইছাই লোহাটা বজ্জরকে নদীর ধারে পাঠালেন সংবাদ আনতে।

৪. ইছাই এর অনুচর লোহাটা বজ্জর নিধন ঃ

ইছাই এর বাক্য শুনে লোহাটা বজ্জর বেয়াল্লিশ কোটাল সহ নৌকায় করে কালুবীরের মঞ্চের দিকে এগিয়ে চললো - কালুবীর মঞ্চের উপর মাছ ধরছে, লোহাটা চিৎকার করে মাছ ধরা বন্ধ করতে বলছে আর কালুকে গালাগালি দিচ্ছে। গালাগালি শুনে কালুবীর রেগে কাঁপতে

কাঁপতে ভাবছে নৌকা শুদ্ধ বেটাকে ডুবিয়ে মারি , লোহাটা কাছাকাছি আসতে দু'জন দু'জনকে দেখে চিনতে পারল যে তাদের দুজনারই বাড়ি ছিল রমতিতে, লোহাটা (বজ্জর) হচ্ছে কোটাল আর কালুবীর হচ্ছে ডোম। তারা উভয় উভয়কে চেনে , তাই তারা জাত আর জাত ব্যবসা নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে বিস্তর গালাগালি দিতে লাগল । লোহাটা বজ্জর -

'কালুকে বলিছে কর‍্যা নিদারুণ পণ।
এক শরে আজি তোরে করিব নিধন।।
এই শুনে বীর কালু বলে বেটা শুনরে চন্ডাল।
তোর তীর উড়্যা নিতে হাতে নাঞি ঢাল ।।' (৭৫২)

এই বলে লোহাটার তীর বাঁ হাতে ধরে নিল এবং ঈষৎ হেসে লোহাটাকে বললো -

'তোর ঘা সহিয়া নিলু না হলু আকুল।'

তারপর কালুবীর লোহাটার দিকে তীর ছুড়ল নৌকাকে লক্ষ্য করে, কালুর তীর লোহাটার নৌকাকে চুরমার করে দিল, নৌকার সব লোকেরা জলের প্রবল তোড়ে তলিয়ে গেল, লোহাটা বজ্জর নাকানি চোবানি খেতে খেতে জলের ধাক্কায় তীরে এসে আছড়ে পড়ল, সেই সময় কালুবীর টাঙ্গি দিয়ে তার মুন্ডু কেটে নিয়ে সেনের কাছে ছুটে গেল।

৫. মহামদ কর্তৃক লোহাটার মুন্ডুকে লাউসেনের মুন্ডুতে রূপান্তর ও ময়না প্রেরণ ঃ

লোহাটা বজ্জরের কাটা মুন্ড দেখে লাউসেন কালুবীরকে জড়িয়ে ধরে বললেন - এই বেটা আমার ছয় ভাইকে হত্যা করেছিল, এই মুণ্ডু গৌড়েশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দিই । এই বলে একটা চিঠি লিখে সিঙ্গদার নামে এক লাঠিয়ালকে দিয়ে লোহাটা বজ্জরের কাটা মুন্ডু গৌড়েশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সিঙ্গদার রাজসভায় গিয়ে চিঠি আর লোহাটার কাটা মুন্ডু রাজার পায়ের কাছে রাখল। রাজা চিঠি পড়ে আর লোহাটার কাটা মুন্ডু দেখে মহাআনন্দিত হলেন - বললেন এই বেটা আমার লস্করদের কেটে ছিল, এখন তার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। কিন্তু লোহাটার কাটা মুন্ডু দেখে পাত্রের মাথা ঘুরে গেল মনে মনে বললো -- রঞ্জার বেটাব সব জায়গাতেই জয় হচ্ছে , এখন কি করে ওকে ধ্বংস করা যায়। তখন মনে মনে ঠিক করল - এই কাটা মুন্ডুকে লাউসেনের মুন্ডুর মত তৈরী করিয়ে রঞ্জার কাছে পাঠাবো, রঞ্জা সেই দেখে জীবন ত্যাগ করবে, এদিকে রাজাকে বললো - লোহাটার মুন্ডু দেখতেও আমার ঘৃণা হয়, এই মুন্ডু মাটিতে পুঁতে দিই সবাই লাথি মেরে যাবে। রাজা এই যুক্তিতে সম্মতি জানালেন। তখন পাত্র কামিলা (শিল্পী) দের গোপনে ডেকে বললো - এই কাটা মুন্ডুর ওপর লাউসেনের মুন্ডু গড়ে দাও, এই মায়া মুন্ডু সেনের বলে রঞ্জার কাছে পাঠাবো, যেন সঠিক ভাবে তৈরী হয়। তের জন কামিলা রাতা রাতি ঐ কাটা মুন্ডুর ওপর লাউসেনের মায়া মুন্ডু তৈরী করে পাত্রের হাতে দিল। পাত্র বিলক্ষণ করে দেখল যে এই কৃত্রিম মায়ামুন্ডু সাক্ষাৎ সেনের মুন্ডর মত হয়েছে আর মুন্ডু এত জীবন্ত হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন এই মাত্র কাটা হয়েছে। পাত্র কামিলাকে বিস্তর বসন

ভূষণ ধন রত্ন দিয়ে বিদায় করল। তার পর ইন্দ্রজালকে ডেকে বললো - এই মুন্ডু নিয়ে তুমি ময়নায় গিয়ে রঞ্জাকে দেবে, আর বলবে ঢেকুর যুদ্ধে তোমার ছেলের মৃত্যু হয়েছে, ভূপতি এই মুন্ডু তোমার কাছে পাঠিয়েছে। ইন্দা মায়া মুন্ডু কাপড়ে বেঁধে ময়না যাত্রা করল। পবন বেগে গিয়ে রাতারাতি ময়না পৌঁছে রঞ্জাকে মায়ামুন্ডু দিয়ে অভিনয় করে কাঁদতে কাঁদতে বললো - ঢেকুর যুদ্ধে আপনার ছেলে নিহত হয়েছে রাজা সেই মুন্ডু পাঠিয়ে দিলেন। এই শুনে রাণী রঞ্জাবতী মুর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন, তারপর আছাড় কাছাড় কাঁদতে লাগলেন, এই সংবাদ শুনে রাজা কর্ণসেনও মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, ময়না ভুবনে হাহাকার পড়ে গেল। কর্পূর কাঁদতে লাগল। ডোম পাড়ায় কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল।

প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে কর্পূর বললো - দাদার মৃত্যু হয়েছে বলে আমার মন মেনে নিতে পারছে না, মাকে বললো - এই মুন্ডু এক বার কালিঙ্গাকে দেখাও , কর্পূরের কথায় রঞ্জাবতী মুন্ডু নিয়ে কালিঙ্গার ঘরে গেলেন - কিন্তু তাদের কোন কথা মুখ দিয়ে বেরুল না, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন । কলিঙ্গা তাকে ধরে তুললো, তারপর রঞ্জাবতীর কাছে সব শুনে চার রাণী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন - এর পর চার রাণীতে ঠিক করেন তঁারা সহমরণে যাবেন। চর্তুদ[illegible]রে চার রাণী কালিন্দীর ঘাটে চললেন, সঙ্গে অনুমৃতার বাজনা বাজতে লাগলো, পন্ডিতরা [illegible] ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন। কালিন্দীর ঘাটে পৌঁছে লোকজনেরা চিতা তৈরীর ব্যবস্থা করতে লাগল। চার রাণী স্নান করে নতুন বসন ভূষণ পরে গরীব লোকদের বসন ভূষণ দান করলেন। কর্পূরের হাত ধরে বললেন - দাদার অবর্তমানে এই রাজ্য যেন দেখাশুনা করে - এই বলে চার রাণী অগ্নি কুন্ডের সামনে গিয়ে কুন্ড প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

একদিকে বৈকুণ্ঠে বসে ধর্মরাজ এই দৃশ্য দেখে হনুমানকে ডেকে বললেন - ময়নার কালিন্দীর ঘাটে চেয়ে দেখ, লাউসেনের চার রাণী মহামদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছে। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঁদের ঐ কার্য থেকে বিরত কর, এবং রঞ্জাকে সব কথা খুলে বলে এস। ত্রিদশ ঈশ্বরের এই নির্দেশ পেয়ে হনুমান ময়না গিয়ে গণকের বেশে অগ্নি কুন্ডের কাছে রঞ্জাদেবীর দিকে চেয়ে বললেন - আমি খড়িবজ্র, সুতিকা ঘরে তোমার শিশু চুরি হবার পর আমি বলেছিলাম মালির মালঞ্চে তোমার শিশুকে পাওয়া যাবে, তখন সেখান থেকে শিশু পেয়েছিলে। এই কথা শুনে রঞ্জাবতী গণকের পায়ে ধরে বললেন - আপনি যে শিশুকে খুঁজে দিয়ে ছিলেন সে ঢেকুর যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তাই এই চার বধূ অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করতে যাচ্ছে। আমিও অগ্নিতে ঝাঁপ দেব। এই কথা শুনে ছদ্মবেশী হনুমান বললেন তোমরা একটু শোক সম্বরণ কর। আমি সঠিক গণনা করে বলছি কি হয়েছে। এই বলে ছদ্মবেশী পবন কুমার কপট খড়ি পেতে গণনা করে বললেন - সব গ্রহ তুঙ্গে আর রাহু কেতু একাসনে বসেছেন, এতে কারও অমঙ্গল হয় না। তোমার ছেলের কোন ক্ষতি হয় নাই, সে কুশলেই আছে। এই কথায় রঞ্জাবতী বললেন - লাউসেন ভাল থাকলেই ভাল কিন্তু তার মুন্ডু কি করে এল। এই কথা শুনে গণকরূপী হনুমান বললেন - আমি গণনা করে যা বুঝেছি সেই আসল ঘটনা তোমরা সবাই শোন - ঢেকুরের রণে লোহাটা বজ্জর নিহত হয়েছে। সেন তার মুন্ডুকে গৌড়েশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। গৌড়েশ্বর লোহটার মুন্ডু দেখে সেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু আপনার ভাই

ঢেকুর যুদ্ধের সূচনা ও মায়ামুন্ড পালা

মহাপাত্রের লাউসেনের প্রশংসা সহ্য হল না, লোহাটার মুন্ডুর ওপর কৃত্রিম ভাবে সেনের মুন্ডু তৈরী করে আপনার কাছে পাঠালো। আপনারা সেই মুন্ডু দেখে শোকে কাতর হয়ে অনর্থ এই সব করতে যাচ্ছিলেন। তারপর ঐ মায়া মুন্ডু থেকে প্রলেপ উঠিয়ে দেখাল যে এটা প্রকৃত লোহাটা বজ্জারের মুন্ডু । লোহাটার মুন্ডু দেখে সকলেই বেশ আনন্দিত হলেন । চার রাণী সতী বেশ ত্যাগ করে অন্দর মহলে গেলেন, আর রাজা রাণী ব্রাহ্মণ, পন্ডিত, দরিদ্র সকলকে ভান্ডার খালি করে ধন রত্ন বিতরণ করলেন, এদিকে হনুমান আকাশে উঠে নিজরূপ প্রকাশ করে বলল--

'লাউসেন লাগি কিছু না ভাবিহ মনে।
কুশলে আছয়ে রাজা ঢেকুর ভুবনে।।
আপুনি সারথি তার হন নিরঞ্জন।
রণ জয় করিয়া আসিবে নিকেতন।।''(১০৬৪)

এই দৈব বাণী শুনে ময়না নগরে আনন্দের সীমা রইল না।

এদিকে অজয়ের ধারে লাউসেন কালুবীরকে ডেকে বললেন --- তুমিতো প্রথম সমরে লোহাটা বজ্জরকে সংহার করেছ। এখন এই অজেয় অজয় কি ভাবে পার হব। এই শুনে কালুবীর বললো 'আপনার সাপক্ষে সদা ধর্ম দয়াময়।' আপনি এক ভাবে অনাদ্যের চরণ ধ্যান করুণ, তিনি সব ঠিক করে দেবেন।

'কালুর বচনে তবে ময়নার নাথ।
ভক্তি ভাবে পূজা করে প্রভু জগন্নাথ।।' (১০৯৪)

লাউসেনের পূজা আর মহামায় জপে বৈকুণ্ঠে অস্থির হয়ে উঠলেন ঠাকুর নিরঞ্জন। হনুমানকে ডেকে বললেন - লাউসেন অজয় নদীর তীরে আটকে গেছে, পার হতে পারছে না , ভবানীর বরে অজয়ের জল সাত তাল হয়ে উঠেছে। তুমি শীঘ্র সেখানে গিয়ে রঞ্জার কুমারকে বল - তোমার কাছে যে অন্ডির পাখর ঘোড়া আছে সে সূর্যের ঘোড়া, সে পাখির মত উড়ে নদী নালা সমুদ্র সব পার হতে পারে, তা ছাড়া আমি আলাদা করে বর দিচ্ছি - অন্ডির পাখর লাউসেনের সব অনুচরকে এক সঙ্গে পার করে দেবে, তার কোন ভার লাগবে না। প্রভু নিরঞ্জনের বার্তা শুনে হনুমান অজয়ের ধারে এসে লাউসেনকে সব কথা বলে গেলেন। লাউসেন হনুমানের সব কথা শুনে আনন্দিত মনে বাজীবর অন্ডির পাখরের কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন -- সব শুনে অন্ডির পাখর আনন্দিত হয়ে বললো -

' সাজ্যা আইস দলবলে চল এই ক্ষণে।
এখুনি লইয়া যাব ঢেকুর ভুবনে ।।' (১১২৬)

অন্ডিরের কথায় সেন সকলকে রণ সাজে সাজতে বললেন - সকলে রণ সাজে

সজ্জিত হয়ে অভিরের ওপর চেপে বসতেই সে হাওয়ার মত অজয়ের ওপর দিয়ে উড়ে ঢেকুর ভুবনে সকলকে পৌঁছে দিল। সেখানে পৌঁছাতেই শাকা শুকা খুব জোড়ে জোড়ে সিঙ্গা কাড়া বাজাতে লাগল। এই সিঙ্গা কাড়ার শব্দ শুনে ইছাই সিঙ্গাদারকে ডেকে বললো - ঢেকুর গড়ে কোন বেটা এসেছে, এত যোগ্যতা কার শীঘ্র খোঁজ নিয়ে এস। সিঙ্গাদার ঢেকুরের বাইরে এসে লাউসেনকে দেখে ইছাইকে জানালো গৌড় থেকে লাউসেন এসেছে। ঘোড়ার পিঠে অজয় পার হয়েছে, কালুবীর আপনার প্রধান অনুচর লোহাটা বজ্জরকে হত্যা করেছে। এই শুনে ইছাই মূর্ছিত হবার উপক্রম।

সতের

ঢেকুরের রণ ও ইছাই বধ পালা

১. যুদ্ধের জন্য ইছাই এর শ্যামা মায়ের পূজা ঃ

সিঙ্গাদারের কাছে লোহাটা বজ্জর ও বেয়াল্লিশ কোটালের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইছাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল । মনে মনে ভাবলেন এই বিপদে শ্যামারূপা ছাড়া আর কে রক্ষা করবেন। এই বলে শামারূপার পূজার জন্য শ্যামারূপা মন্দিরে গেলেন। ইছাইএর রাজবাড়ী থেকে (অজয়ের দক্ষিণ তীরে) শ্যামারূপার মন্দির আরও দু'তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এক গভীর জঙ্গলে অবস্থিত। আজও সেখানে রয়েছে গড় জঙ্গলের শ্রীশ্রীশ্যামারূপার মন্দির, আর রয়েছেন নব প্রতিষ্ঠিত শ্বেতপাথরের দশভূজা শ্যামারূপা ভবানী। ইছাই ভবানীর মন্দিরে গিয়ে নানা দ্রব্যে পূজার আয়োজন করে একমনে শ্যামা মায়ের পূজা ও মহাবিদ্যা জপ করতে লাগলেন। ইছাই এর পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে কৈলাশ থেকে ভবানী ঢেকুরে ইছাই এর সামনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন - তুমি কেন এত স্তব করছ। কার [illegible] তোমার যুদ্ধ, ভবানীর কথা শুনে ইছাই জোড় হাত করে বললেন - ধর্মের সেবক লাউসেন এসেছে যুদ্ধ করতে,ও কাঙুর জয় করেছে। ধর্মের বরে ঘোড়ার পিঠে সাততাল অজয় উড়ে এসেছে। তাই আমার খুব ভয় হচ্ছে। ইছাই এর কথা শুনে ভবানী বললেন - যদি বিধাতা, বিষ্ণু, বরুণ, যম, তোমার বিপক্ষে আসে আমি নিজে তোমার জন্য খড়্গা ধরব।

'যুগে যুগে দেবতারা দেখেছে আমাকে।
বিপদে পড়িলেক আমা বিনে কেবা রাখে।।' (৭৪)

এই কথা বলতে বলতে ভবানীর মুখ থেকে তিনটি তীর খসে পড়ল, ঐ তীর তিনটি ইছাইকে দিয়ে বললেন -

'তিন শরে তিন বীর যাবে যম ঘরে।
লাউসেন, কালুবীর, অম্ভির পাখরে।।" (৮০)

তাই তুমি বিলম্ব না করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও।

'এত বলি দেউলে বসিলা ভগবতী।
ভনে নরসিংহ যার শাঁখারি বসতী।।' (৮৪)

২. লাউসেন ইছাই যুদ্ধ ঃ ইছাই এর মৃত্যু ঃ

ভবানীর আজ্ঞা পেয়ে ইছাই রণ সাজে সজ্জিত হয়ে সিংহনাদে ঘোর শব্দ করতে করতে লাউসেনের দিকে অগ্রসর হলেন। লাউসেন দূর থেকে ইছাই এর চাল চলন লক্ষ্য করে

ওর দিকে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হলেন। তখন কালুবীর ছুটে এসে লাউসেনের পায়ে ধরে বললো - আপনি কেন আগে যুদ্ধে যাবেন। আমি আগে গিয়ে সব বুঝে আসি, এই বলে কালুবীর ইছাই এর সামনে গিয়ে বললো - যুদ্ধ করে কি লাভ, রাজার রাজস্ব মিটিয়ে দিয়ে সুখে শান্তিতে রাজত্ব কর। এই কথা শুনে ইছাই জ্বলে উঠল--

'বলে কোন বেটা নিতে পারে ঢেকুরের কর।।' (১৪৪)
'দেবাসুর মোর আগে কথা নাহি কয়।
নীচ জাতি ডোমের অন্তরে নাহি ভয়।।'(১৫৪)

এই বলে দুজনেই দুজনের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। ইছাই ভবানীর দেওয়া বাণ কালুবীরের দিকে নিক্ষেপ করতেই কালুবীর অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লাউসেন ছুটে এসে কালুকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন - আমার জন্য তুমি প্রাণ দিলে আমি লখ্যাকে কি বলব, আমি আর ময়না ফিরে যাব না। এই বলে বিলাপ করতে লাগলেন। কালুকে কোলে করে লাউসেন এক মনে ঠাকুর নিরঞ্জনকে ডাকতে লাগলেন।

প্রভু নিরঞ্জন বৈকুণ্ঠে দেবগণের সাথে যোগ বিচার করছিলেন, লাউসেনের ডাকে চমকে উঠে বললেন -

'শুন যত দেবগণ, বিপাকে পড়্যাছে বড় রঞ্জার নন্দন।' (২৩৬)
"এত বলি সত্বর চলিলা নিরঞ্জন।
পাছু গোড়াইয়া যান যত দেবগণ।।" (২৪০)

দূরে রথ রেখে পদব্রজে অজয়ের ধারে ঢেকুরে সেনের কাছে ঠাকুর নিরঞ্জন উপস্থিত হলেন। ঠাকুরকে দেখে লাউসেন তার চরণ ধরে ধূলায় লুটিয়ে পড়লেন।

'শোকাকুলা সেনকে দেখিয়া নিরঞ্জন
বলিতে লাগিলা প্রভু মধুর বচন।।'

'চিন্তা না করিহ বাছা নাহি কিছু ডর।
তোর পক্ষালব আমি ত্রিদশ ঈশ্বর ।।
হের দেখ মোর সাথে দেবতা সমাজ।
তোর কার্য্য সাধিতে আন্যাছি মহারাজ।।
(২৪৮)

লাউসেন ঠাকুর নিরঞ্জনের এই কথা শুনে -

"সম্মুখে করেন স্তব হয়্যা যোড় হাথ।
অব্যয় অনন্তরূপ তুমি জগন্নাথ।।
লক্ষ্মীর বল্লভ তুমি নিত্য নিরঞ্জন।
বেদবিদ্যা বিশ্বরূপে ব্রহ্ম সনাতন।।' ২৮০
কংশ নিসুদনা তুমি কূর্ম্ম অবতার।' ২৫৫
'রাম রূপে রণে কৈলে রাবণ নিপাত।।
ক্ষীন দাসে ক্ষেমা কর‍্যা শত্রু কর ক্ষয়।
ঢেকুর মহিমে প্রভু কর‍্যা দেও জয়।।' ২৮৬

লাউসেনের স্তব শুনে খল খল করে হেসে মাধব বললেন - তুমি আর কি চাও বল। তুমি চাইলে তোমাকে ইন্দ্রের উপর রাজা করে দিতে পারি। প্রভু নিরঞ্জনের এই কথা শুনে লাউসেন জানালেন - আমি ইন্দ্রের উপর রাজা হতে চাই না, আমি প্রার্থনা করছি, কালুবীরের

জীবন ফিরিয়ে দিন, আর এই রণে যেন আমার জয় লাভ হয়। সেনের এই প্রার্থনা শুনে প্রভু মায়াধর তুষ্ট হয়ে কালুবীরের উপর পুষ্প জল ছিটিয়ে দিলেন। কালুবীর জীবন ফিরে পেয়ে সিংহনাদ করে উঠল। সেই শব্দে ঢেকুর যেন কেঁপে উঠল।

ইছাই রেগে কম্পমান হয়ে পুনরায় রণসাজে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, লাউসেনকে দেখে রণহুঙ্কার দিয়ে যুদ্ধে আহ্বান করলেন । লাউসেন ধীর কণ্ঠে বললেন - ইছাই, রাজ কর দিয়ে সুখে শান্তিতে আনন্দে থাক, শুধু শুধু অশান্তির দরকার কি । কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী, রেগে লাউসেনকে বললেন -

'তুমি কোন তুচ্ছ আর রাজা গৌড়েশ্বর ।
এ মুখে আস্যাছ নিতে ঢেকুরের কর ।।' (৩৩২)

ইছাইএর কথা শুনে লাউসেন বললেন - তুমি ধনমদে মত্ত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছো । এই বলে দুজনেই ধনুকে টঙ্কার দিল। দুজনার তীরে তীরে আকাশ ছেয়ে গেল । লাউসেনকে কোন রকমেই জব্দ করা যাচ্ছে না দেখে ইছাই এর মনে পড়ে গেল ভবানীর দেওয়া বাণ, একসঙ্গে দুটো বাণ ধনুকে জুড়লো, একটা লাউসেন বধের আর একটা অভির পাখর বধের ।

দেবী অভয়ার দেওয়া শর নিক্ষেপের জন্য ইছাই প্রস্তুত হতেই দেবলোকে দেবতারা হাহাকার করে উঠলেন । ঠাকুর নিরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, হনুমানকে বললেন -

'দিয়েছেন ইছায়ে অভয়া দেবী শর ।
ব্যর্থ নাহি হয় কভু দেবীর আতর ।। ' (৩৯৪)

তখন তিনি হনুমানের কানে কানে বললেন - তুমি শীঘ্র করে লাউসেনের কাছে গিয়ে কানে কানে বলবে - ইছাই অভয়ার দেওয়া বাণ তোমার দিকে নিক্ষেপ করতে চলেছে, এই বাণ ব্যর্থ হবার নয় কিন্তু তোমাকে অভয়া যে খড়্গ দিয়েছেন সেই খড়্গ তুমি সামনে ধরবে । তখন দেবীরই দুই অস্ত্র মিলেমিশে যাবে, লাউসেনের কোন ক্ষতি হবে না ।

হনুমান তড়িৎ গতিতে এসে লাউসেনকে প্রভু নিরঞ্জনের উপদেশ দিয়ে গেলেন । এদিকে আকাশ আলো করে দেবীর জোড়া শর ছুটে আসছে দেখে লাউসেন দেবীর দেওয়া খড়্গ সামনে ধরলেন - দেবীর দেওয়া দুই অস্ত্র একে অপরের সঙ্গে মিশে গেল ।

'দেবী দত্ত দুই অস্ত্র দুই সমতুল।
খড়্গাতে লাগিল বাণ যেন চাপা ফুল।।' (৪১০)

লাউসেন অক্ষত রয়ে গেলেন। ইছাই বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন কি করে এরকম সম্ভব হল। ক্ষণিকের, মধ্যেই ইছাই তীর ধনুক রেখে খড়্গ নিয়ে ছুটে এল । আবার দুই বীরের মহারণ আরম্ভ হতেই দেবতারা অন্তরীক্ষ থেকে দেখতে থাকেন - কি হয় কি হয় । দুজনার

"খড়গে খড়গে লাগ্যা অগ্নি উঠে দুর দুর ।" লাউসেন রেগে কাঁপতে কাঁপতে একটু দাঁও পেতেই দেবীর দেওয়া খড়্গ দিয়ে ইছাই এর কাঁধে চোট হানেন । আর তাতেই ইছাই এর মুন্ড মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যায় । আর কাটা মুন্ড 'ভবানী মাগো' বলে ঘন ঘন ডেকে বলে "রণে হই নিধন আপনে দেখে যা ।" দেউলে বসে দেবী ইছাই-এর ডাক শুনে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে ইছাই নিহত হয়েছে দেখে চিন্তিত হয়ে -

'মুন্ড হাতে অভয়া বলেন হায় হায় । ভকতের ভক্তি ভাবে ভবানী সরস ।।
ইছাই সোনার তনু ধুলায় লোটায় । মুন্ডে মহাবিদ্যা জপ কৈল বার দশ ।।' ৪৭৪

এরপর ভবানী ইছাই এর কাঁধে তার মুন্ড স্থাপন করতেই ইছাই প্রাণ ফিরে পেল। এবং সাক্ষাৎ শঙ্করীকে দেখে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ভবানীর স্তব করতে লাগল ।

'স্তব পাঠ সন্মুখে সম্পুট হয়্যা পানি । শক্তিরূপা সনাতনী তুমি সর্বভূতে ।।
জয় জয় (জয়) দুর্গা ভৈরবী ভবানী ।। নমো নমো নিত্য নারায়ণী নমস্তুতে ।।' ৪৮২

এই ভাবে ইছাই দেবী ভবানীর স্তব করতে লাগল । ইছাই এর স্তবে দেবী বললেন - 'তোর ভক্তিভাবে বাছা হয়্যাছি অধীন ।' বর চেয়ে নাও । ইছাই তখন জোড়হাত করে মা ভবানীকে বললেন - শত্রুপক্ষ যদি আমার মুন্ড কেটে দেয় তোমার কৃপায় যেন ঐ মুন্ড বার বার জোড়া লেগে যায় । দেবী ইছাইকে বর দিয়ে বললেন - তোমাকে বর দিলাম - "কাটা মুন্ড বার বার লাগিবেক স্কন্দের উপর " এই বলে দেবী দেউলে গিয়ে বসলেন ।

দেবীর বরে ইছাই প্রাণ ফিরে সিংহনাদে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হল, লাউসেন ইছাই দুই বীরে পুনরায় যুদ্ধ বেধে গেল, কখনও শরবৃষ্টি, কখনও গদাযুদ্ধ, কখনও খড়্গ ঠন ঠনানি। এমনি খড়্গ যুদ্ধে দেবী ভবানীর দেওয়া খড়্গে পুনরায় ইছাইকে আঘাত করলেন, ইছাই এর মুন্ড মাটিতে গড়াগড়ি যেতেই মুন্ড শ্যামারূপা বলে ডাক দিতে থাকে, আর ঐ মুন্ড ইছাই এর কাঁধের উপর জোড়া লেগে গেল। ইছাই পুনরায় যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল, এই ভাবে লাউসেন যত বার ইছাই এর মুন্ড কাটে তত বারই অভয়ার বরে মুন্ড নাম জপ করতে করতে জোড়া লেগে যায়। এই দেখে ঠাকুর নিরঞ্জন দেবতাগণকে বললেন দেবী ইছাইকে বর দিয়েছেন, এর অন্যথা তো হবে না। মনে হয় ঢেকুর জয় হল না। ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন কি করা যায়। তখন দেব সভা ভেবে চিন্তে বললেন দেবী শ্যামারূপা গড়ে থাকলে রণ জয় সম্ভব নয়, কিন্তু দেবীকে যদি কোন ভাবে কৈলাসে পাঠিয়ে দেওয়া যায় সে ক্ষেত্রে ইছাই বধ ও রণ জয় সম্ভব। সবাই ঠিক করলেন প্রজাপ্রতি ব্রহ্মাকে ঢেকুরে শ্যামারূপার কাছে পাঠিয়ে দিলে ভাসুর ব্রহ্মাকে দেখে দেবী কৈলাস চলে যাবেন। সেই মত ব্রহ্মা এক হাতে কমন্ডুলু, আর এক হাতে জপমালা নিয়ে ঢেকুরে শ্যামারূপার সামনে যেতেই , শ্যামারূপা মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, পথে গিয়ে মনে পড়ে গেছে, ইছাই একলা আছে । আরও ভাবলেন এটা হয়ত দেবতা সমাজের চক্রান্ত তাই

আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য ব্রহ্মাকে পাঠিয়েছেন, নচেৎ ব্রহ্মা শুধু শুধু এখানে আসবেন কেন, এই ভেবে দেবী কাঁপতে কাঁপতে চামুন্ডা রূপে আবার ঢেকুরে ফিরে এলেন -

'কোপে কম্পা ঠাকুরানী পদ্মারে বলেন বাণী
ব্রহ্মার করিব রক্ত পান।
ইন্দ্রের কাটিব মাথা কি করিতে পারে ধাতা
বরুণের বধিব পরাণ।।' (৬৪৪)

দেবী ভবানীর এই রণচন্ডী মূর্তি দেখে ব্রহ্মা ঢেকুর ছেড়ে বৈকুণ্ঠে পালিয়ে গিয়ে দেব সভায় বললেন - তোমাদের জন্য আমার এই অপমান, আর আমি যাব না।

পুনরায় লাউসেন ইছাই যুদ্ধ বেধে গেল। লাউসেন যত বার ইছাই এর মস্তক ছেদন করে দেবীর বরে সেই মুন্ড আবার জোড়া লেগে যায়। এই দেখে ব্রহ্মা বললেন - ইছাই এর মুন্ড যদি মর্ত্তে থাকে তাহলে দেবী ভবানী আবার তাকে জিয়িয়ে দেবেন, তাই এই মুন্ড মাটিতে পড়বার আগেই পাতালে বাসুকীর মুখের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। বাসুকী মুন্ড ভক্ষণ করে নিলে ইছাই আর বাঁচবে না। ব্রহ্মার কথায় প্রভু নিরঞ্জন পুনরায় হনুমানকে ঢেকুর রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন - ইছাই এর মুন্ড কাটা গেলে তুমি অন্তরীক্ষে ঐ মুন্ড ধরে নিয়ে পাতালে বাসুকীর মুখে ফেলে দিয়ে আসবে। নিরঞ্জনের নির্দেশ মত হনুমান ঢেকুর যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে অন্তরীক্ষে রইলেন - লাউসেন ইছাই এর মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বাঁধলে ভবানীর খড়্গ দিয়ে লাউসেন ইছাই এর মুন্ড কেটে ফেললেন - হনুমান সেই মুন্ড লুফে নিয়ে পাতালে গিয়ে বাসুকীর মুখের মধ্যে ফেলে দিল, তখনও মুন্ড ভবানী ভবানী বলে ডাকছে, কিন্তু বাসুকী একটু একটু করে সেই মুন্ড গিলে ফেললো।

এদিকে ইছাই এর ডাকে শ্যামারূপা ভবানী রণস্থলে এসে ইছাই এর কাটা মুন্ড দেখতে না পেয়ে ধ্যানে বসে দেখলেন ঐ মুন্ড পাতালে নিক্ষেপ করা হয়েছে, ভবানী পাতালে গিয়ে বাসুকীকে ইছাই এর মুন্ড পেট থেকে উগরে দিতে বললেন অন্যথায় সব সাপকে পুড়িয়ে মারবার হুমকিও দিলেন। বাসুকী ভয়ে পেট থেকে ইছাই এর মুন্ড উগরে দিল, - আর ভবানী সেই মুন্ড নিয়ে এসে ইছাই এর মাথায় বসিয়ে দিলেন। ইছাই পুনরায় জীবিত হয়ে উঠল। এই দেখে প্রভু নিরঞ্জন ও দেব সমাজ ঠিক করলেন - দেবীকে যে কোন ভাবে কৈলাশে পাঠাতে না পারলে ইছাইকে পরাজিত করা যাবে না। আর ধর্মপূজাও প্রচারিত হবে না। তাই প্রভু করতার নারদকে ঢেকুরে পাঠিয়ে বললেন - তুমি দেবীর সামনে গিয়ে এমন কটু বাক্য বলবে, যাতেতিনি তোমার পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে কৈলাসে চলে আসেন। তাহলেই লাউসেন ইছাই কে পরাজিত করে ঢেকুর জয় করবে, আর সেখানে ধর্মের পূজা প্রবর্তন হবে। ব্রহ্মার যুক্তি অনুযায়ী প্রভু নিরঞ্জন নারদকে ঢেকুর পাঠিয়ে দিলেন - নারদ ঢেকুরে গিয়ে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখতে লাগলেন - শ্যামারূপা ভবানী কি করেন - দেখলেন ভক্ত ইছাই এর বার বার মুন্ড ছেদন দেখে ভবানী বলছেন -

'আজ রণে রক্ত পান করিব সেনের।'

সেই সময় নারদ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ভবানীর সামনে জোড় হাত করে বললেন - মাসি লাউসেনের রক্ততো পাতলা হবে, তার চেয়ে তোমার সামনে গোয়ালা ইছাই রয়েছে ওর খাঁটি দুধ খাওয়া রক্ত খুব মিষ্টি হবে, ওর 'ঘাড় ভাঙ্গা খাও।' নারদের এই কথা শুনে ভবানী রেগে আগুন হয়ে বললেন -

'এহাকে বধিলে ঘুচে আমার জঞ্জাল।
যেখানে সেখানে বেটা আস্যা হয় কাল।।
এত বলি শ্যামারূপা হাতে নিল অসি।
পালাল প্রাণের ভয়ে নারদ তপসি ।।' (৮৭০)

এদিকে গোপনে ঠাকুর নিরঞ্জন হনুমানকে বললেন - তুমি শীঘ্র ঢেকুরে গিয়ে সেনের কানে কানে বলগে - শ্যামারূপা ঢেকুর ছেড়ে কৈলাসে চলে এসেছেন, এই সুযোগে ইছাই নিধন করতে হবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে - দেবীর বরে ইছাই এর মাথা আবার জোড়া লাগবে আর ইছাই আবার বেঁচে উঠবে। তাই এবার যখন লাউসেন মস্তক ছেদন করবে, তখন সেই মুন্ড সঙ্গে সঙ্গে গোলকে গোবিন্দের কাছে নিয়ে আসবে, কারণ -

'এক ভাবে গোয়ালা পূজ্যাছে ভগবতী।
ইছাএর উত্তম করিতে চায় গতি ।।
বিষ্ণু ভক্তি প্রদায়িনী হন মহামায়া।
অতএব ইছাএ দিতে চাই পদছায়া।।' (৯৩৮)

এই বলে হনুমানকে ঢেকুর যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন - রণক্ষেত্রে দুই বীরের নিদারুন যুদ্ধ চলছে, লাউসেনের অশেষ রণ কৌশলের প্রভাবে পুনরায় ইছাই এর মুন্ড কাটা গেল, মাটিতে পড়ার আগেই সেই মুন্ড লুফে নিয়ে হনুমান আকাশ পথে গোলকে গিয়ে গোবিন্দের পায়ের সামনে রেখে দিল। সবাই সাধু সাধু বলে ইছাই এর ভবানী সাধনার প্রশংসা করতে লাগলেন, বললেন -

'সার্থক সেবিয়া ছিলে ভবানী চরণ।
পরিণামে চতুর্ভুজ পাল্য নারায়ণ।। (৯৮০)

ইছাই মুক্ত হল আর লাউসেনের সমর বিজয় হল। সবাই লাউসেনের জয় জয়কার দিলেন। কালুসিং বীর ঘন ঘন সিঙ্গা বাজাতে থাকেন। সেই শব্দ শুনে কৈলাসেতে শ্যামারূপা চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ঢেকুর রণক্ষেত্রে এসে দেখলেন ইছাই বীর নিহত হয়েছেন।

'সেবকের সন্তাপে কান্দেন ভগবতী।
ভনে নরসিংহ যার শাঁখারি বসতি ।।' (৯৯০)

শ্যামারূপা ইছাই এর মুন্ডহীন দেহ কোলে তুলে কাঁদতে থাকেন আর আপশোস করতে থাকেন - নারদের কপট চাতুরী না বুঝতে পেরে কৈলাসে চলে গিয়েই এই সর্বনাশ হল। যদি ইছাই এর কাটা মুন্ড পেতাম তাহলে আবার ইছাই কে জিইয়ে দিতাম। এই বলে দেবী শ্যামারূপা ভবানী ইছাই এর দেহ কোলে ক'রে দেউলে পূজা করা ফুলের উপর শুইয়ে কপাট

বন্ধ করে দিয়ে ইছাই এর মুন্ড খুঁজতে চলে গেলেন। অনেক খোঁজা খুঁজি করেও মুন্ড না পেয়ে শোকাকুলা হয়ে ঢেকুরে ফিরে এলেন।

সহচরী পদ্মাকে নিয়ে ঢেকুরে ফিরে একটা গাছের তলায় লাউসেনকে দেখে ক্রোধে তাঁকে কাটতে গেলেন। লাউসেন দুহাতে দেবীর পা জড়িয়ে বললেন - মা আপনি ময়নার আখড়ায় নিজের হাতের খড়্গ আমাকে দিয়েছিলেন, আমাকে যদি হত্যা করতে চান আপনার নিজের এই খড়্গ দিয়ে আমাকে হত্যা করুন, লাউসেনের হাতে দেবী তার নিজের খড়্গ দেখে সব মনে পড়ে গেল। লাউসেনকে দেবী বললেন - তুমি আগে তোমার পরিচয় দাও নাই কেন, তুমি কানড়ার স্বামী অর্থাৎ আমার জামাই, তুমি এসব কথা আগে বল নাই কেন? এখন কি নিদারুন ঘটনা ঘটে যেত পারত। তখন পদ্মাবতী পূর্বের সব কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন -

"পদ্মাবতী পূর্বকথা করাল্য শরণ।
সেন জন্মে ধর্মপূজা প্রকাশ কারণ।।
এসব চরিত্র লীলা সকলি তোমার।
ইছাই হইতে বাড়া রঞ্জার কুমার।।" (১০৫৮)

পদ্মাবতী আরও বললেন - তুমি ইছাই এর জন্য আর শোক ক'রো না, তোমার সেবা করে ইছাই স্বর্গে গমন করেছে, চতুবর্গ লাভ করেছে। এর চেয়ে বড় কি আছে। পদ্মার কথায় দেবী শোক সম্বরণ করে লাউসেনকে আশীর্ব্বাদ করে ঢেকুর ছেড়ে কৈলাসে চলে গেলেন।

'পদ্মার বচনে শোক সম্বরিল জয়া।
লাউসেন রাজাকে বিস্তর করিল দয়া।।
আশীর্ব্বাদ অনেক করিয়া ভগবতী ।
অবিলম্বে চল্যা গেলা কৈলাস বসতি।।' (১০৭০)

আর প্রভু মায়াধরও বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন, সেই সঙ্গে দেব সভাও ভঙ্গ হল। দেবতারাও নিজ নিজ ঘরে চলে গেলেন।

ঢেকুর জয়ের পর লাউসেন ধর্মরাজের পদযুগল বন্দনা করে সোম ঘোষকে ডেকে পাঠালেন। সোম ঘোষও অতি বিনীত ভাবে লাউসেনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। লাউসেন সোম ঘোষকে স্বান্তনা দিয়ে বললেন - শোক তাপ করবেন না , সবই দৈব। আপনি হিসাব করে রাজকর মিটিয়ে দিয়ে শান্তিতে রাজত্ব করুন। লাউসেন হিসাব করে সোম ঘোষের কাছ থেকে নয় লক্ষ টাকা রাজস্ব, আর পঞ্চাশ মোহর সেলামী নিয়ে গৌড় যাত্রা করলেন। সঙ্গে সোম ঘোষও চললেন। গৌড়েশ্বর ঢেকুর জয়ের জন্য লাউসেনকে আলিঙ্গন করে নানা ধন রত্ন সম্মান করলেন। অবশ্য সোম ঘোষকে দেখে রাজা প্রথমে খুব রেগে গিয়ে ছিলেন, কিন্তু লাউসেন বললেন এঁরতো কিছু দোষ ছিল না, এঁকে ক্ষমা করে দিন। সেনের কথায় রাজা সোম ঘোষকে ক্ষমা করে দিলেন কিন্তু ঢেকুর জয়ে মহামদের মাথায় যেন বাজ পড়ল। লাউসেন গৌড় হতে বিদায় নিয়ে ময়না চলে গেলেন। ঢেকুর জয় করে পুত্র ঘরে আসতেই কর্ণসেন রঞ্জাবতী আনন্দে আটখানা। রাণীরাও খুব খুশি।

আঠারো

অঘোর বাদল পালা

ঢেকুর জয় ও ইছাই বধের পর গৌড়েশ্বর আজ বিশেষ দরবার দিয়েছেন। দরবারে যেমন সিফাই, সামন্ত, খানসানা,পাত্রমিত্র, বারভূঞা, দাসদাসি, তীরন্দাজ, বন্দুকী, পন্ডিত, কবি, খাজাঞ্চি, নট নটী, সব রয়েছে তার সঙ্গে আজকের বিশেষ দরবারে উপস্থিত রয়েছে ছেলে, নাতি, ভাই, ভইপো, ভাগ্না, খুড়ো, জেঠা, মামা প্রভৃতি আত্মীয়গণ। কেউ গান করছেন, নটীরা নাচছে, পণ্ডিতেরা দান ধ্যানের পুণ্য ফলের বর্ণনা দিচ্ছেন, বলছেন -

'তিন মাস বছরের মকর তুলা মেষ।
ইথে দান ধ্যান কৈলে নাঞি পুণ্য শেষ।।' (২৮)

রাজা গৌড়েশ্বর দান ধ্যানেও কর্ণের মত বিখ্যাত। আর এক দিকে রাজসভায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে । মহারাজ গৌড়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিহার লীলা শুনছেন। কিন্তু মহাপাত্রের কোন দিকে মন নাই, ওর একটাই চিন্তা - বেটা লাউসেন সর্বত্র জয় করে আসছে, কি ক'রে ওকে ধ্বংস করা যায়, আর রঞ্জাকে আটকুড়ি করা যায়। মনে মনে ভাবলো - ধর্মের পূজা করে রঞ্জার বেটা সর্বত্র জয় করছে। তাই ভাবল রাজাকে দিয়ে ধর্মপূজার ব্যবস্থা করে বাঁ হাতে লাউসেনের নামে পূজা দেব, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

পাত্র মনে মনে এই পরামর্শ করে রাজাকে বললেন - মহারাজ শুধু দান ধ্যান করলেই হবে না, ধর্ম পূজা করতে হবে। ধর্মপূজা করেই রঞ্জার ছেলে সর্বত্র জয় করে আসছে। পাত্রের যুক্তি রাজার মনে লাগল, বললেন - ভান্ডার থেকে দশ লক্ষ টাকা নিয়ে ধর্মের মন্দির নির্মান কর। পাত্র বলে এত টাকার কোন প্রযোজন নাই । লোকদের সব বেগার দিতে হবে। এই বলে পাত্র জোর করে লোকজনদের বেগার খাটিয়ে মন্দির তৈরীর ব্যবস্থা করল।

মন্দির তৈরী হয়ে গেলে পাত্র রাজাকে বললো - মহারাজ ভাল পন্ডিত দিয়ে পূজা করাতে হবে। মহারাজ রামাই পন্ডিতকে আনালেন ধর্মপূজা করার জন্য। পন্ডিত মশাই পূজার আয়োজনের ফর্দ করে দিলেন। আরও জানালেন -

'গাজন করহ মহারাজা এক ভাবে।
ধর্মের কৃপায় তুমি চর্তুবর্গ পাবে।।'

ভূপতি ভক্তি ভাবে ধর্মপূজার আয়োজন করলেন। বেদীর উপর ধর্মের পাদুকা স্থাপন করে, সেখানে ঘট স্থাপনের পর গণেশাদি পঞ্চ দেবতার অর্চনা করে পন্ডিত মশাই পুজা আরম্ভ করলেন। তার আগে লক্ষ্মী স্থাপন করলেন। সভাপন্ডিত এবং গাজনের সন্ন্যাসীদের বরণ করে 'গৌড়েশ্বর ভূপতি পূজেন জগদীশ'। শাঁখ, ঘন্টা, বাজনা, বাদ্য বাজিয়ে ধর্মের গাজন বাজারে বাজারে ঘুরে আবার মন্দিরে ফিরে এল। রাজা এক ভাবে ধর্মের পূজা করতে থাকেন কিন্তু পাত্র বাঁ হাতে করে ফুল দিয়ে বলেন - লাউসেনকে নির্মুল কর বাবা, তিন দিনে লাউসেন যেন মারা যায়, তাহলে তার বড় বেটাকে দাদুর ঘাটে বলি দেবো।

এদিকে বৈকুণ্ঠে ধর্মরাজ মহাসুখেই ছিলেন, হঠাৎ তাঁর বাম অঙ্গ জ্বলে পুড়ে যেতে লাগলো - ঠাকুর নিরঞ্জন হনুমানকে বললেন - কি ব্যাপার বল তো আমার বাম অঙ্গ এভাবে

পুড়ে যাচ্ছে কেন ? তুমি গুণে দেখ কি হয়েছে। হনুমান গুণে গেথে জোড় হাতে ঠাকুর নিরঞ্জনকে জানাল -

'তব পূজা করিছে ভূপতি গৌড়েশ্বর ।
এক ভাবে পূজে রাজা চরণ কমল।।
দু মন করিয়া পূজে পাত্র বেটা খল।
তার মনে লাউসেন হউক নিধন ।।'(২৮৮)

তখন ঠাকুর নিরঞ্জন ওখানে যেতে চাইলেন, কিন্তু হনুমান বললো -

'এক ঠাঞি পূজায় হয়্যাছে দুই ভাব।
দেখিতে এমন পূজা কি বা আছে লাভ।। ' ২৯৮

এবং আরও জানালো - গৌড়দেশে অঘোর ঝড় বাদলের ব্যবস্থা করুন, যদি অঘোর বাদলে ভক্তি ভাব বজায় থাকে তখন যাবেন। হনুমানের কথা শুনে ঠাকুর নিরঞ্জন ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন - গৌড়ের রাজা একভাবে আমার পূজা করছে, কিন্তু ঐ মন্দিরে পাত্র বেটা কপট চাতুরী করে বাঁ হাতে আমার পুজা করছে। তুমি সেখানে অঘোর ঝড় বৃষ্টির ব্যবস্থা কর। প্রভু নিরঞ্জনের নির্দেশে ইন্দ্র সেখানে প্রবল ঝড় বৃষ্টির ব্যবস্থা করে দিলন। ঈশান কোণে মেঘ জমা হয়ে বজ্র বিদ্যুৎ সহ প্রবল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হল। গাছ পালা ঘর বাড়ি সব ভেঙ্গে পড়ছে । চারিদিকে লোক জনের ছোটাছুটি , অনেকে দালান ঘরের উপর তলায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। সাত দিন ধরে এই বৃষ্টির বিরাম নেই। এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে পাত্র রাজাকে বললো - ধর্মপূজা করেই এই সর্বনাশ হল, আপনি পূজা বন্ধ করে দিন, রাজা সাধারণ ভাবে দুর্বল চরিত্রের মানুষ - নিজের উপর বিশ্বাস বা ভরসা খুব একটা নাই। পাত্রের কথা শুনে তিনি পূজা বন্ধ করে দিলেন। পন্ডিত মশাই ঘট বিসর্জন করে ঘর গেলেন। ধর্মপূজা অসমাপ্ত হয়ে রইল।

কিন্তু ঝড়, বৃষ্টি, বাদল বন্ধ হয় না। লোক জনের দুর্গতির শেষ নেই । রাজা পাত্র যুক্তি করে - ''কি কায্য করিলে ঘুচিবে অঘোর বাদল।' রাজা ইন্দ্রজাল কোটালকে ডেকে বললেন - ময়না থেকে লাউসেনকে নিয়ে এস , সেই পারবে ধর্মের আশীর্ব্বাদে বাদল ঘুচাতে। মহারাজের কথায় ইন্দ্রজাল ময়না গিয়ে লাউসেন কর্পূরকে সব কথা জানাল। লাউসেন কর্পূর তখন সবে দরবারে বসেছেন। ইন্দ্রজালের কথা শুনে মা বাবার কাছে বিদায় নিয়ে দুভাই গৌড়ে চলে এলেন। গৌড়ে পৌঁছে রাজা আর মাতুলকে প্রণাম করে জোড় হাতে দাঁড়ালেন। রাজা তাকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন - এই মহাবাদল থেকে তুমি বাঁচাও। পাত্র বাদলে ভীষণ কাতর হয়েছে তাই জোড় হাত করে সেনকে বললো - 'ভাগিনা বাঁচাও প্রাণ ঘুঁচাও বাদল।'' দুই ভাই সব শুনে গাজন ঘরে গিয়ে ভক্তি ভাবে নিরঞ্জনের পূজা করলেন। ধর্মের আজ্ঞায় ইন্দ্র মেঘেদের চলে যেতে বললেন - বাদল থেমে গেল, সূর্যের উদয় হল। গৌড়দেশে লাউসেনের জয় জয়কার উঠল। সকলে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। রাজা অনেক ধন রত্ন দিয়ে লাউসেনকে আশীর্ব্বাদ করলেন। সেই দেখে পাত্র বলে — এত আদরের কি আছে, ঝড়, বৃষ্টি নিয়মেই থেমেছে। মঙ্গলের বাদল মঙ্গলে ভাঙ্গা যায় -

'ভাগিনা কি কাজ কৈল্য ধন দেহ তায়'।। ৪৮৬

— অবশ্য এক্ষেত্রে রাজা পাত্রের কথা না শুনেই লাউসেন ও কর্পূরকে অনেক উপহার দিলেন, আর কিছু দিন তাদের গৌড়ে থেকে যেতে বললেন। দুই ভাই দিন কতক গৌড়ে থেকে গেলেন।

উনিশ
পশ্চিমে রবির উদয় পালা

১. অসমাপ্ত ধর্মপূজার জন্য গৌড়ের অমঙ্গল ঃ

ধর্মের পূজা অসমাপ্ত হওয়ায় এবং পাত্র বাঁ হাত দিয়ে ধর্মরাজকে পূজা দেওয়ার ফলে গৌড়ে নেমে এল অমঙ্গলের নিনাদ, চারদিকে মড়ক লাগল, প্রজারা গৌড় ছেড়ে পালাতে লাগল, গৌড়েশ্বর পাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন - কোন পাপে গৌড়ের এই দশা হল, পাত্র আসল কথা না বলে ভাবতে লাগলো - 'ভাগিনাকে কি কর‍্যা পাঠাই যম ঘর।' বেটা সব কাজে জয় করে আসছে, এবার পশ্চিমে উদয় দিতে পাঠাবো। আর -

'পশ্চিমে উদয় রবি কভু না হইবে।
এবার সেনের বেটা সেখানে মরিবে।।' (৫১২)

এই কথা মনে ভেবে জোড় হাতে ভূপতিকে বললেন - মহারাজ কোন দান ধ্যান করে এই পাপ মোচন করা যাবে না, তবে একটা উপায় আছে, যদি আপনি পশ্চিমে রবির উদয় দেখেন তাহলে এই পাপ হতে অব্যাহতি পাবেন। রাজা বললেন - পশ্চিমে রবির উদয় কোন কালে শুনি নাই, কার সাধ্য এই কাজ করে। তখন পাত্র বললেন - লাউসেন সর্বকালে দিবাকরের সেবা করে, এক মাত্র সেই পশ্চিমে রবির উদয় দিতে পারে, তাই লাউসেনকে আজ্ঞা করুন, লাউসেন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, মহারাজ লাউসেনের হাত ধরে বললেন - বাপধন তুমি অনেক কাজ করেছ, এবার পশ্চিমে রবির উদয় ঘটিয়ে আমাকে পাপ মুক্ত কর। মহারাজের এই কথা শুনে লাউসেন জোড় হাত করে বল্লেন - মহারাজ পশ্চিমে রবির উদয় কেউ কখনও শোনে নাই, এই অসম্ভব কাজ আমি কি ভাবে করব। ভাগ্নার কথা শুনে পাত্র রেগে গিয়ে বললো - বেটা খুব সেয়ানা হয়েছে, বড়াই করে বলে যে সে অঘোর বাদল বন্ধ করেছে, আর রাজাকে ভুলিয়ে নানা ধন লুটে নিয়েছে, আর আসল কাজের বেলায় নাই। পাত্রের এই কথা শুনে লাউসেন মাথা হেঁট করে রইলেন। গৌড়রাজ লাউসেনের হাতে ধরে বললেন - এই বার এই কাজটি তুমি ক'রে দাও, আমাকে পাপ মুক্ত কর। রাজার কথা শুনে লাউসেন বললেন - পশ্চিমে উদয় দিতে হলে কোথায় কি ভাবে যেতে হবে সে কথা মাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে, আমি কিছুই জানি না, লাউসেনের কথায় গৌড়েশ্বর তাকে ময়না গিয়ে মায়ের কাছ থেকে সব কথা জেনে আসতে বললেন। এই কথা শুনে পাত্রের মাথায় যেন বাজ পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে গিয়ে বললেন - পাগল হয়েছেন মহারাজ, ওকে ছেড়ে দিলে ও আর আসবে না, ওকে ময়না না পাঠিয়ে ওর মা বাবাকে এখানে তুণ বন্দী করে রাখুন। যত দিন না ও পশ্চিমে উদয় ঘটাবে তত দিন ওর বাবা মা এখানে বন্দী থাকবে।

পাত্রের কথায় গৌড়েশ্বর লাউসেনকে বললেন - যদি তুমি ময়না যেতে চাও যেতে পার কিন্তু তোমার মা বাবাকে তুণ বন্দী করে রাখবে। এই কথা বলতে না বলতেই পাত্র কোটালকে বললো - লাউসেনকে বন্দীশালে নজর বন্দী করে রাখ, আর গোপনে ইন্দ্রজাল

কোটালকে বললো - ওকে এমন ভাবে বাঁধবে যাতে ও যম ঘরে যায়। লাউসেন মারা গেলে তোমাকে প্রচুর ধনরত্ন দেবো,আর ময়নার জায়গীদার করে দেব। ইন্দ্র কোটাল এই সব পাবার আশায় বন্দীশালে লাউসেনকে হাতে পায়ে গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে বুকে পাথর চাপিয়ে রেখে দিল। লাউসেন একটুকু নড়াচড়া করতে গেলেই তাঁর হাতের মাংস ছিঁড়ে যাচ্ছে। লাউসেন যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে, তাই দেখে কর্পূরও কেঁদে অচেতন। তখন লাউসেন কর্পূরকে বললেন - তুমি ময়না গিয়ে মা বাবাকে খবর দাও, আর সব কথা বলবে, কর্পূর রাত দিন চলে ময়নায় হাজির হয়ে মা বাবাকে বললো - গৌড়েশ্বর দাদাকে পশ্চিমে উদয় দিতে বলেছেন, এখন দাদাকে বেঁধে বন্দীশালে রেখেছে। আর আপনাদের তুণবন্দী করে রাখলে দাদকে ছেড়ে দেবে পশ্চিমে উদয় দেবার জন্যে। পুত্র বন্দী শুনে রাজা কর্ণসেন ও রাণী রঞ্জাবতী কাঁদতে কাঁদতে কর্পূরকে বললেন - আমাদের গৌড়ে নিয়ে চল, আমরা এক্ষুণি যাব। লাউসেন বন্দী শুনে কালুবীর, শাকা শুকা, লখ্যা আর ময়নার যত সব লোক কেঁদে আকুল। যাই হোক, কর্ণসেন রঞ্জাবতী কর্পূরকে নিয়ে রাতারাতি গৌড়ে পৌঁছালেন। সেখানে গিয়েই বন্দীশালে ছেলের সঙ্গে দেখা করলেন, দেখা হতেই সবাই কেঁদে আকুল। এদিকে পাত্র কর্ণসেনদের আসার সংবাদ পেয়ে পোতা মাঝিকে হুকুম দিল - কর্ণসেনকে তুণ বন্দী করে রাখ, আর লাউসেনের বাঁধন খুলে দাও। আর ওর কাছ থেকে লিখিয়ে নাও যে ও পশ্চিমে রবির উদয় করাবে। এই শুনে পোতা মাঝি বন্দীশালে গিয়ে লাউসেনের বাঁধন খুলে সেই চেন শিকল দিয়েই কর্ণসেনকে বেড়ি দিয়ে রাখল

লাউসেন মায়ের কাছে গিয়ে বললেন - মা কোথায় গিয়ে ধর্মরাজের পূজা করলে পশ্চিমে রবির উদয় বর পাব সে কথা আমাকে বল। লাউসেনের কথা শুনে রাণী রঞ্জাবতী বললেন - সামুল্যাকে সঙ্গে নিয়ে হাকন্ড ভুবনে যাবে, সামুল্যা ধর্মরাজের পূজার ব্যাপারে সব কিছু জানে। তুমি তার উপদেশ মত সব কিছু ব্যবস্থা করবে। এক ভাবে সেখানে ধর্মের পূজা করবে, তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে।

'তরি আরোহণে যাবে হাকন্ড ভুবন।
সাথে নিবে সাঙ্গযাত পূজা আওজন।।
এক ভাবে সেখানে পূজিবে মায়াধর।
ধর্ম কৃপা কর‍্যা দিবে উদয়ের বর ।।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে শুন বাপধন।
সর্বকাল অনাথের নাথ নিরঞ্জন।।' (৭১২)

এই বলে রঞ্জাবতী লাউসেনের গলা ধরে কান্নাকাটি করে তাঁকে বিদায় দিলেন। সেন কর্পূরকে বললেন - বৃদ্ধ পিতা মাতাকে তুমি দেখবে, তোমার উপর সব দায়িত্ব রইল, যদি পশ্চিমে উদয় দিয়ে ফিরে আসি আবার দেখা হবে। এই বলে লাউসেন মা বাবার চরণে বিদায় নিয়ে ময়না যাত্রা করলেন।

২. ধর্মপূজা ও পশ্চিমে রবির উদয়ের জন্য লাউসেনের হাকন্ড যাত্রা ঃ

সেন গৌড় থেকে ময়না এসে পৌছলেন, কলিঙ্গা ও অন্যান্য রাণীদের বললেন - মামার কথায় গৌড়েশ্বর আমাকে পশ্চিমে রবির উদয় দিতে বলেছেন, তার জন্য মা বাবাকে

তৃণবন্দী করে রেখেছেন। এসবই মাতুলের চক্রান্ত। পশ্চিমে রবির উদয় দেবার কথা জানিয়ে বললেন - আমাকে হাকন্ডে ধর্মরাজের পূজা করতে যেতে হবে, তা না হলে আমার মা বাবার প্রাণ বাঁচে কি না ঠিক নাই, তাই আর বিলম্ব করে লাভ নাই। জয়পতি মন্ডলকে বললেন - যাজপুর থেকে রামাই পন্ডিতকে ডেকে এনে হাকন্ডে ধর্মপূজার জন্য কি কি প্রয়োজন তা আপনি ব্যবস্থা করে দিন। রাজার হুকুমে পশ্চিমে উদয়ের জন্য ধর্মের গাজন দিতে হাকন্ড যেতে হবে। এর পর রামাই পন্ডিতের নির্দেশ অনুযায়ী পূজার সমস্ত কিছু আয়োজন গুছিয়ে নিলেন। লাউসেনের ইচ্ছা ধর্মের গাজনে সূর্যের অর্ঘ্য দেবার, তাই কপিলা নামে একটি গাভিকে নিলেন। সামূল্যা দেবীকে পরম যত্নে নিয়ে এলেন, সেন তার পায়ে ধরে বললেন - চাপায়ে মা যখন 'শালেভর' দিয়েছিলেন তখন আপনার কৃপায় মা স্বচক্ষে মায়াধরের দর্শন পেয়েছিলেন। আমি এখন বড় বিপদে পড়েছি, রাজার হুকুমে পশ্চিমে রবির উদয় দিতে হবে, সেই জন্যে মা বাবা সেখানে তৃণ বন্দী হয়ে আছেন। মাসি, আপনি বলুন কি করলে পশ্চিমে উদয়ের বর পাব। লাউসেনের কথা শুনে সামূল্যা দেবী বললেন - তুমি কিছু চিন্তা ক'রো না, আমি ভূত ভবিষ্যত বলতে পারি।

> 'হাকন্ডে পূজিলে ধর্ম সিদ্ধ মনোরথ।
> অনাথের নাথ ধর্ম জানে ত্রিজগৎ।।
> পশ্চিমে উদয় বর পাইবে সে ঠাঞি।
> না কান্দিহ প্রাণধন চিন্তা কিছু নাঞি।।' (৮২০)

সামূল্যা দেবীর কথা শুনে হাকন্ড যাত্রার জন্য লাউসেন জয়পতি মন্ডলকে সাঙ্গযাত সহ তরণী সাজিয়ে দিয়ে বললেন, পূজার সমস্ত আয়োজন সঙ্গে দিতে বললেন, তারপর কলিঙ্গা ও অন্যান্য রাণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুত্র চিত্রসেনকে কোলে নিয়ে আদর করে কালুবীরকে ডেকে বললেন - তোমার হাতে ময়নার দায়িত্ব অর্পণ করলাম। জাতি, কুল, মান,ধন সবই তোমার অধিনে থাকবে। রাতে দিনে এদের রক্ষা করবে। এই বলে জয়পতি মন্ডল প্রমুখ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকার কাছে এলেন ।

লাউসেনের নৌকা কালিন্দীর প্রবল স্রোতে ছুটে চললো - সন্ধাপুরে ধর্মরাজের দর্শন করে বাঁ দিকে পীরের মোকাম দর্শন করার পর দারকেশ্বর রূপনারায়ণ নদীতে নৌকা এসে পড়ল, তার পর উসুতপুরের ধর্মের দেহরায় স্নান পূজা অর্ঘ্যদান সেরে নৌকা চললো তমলুকে (তাম্রলিপ্ত)। রাতারাতি তমলুক পার হয়ে নৌকা পৌঁছাল সাগর দ্বীপে কপিল মুনির আশ্রমে। এর পর নৌকা চললো আরও দক্ষিণে দূর থেকে চাঁপাই ভুবনের ধর্মরাজ দর্শন করলেন সকলে, এখানেই রঞ্জাবতী শালেভর দিয়েছিলেন, এর পর নৌকা গিয়ে পড়ল সাগরের কালা নীরে, সমুদ্রের ঢেউতে নৌকা পাক খেতে থাকে, সেন সামূল্যা দেবীর পায়ে ধরে বললেন - ঠাকুরের পূজা কি করে করব, এখানেই তো সব ডুবে মারা যাবো, সামূল্যা দেবী বললেন - কিছু ভয় নাই বাছা, 'আপনি কান্ডারী হয়্যা তরাবে গোসাঞি।' গোসাই এর কৃপায় নৌকা এসে পৌঁছাল ' 'সেতুবন্ধ' রামেশ্বরমে, এর বাঁ দিকে লঙ্কা (শ্রীলঙ্কা)। রামেশ্বরমে শ্রীরামের কীর্তি দেখে সেন এবং সকলেই খুব মোহিত । প্রবল ঢেউ এর মধ্যেই সেতু বন্ধ পার হয়ে আরও দক্ষিণে নৌকা এসে পৌঁছাল। সকলে দূর থেকে ডান দিকে মক্কা মদিনার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালেন। এর পর এল সেই কাঙ্খিত হাকন্ড ভুবন।

'শ্রীরামের কীর্তি দেখ্যা সেনে লাগে ধন্ধ।
হাতে প্রাণ করিয়া পারাল্য সেতুবন্ধ।।
ডানি দিগে দূরে মক্কা মদিনার ঘর ।
হাকন্ড ভুবন পাল্য রঞ্জার কুঙর।।'(৮৮৬)

সামূল্য বল্লেন - এখানেই হচ্ছে হাকন্ড ভুবন, এর সমান তীর্থ ত্রিভুবনে আর নাই। হাকন্ডের ঘাটে নৌকা বাঁধা হল। হাকন্ড দেখে সন্ন্যাসীরা খুব আনন্দিত হলেন, এখানকার নদীর জল আরক্ত বর্ণের, এই জল স্পর্শ করলেই কোটি জন্মের পাপ খন্ডন হয়। সামূল্যা দেবী লাউসেনকে বললেন --

'পৃথিবীতে যত তীর্থ সব এই স্থানে।
তীর্থরাজ বল্যা কৈল ধর্মের পূরাণে।।' (৮)

'বিলোকন কর বাছা ধর্মের দেউল।
কোটি চান্দ কিরণ না হয় সমতুল।।' (১৮)

'নিরবধি এখানে থাকেন মায়াধর।
বৃন্দাবনে যেন হরি বারানসে হর ।।' (৩২)

তিনি আরও বললেন - ব্রহ্মা এখানে এসে প্রভু নিরঞ্জনের পূজা করেছিলেন। রাজা রাবণ এখানে এসে তাঁর দশ মুন্ড কেটে ধর্মের সেবা করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এখানে এসে ধর্মের গাজন ক'রেছিলেন, বরুণ এখানে দশবার যজ্ঞ করেছিলেন, যুধিষ্ঠির বনবাস কালে এখানে ধর্মের আরাধনা করে তাঁর হারানো রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। তাই -

'মহাসিদ্ধ পীঠ এই অনাদ্যের স্থান।
ভক্তি ভাবে পূজিল ভক্তের ভগবান।।' (৫০)

সামূল্যার এই কথা শুনে লাউসেন তাঁর পায়ে ধরে বললেন -- মাসি, বৃদ্ধ পিতা মাতা গৌড়ে তৃণ বন্দী আছেন, তাদের কথা মনে হলেই আমার প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে। কত দিনে মা বাবা উদ্ধার হবেন, কি ভাবে পশ্চিমে রবির উদয় বর পাব তুমি বল। সামূল্যা দেবী বললেন -

'তোমার সাপক্ষ সদা আপনি গোসাঞি।' ৬০

তুমি কিছু চিন্তা কর না, সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে অনেক সময় পুরুষের দশ দশা হয়। রাম চন্দ্রকে বনবাসে যেতে হয়েছিল, রাবণ সীতাকে চুরি করেছিল, ফলে রাবণ সবংশে নিধন হয়ে ছিল, যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় হেরে বনবাসে যেতে হয়েছিল, নানা ভেক ধরে এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করতে হয়েছিল, আবার যুদ্ধে কৌরবরা নিধন হল আর পান্ডবদের জয় হল। দশার ফেরে অনেক কিছু হয় তার জন্য মনস্তাপ ক'রো না । তুমি ধর্ম পূজায় বর পাবে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, তুমি শীঘ্র শীঘ্র পূজার স্থল পরিস্কার করিয়ে পূজার আয়োজন কর।

৫১২,৭১২,৮২০,৮৮৬ 'অঘোর বাদল পালার' চরণ সংখ্যা।

লাউসেন তার দুই অনুচর ইছা আর রানাকে ডেকে পূজার স্থল পরিষ্কার করতে বললেন। ইছা রানা 'জয় ধর্মরাজ' বলে হাকন্ডের ঘাটে বন পরিষ্কার করে সুন্দর পরিপাটি করে পূজার স্থল নির্মান করে দিল।

'অক্ষয় তৃতীয়া শুক্লা মঙ্গল বাসর।
ধর্মকে পূজেন সেন হাকন্ড ভিতর।।'(২৮০)

শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হাকন্ডের ভিতর সেন ধর্মপূজা করতে বসলেন। প্রভু নিরঞ্জনকে স্মরণ করে সন্ন্যাসীসহ সেন হাকন্ডের জলে স্নান করে পূজার স্থলে উপনীত হলেন। কাঁশি, ঘন্টা, ঢাক, ঢোল, সানাই সুমধুর সুরে বাজতে লাগল। রামাই পন্ডিত মশাই বেদীর উপর ধর্মরাজের পাদুকা স্থাপন করলেন। লাউসেন আসনে বসে হাতে কুশের আংটি পড়ে তিন বার 'শ্রী বিষ্ণু' বলে আচমন ক'রে পন্ডিত মশাই এর নির্দেশ মত ঘট স্থাপন করলেন। তারপর স্বস্তি বচন অঙ্গ শুদ্ধির পর গাজনারম্ভের সঙ্কল্প করে লক্ষ্মী স্থাপনের পর পন্ডিত মশাই সূর্য্য পূজার মন্ত্র.পাঠ করালেন। সব ভক্ত সন্ন্যাসীরা তাঁদের উত্তরি সঙ্কল্প করিয়ে নিলেন। এর পর দেব দেবীর বরণ করে সেন পন্ডিত মশাই ও সামুল্যা দেবীকে নানা ভূষণ বসন অঙ্গুরী দিয়ে বরণ করলেন। তার পর পঞ্চ ঘট স্থাপন করে ষোল উপচারে ধর্মপূজা আরম্ভ করলেন।

'ষোল উপচারে পুজা পুরাণ বিহিত।
এক ভাবে ভূপতি পূজেন জগদীশ।।'

গাজনের সন্ন্যাসীরাও এক মনে নিরঞ্জনের পূজা করেন, কেউ মুখে কাঁটা ফোটান, কেউ পিঠেতে ভাঙ্গেন কাঁটা, কেউ বুকে মারে ঝাটা, কেউ বা খাঁড়ার উপর ভর দেন। লাউসেন প্রভু নিরঞ্জনকে প্রণিপাত করে স্তব আরম্ভ করলেন -

'আমি শিশু মুঢ়মতি কিবা জানি স্তব।
নিজ গুণে কৃপা কর আপুনি মাধব।।' ২৯৬
'অবোধ ভূপাল মামা পাষাণ হৃদয়।
দেখিবারে চান রবি পশ্চিমে উদয়।।
বৃদ্ধ পিতা মাতা বন্দী গৌড় বন্দীশালে।
ঠেকাচ্ছে বিষম ঘোরে পড়্যাছি জঞ্জালে।।
কেবল ভরসা মোর রাতুল চরণ।
পশ্চিমে উদয় বর দেহ নিরঞ্জন।।'(৩০৪)

এই ভাবে লাউসেন একাগ্রচিত্তে ঠাকুর জগদীশের স্তব পূজা করে চলেছেন। গৌড়ের পাত্র (লাউসেনের মামা) যখন জানলেন যে তার ভাগ্না হাকন্ডে গিয়ে এক ভাবে নিরঞ্জনের পূজা করছেন পশ্চিমে উদয়ের বর পাবার জন্য তখন তার মাথা ঘুরে গেল।

৩.মহাপাত্রের ময়না আক্রমণ ও পরাজয় বরণ ঃ

পাত্র মনে মনে সাত পাঁচ ভাবতে লাগল, কি করে ভাগ্নাকে যম ঘরে পাঠানো যায়। একবার ভাবল - পশ্চিমে রবির উদয় কখনও হবে না বেটা ওখানেই মারা যাবে। তখন আমি ময়না দখল করব।

'ভান্ডার লোটাব পুড়াইব দেশ খান।
লঙ্কা যেমন পুড়াইয়া ছিল হনুমান।।
'হাড়ি মুচিগণে দেব সেনের যুবতী।
চিত্রসেনে বলি দিয়া পূজিব পার্বতী।।' (৩৮৪)

এই সব মনে ভেবে পাত্র মহারাজের কাছে গিয়ে জোড় হাত করে বললেন - মহারাজ খবর পেলাম ভাগ্না লাউসেন ধর্মপূজার জন্য ময়নার বাইরে গেছে, এই সময় কোথাকার এক গন্ডার কিম্বা কোন অসুর গন্ডারের ভেক ধরে এসে ময়না ছারখার করে দিচ্ছে, ঘরদোর সব ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছে। তার সামনে কেউ যেতে পারছে না, প্রজারা সব ঘর দুয়ার ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এখন কি করা যায় বলুন। পাত্রের কাছে এই কথা শুনে মহারাজ বললেন - আমি নিজেই গন্ডার শিকারে যাবো, কুমার চিত্রসেনকে দেখব, তাকে জামা জোড়া ঘোড়া অলঙ্কার দিয়ে আর্শীবাদ করব, তার পর গন্ডার বধ করে ঐ দিকের পুণ্য স্থান দ্রাবিড়, পুরীর জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম বিমলা মাতা ইত্যাদি দর্শন করে দেশে ফিরব -

'বিধি যদি মোরে দেই   মনের মানস এই
পূর্ণবার দেশেতে গমন।।
নিবাস শাঁখারি গ্রাম   বসু বংশে অনুপাম
মথুরা বসুজা মহাশয় (৪৫০)
সত্যবাদী সদাচার   করে সব সুবিচার
না করি সংশয়।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনশ্যাম   অশেষ গুণের ধাম
মধ্যম শ্রীরাধিকা বল্লভ।
রামকৃষ্ণ সর্বানুজ   দাতা শক্তি মুক্তি ভুজ
ছোট ভাই সবার দুর্লভ।।
ঘনশ্যাম বসু সুত   কাব্যকলা অনুগত
নরসিংহ নামে যে বিখ্যাত।
হয়্যা এক ভাবচিত রচিল ধর্মের গীত
সেব্যা ত্রিলোচন বৈদ্যনাথ।।'
(৪৬০)

রাজা গন্ডার শিকারে ময়না যাবেন শুনে সারা গৌড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। রাজাও শিকারী সাজে সাজতে লাগলেন, হাতি ঘোড়া সাজানো হল, সিপাই বন্দুকী সব নিজ নিজ ঢাল তলোয়ার তূণ ঠিক করে নিল। এই সব দেখে পাত্র ভাবতে লাগল কি করতে গেলাম আর কি উল্টো বিপত্তি বল, তখন তাড়াতাড়ি রাজার কাছে এসে বললো - মহারাজ আপনি রাজ্য ছেড়ে দূর দেশে শিকারে গেলে রাজ্য দেখাশুনা করবে কে। রাজ্যে অরাজক দেখা দেবে। সব লুট পাট হয়ে যাবে। পাত্রের কথা শুনে রাজা একটু ভয় পেয়ে গেলেন। তখন পাত্রকে বলেন - এক কাজ কর তুমিই গন্ডার শিকারে যাও। এই অল্প কাজে আমার যাবার দরকার নাই। এই বলে পাত্রকে ময়না পাঠালেন। পাত্র এটাই চাইছিল।

পাত্র ন'লক্ষ দল বল, বন্দুকী, ঢালি, হাতি, ঘোড়া নিয়ে ময়না যাত্রা করলো। মনে মনে বলতে লাগলো - এবার ময়না লুটেপুটে নেব। মনের আনন্দে রাতে দিনে চলে ময়নার কাছে কালিন্দীর ঘাটে পৌঁছালো। সেখানেই প্রথম তাঁবু ফেলে যুক্তি করতে বসলো বারভূঞাদের নিয়ে - কি করে ময়না আক্রমণ করা যায়, কারণ সেখানে কালুবীর, লখ্যা, শাকা শুকা, কানড়া সহচরী ধুমসী এরা সব আছে, এরা প্রত্যেকেই অপরাজেয়, তার উপর সেনের স্ত্রীরাও সকলেই সমরে পন্ডিত। তখন বার ভূঞারা বললেন - আগে চর পাঠিয়ে সব খবরাখবর সংগ্রহ করে তারপর আক্রমণ করা যাবে। পাত্র গঙ্গাধর ভাট কে খবর এনে দিতে বললো - কিন্তু কালুবীর

আর ধুমসীর ভয়ে গঙ্গাধর বা অনেকে একা একা ময়না যেতে রাজি হল না। পাত্র রেগে গেলে অবশেষে ইন্দ্রজাল কোটাল ময়নার চর হয়ে যেতে রাজি হল। ইন্দ্রজাল তিন জন চোরকে সঙ্গে নিয়ে চোর বেশে ময়না যাবার জন্য তৈরী হল। পাত্র তাকে নিজের গায়ের খাসা জোড় আর চড়বার ঘোড়া সঙ্গে দিল। ইন্দ্র ভাবল ময়না যাবার আগে দেবী অভয়ার পূজা করে বর চেয়ে নিয়ে যাবে, চোরেরা চুরি করতে যাবার আগে অনেক সময় ঠাকুরের পূজা করে যায়। সেই মত ইন্দাও পূজার নানা উপকরণ নিয়ে কালিন্দী থেকে পদ্ম ফুল তুলে ধূপ দীপ জ্বেলে দেবী অভয়া আর দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করতে বসল। অভয়া ইন্দার পূজায় তুষ্ট হয়ে ইন্দাকে বর দিতে চাইলেন। ইন্দা বললো - মা আমায় এমন বর দিন যাতে ময়নার সবাই ঘুমে অচৈতন্য হয়ে যায়। দেবী তখন বললেন - কানড়া ধুমসী আর লখ্যা ছাড়া বাকি সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে।

অমাবস্যার রাত্রি, তার উপর ঘন মেঘ, তারই মধ্যে ইন্দারা সিন্ধকাটি আর মন্ত্রপূত ইন্দুর মাটি দিয়ে ময়না নগরে প্রত্যেকের ঘরের চারপাশে ছড়াতে লাগল। আর তাতেই দেবীর বরে সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়তে লাগল। চার চোর ভিতর মহলে ঢুকে সোনা, রূপা, অনেক মূল্যবান ধন রত্ন চুরি করে নিল, তার পর তারা ডোম পাড়ায় গেল, সেখানেও সবাই ঘুমে অচেতন, এক মাত্র লখ্যা (কালুবীরের স্ত্রী) ধর্ম্ম পূজা করছিল, ইন্দা ঠিক বুঝতে পারে নাই, ঘরে ঢুকতেই লখ্যা চোর চোর বলে ছুটে যেতেই চোরের দল প্রবল বেগে পাত্রের কাছে গিয়ে সব ঘটনা জানালো, আরও বললো - গোটা ময়না ঘুমে অচেতন, এটাই ময়না আক্রমণের উপযুক্ত সময়। ইন্দার যুক্তি অনুযায়ী পাত্রও দলবল নিয়ে কালিন্দী পার হয়ে চারি দিক থেকে ময়না আক্রমণ করল।

এদিকে হাকন্ড হতে ধর্মরাজ সব দেখে হনুমানকে পাঠালেন - কালুবীরকে স্বপ্নে ময়না আক্রমণের কথা জানিয়ে দিতে, যাতে কালুবীর যুদ্ধ করে ময়না রক্ষা করতে পারে। এই শুনে হনুমান হাওয়ার বেগে ময়না গিয়ে কালুবীরের মাথার কাছে বসে বললো - কালু তুমি সুখে ঘুমচ্ছ, আর এদিকে পাত্র দলবল নিয়ে ময়না ঘিরে ফেলেছে, তুমি শীঘ্র উঠে ভবানীর পূজা করে রণে পাত্রকে পরাজিত কর। কালুবীর ঘুম থেকে ধড়ফড় করে উঠে লখ্যা শাকা শুকা আর সব ডোমেদের ডেকে স্বপ্নের কথা বললো - আর স্বপ্ন অনুযায়ী দেবী ভবানীর পূজার জন্য নানা দ্রব্যের সঙ্গে একটু কারণের (মদ) ব্যবস্থা করল। ধূপ দীপ মিষ্টান্ন ফুল ফল দিয়ে কালু আর তার সঙ্গিরা পূজা আরম্ভ করল।

'বীর কালু মহানন্দে চন্দনাদি অষ্ট গন্ধে
পূজা করে দেবীর চরণ।।' (১০৫৬)

কালুবীরেরর ভক্তি দেখে দেবী চতুর্ভূজারূপে সিংহযানে পূজার স্থলে উপস্থিত হলেন। কালুবীর পূজা করতে করতে স্বভাব গুণে লোভ সামলাতে না পেরে দেবীকে নিবেদন না করেই কারণ (মদ) পান করে ফেলল, মহাপূজা বিফল হল। দেবী ক্রোধে কালুবীরকে শাপ দিয়ে কৈলাশে ফিরে গেলেন। মদের ঘোরে ডোমেদের আর কোন খেয়াল নাই, 'মাতাল হইল ডোম নাহিক সম্বিত।' তখন ডুমনীরা (কালুদের স্ত্রীরা) ওদের ধরে ঘরে নিয়ে গেল । কালুবীর ঘরে গিয়ে নেশার ঘোরে স্বপ্নের কথা বললো যে - গৌড়ের পাতর ন'লক্ষ দলবল নিয়ে ময়না আক্রমণ করতে এসেছে, আট দিক ঘিরে ফেলেছে। আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে। কিন্তু আমার

এমন অবস্থা আমি আর উঠতে পারছি না। কালুবীরের কথা শুনে লখ্যা বললো- তোমার যখন শরীর খারাপ তুমি ঘরে থাক, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। কালুবীর লখ্যাকে বললো - তুমি মেয়ে ছেলে তোমার বয়স হয়েছে, তুমি পাত্রের দলবলের সঙ্গে পারবে না। লখ্যা বলে - যম ইন্দ্র বরুণ গৌড়েশ্বর কিম্বা পাত্র যেই আসুক না কেন তার মাথা কেটে নেব , তোমার কোন চিন্তা নাই, এই বলে কালুবীরকে স্নান করানোর জন্য কালিন্দীর ঘাটে থেকে কলসী কাঁখে জল আনতে গেল, সেই সময় দূর থেকে পাত্র লখ্যাকে দেখে তার দিকে এগিয়ে বললো - আমি মহামদ রাজার মন্ত্রী আমি তোমার জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম, দেবতার ইচ্ছাতেই তুমি নিজে এখানে এসেছো। তোমাকে কিছু সমাচার দিতে এলাম - শুনলাম লাউসেন হাকন্ডে মারা গেছে, কালুকে আর তোমাকে মধুপুর জাইগির দিতে চাই, এটি ময়নার মতই, সেখানে তোমরা লোকজন নিয়ে সুখে বসবাস কর। পাত্রের এই কথা শুনে আগুণে ঘি দেওয়ার মত লখ্যা জ্বলে ওঠে, পাত্রকে বললো -

'জাতি ধন জীবন সঁপিয়া মোর হাথে।
গেছেন হাকন্ড পুরী ময়নার নাথে।।
তোর পারা অধর্মী সংসারে কেবা আছে।
সেনের মাতুল এ কারণ প্রাণ বাঁচে।।' (১২৮৮)

লখ্যার এই কথা শুনে পাত্র ভয়ে পালিয়ে গেল ।

লখ্যা বাড়ি ফিরে এসে ভাবল পাত্ররা যেকোন সময় ময়না আক্রমণ করবে, তাই আর দেরি না করে রণ সাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ যাত্রা করল।

'পিঠে ঢাল হাতে বাস পায় লাগে তালি।
সাজিল দৈত্যের রণে যেন ভদ্র কালী।।' (১৩২০)

পাত্রের সিপাই সর্দাররা লখ্যাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল, যেমন ভবানীকে বেড়ে ছিল শম্ভু নিশম্ভু। চারদিক থেকে নানা অস্ত্র ছুটে আসছে, কিন্তু লখ্যার নির্ভয় শরীরে কিছুই লাগে না, এর পর লখ্যা আথালি পাথালি চোট হেনে চলেছে, অসংখ্য হাতি ঘোড়া মাহুত রাউত কাটা গেল।

'কালিকা কাটেন যেন অসুরের দল।' ১৩৫৬

নানা ধরণে বিষ মাখা তীর দিয়ে লখ্যা বহু সৈন্য নিহত করল। লখ্যার রণ দেখে-

'আপুনি কালিকা দেবী উড়িলা সমরে। ' ১৩৭৯

দেবীর আশীর্ব্বাদে লখ্যা পাত্রের তিন লক্ষ সেনাকে ধরাশায়ি করে দিল, তখন রাজা পাত্রের দলবল পবন বেগে কালিন্দী পার হয়ে পালিয়ে গেল। যুদ্ধ জয় করে লখ্যার মনে খুব আনন্দ হয়েছে। তাই একভাবে ঠাকুর নিরঞ্জনের পূজা করতে বসেছে।

'রণ জিন্যা লখ্যার আনন্দ বড় মনে।
এক ভাবে ভাবেন ঠাকুর নিরঞ্জনে।।' (১৪২০)

এরপর রণ জয়ের নিশান হিসাবে হাতির কাটা শুঁড় আর সিপাইএর কাটা মুন্ড ধনুকে বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরল, কালুবীরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে রণজয়ের কথা বলে নিশান দেখাল। কালুবীর এইসব দেখে খুব আনন্দিত হল, আবার ভয়ও পেল, কারণ সে জানে পাত্র ফিরে

যাবার লোক নয়, আবার আসবে, তাই লখ্যাকে বললো ওদের মামা ভাগ্নার অহিনকুল সম্পর্ক, বার বার যুদ্ধ হবে, আমরা আর কত আটকাবো, তাই আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। কালুর এই কথা শুনে লখ্যা মর্মে মর্মে জ্বলে আগুন হয়ে গেল, ভাবল ডোম বেটা অধর্মে মজেছে। কালুকে বললো — সেকালে ছেঁড়া টেনা পড়তে, আর এখন গায়ে খাসা জোড়া। আগে মাঠে শুয়ার চরাত, আর এখন নিজে ঘোড়ায় চড়। ডোম হয়ে দেশের অধিকারী হয়েছে কিন্তু জাতের স্বভাব ধর্ম ভুলতে পার নাই, তাই যিনি জাত প্রাণ সব সঁপে ধর্ম পূজা করতে গেছেন তার অসময়ে চলে যেতে চাইছ। লখ্যার কথায় কালুবীর খুব লজ্জিত হয়ে বললো - আমি যুদ্ধে যাব, তবে আজ আর পারব না, কাল সকালেই যাব। আজ শাকাকে যুদ্ধে যেতে বল। কালুর কথায় লখ্যা শাকাকে যুদ্ধ যেতে বললো, মায়ের কথা শুনে শাকা বললো - মা, আজকে উঠতে পারছিনা, মাথা খসে যাচ্ছে, এই অবস্থায় আজ কি করে যুদ্ধে যাব, শাকার এই কথায় মা রেগে গিয়ে বললো -

'হইয়া সিংহের বেটা শ্রীকাল হইলি' (১৫৬৫)

মায়ের এই কথা শাকার বুকে খুব লাগল, তাই উঠে রণসাজে যুদ্ধে যেতে তৈরী হল। যাবার সময় ঘরের ঈশান কোণে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল, ওর স্ত্রী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যেতে বললে সে কথা না শুনে শাকা বেরিয়ে পড়ল —

'সঙ্গে সিঙ্গাদার নিল করিয়া দোসর।
ভনে নরসিংহ বসু শাঁখারিতে ঘর।।' (১৫৯৪)

শাকাবীর যুদ্ধে গিয়ে হানা দিল —

'একা শাকা সমরে কাটিল বহু সন্য।' (১৫৪৭)

শাকার যুদ্ধ দেখে পাত্রে দলবল অস্থির হয়ে গেল। 'প্রাণ লয়্যা পালাইল গৌড়ের পাতর।' যুদ্ধে শাকার জয় হল কিন্তু তার দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাওয়ার জন্য মাটিতে পড়ে যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল। সিঙ্গাদার কাঁদতে কাঁদতে এসে লখ্যাকে এই সংবাদ দিতেই লখ্যা মাটিতে আছাড় কাছাড় করে কাঁদতে লাগল, মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল - আমার জন্যই শাকার এই অবস্থা হল। শাকার স্ত্রী মউরা কেঁদে আকুল। শুকা শাকার কথা শুনে রেগে কাঁপতে কাঁপতে মাকে বললো - মা, আমি এর প্রতিশোধ নেব, এই বলে শুকা যুদ্ধের সাজে সেজে ডোম পাড়ার সবু লোকজনদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চললো। মার মার বলে পাত্রের লস্করদের সামনে হাজির হল শুকা আর তার দলবল। যুদ্ধে শুকা ছিল পরম বীর —

'একা শুকা মহাবীরে গগন ছাইল তীরে।' ১৮০৫
'ডোম সব বলবান কাট্যা করে খান খান।' (১৮৪৭)

শুকাবীরদের সঙ্গে যুদ্ধের বিপরীত ফল দেখে পাত্রের দলবল রণে ভঙ্গ দিল। যারা পালাতে পারল না তারা ছাই মাটি মেখে যোগী সেজে কোন রকমে প্রাণ বাঁচাল। এরই মধ্যে গদা নামে এক পাইক জ্বরে কাঁপছে, পালাতে পারল না। কিন্তু সে অনেক ছলা কলা জানতো, সে মৃত সৈন্যদের সাথে মরার মত পড়ে রইল। শুকা আর তার দলবল রণ জয় করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে - রণশ্রমে তৃষ্ণায় আকুল। তাই তারা কালিন্দী নদীর তীরে ঢাল তলোয়ার তীর ধনুক

রেখে জলে নেমে গেল। জলে নেমে শরীর শীতল হতে ওদের মনে হচ্ছিল আরও কিছুক্ষণ জলে থাকতে। এই সময় গদা পাইক মরার ভেতর শুয়ে শুয়ে সব দেখছিল, ডোমেরা জলে খেলা করছে দেখে সে গুঁড়ি গুঁড়ি করে এসে শুকাদের সব অস্ত্রসস্ত্র চুরি করে নিয়ে পালাল। এই অবসরে কবি তার গীত রচনার ভুল ত্রুটির জন্য প্রভু নিরঞ্জনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন --

'নিবাস শাঁখারি গ্রাম বসু বংশে ঘনশ্যাম।
নরসিংহ তাহার নন্দন।
হয়্যা এক ভাবচিত রচিল নূতন গীত।
অপরাধ ক্ষেম নিরঞ্জন।' (১৮৯০)

গদা পাইক শুকাদের সব অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে পাত্রের কাছে গিয়ে জোড় হাতে বললো - এই দেখুন ডোমেদের সব অস্ত্র নিয়ে এসেছি, ওরা সব কালিন্দীর জলে স্নান করছে, এই সুযোগে ওদের আক্রমণ করুন। গদার কথায় পাত্র আনন্দিত হয়ে তাকে নানা পুরস্কার দিল, তারপর বারভূঞা ও দলবল নিয়ে কালিন্দী নদীর ধারে গিয়ে ওদের ঘিরে ফেলল। বেড়া পাকে পড়ে ডোমরা চার দিকে চেয়ে দেখলো তাদের সমস্ত অস্ত্র কেউ চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে, তারা হায় হায় করতে লাগল -- এই সময় পাড়ের ওপর থেকে পাত্রের লস্করা শুকাদের চার দিক থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল যেমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুকে আক্রমণ করেছিল। শুকা ডোমেরা কালিন্দীর জলের মধ্যে নিরস্ত্র হয়ে কাটা পড়ল। সিঙ্গাদার দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে শোকে কাতর হয়ে লখ্যার কাছে গিয়ে গদা পাইকের কান্ড এবং শুকা ও দেলাইদের নিহত হওয়ার ঘটনা জানাতেই লখ্যা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, সারা ডোম পাড়ায় কান্নার রোল পড়ে গেল। এই ঘটনা শুনে কালুবীর শোকে তাপে রাগে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

'পুত্র শোকে কালু যায় করিবারে রণ।
ইন্দ্রজিৎ শোকে যেন সাজেন রাবণ।।' (১৯৬৪)

কালুবীর অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে চললো। কালুবীর যুদ্ধে আসছে শুনে পাত্র বারভূইঞাদের নিয়ে যুক্তি করতে বসলো। বারভূইঞারা বললো -- ন'লক্ষ দল নিয়ে আমরা যুদ্ধে করতে এসেছিলাম, এরই মধ্যে ছ'লক্ষ সেনা মারা গেছে, লখ্যা (কালুর স্ত্রী) একাই তিন লক্ষ সেনা খতম করেছে। এখন সেনাদের মনোবল ভগ্ন, তার উপর কালুবীরের মত যোদ্ধা, এই অবস্থায় তাকে কোন মতেই সম্মুখ সমরে পরাজিত করা যাবে না, কৌশলে কার্য সিদ্ধি করতে হবে। কাম্বা ডোমকে কালুর কাছে পাঠিয়ে দিন, ও'কালুর ভাই, প্রতারণা করে ও কার্যসিদ্ধি করবে। এই শুনে পাত্র কাম্বাকে ডেকে বললো — তুমি যদি কালুর মাথা এনে দিতে পার প্রচুর পুরস্কার পাবে। আর আমার লজ্জা নিবারণ হবে। পাত্রের কথা শুনে কাম্বা বললো - আমি সাধারণ ভাবে ওদের কাছে গেলে ওরা আমাকে হত্যা করবে, তার চেয়ে আমাকে অপমান করে মাথা নেড়া করে মুখে চুনকালি মাখিয়ে পাঠিয়ে দিন, আমি কালুবীরের মাথা এনে দেবো।

কাম্বা ডোমের কথায় লোকজনের সামনে পাত্র তাকে অপমান করতে লাগল, বললো - কালু কাম্বা দু'জন সহোদর ভাই, শত্রুর ভাইকে এখানে রাখা ঠিক নয়, ও আমাদের সংবাদ পাচার করছে। ওর মাথা মুড়িয়ে মুখে চুনকালি মাখিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে ময়না পাঠিয়ে দাও। পাত্রের কথায় রাজার লস্করেরা মহানন্দে কাম্বার মাথা নেড়া করে মুখে চুনকালি মাখিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চাপিয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে ময়না পাঠিয়ে দিল। কাম্বা কপট কান্না কাঁদতে কাঁদতে কালুর পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল। কালু এই ব্যাপার দেখেতো অবাক হয়ে গেল। কাম্বা কালুর পায়ে ধরে বললো -- দাদা, আমি তোমার ছোট ভাই, সেই কথা পাত্র জেনে ফেলেছে তাই আমাকে বিশ্বাস না করে অপমান করে তাড়িয়ে দিল, এই দেখ আমার অবস্থা। কাম্বা সর্বকালের খল এবং শঠ, আর কালু সরল হৃদয়। ভাই কাম্বার কথা বিশ্বাস করে কালু তাকে আশ্রয় দিল এবং বললো --

'এক ভাতে থাকিব যে ছিল পূর্বাপর।
আজি হত্যে হল্য ভাই দুজনার ঘর।।' (২০২২)

কালুর এই কথা শুনে খল কাম্বা বললো -- দাদা, তুমি বললেও বৌদি রাজি হবেনা, তার চেয়ে আমি অন্য কেথাও যাই, ভায়ের কথা শুনে কালুবীর বললো -- আমার কথা লখ্যা একটুও নড়চর করতে পারবেনা, যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তাহলে কালিন্দীতে চল, আমি কালিন্দীর জলে দাঁড়িয়ে তামা তুলসী হাতে নিয়েও এই কথা বলব।

কাম্বার সঙ্গে কালুর সব কথা লখ্যা অন্য ঘর থেকে শুনে কালুকে বললো -- কাম্বা সর্বকালের খল, ঘরভেদা লোকেদের জন্য লঙ্কার রাবণ বিনষ্ট হয়েছিল, তুমি ওর কোন কথা শুনবে না। লখ্যার কথায় কান না দিয়ে দু'ভাই কালিন্দীর ঘাটে গেল। লখ্যাও হাতে টাঙ্গি নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের পিছু পিছু গেল। কালু কালিন্দীর জলে স্নান করে জলে দাঁড়িয়ে হাতে তামা তুলসী নিয়ে বললো -- তুমি যা বলবে আমি তাই করব। এর অন্যথা কিছু হবে না। এই কথা শুনেই কাম্বা তার আসল রূপ প্রকাশ করে বললো --

'আপনি সুকৃতি বঠ সত্য কৈলে ভাই।
আমার মানস দাদা তোমার মাথা চাই।।' (২০৭৬)

কাম্বার এই কথা শুনে কালু একে বারে হতভম্ব হয়ে গেল। প্রথমে কিছু কথা বলতেই পারল না। তারপর বললো -- আমি অধর্ম করবো না, তুমি বিশ্বাসঘাতক, আমার হাতে খড়্গ আছে, তুমি আমার মাথা কেটে নাও। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাম্বা কোন রকম অনুতাপ না করে কালুর মাথা কেটে নিয়ে পাত্রের কাছে ছুটলো সেই সময় লখ্যা পিছু থেকে টাঙ্গি দিয়ে এক চোটে কাম্বার মাথা কেটে ফেলল -- এরপর লখ্যা কালুর কাটা মুন্ড নিয়ে ময়না ভুবনে কলিঙ্গার কাছে গেল। তার দু'চোখে শ্রাবণের ধারা বইছে, অতি কষ্টে সামলে নিয়ে পাত্রের নির্মম অত্যাচারের কথা বললো। শাকা শুকা কালুবীর ছাড়াও ডোম পাড়ার সব পুরুষই নিহত

হয়েছে, লখ্যার মুখে এই সব সমাচার শুনে কলিঙ্গা তার হাত ধরে অনেক সান্তনা দিয়ে আর শাকা শুকা কালুবীরদের হত্যার বদলা নেবার সঙ্কল্পের কথাও জানালো।

দুর্গা যেমন অসুর বধের জন্য নানা রকম অস্ত্রে সজ্জিতা হয়েছিলেন কলিঙ্গাও সেই রকম রণসাজে সজ্জিতা হয়ে অন্ডির পাখর ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন, যাবার সময় পুত্র চিত্রসেনকে কানড়ার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন। অন্ডির পাখর নিমেষে শত্রু সৈন্যের সামনে উপস্থিত হল। পাত্র যোদ্ধৃবেশে কলিঙ্গাকে দেখে ভাবল -- লাউসেন পশ্চিমে উদয়ের জন্য না গিয়ে ময়নায় বসে যুদ্ধ চালনা করেছে। তাই সবাইকে ডেকে সেই কথাই বলতে লাগলো। তখন কালিঙ্গা দেখল তার স্বামীর নামে মিথ্যা বদনাম দিচ্ছে পাত্র -

'এত ভাবি কালিঙ্গা দেখাল্যা তুল্যা শংখ।
পাত্র বলে কালিঙ্গার করাব কলঙ্ক।।' (২১৯৮)

পাত্র যখন বুঝতে পারল কলিঙ্গা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছে, তখন তাঁর ইজ্জত হরণ করার জন্য —

'হাসান হুসেন ডাক্যা বলে পাত্রবর।
সাবধানে মিঞা সব কলিঙ্গাকে ধর।।
নিকা কর্যা লয়া রাখ মহল ভিতর।' (২২০৩)

পাত্রের কথা শুনে হাসন হুসেন আনন্দে আটখানা হয়ে চারদিক থেকে কালিঙ্গাবে ঘিরে ফেলে নানা রকম উপহাস করতে লাগল। কলিঙ্গাও সমরে বিশেষ দক্ষ, বাণে বাণে চারদিক ছেয়ে দিলেন, কলিঙ্গার যুদ্ধের ভয়ে পাত্রের দল 'ভঙ্গ দিয়া সমরে পালান সর্বজন।' কিন্তু হাসন হুসেনের একটা লোভ ছিল তাই তারা না পালিয়ে পুনরায় আক্রমণ হানল। কিন্তু কলিঙ্গা -'তীরে তীরে ছায়্যা নিল ধরণী আকাশ'

কলিঙ্গার চোটে হাসন হুসেন ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। এদিকে কলিঙ্গার তূণের সব শর শেষ, ঘোড়ার ওপর রাণী বসে কিন্তু হাতে কোন অস্ত্র নাই। এই নিরস্ত্র অবস্থায় কলিঙ্গাকে চারদিক থেকে ঘিরে

'পেটে মার্যা কাটারি কলিঙ্গা গেল মর্যা।' (২২৮০)

অন্ডির পাখরও খুব আহত হয়েছিল,

'জর্জ্জর হইল ঘোড়া তীর গুলি শরে।
কলিঙ্গাকে পিঠ্যে কর্যা লয়্যা যায় ঘরে।।' (২২৯৮)

ঘরে গিয়ে একবার হ্রেষা দিয়েই সেও প্রাণ ত্যাগ করল। ঘোড়ার ডাক শুনে কানড়া ধুমসীকে বললো -- দিদি যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসেছে, তুমি ছুটে গিয়ে দেখে এস্, ধুমসী ছুটে বাহির দলজে গিয়ে দেখে পাটরাণী কলিঙ্গা মাটিতে পড়ে আছেন, আর অন্ডির পাখরও পড়ে রয়েছে। ধুমসী কপালে আঘাত হানতে হানতে কানড়াকে গিয়ে এই দুঃসংবাদ দিতেই কানড়া চিত্রসেন

সবাই ছুটে এসে ঐ দৃশ্য দেখে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তখন ধুমসী বললেন এখন এত শোক করার সময় নয়, দেশকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তা করতে হবে। কলিঙ্গার সৎকার করার পর কানড়া পূজাস্থলে গিয়ে ভবানীর আরাধনায় বসলেন,

'একভাবে কানড়া ভাবেন ভগবতী।
কৈলাশে অস্থির মন হইলা পার্বতী।।' (২৩৩৪)

পদ্মাবতীকে নিয়ে দেবী অভয়া পূজাস্থলে এসে কানড়াকে দেখা দিলেন, কানড়া ভবানীর চরণ যুগল ধরে গলায় বস্ত্র দিয়ে বললেন — আপনি ময়না গড়কে রক্ষা করুন, পাত্রের দলবল কালুবীর, শাকা শুকা, কলিঙ্গা ও দলুইদের সংহার করেছে, এখন আপনি না রক্ষা করলে আর আমার কে আছে।

'এত শুনি ভবানি হাসিয়া কন কথা।
তোর সনে বাদ করে কার বা যোগ্যতা।।
আমি আছি সাপক্ষ তোমার কারে ডর।' (২৩৫৩)

অভয়ার আজ্ঞা পেয়ে কানড়া পুলকিত মনে যুদ্ধ যাত্রার জন্য নানা অস্ত্রে নিজে সজ্জিতা হল, ধুমসীও যুদ্ধ সাজে এসে কানড়ার সামনে দাঁড়ালো। সহিস ঘোড়া সাজিয়ে আনলে কানড়া ঘোড়ায় উঠেলেন। আর ধুমসীকে আশ্রয় করে ভবানীও চললেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

রণস্থলে কানড়া আর ধুমসী উপস্থিত হল। সেই দেখে পাত্রের দলবল চমকে উঠল, সিমুল্যায় এই ধুমসী একাই সবাইকে কেটেছিল, পাত্র সকল সিপাই সন্দারকে সাবধান করে দিয়ে কানড়ার কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে নানা কটু কথা বলতে লাগল। কানড়া রেগে কম্পবান হয়ে ধুমসীকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন, উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। একদিকে ধুমসীকে আশ্রয় করে ভবানী প্রবল যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, যেন নিশম্ভুর সঙ্গে হানাহানি, আর একদিকে প্রবল বিক্রমে কানড়া যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। কানড়া আর ধুমসীর রণ দেখে পাত্রের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, যে যেদিকে পারল পালাল। কেউ জলে লাফিয়ে পড়ল, কেউ ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে পড়ল, কেউ পরিধান বস্ত্র ফেলে দিগম্বর সন্ন্যাসী হয়ে গেল। পাত্র প্রাণ ভয়ে আখ বনে লুকিয়ে পড়ল, ধুমসী তখন আখ বন জ্বালিয়ে দিল, পাত্রের মোচদাঁড়ি পুড়ে গেছে, কোন রকমে প্রাণে বেঁচে একটা গর্তের কাছে লুকিয়ে ছিল, ধুমসী সেখান থেকে টেনে এনে হেঁচুড়ে হেঁচুড়ে কানড়ার কাছে নিয়ে গেল। কানড়া পাত্রকে দেখে বললেন — এ অনেক অত্যাচার করেছে, এর মুন্ড কেটে হাটে টাঙ্গিয়ে দাও। তখন ভবানী বললেন — ওকে মারা উচিৎ হবেনা, কারণ সেন এসে রাগারাগি করবে। তার চেয়ে এমন অপমান কর যাতে মরণের অধিক হয়। ধুমসী এই আজ্ঞা পেয়ে তাড়াতাড়ি পাত্রের মাথা নেড়া করে তাতে ঘোল ঢেলে, মুখে চুন কালি মাখিয়ে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে, গাধার পিঠে চাপিয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে ময়না পার করে দিয়ে এল।

'গলায় জুতার মালা পাছে ঢোল বাজে।
অপমানে মহাপাত্র মৃত প্রায় লাজে।।' (২৬৬২)

পাত্র মুখে চুনকালি মেখে মাথা হেঁট করে ঘরে ফিরে গেল, বিকালের মধ্যে রমতি পৌছাল, কিন্তু ভাবল এই মুখে কি করে বাড়ি ঢুকব, তার চেয়ে সন্ধ্যা হলে ঘর ঢুকব। এই বলে একটা শিউলী গাছের ঝোপে লুকিয়ে রইল। একদিকে বৈকুণ্ঠ থেকে ধর্মরায় পাত্রের এই অবস্থা দেখে হেসে হনুমানকে বললেন, পাত্র বেটা অপমানিত হয়ে চুনকালি মেখে রমতিতে লুকিয়ে আছে, ওর আরও কিছু হেনস্তা হওয়া দরকার, তুমি আরও কিছু ব্যবস্থা কর। মায়াধরের কথা শুনে হনুমান তখুনি গণক বেশ ধরে হাতে পাঁজি নিয়ে রমতি নগরে পাত্রদের ঘরে এলেন। খড়িপেতে বলতে লাগলেন -- আজ শুক্রবার ষষ্ঠি, সিংহ রাশি একাদশে চন্দ্র, আয়ুস্মান যোগ, মহাপাত্র ময়না ভুবন গেছেন, শীঘ্রই তাঁর আগমন হবে, কিন্তু আজ রাতে একটা অকল্যাণ দেখছি, সন্ধ্যার সময় এক ভূত আসবে, বাড়ির লোকজনদের নাম করে ডাকবে বলবে - আমি পাত্র, বাড়ি এসেছি। কিন্তু তোমরা সাবধানে থাকবে, দোর খুলবে না। এই বলে হনুমান চলে গেলেন। গণকের কথা শুনে পাত্রের বাড়ির লোকজন দরজায় ভাল করে খিল দিয়ে দিল। ঠিক সন্ধ্যার সময় পাত্র এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে , কেউ ঘর খুললো না তখন পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই পোড়া মুখে চুনকালি মাখা অবস্থা দেখে বাড়ির সব লোকজন ভূত বলে ঝাঁটা জুতো লাথি মারতে লাগল। পাত্র প্রাণ ভয়ে নিজের ঘর ছেড়ে গৌড়ে পালিয়ে গেল। গৌড়েশ্বরের কাছে গিয়েই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অচেতন হয়ে পড়ল, তারপর জ্ঞান ফিরলে রাজাকে বললো -- লাউসেন হাকন্ড না গিয়ে কানড়ার বেশ ধরে এস আমাদের সব দলবলকে কেটে শেষ করে দিয়েছে। আমি কোন রকমে এই অবস্থায় প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। এই কথা শুনে রাজা চিন্তা করতে লাগলেন, এখন কি করা যায়।

৪) ধর্ম পূজায় লাউসেনের দেহ খন্ডিকরণ ও পশ্চিমে উদয়ের বর প্রাপ্তি ঃ

এদিকে হাকন্ডে লাউসেন এক মনে ধর্মের পূজা করে যাচ্ছেন। এক সময় পূজার অর্ঘ্য মাটিতে পড়ে গেল। এই দেখে লাউসেন কেঁদে হায় হায় করতে করতে মাথায় ঘা দিতে লাগলেন। সামূল্যার পা ধরে বললেন-- মাসি আমার কি অপরাধ হল যার জন্য দেবতাকে নিবেদিত অর্ঘ্য মাটিতে পড়ে গেল। মা-বাবা বন্দী আছেন। মাতুল আমার পরম শত্রু, এই অভিমানে মা প্রাণ ত্যাগ করলেন কিনা কে জানে। এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বললেন-- মাসি এখানেতো কেউ নাই যে ময়না থেকে খবর এনে দেবে। লাউসেনের ভাবনা দেখে দুই পাখি শুক আর শারি বললো -- মহারাজ আপনি চিঠি লিখে দিন, আমরা ময়না গিয়ে সংবাদ এনে দেব। এই পাখিদের বচনে সেন আনন্দিত হয়ে কলিঙ্গাকে চিঠি লিখে দিলেন -- দেশের সব সমাচার বিস্তারিতভাবে জানাতে বললেন। কৃষ্ণাচতুর্দশী অন্ধকার রাত্রিতে শুক শারি রাম রাম রাধাকৃষ্ণ বলতে বলতে খুব দ্রুত গতিতে উড়ে ভোর বেলায় ময়নায় পৌছাল। যুদ্ধবিধস্ত ময়নার ছারখার অবস্থা দেখে কিছুই চিনতে পারছিল না। তারপর একটা বাড়ির ভেতর ডালিম গাছ দেখে চিনতে পারল। সেখানে বসে কলিঙ্গার নাম করে দুজনাতে ডাকতে লাগল। ধুমসী ঘুম থেকে উঠে ডালিম গাছে মানুষের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি করে কানড়াকে গিয়ে বললো - ডালিম গাছে ভূতএসেছে, মানুষের গলা করে কে যেন ডাকছে। কানড়া ধুমসী দুজনাতেই ডালিম গাছের তলায় গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাখি দুটি মা বলে কানড়ার হাতের ওপর বসে তার মুখপানে চেয়ে দেখতে লাগল, দেখল ইনি কলিঙ্গা নন। কিন্তু পথশ্রমে মুখে কোন শব্দ করতে পারছে না। তখন কানড়া তাদের

মুখে জল দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন।

শারি ও শুক একটু সুস্থ হলে কানড়া লাউসেনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন - কতদিনে পশ্চিম উদয়ের বর পাবেন, কতদিন পর তিনি আসবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কানড়ার কথা শুনে শারি শুক বললো — এই পত্রের মধ্যে সব সমাচার লেখা আছে, আমাদের কলিঙ্গার কাছে নিয়ে চলুন। তখন কানড়া বললেন — পাত্রের সেনারা এসে ময়না ছারখার করে দিয়ে গেছে। শাকা শুকা কালুবীর সব মারা গেছে। তারপর কলিঙ্গাও যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। কলিঙ্গার নিধনের কথা শুনে শারি শুক অন্তরে খুব দুঃখ পেল, তাদের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরল না, শুধু চিঠি লিখে দিতে বললো -

'এত শুনি কানড়া লিখেন সমাচার।	নিজ কুলে কমল উদিত শশধর।।
শ্রীযুক্ত ময়নাপতি মঙ্গলৈকাগার।।	সব গুনে রত্নাকর বিখ্যাত ভূতলে।
পরম দেবতা প্রাণনাথ পূজ্যবর।	কানড়া প্রণাম করে চরণ কমলে।।'

(২৮৭০)

তারপর লিখলেন আপনি হাকন্ড পুরী যাবার পর পাত্র ভূপতির দল বল নিয়ে এসে ময়না আক্রমণ করেছিল। লখ্যা প্রথমে শত্রু পক্ষের তিন লক্ষ সেনাকে ক্ষতম করে, শাকা শুকা ও বহু সেনা নিহত করে যুদ্ধ জয় করেই ফেলেছিল, কিন্তু কৌশলে পাত্রের দলবল শাকা শুকাকে হত্যা করে, তারপর ষড়যন্ত্র করে কাম্বা ডোমকে দিয়ে কালুবীরকে হত্যা করিয়েছে। সেই দেখে বড়দি (কলিঙ্গা) নিজে যুদ্ধে যান এবং পাত্রের অনেক সেনা নিধন করেন, কিন্তু নিরস্ত্র হয়ে পড়লে পাত্রের সেনারা দিদিকে হত্যা করে, রণে আহত হয়ে অভির পাখরেরও মৃত্যু হয়। পাত্রের দলবল লঙ্কাপুরীর মত ময়না নগর ছারখার করে দিয়েছে। তাই ভবানীর পূজা করে আমি নিজে যুদ্ধে যাই, ধর্মের কৃপায় ভবানীর সহায় আপনার আশিসে রণজয় করে আসি, মামাশ্বশুরকে প্রাণে না মেরে মুখে চুনকালি মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। কলিঙ্গার সৎকার করেছি, তারপর আগামী চৌদ্দই কার্ত্তিক অশৌচান্ত হবে, আপনি নিজে পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম করবেন। আপনার চিত্রসেন ভাল আছে। শ্বশুর শাশুড়ী সকলেই ভাল আছেন।

'শ্রীচরণে কিমধিক নিবেদিব আর।
তোমার কুশলেতে কুশল সভাকার।।
তারিখ তেরই তুলা দ্বিপ্রহর রাতি।
খাম কর‍্যা বান্ধিল পক্ষীর গলে পাঁতি।।' (২৯০৬)

তারপর পাখিকে সম্মান করে আকাশে উড়িয়ে দিলেন। শারি শুক পবন বেগে হাকন্ডে লাউসেনের কাছে পৌছাল, সেন শারি শুকের মুখে জল দিয়ে সকলের সামনে চিঠি পড়তে লাগলেন। কলিঙ্গার মৃত্যু সংবাদে লাউসেন অচেতন হয়ে পড়লেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে কলিঙ্গার জন্য কান্নাকাটি করতে লাগলেন। সামূল্যা মাসিকে বললেন — মা বাবা গৌড়ের কারাগারে বন্দী, আমি এখানে পশ্চিম উদয়ের বর পেলাম না। কলিঙ্গা মারা গেছে, তোমরা সব বাড়ি ফিরে যাও। আমার এখানে মরণই ভাল।

সামূল্যা সেনের মুখে হাতে জল দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন — শোক নিবারণ কর, কলিঙ্গার পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করে মহাপদ্ম দিয়ে ধর্মের পূজা কর। মনোরথ পূর্ণ হবে, তখন

লাউসেন বললেন - হাকন্ডের জলে প্রবল স্রোত, তাছাড়া সমুদ্রের জলে পদ্ম ফোটে কোথাও শুনি নাই। সামুল্যা বললেন - জলের কমল নয়, চার মহাপদ্ম হল - মহেশের পাদপদ্ম, হরির লোচন, বিধাতার নাভিপদ্ম, আর চতুর্থ কমল হচ্ছে তোমার বদন। তুমি যদি তোমার বদন কেটে আদ্য পূজা কর, তাহলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হবে। লাউসেন সামুল্যার এই কথা শুনে মনে খুব দুঃখ পেলেন। মনে মনে বললেন - মাসিকে আমি মায়ের অধিক জ্ঞান করতাম, সেই মাসি আমার মাথা কাটতে বলছেন, তবে কি মাসির সঙ্গে মামার যোগসাজস্ আছে। সেন চুপ করে আছে দেখে সামুল্যা ভাবলেন লাউসেনের মনে সন্দেহ আছে, তাই তিনি সেনকে বললেন - তোমাকে আমি কোলের ছেলের মত দেখি, তোমার অনিষ্ট আমি চাই না, তোমার জন্মের সময়ও তোমার মা শালেভর দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে, দয়ার ঠাকুর ভগবান তোমার মায়ের প্রাণ দান করে পুত্র বর দিয়েছিলেন, তারপর তুমি জন্মগ্রহণ করলে। আমি জাতিস্মরা, সবই জানতে পারছি, তোমার বদন কমল দিয়ে ঠাকুর নিরঞ্জনের পূজা কর, সব সমাধান হবে।

সামুল্যার কথা শুনে লাউসেন একমনে একভাবে ঠাকুর ধর্মরাজ নিরঞ্জনের পূজা করতে লাগলেন। চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তারপর যজ্ঞকুন্ড জ্বাললেন।

অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি লাউসেন ধর্মরাজের পূজার জন্য ডান হাতে খড়্গ নিয়ে বাম হাতের মাংস কেটে যজ্ঞ কুন্ডে আহুতি দিলেন- সেই মাংস জবা ফুল হয়ে বৈকুণ্ঠে ধর্মের চরণে গিয়ে পড়ল, এইবার ডান অঙ্গের মাংস অগ্নি কুণ্ডে আহুতি দিলেন। সেই মাংস রক্ত পুষ্প হয়ে অনাদ্যের পায়ে গিয়ে পড়ল। এরপর তিনবার ধর্ম ধর্ম বলে নিজের মাথা কেটে ধর্মের চরণে অঞ্জলি দিলেন। সামুল্যা তাড়াতাড়ি তেকাঠায় সেই মস্তক তুলে রেখে দিলেন।

দেব লোকের সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন, লাউসেনের দেহ নব খন্ড হতে দেখে সাঙ্গজাত সকলে অচেতন হয়ে পড়ল। তারপর ব্রাহ্মণ পরোহিত সামুল্যা, কপিলা গরু এবং সব সন্ন্যাসী, শারি শুক সকলে একে একে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

'ধর্মের গাজন সব হইল শ্মশান।
ভনে বসু নরসিংহ সাপক্ষ ভগবান।।'(৩০৬০)

সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হলে বাটুয়া কুকুর সেনের দেহ আগলে রইল যাতে ডাশমাছি কাক চিল যেন ঐ দেহ স্পর্শ করতে না পারে। ধর্মের গাজন স্থলে স্ত্রী হত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যা, গো হত্যা এই তিন হত্যার মহাপাপ ধর্মের উপর গিয়ে পড়ল। তখন হনুমান বলল - প্রভু, তোমার বরপুত্র লাউসেন হাকন্ড ভুবনে তোমার পূজার জন্য নিজের দেহ নখন্ড করে অঞ্জলি দিয়েছে। তার সঙ্গে সাঙ্গসুর সবাই মারা গেছে, সেখানে গো, ব্রাহ্মণ আর নারী হত্যা হয়েছে। এই পাপ থেকে মুক্তির জন্য

'বারমতি পরিপূর্ণ করিতে যদি চাও।
পশ্চিম উদয় বর দিতে তবে যাও।।' (৩১০৬)

পবন নন্দনের এই কথা শুনে উনকোটি দেবতাকে নিয়ে প্রভু ভগবান পুষ্প রথে হাকন্ডে এলেন।

গাজনের স্থানের কিছুটা দূরে রথ রেখে পদব্রজে সন্ন্যাসী বেশে গাজনের স্থানে গেলেন। দ্বারের কাছে যেতেই বাটুয়া কুকুর পথ আগলে দাঁড়াল, ঠাকুর বললেন -- আমি লাউসেনকে দেখতে যাব, আমাকে পথ ছেড়ে দাও। এই শুনে

'বাট্টা বলে না ছাড়িব বিনা পরিচয়ে।'

বাটুয়ার কথা শুনে দয়াময় ঠাকুর হেসে বললেন -

'আমি ধর্ম ঠাকুর যুগের যুগপতি।
সৃষ্টি স্থিতি পালয়এর আমি বঠি গতি।।' (৩১৪২)

বাট্টা বলে এই কথায় আমার বিশ্বাস হয় না, যদি তোমার চর্তুভুজ মূর্ত্তি দেখাও আমার বিশ্বাস হবে।

'এত শুনি চতুর্ভুজ হল্য নারায়ণ।
বনমালা গলে দোলে গরূড় বাহন।।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শোভে চারিহাথে।
রূপ দেখি বাটুয়া চরণ বন্ধে মাথে।।' (৩১৫২)

বাটুয়া সবার আগে সচক্ষে নারায়ণের দর্শন পেল। তাই --

'বর মাগে বাটুয়া জুড়িয়া দুই কর।
ঠাকুরায়ে কৃপা কর প্রভু মায়াধর।।
শঙ্করী চরণে শিবে হও কৃপান্বিত।
ধর্মের আজ্ঞায় নরসিংহ রচে গীত।।' (৩১৬০)

এরপর প্রভু নিরঞ্জন গাজনের স্থানে গেলেন। দেখলেন লাউসেনের খন্ড বিখন্ড দেহ, আর তেকাঠায় মস্তক। সেই দেখে ঠাকুরের চোখ ছল ছল করে উঠল। হাতে মুন্ড তুলে নিয়ে তার খন্ডিত দেহে মাথা জোড়া দিয়ে তাতে পদ্মহাত বুলিয়ে দিয়ে মহামন্ত্রে প্রাণ সঞ্চার করলেন। তারপর অন্তরীক্ষে রথে গিয়ে বসলেন। লাউসেন চোখ খুলে চারদিক চেয়ে দেখলেন কেউ কোথাও নাই, তখন তিনি বললেন -- আমি তো মারা গিয়েছিলাম, আমাকে জিইয়া দিল কে? যদি কৃপাই করলে প্রভু পশ্চিমে উদয়ের বর দাও, নতুবা আমি আবার নিজেকে খন্ডিত করব, এই বলে লাউসেন পুনর্বার হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে গলায় বসাতে গেলেন, আর তখনই ঠাকুর লাউসেনের ডান হাত ধরে বললেন -- তোমার পূজায় আর সাহসে আমি সন্তুষ্ট, তুমি বর নাও। চোখের সামনে ঠাকুরকে দেখে তাঁর পায়ে প্রণিপাত হয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন -- আপনার চরণ কমল দেখে আমার জীবন সার্থক হল। মনের আশা আপনার চর্তুভুজ মূর্ত্তি আর দশ অবতার রূপ দেখার, তারপর বর চেয়ে নেব --

'ভক্তের অধীন ধর্ম দয়ার নিধান।
মৎস্য কুর্ম্মরূপে দেখা দিল ভগবান।।
দেখাল্য বরাহ রূপে ধরণী উদ্ধার।
ধরিল নৃসিংহ রূপ দেখ্যা চমৎকার।।
অতি খর্ব তনুরূপ দেখাল্য বামন।
ভৃগুরাম রূপ হরি হাথে শরাসন।।
'দুর্বাদল শ্যাম আর হলধর রাম।
বৃদ্ধ রূপ দেখাইল কল্কি পরিণাম।।' ৩২৭২
'ভক্তের ভক্তির ভাবে অকপট ভাব।
চতুর্ভুজ রূপ তবে হল্য পদ্মনাভ।।' (৩২৭৬)

পশ্চিমে রবির উদয় পালা

ঠাকুর নিরঞ্জনের দশ অবতার রূপ এবং চতুর্ভূজ রূপ দেখে লাউসেন মোহিত হয়ে তাঁর চরণ যুগলে প্রণিপাত হয়ে জোড় হাতে পশ্চিমের উদয়ের বর প্রার্থনা করলেন। ঠাকুর নিরঞ্জন হেসে বললেন — বাছা, তুমি অসম্ভব বর চাইছ। কত যুগ বয়ে গেছে, সূর্য কবে পশ্চিমে উদয় হয়েছেন? তুমি অন্য বর চাও। ঠাকুর নিরঞ্জনের এই কথা শুনে লাউসেন জোড় হাত করে বললেন - আমার মা বাবা গৌড়ে বন্দী হয়ে আছেন, পশ্চিমে উদয় না দিলে তাঁদের বন্দী দশা ঘুঁচবে না, আমি সেই কারণে কঠোর আরাধনা করে আমার দেহ ন'খন্ড করে আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম, আপনার অসাধ্য কোন কিছুই নাই। পশ্চিমে উদয়ের বর যদি না পাই তাহলে আমার এই প্রাণ রেখে কোন লাভ নাই, আমি পুনরায় এই প্রাণ ত্যাগ করব।

'এত শুনি হাসিয়া বলেন নিরঞ্জন।
দিনু বর পশ্চিমেতে উদয় তপন।।' (৩২৯৬)

প্রভু ধর্মরায়ের কাছে পশ্চিমে উদয়ের বর পেয়ে লাউসেন প্রভু নিরঞ্জনের চরণে আর একটি প্রার্থনা করে বললেন, প্রভু কৃপা করে আমার সাঙ্গজাত সকলের প্রাণ দান করুন।

লাউসেনের অনুরোধে —

'এক এক সভাকে জিয়ান ভগবান।।' (৩৩০০)

এরপর প্রভু ভগবান বৈকুণ্ঠে গমন করে দেবতাদের নিয়ে দেবসভা বসালেন। সভায় বল্লেন আমি লাউসেনকে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখার বর দিয়েছি। তোমরা সে কাজ মনোযোগ দিয়ে পূর্ণ কর। এই শুনে দেবতা সমাজ খুব আনন্দিত হলেন। ঠাকুর নিরঞ্জন চারদিক চেয়ে দেখলেন কোন কোন দেবতা দেব সভায় এসেছেন, এখানে সবাই এসেছে একমাত্র দিবাকর ছাড়া, প্রভু ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন সূর্য্যদেব আসেন নাই কেন? তখন দেবতারা বললেন - গো হত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যা আর স্ত্রী হত্যার পাপ প্রথমে সূর্য্যকে গিলতে গিয়েছিল, সেই ভয়ে সূর্য্য পাতালে লুকিয়ে আছে। এই শুনে ভগবান নারদকে বললেন - তুমি শিঘ্র সূর্য্যকে ধরে নিয়ে এস। ঠাকুরের কথায় নারদ সূর্য্যদেবকে হাকন্ডের দেব সভায় ডেকে আনলেন। সূর্য্যকে দেখে দেবতারা খুব আনন্দিত হলেন, সূর্য্যদেব ঠাকুর নিরঞ্জনকে জোড় হাত করে তাঁর চরণে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। ঠাকুর নিরঞ্জন সূর্য্যকে তাঁর সামনে বসিয়ে বললেন - দেবসমাজ তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তুমি একবার পশ্চিমে উদয় দিলে বারমতি পূর্ণ হয়, ধর্মের পূজা প্রসারিত হয়। ঠাকুর নিরঞ্জনের কথা শুনে ভাস্কর বল্লেন - প্রভু, আপনিই দিবানিশি নির্ণয় করে দিয়েছেন। সেই মতই আমি চলি। আজ কি করে এর ব্যতিক্রম করা যাবে। ঠাকুর নিরঞ্জন তখন বললেন - তোমার বাহন এক চক্রের রথ যেভাবে আবর্তন করে তাতে পশ্চিমে উদয় দেওয়া সম্ভব নয় ঠিকই, কারণ তোমার রথ একটি নির্দিষ্ট পথে আবর্তিত হয়। এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, তুমি আমার রথে আরোহন কর। এই রথ যে কোন দিকে যেতে পারে। ঠাকুর নিরঞ্জনের কথায় আনন্দিত হয়ে সূর্য্যদেব ভগবানের রথে উঠলেন।

৫. পশ্চিমে রবির উদয় : দেবকুলে কলরব উঠল পশ্চিমে রবির উদয় হবে। যত দেবতা, দেব নারী, দেব কন্যা সব হাকন্ডের কূলে এসে উপস্থিত হলেন। সূর্য্যদেব ভগবাননিরঞ্জনের রথে

উঠলেন, বাসুকী রথের দড়ি হলেন, আর সব দেবতা রথ টানতে লাগলেন, এমনকি প্রভু নিরঞ্জনও। একই বলে ভক্তের ভগবান। ভক্তের জন্য ভগবান কি না করতে পারেন। ঘোর অন্ধকার, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর দেবতাদের রশি টানার ফলে সূর্য্যকে নিয়ে ভগবানের রথ পশ্চিমে হাজির হল, সহস্র কিরণে দিবাকর পশ্চিমে উদয় হলেন—

'ঘোর অন্ধকার রাতি দ্বিতীয় প্রহর।
সহস্র কিরণেতে উদয় দিবাকর।।' (৩৩৭৬)

সবাই হরি হরি বলে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন, চারিদিকে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল। লাউসেন পশ্চিমে উদয় দেখে নাচতে আরম্ভ করে দিলেন, সেই দেখে পুরোহিত ব্রাহ্মণ সাঙ্গযাত সন্ন্যাসীরাও নাচ শুরু করে দিলেন। সামুল্যা জয় জয়কার দিতে লাগলেন। দেবতারা বললেন - লাউসেনের দ্বারা ত্রিভুবন উদ্ধার হল। গৌড় থেকেও ভূপতি গৌড়েশ্বর পশ্চিমে রবির উদয় দেখলেন। লাউসেনকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের নানা দ্রব্য দান ধ্যান করতে লাগলেন। এই সব দেখে পাত্রের মাথায় যেন আবার বাজ পড়ল। গৌড়েশ্বরকে বললেন - মহারাজ, পশ্চিমে রবির উদয় কেউ কখনও শোনে নাই, জয় ধোপার ঘর পুড়ছে তাই দেখে আপনি পশ্চিমে উদয় হয়েছে ভেবে দান ধ্যান করছেন, আপনি অযথা অর্থ নষ্ট করছেন, রাজা এক্ষেত্রে পাত্রের কথা শুনলেন না। কর্ণসেন রঞ্জাবতী কপূর্র সবাই দেখলেন পশ্চিমে উদয়, ময়নাতে কানড়া এবং অন্যন্যরাও দেখলেন। লাউসেন পশ্চিমে উদয়ের সাক্ষী করলেন হরিহর বাইতিকে। এরপর সর্য্যদেব নিজের পুর্বস্থানে ফিরে গেলেন, ধরণী আবার অন্ধকার হয়ে গেল, ঠাকুর ধর্মরাজ বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন। দেবতারা সব নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করলেন। পূজা পরিপূর্ণ করে লাউসেন সকল সাঙ্গযাতের সঙ্গে আলিঙ্গন করে সামুল্যাকে প্রণাম করে বললেন - মাসি তোমার প্রসাদেই ধর্মের দর্শন পেলাম আর পশ্চিমে রবির উদয় হল, তুমি পায়ের ধূলা দাও। পূজা সম্পন্নের পর ঘট বিসর্জন দিয়ে সকলে নৌকায় উঠলেন বাড়ি ফেরার জন্য।

'আসর সহিত ধর্ম হবে বরদায়।
বন্দিয়া মউর ভট্ট নরসিংহ গায়।।' (৩৪৪৮)

কুড়ি

স্বর্গারোহণ পালা

ধর্মজয় বলে নাবিকরা তরী ছাড়ল, সমুদ্রের ঢেউ উঠে সাততাল, –

'বামদিগে রহে মক্কা মদিনার ঘর।

দিবা নিশি যেখানে থাকেন পেগম্বর।।' (১৮)

ডানদিকে অনন্ত সাগর, যার অন্ত নাই, তাই নৌকা বামকূল ধরে ধরে এগিয়ে চললো - সেতুবন্ধ, কালিদহ পেরিয়ে নৌকা এল সাগর সঙ্গমে যেখানে ভগীরথ গঙ্গা এনে সাগর রাজার ষাট সহস্র পুত্রকে উদ্ধার করেছিলেন। কপিল মুনির আশ্রম দেখে নৌকা ভাগীরথী গঙ্গা দিয়ে এগিয়ে চললো - তারপর ত্রিবেণী, বালিঘাট, সুতি পেরিয়ে গৌড় নগরে পৌছাল। লাউসেন মনে মনে ভাবলেন প্রথমে বন্দীশালে মা বাবার সঙ্গে দেখা করে তারপর রাজার কাছে যাব। এই ভেবে লাউসেন বন্দীশালার দিকে এগুলেন দূর হতে দেখেন অন্নহীন মলিন বসন পায়ে বেড়ি অবস্থায় মা-বাবা দীন দুঃখির মত অতি কষ্টে রয়েছেন। সেই দেখে সেনের অন্তর ফেটে গেল, তারপর মা বাবার কাছে গিয়ে জোড় হাতে দুজনার চরণ বন্দনা করলেন, লাউসেনকে দেখে রাজারাণী খুব আনন্দিত, আনন্দাশ্রুতে তাঁদের বসন ভিজে গেল, সেন ভাই কর্পূরকে আলিঙ্গন করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। রাণী রঞ্জাবতী লাউসেনের কাছে হাকন্ডের ধর্ম পূজার ও পশ্চিমে রবির উদয়ের বিস্তারিত বর্ণনা শুনলেন। লাউসেনের স্পর্শে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর বন্ধন মুক্ত হল।

এদিকে পোতা মাজি এই সব দেখে গিয়ে মহাপাত্রকে চুপি চুপি সব বলে এল, বললো - লাউসেন ফিরে এসে বাবা মার সঙ্গে দেখা করেছে। কর্ণসেন রঞ্জাবতীর বন্ধন খসে পড়েছে। এই শুনে মহাপাত্র রেগে আগুন। সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে গিয়ে মনে মনে গালাগালি দিতে দিতে লাউসেনের চুলের মুটি ধরে বলে- বেটা চোর, হাকন্ড না গিয়ে সাঙ্গযাতদের সাজিয়ে এনে পশ্চিমে উদয়ের কথা রটিয়ে চুরি করে মা বাবাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা হচ্ছে। এই বলে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গেল। রঞ্জাদেবী ভায়ের দু'পা ধরে সকরুণ মিনতি করতে লাগলেন লাউসেনকে ছেড়ে দেবার জন্য।

'খল কি সরল হয়, না শুনে বচন।

লাউসেনে বান্দ্যা লয়্যা করিল গমন।। (১১০)

গৌড়রাজ দরবারে বসেছেন, এমন সময় পাত্র লাউসেনকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে বললো - ভাগ্নার মত ধূর্ত্ত পৃথিবীতে আর কেউ নাই, ঘরে লুকিয়ে থেকে কলিঙ্গার বেশে আমাদের দলবলকে কাটল, ভাগ্য জোরে প্রাণে বেঁচে গেছি, তারপর বলে পশ্চিমে উদয় দিয়েছি, এইসব মিছে কথা। পাত্রের এই সব কথা শুনে মেরুদন্ডহীন গৌড়েশ্বর লাউসেনকে বললেন - তোমাকে এমন বুদ্ধি কে দিল, নৃপতির কথা শুনে লাউসেন তাঁর হাক ভ যাত্রা, তারপর গভীরভাবে ঠাকুর নিরঞ্জনের পূজা, তাতেও বর না পেয়ে নিজের দেহ নয় খন্ড করা, সব সাঙ্গজাতের প্রাণ ত্যাগ এবং সবশেষে ঠাকুর নিরঞ্জনের বরে বার দন্ড দিবাকরের পশ্চিমে উদয়ের কথা নিবেদন

করলেন। লাউসেনের কথা শুনে পাত্র হেসে রাজাকে বললো - মহারাজ, ভাগ্না এই সভার লোকজনদের অন্ধ ভেবেছে। ওর দেহ যদি ন'খন্ড হয়ে থাকত তাহলে গায়ে অস্ত্রের দাগ থাকত। এই বলে পাত্র খল খল করে আবার হেসে উঠল।

পাত্রের কথা শুনে লাউসেন ভাবতে লাগলেন ঠাকুরের কৃপায় সব দাগ মিলিয়ে গেছে এখন কি উপায়। এই ভেবে মনে মনে বললেন -

'ধর্ম বিনা এসময় রক্ষা করে কে'

তাই মনে মনে ধর্মের ধ্যান পূজা করতে লাগলেন।

'দীনবন্ধু দীনের দয়াল ভগবান।	'জীবের জীবন তুমি চরাচর নাথ।
তপ্ত তৈলে সুধন্যার কৈলে পরিত্রাণ।।	অনন্ত মহিমা গুণ ত্রিজগৎ বিখ্যাত।।' ১৮০
ভকত বচ্ছল তুমি দুষ্টের দলন।	'বারে বারে বিপত্যে রাখ্যাছ ভগবান।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ।।'	গৌড়েতে এবার প্রভু কর পরিত্রাণ।।'১৮৮

প্রভু তুমি কৃপা করে পশ্চিমে উদয় দেখালে, আর এখানে পাত্র ভূপতিকে উল্টো পাল্টা বুঝাচ্ছে। আর ভূপতি পাত্রের কথা ছাড়া চলেন না। এবার প্রভু গৌড়েতে আমাকে পরিত্রাণ কর। লাউসেনের প্রার্থনায় ঠাকুর বৈকুণ্ঠে চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং ঠাকুরের কৃপায় লাউসেনের গায়ে যেখানে যেখানে অস্ত্র দিয়ে মাংস কেটে নেওয়া হয়েছিল সেই নয় জায়গায় বিরাট বিরাট কাটা দাগ সৃষ্টি হয়ে গেল। গৌড়েশ্বর সেই দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলেন, রাজ সভার সকলেই সচকিত, গৌড়েশ্বর লাউসেনকে পুরস্কৃত করলেন। সেই দেখে পাত্রের মাথা ঘুরে গেল, আবার চিন্তা করতে লাগলেন কি করে ভাগ্নাকে যম ঘরে পাঠাই, রঞ্জা কবে আটকুড়ি হবে, মাথা হেঁট করে এই সব ভাবতে ভাবতে কুট বুদ্ধি এল। রাজাকে বললো - মহারাজ, ভাগ্না ভোজবাজি জানে, আপনাদের ভোজবাজি দ্বারা গায়ের দাগ দেখালো, কখনও শুনি নাই পশ্চিমে রবির উদয়। জয়া ধোপা বনের মধ্যে ক্ষার পোড়াচ্ছিল। আর সেই আগুন দেখিয়ে ভাগ্না বললো - পশ্চিমে উদয় দিয়েছি। মিছে কথা বলতে ভাগ্নার জুড়ি নাই। পাত্রের কথায় গৌড়েশ্বর লাউসেনকে বললেন বাছা সভা মাঝে তোমার মিছে কথা বলা উচিত হয় নাই। লাউসেন তখন রাজাকে জোড়হাত করে বললেন - আমার কি যোগ্যতা আছে যে আপনার সাক্ষাতে মিছে কথা বলব। হাকন্ড যাওয়া, ঠাকুর নিরঞ্জনের পূজা করা, আর পশ্চিমে উদয়ের ঘটনা সম্পর্কে হরিহর বাইতি সব কিছু জানে, ও সাক্ষী আছে। ভূপতি বললেন ভাল কথা হরিহর আমার কাছে সাক্ষী দিয়ে যাক্। সাক্ষীর কথা শুনে পাত্র ভাবল খুব ভাল হল। হরিহরকে টাকা পয়সা দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়াব। আর মনে মনে বললেন—

'সংসারে যতেক দেখ সভে অর্থে বশ।	নিধন্যা লোকের হয় বিফল জীবন।
ধন হল্যে ধরণীতে বাড়া নাম যশ।।	দেখা পাই সভার যদ্যপি থাকে ধন।' (২৫৪)

হরিহরকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দেবাব ব্যবস্থা ও হরিহরের শূলি ঃ এই সব কথা ভেবে পাত্র রাজার ভান্ডার থেকে এক সহস্র মোহর চুরি করে হরিহরের কাছে গিয়ে ঐ মোহর হরিহরকে দিয়ে বললো - তুমি এই মোহরগুলি রাখ, আর রাজার কাছে গিয়ে বলবে পশ্চিমে উদয় হয় নাই। হরিহর টাকার লোভে রাজি হয়ে গেল। বললো -আমার স্ত্রী দীঘির ঘাটে জল আনতে গেছে। ও আসলেই আমি রাজ দরবারে যাব। এ'দিকে পুকুর ঘাটে বাইতির স্ত্রী দেখল বাহান্ন পূর্ব পুরুষ দাঁতে কুটো দিয়ে ছল ছল চোখে দাঁড়িয়ে আছে, বধুকে (বাইতি স্ত্রী) দেখে একে একে তাঁদের পরিচয় দিয়ে বলেন- তোমার স্বামী রাজ দরবারে মিথ্যে সাক্ষী দেবে, আমরা সবাই নরকস্থ হব। আমাদের সুবংশ বলে সুনাম ছিল, হরিহরও খুব সৎ ছিল, কিন্তু টাকার লোভে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি হয়েছে। ফলে আমাদের বংশের সকলের নরক বাস হবে। তুমি হরিহরকে নিরস্ত্র কর। পূর্বপুরুষদের এই করুণ অবস্থা দেখে বাইতিনী ঘাটে কলসী ফেলে রেখে হরিহরকে গিয়ে বললো - তুমি এত স্বর্ণ মুদ্রা কোথায় পেলে? হরিহর বল্লো - মিছা সাক্ষী দেবার জন্য পাত্র দিয়েছে। এই কথা শুনে বাইতিনী কপালে ঘা দিতে দিতে বল্লো -

'আজি কেন পাপে মন দিলে প্রাণনাথ

প্রায়শ্চিতে শুন্যাছি পাপেতে ধন যায়।	কি লাগিয়া ওহে নাথ পাপে দিলে মন।
পূর্বধন বিনষ্যতি পাপেতে করায়।।	পিতৃলোক করে দেখ নরকে (গ)মন।।' ৩১৮

এই বলে বাইতিনী স্বামীর পায়ে ধরে অনুনয় ।বনয় করতে লাগল, বললো - লাউসেন সত্য সত্যই পশ্চিমে উদয় দিয়েছেন, তুমি তার সাক্ষী, তুমি কি করে বলবে পশ্চিমে উদয় হয় নাই। আ‌. ..দর স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন নাই, যে ধনে পূর্বপুরুষরা স্বর্গে ঠাঞি পাবেন সেই সত্য কথা তুমি বলবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে -

'ধন লোভে বাইতির ভুল্যা গেল মন। '(১৮০)
ভনে নরসিংহ নব মল্লিকা নন্দন।।' ৩২৮

এদিকে হরিহরের বাড়ি থেকে ফিরে রাজ দরবারে বসে, পাত্র ইন্দা কোটালকে বললো - হরিহরকে ডেকে নিয়ে এস, ওকে সাক্ষী দিতে হবে। ইন্দা কোটাল কুটিল ছিল, সে তাড়াতাড়ি গিয়ে হরিহরকে ডেকে নিয়ে এল সাক্ষী দেবার জন্য। হরিহর ভূপতির সামনে উপস্থিত হলে রাজা বললেন -হরিহর, তোমার ধর্মে মতি আছে, তোমার পূর্বপুরুষরা দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি মিথ্যা সাক্ষী দিলে তাঁরা নরকস্থ হবেন,

'মিছা সাক্ষী দিলে তার নাহিক নিস্তার।
শতেক পুরুষ নরকস্থ হয় তার।।
তোর পূর্বপুরুষ আছয়ে দন্ডাইয়া।
সত্য সাক্ষী দিলে তারা যাবেক তরিয়া।।' (৩৪৮)

এই বলে হরিহরের হাতে তিল তুলসী গঙ্গাজল দেওয়া হল। এই দেখে বৈকুণ্ঠে ঠাকুর ধর্মরাজের মন চঞ্চল হয়ে উঠল, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন হরিহর মিথ্যা সাক্ষী দি'

সেনকে বিপাকে ফেলবে। তিনি তখন হনুমানকে দিয়ে বিদ্যাদেবী সরস্বতীকে ডাকিয়ে এনে বললেন- তুমি গৌড়দেশে গিয়ে হরিহরের কণ্ঠে বসবে, লাউসেন পশ্চিমে উদয় দিয়েছে। কিন্তু পাত্র হরিহরকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াতে চায়। হরিহর আমার সেবক, কিন্তু অর্থের লোভে হরিহর তার সর্বনাশ ঘটিয়েছে। হরিহর যেই মিথ্যা কথা বলতে যাবে তুমি তার মুখ দিয়ে সত্য কথা বলাবে। ধর্মরাজ ভগবানের এই কথা শুনে দেবী সরস্বতী গৌড়ের রাজ সভায় গিয়ে হরিহরের কণ্ঠে গিয়ে ভর করলেন। হরিহর রাজসভায় যেই মিথ্যা কথা বলতে গেল, ওমনি হরিহরের মুখ দিয়ে সত্য কথা বেরিয়ে গেল। হরিহর বললো - লাউসেন হাকন্ডে গিয়ে দশমাস ধরে প্রভুমায়াধরের পূজা করেও পশ্চিমে উদয়ের বর না পেয়ে নিজের দেহ নয় খন্ড করে দেবতাকে উৎসর্গ করলেন। সাঙ্গসুররা প্রাণ ত্যাগ করলেন, তখন প্রভূ পশ্চিমে উদয়ের বর দিলেন, এবং দিবাকরকে ডেকে পশ্চিমে উদয়ের আদেশ দিলেন, দিবাকর বার দন্ড পশ্চিমে উদয় দিলেন । হরিহর বাইতির সাক্ষদানে লাউসেনের জয় হল, আর বাইতির পিতৃলোক স্বর্গে গমন করলেন। তখন গৌড়েশ্বর লাউসেনকে হাত ধরে নিজের কাছে বসিয়ে সমাদর করলেন এবং যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন। মহাপাত্র ভাবল এবারও বেটা সম্মান পেয়ে গেল, আর কি করা যায়, তবে তার আগে হরিহর বাইতিকে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, এই ভেবে মাথা হেঁট করে চিন্তা করতে লাগল, আর পাত্র মাথা হেঁট করলেই অনেক কুবুদ্ধি বেরিয়ে আসে। তারপরই মনে মনে বললো - হরিহরকে শূলে চড়াবো। এই কথা বলেই রাজা গৌড়েশ্বরকে বললেন - আমি বুঝতে পারছিনা রাজ ভান্ডার থেকে কি করে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা চুরি হল। সিন্দুকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ছিল চোরে তা চুরি করে নিয়েছে। এই কথা শুনে রাজা হাহুতাশ করতে লাগলেন, বললেন - কোটাল কিভাবে চৌকি দিচ্ছে? কোটালকে ধরে নিয়ে এস।

একজনকে বলতে একশ জনায় গিয়ে কোটালকে ধরে নিয়ে এল। ইন্দাকে দেখে রাজা রেগে আগুন, বললেন - বসে বসে খাচ্ছিস আর ঘুমুচ্ছিস, ভান্ডার থেকে চুরি হয় কি করে? চোর ধরতে না পারলে তোর শির নেবো। ইন্দা কোটাল ঘরে ঘরে ঢুকে চোর খুঁজতে লাগল, তারপর হরিহর বাইতির ঘরে ঢুকে সিন্দুকের মধ্যে মোহর দেখে তাঁকে পিঠ মড়া দিয়ে বেঁধে চুলের মুঠি ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা হরিহরকে বললেন - তোমাকে ভাল বলেই জানতাম আর তুমিই হলে এদেশের বড় চোর, পাত্র সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে বললো - মহারাজ একে শূলে দিলে উচিত শাস্তি হয়। মহাপাত্রের কথায় রাজা হরিহরকে শূলে দিতে আজ্ঞা দিলেন। কোটাল ভৈরবি গঙ্গার ধারে শূলি কাষ্ঠ বসালো। সেখানে হরিহরকে নিয়ে আসা হল, হরিহর কোটালকে বললো - মৃত্যুর আগে একবার গঙ্গা স্নান করে তর্পণ করার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। তুমি অনুমতি দিলে সেই ইচ্ছা পুরণ হয়। কোটাল তাকে স্নান করতে অনুমতি দিল। হরিহর গঙ্গায় স্নান করে, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়েই প্রভূ নিরঞ্জনকে ডাকতে লাগলেন, এই অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। জলেরই নৈবেদ্য, জলের ধূপ, দীপ মনে মনে রচনা করে গঙ্গাজল দিয়েই ঠাকুর নিরঞ্জনের পূজা করে করে - ঠাকুর আজন্ম ভক্তি ভাবে তোমার পূজা করে এসেছি, কখনও কোন অন্যায় অধর্ম করি নাই, শুধু এই বার পাত্রের কথায় টাকার লোভে মিথ্যা সাক্ষী দিতে সম্মত হয়েছিলাম, সেই পাপেই কি এত বড় শাস্তি। প্রভূ এবার ক্ষমা কর, নচেৎ তোমার

সেবকের অপমৃত্যু হবে। বৈকুণ্ঠ থেকে ঠাকুর নিরঞ্জন হরিহরের ডাক শুনে হনুমানকে বললেন - হরিহর খুব বিপদে পড়েছে। পাত্র আর রাজা যখন হরিহরকে শূলে চড়াবে, তুমি অন্তরীক্ষে থেকে হরিহরকে তখন বৈকুণ্ঠে নিয়ে চলে আসবে। ঠাকুর নিরঞ্জনের কথা শুনে হনুমান রথে করে গৌড় যাত্রা করলো। গৌড়ের আকাশে রথ রেখে গঙ্গার ধারে শূলি কাঠের কাছে অদৃশ্য অবস্থায় রইল। এদিকে রাজা পাত্র সেখানে এসে উপস্থিত। হরিহরকে শূলে চাপাবার আদেশ দিলেন রাজা, সঙ্গে সঙ্গে জনা ছয় লোক হরিহরকে শূলের উপর চাপিয়ে দিল। শূলের উপর চাপাতেই হরিহর ঠাকুর মায়াধরকে প্রাণপনে ডাকতে লাগল, আর অন্তরীক্ষে থেকে হনুমান হরিহরকে কোলে করে তুলে নিয়ে বিমানে চাপিয়ে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল। সকলে দেখলেন হরিহর সশরীরে স্বর্গে চলে গেল।

'আকাশে উঠিল রথ দেখে সর্বজন।
সকায়েতে স্বর্গে গেলা বাইতি নন্দন।।
লোকজন সকলে লাগিল চমৎকার।
সভে বলে হরিহরি ধর্ম অবতার।।' (৫১৪)

সবাই বলাবলি করতে লাগল রাজা অবিচার করে হরিহরকে শূলি দিচ্ছিলেন। এই দেখে রাজা পাত্র দুজনাতেই বিপাকে পড়ল।

মহাপাত্র যখন দেখল এই শূলি কাঠে চাপতেই হরিহর স্বর্গে চলে গেল, নিশ্চয় এই শূলি কাঠ শুভক্ষণে নির্মান করা হয়েছে। এই শূলিতে যে চাপবে সেই স্বর্গে যাবে। এই অনুমান করে পাত্র তার বড় ছেলেকে ডেকে এনে বললো - তুমি এই শূলে চেপে স্বর্গে যাও, সেখানে গিয়ে হরিহরকে সমুচিত শাস্তি দাও, সে আমাকে অনেক দাগা দিয়েছে। এই শুনে পাত্রের বড় ছেলে কামদেব বললো - এ কথা তুমি কি বলছ, স্বর্গে গিয়ে ঝগড়া বিবাদ করা যায় না, তাছাড়া আমিতো কোন দিন কোন দেবতার সেবা করি নাই, কোন গুণে কে আমাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে? বাবা হয়ে কি করে ছেলেকে শূলে দেবে। ছেলের কথা শুনে পাত্র জ্বলে উঠে বললো - আমার চেয়ে তুমি ভাল বোঝ, এমন কুপুত্র ভগবান আমাকে দিয়েছে। এই কথা শুনে কামদেব বললো তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। এরপর কামদেবকে গঙ্গাস্নান করিয়ে কপালে চন্দন, গলায় মালা দিয়ে শূলে চাপিয়ে দিল, হীরাধার শূল কামদেবের ব্রহ্মতালু ভেদ করে বেরিয়ে গেল, কামদেব চিৎকার করতে করতে মারা গেল, সেই দেখে পাত্র বললো - এবেটা নিশ্চয় খুব পাপ করেছে, তাই স্বর্গে যেতে পারল না, এরপর পাত্র তার মেজ, সেজ এবং পরপর সব ছেলেদের নিয়ে এসে শূলে চাপাল এবং সবাই মারা গেল। এমন কি ছ'মাসের ছোট শিশুকেও মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এল —

'দেবকীর কোলে হৈতে লইয়া ছাওাল। কাড়িয়া কোলের শিশু লইল পাতর।
ধর্য়া লয়্যা যান যেন কংশ মহীপাল।। অমনি দিলেক তুল্যা শূলির উপর।।'
(৫৮০)

এই শিশু পুত্রও মারা গেল, এই ভাবে পাত্রের সাত পুত্র শূলিতে মৃত্যু বরণ করল। তখন কবি বলছেন --

'চিন্তিতে পরের মন্দ আপনাকে ধরে।
পুত্রগণ মৈল পাত্র হায় হায় করে।। (৫৮৬)

রঞ্জাবতী দেখলেন ভাইয়ের নিজের দোষে সব ভাইপোরা মারা গেল, বংশে আর কেউ রইল না। তাঁর নিজের দুঃখতো আছেই তবুও ভাইয়ের এই সাত পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর বুক ফেটে গেল। তাই রঞ্জাবতী পুত্র লাউসেনের দিকে একবার অনুনয়ের চোখে চাইলেন। মায়ের মনের কথা বুঝতে পেরে লাউসেন প্রভু নিরঞ্জনকে স্মরণ করে পাত্রের পুত্রদের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। সেই দেখে গৌড়েশ্বর অবাক হয়ে গেলেন। লাউসেনকে বিস্তর সম্মান করলেন, রঞ্জাবতী কর্ণসেনকেও বিস্তর পুরস্কার দিলেন। কিন্তু এত সবের পরেও মহাপাত্রের চেতনা হল না। এখনও তার নিষ্ঠুরতা গেল না। এখনও লাউসেনকে বিব্রত করার জন্য মহারাজকে বললো — মহারাজ, ভাগ্নেতো সকলের সামনে আমার মৃত পুত্রদের জিয়িয়ে দিল, ও তাহলে আমাদের সব মৃত সৈন্য সামন্তদের জিয়িয়ে দিক।

পাত্রের একথা শুনে লাউসেনের অন্তরে এতদিন পরে একটু ক্রোধের সঞ্চার হল। মনে মনে বললেন — বারে বারে এই নিষ্ঠুর মামা আমাকে নানা রকম দুঃখ দিচ্ছে, ঠিক কৃষ্ণের মামা কংশাসুরের মত। আর সব সময়েই ঠাকুর নিরঞ্জন রক্ষা করছেন, উদ্ধার করছেন। মনের অনুতাপে লাউসেন মাতুল মহাপাত্রকে অভিশাপ দিলেন। তার ফলে পাত্রের সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ রোগ দেখা দিল।

'হাত পা গলিয়া গেল খস্যা পড়ে মুখ।
ধর্ম নিন্দা করিয়া পাতর পাইল দুখ।।' (৬১৬)

রাজা গৌড়েশ্বর পাতেরর এই অবস্থা দেখে সচকিত হয়ে লাউসেনকে বললেন —

'অপরাধ মার্জ্জনা করিবে বাপধন।
যথোচিত শাস্তি হৈল ক্ষেমহ এখন।।' (৬২০)

রাজার কথায় লাউসেন কিঞ্চিত লজ্জিত হয়ে মামার রোগ নিরাময়ের হেতু রাত্রি বাসের বসন পাত্রকে দিলেন গায়ে বুলাবার জন্য। পাত্র সেই বসন তার গায়ের সর্বত্র বুলালো শুধুমাত্র মুখ বাদে। ফলে তার দেহ থেকে কুষ্ঠ রোগ নির্মূল হয়ে গেল। শুধু মুখে রয়ে গেল ধবল কুষ্ঠ।

'ধর্মবর পুত্রে পাত্র দিয়াছিল দুখ।
নিদর্শন ধর্মের ধবল রহে মুখ।।' (৬৩০)

ধর্মের মহিমা দেখে লোকে চমৎকৃত হলেন। গৌড় দেশে ধর্ম পূজা প্রচার হল। গৌড়েশ্বর কর্ণসেন লাউসেন রঞ্জাবতী ও কর্পূরকে নানা রকম উপঢৌকন দিয়ে বিদায় জানালে।

স্বর্গারোহণ পালা

বিদায়কালে লাউসেন ও কর্পূরকে কোলে টেনে নিয়ে বিদায় চুম্বন দিলেন। এরপর লাউসেনরা ভৈরবী গঙ্গা পার হয়ে রমতি নগরে দু'দিন কাটিয়ে ময়না যাত্রা করলেন।

'রাত্যে দিনে চল্যা যান আনন্দিত মনে।
উপনীত হৈল সভে ময়না ভুবনে।।'

রাম অযোধ্যায় ফিরে এলে প্রজাগণের যেমন আনন্দ হয়েছিল, লাউসেন ময়নায় ফিরে আসায় প্রজাগণের মধ্যে সেই রকম আনন্দ উচ্ছাসে ভরে গেল। ছোট বড় সবাই রাজবাড়ির দিকে ছুটে গেল তাঁদের দেখবার জন্য। জয়পতি মন্ডল ও অন্যান্য প্রজারাও এলেন নানা ভেট্ নিয়ে। কিন্তু স্বর্ণপুরী ময়না পত্রের অত্যাচারে ছারখার হয়ে গেছে। কলিঙ্গা, কালুবীর, অন্ডীর পাখর শাকা শুকা ও অন্যান্য দোলাইরা মারা গেছে। এই সব দেখে লাউসেন, রঞ্জাবতী, কর্ণসেন সকলে খুব অনুতাপ করতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠ থেকে ঠাকুর নিরঞ্জন সব দেখে বললেন আমার শুদ্ধ সেবক আদিত্য লাউসেন কলিঙ্গাদের জন্য খুব অনুতাপ করছেন। আমি ওদের ও রাজার দলবলদের জিয়াইয়া দেব। তারপর তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে ডেকে বললেন — তুমি ময়না গিয়ে সুধা বৃষ্টি কর, যাতে সবাই জীবিত হয়ে ওঠে। এই শুনে ইন্দ্র অষ্টগজ ও অমৃত কুম্ভের জল নিয়ে ময়না চললেন। হাতিদের দিয়ে সেই জল রণভূমিতে ছিটিয়ে দিলেন। কালুবীর, অন্ডীর পাখর, শাকা শুকা দোলাইরা, এবং গৌড়রাজের সৈন্যরা ও হাতি ঘোড়া সব বেঁচে উঠল। এই সব ঘটনায় চারদিকে সেনের জয়জয়কার পড়ে গেল। কিন্তু এত সবের পরও কলিঙ্গা প্রাণ ফিরে পেল না। কলিঙ্গার অভাবে লাউসেন বিলাপ করতে থাকেন। তখন বৈকুণ্ঠ থেকে ঠাকুর করতার হনুমানকে ময়না পাঠিয়ে দিলেন কলিঙ্গাকে জিয়াতে। হনুমান ময়না ভুবনে এসে লাউসেনকে বললেন — তুমি কলিঙ্গার জন্য এত বিলাপ করছ কেন, তোমার অন্যান্য স্ত্রীতো রয়েছেন, হনুমানের এই কথা শুনে লাউসেন বললেন — কলিঙ্গা আমার প্রধানা পাটরাণী আমার বাম অঙ্গ, আর পুরাণের রাণী হচ্ছে প্রধান' রাণীকে নিয়েই পূজা অনুষ্ঠান করতে হয়, তাই —

'যদি নাঞি জীবনে কলিঙ্গা পয়দল।
পাটরাণী বিনে মোর সকল বিফল।।' (৭১২)

লাউসেনের এই কথা শুনে হনুমান লাউসেনকে চিতার কাছে যেতে বললেন। কালিঙ্গার চিতার অঙ্গারের কাছে গিয়ে হনুমান ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে মন্ত্রপুত জল কলিঙ্গার অঙ্গারের মধ্যে জোরে ছিটিয়ে দিলেন। কলিঙ্গা প্রাণ ফিরে পেলেন। ময়না ভুবনে আনন্দের সীমা রইল না। ধর্মের মহিমায় সব ফিরে পেলেন লাউসেন। ময়নার ঘরে ঘরে ধর্মপূজার প্রচলন হল।

'আনন্দের সীমা নাঞি ময়না ভুবনে।
ধর্মপূজা বারমাস সর্ব নিকেতনে।।' (৭২০)

এরপর লাউসেন বেশ কিছুদিন রাজত্ব করলেন—

'রামের সমান রাজা প্রজাকে পালেন।' (৭২২)

লাউসেনের স্বর্গারোহন ঃ মর্ত্তে লাউসেনের ক্রিয়া কলাপ শেষ হয়ে আসায় ঠাকুর ভগবান হনুমানকে বললেন - তুমি রথ নিয়ে ময়না নগরে গিয়ে লাউসেনকে নিয়ে এস। মর্ত্তে আমার পূজা প্রচার শেষ হয়েছে, আর ওখানে থাকার প্রয়োজন নাই। ঠাকুরের কথা শুনে হনমুান রথ নিয়ে সেনের কাছে গিয়ে বললেন তোমার এই পৃথিবীর কাজ শেষ হয়েছে, তুমি স্বর্গে চল, তোমাকে নিতে মাধব আমাকে পাঠালেন।

'তুমি বঠ আদিত্য কশ্যপ বঠ তাত। কর্পূর পাতর ইনি অকৃত্রিম অঙ্গ।
চারি নারী বাসবের নর্তকী বিখ্যাত।। তোমা হৈতে প্রকাশিল পূজার প্রসঙ্গ।।'

(৭৩৬)

এইবার তুমি নিজের ঘর চল, হনুমানের কথা শুনে লাউসেন খুব আনন্দিত হলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম ছেড়ে স্বর্গে যেতে মন চাইছিল না। হনুমান লাউসেনের মনের কথা বুঝতে পেরে কলিকালের কিছু বিবরণ দিয়ে বললেন কলিকালে --

'অধর্ম অনেক হবে ধর্মলোপ পাবে।
সংসারের যত লোক অল্প আয়ু পাবে।।' ৭৬৪
'ফল ফুল ক্ষীণ হবে যত তরুবর।
গো ব্রাহ্মণ নারি ভ্রূণ হত্যা নিরন্তর।।
ধন লোভী ভূপতি হবেন অবিচারী।
লুট কর‍্যা লিবেন লোকের ঘর বাড়ি। ৭৭০
রাজকর বড়া হব দুস্থি হব লোক।
প্রজা পীড়া পাবেক সদত রোগ শোক।।'
'ডাকা চুরি দেশেতে হবেক অনুক্ষণ।
বলবানে লুটিবেক দুর্বলের ধন।।'

(৭৭৬)

কলিকালের এই সব অনেক কথা শুনে লাউসেনের মন স্বর্গে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। তখন তিনি হনুমানকে বললেন -- গুরুদেব কোন যুগে কে কোথায় প্রভু নিরঞ্জনের পূজা করে বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন আমাকে একটু শ্রবণ করাও। হনুমান তখন লাউসেনকে ধর্মপূজার বারমতি বলতে লাগলেন -- বললেন প্রথমে - ব্রাহ্মণ হরিহর একমনে ধর্মপূজা করে বৈকুণ্ঠে গমন করেন, দ্বিতীয় - ভোজরাজ মধুপুরে ভক্তি ভাবে নিরঞ্জনের পূজা করে বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন। তৃতীয় - কালু ঘোষ —

'ভক্তিভাবে নিরঞ্জনে দিল পুষ্পজল।
পরিণামে সে জনা বৈকুণ্ঠে পায় স্থল।।' ৮২৬

চতুর্থে - পুন্ডীব ঘোষ, পঞ্চমে পুর দত্ত উসত পুরেতে ধর্মের গাজন দিয়ে বৈকুণ্ঠপুরী গেলেন, ষষ্ঠে ধূস দত্ত, সপ্তমে (দেবরাজ) ইন্দ্র নিজে একভাবে ঠাকুর নিরঞ্জনের পূজা করে দেবতাদের মধ্যে প্রধান বা দেবরাজ হয়েছিলেন। এরপর (অষ্টমে) সন্ধ্যাপুরে পূজা দিলেন চন্ডাল, তার ভক্তি বলে সিদ্ধ ধানে অঙ্কুর বের হল, তিনিও স্বর্গে গেলেন। নবমে গদা ডোম আনন্দিত মনে ধর্মপূজা করে বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন। দশমে লঙ্কার রাজা দশানন যোলগত ভক্ত নিয়ে একমনে ধর্মপূজা করে বৈকুণ্ঠ ভুবনে যান, এরপর একাদশে তোমার জননী এক মনে প্রভু নিরঞ্জনের পূজা করে 'শালেভর' দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। মায়াধর তোমার মাকে জিয়িয়ে দিয়ে পুত্র বর

দিলেন, সেই বরে তোমার জন্ম, তারপর --

'দ্বাদশ পূজিলে তুমি বিখ্যাত ভুবনে। কলিকালে তোমা হৈতে পূজার প্রচার।
পশ্চিমে উদয় বর দিলা নিরঞ্জনে।। বিমানে বৈকুণ্ঠে চল কশ্যপ কুমার।।' ৮৬২

হনুমানের কাছে ধর্মপূজার বারমতি শুনে লাউসেন কর্পূরকে বললেন -- ভাই আর কেন, এখন চল স্বর্গে যাই। এরপর দু'ভাই রাজা কর্ণসেনের কাছে গেলেন, লাউসেন পিতাকে বললেন - আপনি আমাদের সঙ্গে এই রথে করে স্বর্গে চলুন। কর্ণসেন তখন বললেন -- এই সমাজ, রাজত্ব, সংসার কাকে দিয়ে যাব। চিত্রসেন এখন ছোট শিশু, আমি স্বর্গ গেলে তার কি গতি হবে। লাউসেন পিতার মন বুঝে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে বল্লেন - 'স্বর্গে চল জননী বিমানে করি ভর'। রাণী রঞ্জাবতী পুত্রের কথা শুনে বললেন -

'পতিব্রতার পতি গতি বেদের বচন।
স্বামী ছাড়া স্বর্গে যাব এ কথা কেমন।' (৮৮৪)

মায়ের কথা শুনে লাউসেন মাকে বললেন - তুমি এখন বার বৎসর পৃথিবীতে থাক, তারপর বিচিত্র বিমানে বৈকুণ্ঠে যাবে। মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কালুবীরকে বললেন - কালু, রথ এসেছে স্বর্গে চল। কিন্তু স্বর্গে মদ মাংস পাবে না বলে যেতে রাজি হল না। তখন লাউসেন কালুবীর, জয়পতি মন্ডল, ও অন্যান্য প্রজাদের সুখে শান্তিতে থাকার বর দিয়ে বিদায় নিলেন। কবি নরসিংহ বসুও এই অংশে ঠাকুর মায়াধরের কাছে আত্মীয়, বন্ধু সকলের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন।

'বসু বংশে অবতংশ মথুরা বসুজা। প্রতক্ষে বিভব দিবে ধনপুত্র ধান।
সদা যার সাপক্ষ শঙ্করী অষ্টভুজা।। কৃপা কর্য়া ধর্ম কর্য় সভার কল্যাণ।
তার বংশে পুত্র কন্যা যত হয় যার। কদাচিৎ কেহ যেন দুঃখ নাঞি পায়।
সভাকে করিবে দয়া প্রভু করতার।। সদা সুখে সভাকে রাখিবে ধর্মরায়।।

অপরাধ ক্ষেমহ ঠাকুর মায়াধর।
ভনে নরসিংহ আশীর্ব্বাদ অতঃপর।।' (৯১০)

লাউসেন স্বর্গে যাবেন এই কথা চারদিকে প্রচার হয়ে গেল, নগরের লোকজন সেই দৃশ্য দেখার জন্য ছুটে এলেন। কুমার চিত্রসেনকে রাজ্যভার দিয়ে সবার হাতে হাত সমর্পণ করে লাউসেন রথে বসলেন।

'বাম দিকে কলিঙ্গা দক্ষিণে বিদ্যাধরী। ডানদিকে বসিলেন কর্পূর পাতর।
বিমলা বসিলা আর কানড়া সুন্দরী।। সম্মুখে রহিলা ঘোড়া অম্ভীর পাখর।' ৯২০

এরপর বিমানের ঘোড়া আকাশ পথে উঠে গেল, সবাই আকাশ পানে চেয়ে রইল। দেখাদেখি লাউসেনের রথ দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল।

'স্বর্গদ্বার সন্মুখে হইলা সন্নিধান। তারপর বৈকুণ্ঠে দিলেন দরশন।
মন্দাকিনী জলে সভে করিল স্নান।। লাউসেন দেখিয়া উঠিয়া নিরঞ্জন।।

হাথে ধর্য়া কত কথা বদন সহাস।
তোমা হৈতে হৈল মোর পূজার প্রকাশ।।' (৯৩৬)

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল ঃ সমাজ ভাবনা

তারপর প্রভুনিরঞ্জন লাউসেনকে বললেন — পৃথিবীতে গিয়ে অনেক অন্যায় অবিচার পাপ কার্য দেখেছো, সেইসব পাপী তাপী ব্যক্তিদের কি রকম সাজা হয় একবার যমপুরে গিয়ে দেখে এস। লাউসেন যমপুরে গিয়ে দেখলেন নানা পাপীর নানা রকম শাস্তি হচ্ছে। এই সব দেখার পর লাউসেনরূপী আদিত্য নব কলেবরে আপন ঘরে চলে গেলেন। চার বিদ্যাধরী (লাউসেনের স্ত্রীরাও) আপন স্থানে গেলেন। কর্পূর প্রভু নিরঞ্জনের কাছে গেলেন। অভীর পাথর গেল সূর্যের কাছে।

ধর্মের পণ্ডিত পূজার ঘট বিসর্জ্জন দিলেন। এবং পুনরায় আসার জন্য আহ্বান জানালেন।

'গচ্ছ গচ্ছ বৈকুণ্ঠে ঠাকুর করতার। আবাহন দেবতা স্বস্থানে যায়্যা বস্য।
পূজা আবাহন কালে আস্য পূনর্বার।। পূজা আবাহন কালে পূনর্বার আস্য।।'
(৯৮০)

'নরসিংহ নিবেদয় চরণ কমলে।
চন্দ রায়ে নিরঞ্জন রাখিবে কুশলে।।' (৯৮৪)

এরপর কবি ধর্মরাজের কাছে সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করে গীত সমাপ্ত করেছেন।

'সভাকে কল্যাণে রাখিবে করতার। সদা কাল করি যেন তোমার কীর্ত্তন।।
মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবে সভার।।' ১০০৮ ঘুমে পাসরিলে গীত না পড়িলে মনে।
'অন্নজলে সুখেতে রাখিবে নিরঞ্জন। ১০১১ অপরাধ তাহার ক্ষেমহ নিরঞ্জনে।।'

নরসিংহের অপরাধ ক্ষেম নিরঞ্জন।
সঙ্গীত সম্পূর্ণ হরি বল সর্বজন।।' (১০১৬)

ইতি শ্রী ধর্মমঙ্গল সমাপ্ত।

গ্রন্থসূত্র ঃ
১) ডঃ সুকুমার মাইতি সম্পাদিত - নরসিংহবসুর ধর্মমঙ্গল।
২) পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ - ডঃ রজতকান্ত রায়।
৩) গৌড়ের ইতিহাস - রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
৪) শ্রীশ্রীগীতামৃত - সম্পাদনায় - শ্রী সতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশনায় - শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বানন্দ গিরি।
৫) উদ্বোধন পত্রিকা - বৈশাখ - ১৪০৯, চতুর্থ সংখ্যা।
৬) 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' - (শ্লোক সরবরাহ করেছেন - শ্রীশিশির ভট্টাচার্য্য মহাশয়)।
৭) বর্ধমানের বড় মানুষ - শ্রী সুধীরচন্দ্র দাঁ।
৮) মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস — ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

কবি নরসিংহ বসুর স্মৃতিচারণ সভায় তাঁর কাব্যগ্রন্থে মাল্যদান করছেন রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি মাননীয় সুধীরচন্দ্র দাঁ, সহযোগিতায় শ্রীনিবারণ চন্দ্র বসু। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ড. সুকুমার মাইতি
ফটো ঃ পঞ্চানন মুখার্জ্জী

কবির স্মরণসভায় কবিকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় সুধীরচন্দ্র দাঁ, শাঁকারী রামকৃষ্ণ আশ্রমের মাননীয় অধ্যক্ষ মহারাজ ও লেখক সহ রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যবৃন্দ। ফটো ঃ পঞ্চানন মুখার্জ্জী

বিঃ দ্রঃ ১। এই গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠার ২৯ ছত্রের প্রারম্ভে 'সফিকুল আলাম খাঁ' এর পরিবর্তে 'রফিকুল আলাম খাঁ' হইবে। ২। গ্রন্থের ম্যাপগুলির স্কেল অনুযায়ী নহে।

কবির স্মরণসভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন কবির দশম প্রজন্মের সদস্যা ড. মঞ্জরী সরকার (বসু)

ফটো ঃ পঞ্চানন মুখার্জ্জী

কবির স্মরণসভায় শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী।

ফটো ঃ পঞ্চানন মুখার্জ্জী

পারাশষ্ট - ৪

আলোচনা ও পরিশিষ্ট অংশের নির্ঘন্ট

ষ

স

হ